ত্রিভুবন

সমরেশ বসু

ত্রিভুবন

সমরেশ বসু

: প্রাপ্তিস্থান :
কামিনী প্রকাশনী
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম কামিনী প্রকাশনী সংস্করণ :
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৯০

দ্বিতীয় সংস্করণ :
মাঘ, ১৩৯৩

প্রচ্ছদ :
সত্য চক্রবর্ত্তী

মুল্য :—পাঁচশ টাকা

মুদ্রাকর :
দি বি. জি. প্রিন্টার্স
১৯এ. গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ত্রিভুবন

: প্রকাশকের নিবেদন :

নয়নপুরের মাটি, মিছিমিছি, যাত্রিক, সমরেশ বসুর প্রিয় তিনখানি বিখ্যাত উপন্যাসের এই সংকলন (ত্রিভুবন) বাংলার রসিক পাঠক পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা বিশেষ আনন্দিত। আমাদের এই পরিকল্পনার উপহার পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলে বাধিত হব।

—প্রকাশক

নয়নপুরের মাটি

॥ ১ ॥

খালের ধারে শাবল দিয়ে খুঁড়ে মাটি তুলছিল মহিম। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে চটকে টিপে টিপে মাটির এক একটা টুকরো নিয়ে পরখ করে দেখছিল। কিন্তু পছন্দ হচ্ছিল না, আবার শাবল নিয়ে উবু হয়ে খুঁড়ে চলছিল।

এখন ভর দুপুরবেলা। নিস্তব্ধ খালপার। সূর্য হেলে পড়েছে খানিক পশ্চিমে।

খালের জলের রঙ আর গতি দেখলেই বোঝা যায় নদী খুব কাছেই। তা ছাড়া, খালের এপার ওপারও ছোটখাটো একটি নদীর মতই চওড়া। যতদূর গেছে, তত সরু হয়ে গেছে খাল। নদী কাছে বলেই হাওয়ার গতি একটু বেশি।

খালের ধারে বাড়ি-ঘরদোর চোখ পড়ে না। খানিকটা দূরেই দু' পারেরই গ্রামের চিহ্ন চোখে পড়ে। পশ্চিম দিকে গিয়ে খাল দক্ষিণে মোড় নিয়েছে প্রায় আধ-মাইলটাক দূরে। এ আধ-মাইল পর্যন্তই গ্রামের চিহ্ন ক্রমশ কালচে ক্ষীণ রেখাতে দিগন্তে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে কয়েকটা বেমানান তাল, নারকেল, দেবদারু জাতীয় উঁচু মাথা? ওগুলো দূরাগত যাত্রীদের গ্রাম বা পাড়া চিনতে সাহায্য করে।

উঁচু পাড়। দেখলেই বোঝা যায় এ দেশের জমি উঁচু, মাটি শুকনো কিন্তু ফলবন্ত। বিশেষ করে খালের ধারে ধারে এ গ্রামগুলো ঐশ্বর্যবান যে বেশি, তা খালধারের সবুজ শস্যে ভরা মাঠের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। খালের উঁচু পাড়ের জমিগুলো যে পর্যন্ত চোখে পড়ে, প্রায় সম্পূর্ণ ই দিগন্তবিসারী ধানখেত। সবুজের সোনা। কোথাও কোথাও

পাঁশুটে ছোপের হালকা আভাস দিয়েছে। অর্থাৎ ধান পাকার দেরি নেই আর।

অজস্র ধারা সূর্যের আলোতে কিশোরী ধানগাছ তার উত্তোলিত গ্রীবা বাঁকিয়ে উঁচিয়ে ধরেছে রসে-গন্ধে-বর্ণে-সম্ভারে পূর্ণ যৌবনকে। তারই নাচন লেগেছে তার হেলানো-দোলানো নরম মাথায় কোটি মানুষকে তার মাতাল ডাকের মাথা দোলানি—ঘরে ঘরে নেশা, চোখে চোখে স্বপ্নের ছায়া ঘনিয়ে নিয়ে আসার মাথা দোলানি।

খালের ধারে ধারে সাদা-কালো বকের ঘাড় কাৎ ক'রে বিচক্ষণ শিকারীর ভঙ্গিতে ধীর বিচরণ চলেছে। পানকৌড়ি পাখী একটা টুকটুক করে জলে ডুব্‌ছে আর উঠ্‌ছে পাহিহাঁসের মত, আর ঘন ঘন তার তীক্ষ্ণ ঠোঁটের ডগায় চক্‌চক্ করে উঠছে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফটানো জ্যান্ত ছোট মাছ। আর তাই দেখে দেখে মাঝে মাঝে দু'একটা লোভী বক পানকৌড়ির ঠোঁট থেকে মাছটা ছিনিয়ে নেবার জন্য সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে তার মাথার উপর দিয়ে। কিন্তু হার মানতে হচ্ছে বক-গুলোকে। সামনেই একটা বেলগাছের উপর, বোধ হয় পাকা বেল দেখেই একটা দাঁড়কাক নিস্তেজ গলায় কা কা করছে। মাঝে মাঝে আকাশের কোল থেকে শিকারী চিল ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় খালের বুকে। শিকার নিয়ে চিঁচিঁ কান-ফাটানো ডাক ছেড়ে আবার সোঁ সোঁ করে উড়ে যাচ্ছে বহু দূর আকাশে।

সূর্যের তেজ আছে, কিন্তু নারকেল গাছের পাতাগুলো কি সুন্দর শ্যামল চিকনধারে চক্‌চক্ করছে। ঋতু শরতের রঙ্ এটা। শরতের শেষ। খণ্ড খণ্ড সর-পড়া মেঘে-ছাওয়া-আকাশ, দেশ হতে মহাদেশান্তরে পাড়ি-জমানো চলন্ত মেঘ। বলা যায় না, খেয়ালী শরৎ কোন মুহূর্তে বলা-কওয়া নেই বাদল ডেকে নিয়ে আসে। আবার নাও আসতে পারে। কারণ হেমন্তের আমেজ পড়তে আরম্ভ করছে।

প্রকৃতি এ খেলা দেখবার এখন সময় নেই মহিমের! সে এখনও শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলেছে। তার ঘর্মাক্ত শ্যামলাঙ্গে সূর্যের আলো পড়ে নারকেল পাতার শ্যামল চিকন বর্ণের মতই চক্‌চক্ করছে

একমাথা কোঁচকানো এলোমেলো চুল। বহুদিন না কাটার জন্য ঘাড়ের উপর দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে বেয়ে পড়ছে চুল। মাঝে মাঝে ওই মাটি হাতেই রুক্ষ মাথাটা চুলকে, ধূসর মাটির রঙে ছেয়ে ফেলেছে মাথাটা। ভেজা কাদা-মাটিতে অনেকখানি ডুবে গেছে পা দুখানি।

তার সামান্য লম্বাটে মুখখানি বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে উঠেছে। পরিশ্রমে আর রোদের তাপে চোখ দুটো হয়ে উঠেছে লাল। কোমল মুখখানিতেও রক্ত জমে শ্যামল মুখ বেগুনী রঙ ধারণ করেছে।

আরও খানিকক্ষণ খুঁড়ে শাবল দিয়ে খোঁড়া অন্ধকার সরু গর্তটায় হাত ঢুকিয়ে দিল সে। আঁচড়ে আঁচড়ে তুলে নিয়ে এল এক খামচা মাটি। মাটির বর্ণ দেখেই তার হাসি ফুটল মুখে। টিপে টিপে দেখল। ভারি নরম আর মিহি, যেন বহু কষ্টে চটকানো এক নম্বর ময়দার দলা। টেনে টেনে দেখল। স'জনে আঠার মতই লম্বা হয়ে যায় মাটি, অল্পতেই ছ্যাক্ড়া মাটির মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় না!

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে খুঁড়ে খুঁড়ে গর্তের মুখটা বড় করে নিয়ে খামচা খামচা মাটি তুলে সঙ্গে নিয়ে আসা বালতিটা ভরে তুলল। ইতিমধ্যে সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমে। গাছের ছায়াগুলো পূর্বদিকে লম্বাটে হয়ে পড়েছে।

খালের জল পাল্টা গতি নিয়ে গা' দিয়েছে ভাঁটার টানে। মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা ভেঙে, ধানখেতের ওপারে গাঁয়ের ভিতর থেকে মানুষের সাড়া-শব্দের ক্ষীণ শব্দ আসছে।

নদীর দিক থেকে জলে বৈঠার ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে ডিঙি নাচিয়ে নাচিয়ে এল শম্ভু মালা।

এপার নয়নপুর, ওপার রাজপুর।

মহিমকে দেখে শম্ভুর বোজা মুখটা একটু হাঁ হয়ে গেল। মুখে একটা দুঃখ প্রকাশ করবার বিচিত্র শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠল সে, ওগো, ও মহিম, বলি খালধারডারে কাটবা নাকি সবখানি?

মহিম তখন শাবল রেখে দিয়ে কোমরে বাঁধা গামছাটা খুলে গায়ের ঘাম মুছছে! শম্ভুর কথায় তার ক্লান্ত শুকনো ঠোঁটে একটু সলজ্জ হাসি

দেখা দিল। কথার কোন জবাব দিল না।

আরে বাবারে বাবা! ছেলের কাণ্ড ছ্যাখো দি'নি! শম্ভূ তার তামাক-খাওয়া কেশো গলায় হেসে বলল, সে কোন্ বেলাতে দেখে গেলাম, মাটি মিলল না এখনো মনের মত?

তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল ছোট ছোট শাবল দিয়ে খোঁড়া অনেকগুলো গর্তের দিকে চেয়ে। এ যে কঁ্যাকড়ার গর্ত করে ফেলেছ যে কুড়িখানেক।

সত্যি মহিম করেছে কি? তাকিয়ে দেখল এবার সে নিজের চোখে। এলোমেলো গর্ত করেছে সে অনেকগুলো। আবার তাকাল সে অবিকল একটি মেয়েমানুষের মত সলজ্জ হাসিচোখে শম্ভূর দিকে।

ভারী দিলদরিয়া শম্ভূ মালা আবার হেসে উঠে আচমকা থেমে গেল। কিন্তু একেবারে হাসি তার মিলিয়ে গেল না। বলল, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক!

তারপর তার প্রৌঢ় দেহের পেশীগুলোর ওঠা-নামার তালে তালে বৈঠার চাড় দিল জলে। ভাঁটার টান কেটে কেটে ডিঙি এগিয়ে চলল রাজপুরের সদরঘাটের দিকে। কি যেন সে বিড় বিড় করছে ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নিচু করে।

যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ার মত থেমে যায় সে। যেন কেউ তাকে বারণ করে দিয়েছে হাসতে, কথা বলতে।

কিন্তু না, এ সব কথা এখন ভাববার সময় নেই মহিমের। মাটি ভরা বালতিটা নিয়ে খাল পাড় থেকে গাঁয়ের পথ ধরল সে।

বাড়ি এসে বালতি থেকে মাটি তুলে নিয়ে একটা কাঠের পাটাতনের উপর রাখল। ঘটিতে জল এনে দুহাত দিয়ে যদৃচ্ছা মত ঘেঁটে চট্‌কে কুটো কাঁটা কাঁকর সমস্ত একটি একটি করে বেছে ফেলল! সে মাটি মোটা চ্যাঁচাড়ি দিয়ে চেঁছে চেঁছে তুলল একটা মালসায়। তাতে ঘটিখানেক জল ঢেলে সাবধানে আল্‌গোছে তুলে রাখল ঘরের এক কোণে।

মহিমকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ইতিমধ্যে ভিড় করছে গুটিকয়েক

ছেলেমেয়ে। অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে, কৌতূহলে বড় বড় চোখগুলো দিয়ে তারা মহিমের কাজকর্ম দেখছিল। রোজই দেখে, ভিড় করে, গোল হয়ে বসে সবাই দেখে! কথা বলতে বারণ আছে মহিমের। অখণ্ড নীরবতার সঙ্গে বিস্মিত কৌতূহলে ড্যাবাড্যাবা চোখগুলো নিয়ে চিরকালই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দল ভিড় করে থাকে তার দরজাটির কাছে।

তাকে সমস্ত গুটিয়ে রাখতে দেখে একটি ছোট ছেলে জিজ্ঞাসা করল, এবার কি বানাবে মহিমকাকা?

এবার!

মহিমের টানাটানা চোখ দুটোতে হঠাৎ যেন স্বপ্ন নেমে আসে। চোখের দৃষ্টি অন্তরাবদ্ধ হয়ে যায়। ঠোঁট অদ্ভুত হাসিতে ফাঁক হয়ে যায়। কি অপূর্ব দৃশ্য যেন তোর চোখের সামনে রয়েছে, এমনি পলক-হীন বিস্ময়ে মুগ্ধতায় স্বপ্নাচ্ছন্ন তার চোখ। এমনি বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন থাকে সে অনেকক্ষণ।

ছেলেমেয়েরা তর্কযুদ্ধ চালায় নিজেদের মধ্যে। মহিমের দিকে তাদের আর ততটা খেয়াল থাকে না। মহিমের এমনি খেয়ালিপনা তারা অনেক দেখেছে। এমনি কথা বলতে বলতে থেমে যাওয়া, কি যেন ভাবা, এমনি অন্য জগতে চলে যাওয়া। পাগলের মত।

হ্যাঁ, পাগলই হয়ে যায় মহিম তার নিষ্পাপ কল্পনারাজ্যে বিচরণ করতে করতে। সে শিল্পী! ভাবরাজ্যেই তার বিচরণ। তার সে ভাবরাজ্যে আনন্দ-বেদনায় আশায় ভরপুর। সমস্ত হৃদয়টুকুর সবখানি অনুভূতি দিয়ে সে তার ভাবরাজ্যকে স্পর্শ করতে চায়, চায় হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত রূপখানি চোখের সামনে এনে হাজির করতে। হাসি-মিশ্রিত এক অদ্ভুত কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে সে, বুকটার মধ্যে অযথা টনটনানিতে ফেটে পড়তে চায় যেন! কেন? কেন মনে হয়, বুকটা যেন বড় ভারী, দীর্ঘশ্বাসে তা শুধু আরও ভারী হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুখোমুখি তর্ক থেকে হাতাহাতি লেগেছে।

মহিম গিয়ে সামনে পড়ে থামায়, ধমকায়। দু-একজন ওস্তাদ ছেলেকে কানমলাও দেয়।

গরু নাকি এগুলান্, অ্যাঁ? মারামারি করছে দ্যাখো।

ও কেন আগেতে মারল, সেটা বল। একজন অভিযোগ করতেই পাল্‌টা আর একজনের কান্নামাখানো গলা জবাব দেয়, দ্যাখো না মহিমকাকা, আমি বলছি বলে কি, তুমি এবার একটা গণেশঠাকুর গড়বে, আর ও অমনি কুঁজো কানু মালার মতো করে ভ্যাংচাল।

এ দরবার এবং বিচার প্রহসন কতক্ষণ চলত বলা যায় না। হঠাৎ সভাস্থল একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল একজনের আবির্ভাবে। ছোটরা সব টুকটুক সট্‌কে পড়তে লাগল এধার-ওধার।

মহিমের বড় ভাইয়ের বউ অহল্যা। এ সংসারের বহুদিনের গিন্নি। ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। আজ পঁচিশ বছর বয়সে সন্তানহীনা এই নারী পরিবারটির মধ্যে একমাত্র মেয়েমানুষ। ভাল-মন্দ, আপদ-বিপদ—সমস্ত কিছুই যার উপর দিয়ে অহর্নিশ বয়ে চলেছে। সবকিছুতেই তাকে মানিয়ে চলতে হয়, সমস্ত দিক বজায় রেখে এই পঁচিশ বছরের বউটি সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে! নিরবচ্ছিন্ন সুখ না হোক, সুখ-দুঃখে এ সংসারকে সে চালিয়ে আসছে। স্বার্থপর নীচ তার স্বামী মহিমের বৈমাত্রেয় দাদা ভরতের সমস্ত দুঃশাসনকে মুখ বুজে সয়েও সে শান্ত। ভারতের স্বার্থপরতা নীচতা ঘরের চেয়ে বাইরেই বেশি, আর তারই বিযাক্ত ঢেউ ঢুকে অপমানে জ্বালিয়ে দেয় তাকে। ভরত ঘর ভরাতে বাইরে যে আঘাত করে, যে নিষ্ঠুরতা নিয়ে চলে—সে তা জানে না—সে নিষ্ঠুরতা তার ঘরের ভিতরে কি অপমানিত বিষ-তীব্রতায় বিদ্ধ করে।

ন' বছর বয়সে তাঁর বিয়ের সময় মহিম পাঁচ বছরের শিশু। দুরন্ত স্বামিকে জব্দ করতে না পারলেও, এ অতিশিশু আপনভোলা দেওর-টিকে সে ভাই-বন্ধুর মত তার বালিকা-চঞ্চল হরিণীর ভীত বুকটাতে জড়িয়ে ধরতে পেরেছিল। আশ্রয় পেয়েছিল তার বাপ-মা-ছেড়ে-আসা ছোট বুকটা ওই শিশুটিরই কাছে।

শিশুটি সেদিন ওকে বুকে করে নিয়ে খেলতে দেখে অহল্যাকে ভুল ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল, তোমার কিন্তু দাদার সঙ্গে বিয়ে হইছে, মোর সাথে নয়।

য়্যাঁ! তাই নাকি গো বুড়ো? খিল্‌খিল্ করে হেসে কুটোপাটি হয়েছিল অহল্যা। সই-বান্ধবীদের ডেকে ডেকে বালিকা সেদিন তার শিশু অর্বাচীন দেওরটির গম্ভীর বুড়োর মত ভুল ভাঙানোর গল্প বলেছিল। ও মা গো! এ কি বুড়ো ছেলে রে বাবা!

শাসন বলতে যা বোঝায়, অহল্যার পক্ষে মহিমকে তার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন। তবু মাঝে মাঝে ধমক দিতে হয় বই-কি। থাকতে হয় রাগ করে, না খেয়ে, কথা না বলে, যদি শান্ত মহিম কখনো সখনো বেয়াদবি করে বসে।

সবই ঠিক ছিল, তবু নিতান্তই অহল্যার বাঁধা বীণার তারে কোথায় যেন কোন তারে একটুখানি বেসুর বাসা বেঁধেছিল। কোথায় যেন ছিল ছোট্ট একটি কাঁটা, আর একটুখানি ক্ষত, সেখানে অনুক্ষণ ক্ষতে আর কাঁটার খোঁচাখুঁচিতে অনুদিন রক্ত ঝরে। সে কি অহল্যার এই পঁচিশ বছরের রসে-গন্ধে ভরা, মহান যৌবনের ভারে বলিষ্ঠ দেহ-বৃক্ষটির মূল ফলহীনা বলে? অহল্যার সন্তানহীনতাই কি সেই হারানো সুর?

কিন্তু সেদিন থেকে সকলেই নির্বাক? ভরতের কোন অভিযোগ থাকলেও সে আশ্চর্যরকম নীরব এই ব্যাপারে। মহিমের এ চিন্তা কখনো মনে এসেছে কি-না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এ সংসারটির যত সমস্ত চিন্তা-ভাবনা অহল্যার একলার।

অহল্যা মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে, ভ্রূ কুঁচকে ঠোঁট চেপে ক্ষুদে পলাতকদের চেয়ে দেখে। মহিম ইতিমধ্যেই একবার অহল্যার মুখভাব দেখে নেয়। বউদি যে রেগেছে একথা বুঝতে পেরেই সে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করতেই অহল্যা ধমকে উঠল, থাক্। মাটি কাটা হয়েছে তোমার?

বড় ভাল মাটি পেয়েছি আজ, জানলে? হাতে নিলে মুখে দিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

ত' তাই দেখলেই পারতা!

যেমন চকিতে এলো তেমনি চকিতে দড়াম্ করে দরজা ঠেলে অহল্যা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এ রাগ অনর্থক নয়; মহিম তা বুঝতে পারে। খুব সম্ভবত তার মাটি কাটার দেরির জন্যই এ রাগ। কিংবা হয়ত ভরত কিছু বলেছে, না হয় তো ঝগড়া করেছে পড়শীদের কারুর সঙ্গে। সংসারের প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও এমনি রাগ মাঝে মাঝে করে থাকে অহল্যা।

সে কিছু না বলে বড় ঘরের দাওয়া থেকে খড়মজোড়া আর গামছাখানা নিয়ে বাড়ির পেছনের ডোবায় গিয়ে নামে। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে, গুটানো কাপড়টা ঠিকঠাক করে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হয়।

নেও, কি হইছে কও। অপরাধজনিত হাসি নিয়ে অহল্যার কাছ-খানটিতে বসে সে।

কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না অহল্যা। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি থেকে হাতায় করে আধসেদ্ধ চাল নিয়ে টিপে টিপে দেখে। দেখে, ভাত ক'টা হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাৎ করে ঘটি থেকে জল নেয় ডান হাতে। হাত শুদ্ধ করে বড় একটা মানকচুর আধখানা কেটে নিয়ে ফেলে দিল হাঁড়িতে।

হাত চলে, কাঁচের আর পিতলের চুড়িগুলো ঠুনঠুন্ করে বাজে। কিছুক্ষণ মহিমও কোন কথা বলে না। দেখে আর শোনে। নিস্তব্ধ থম্‌থমে মুখখানি অহল্যার ধোঁয়ায় আরে আলোতে ঝাপসা। সাবেকী নাকছাবিটা চিক্‌চিক্ করে ওঠে থেকে থেকে। বৌদিকে দেখলে মাঝে মাঝে বনলতাকে মনে পড়ে মহিমের। বৈরাগীর মেয়ে বনলতা। তিনটি স্বামীকে সে পর পর হারিয়েছে। লোকে বলে, খেয়েছে। সত্যই তাই, বনলতার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করতে ভরসা হয়না কারুর বড় একটা। বনলতাও মাঝে মাঝে এমনি কারণে অকারণে মহিমের উপর রাগ প্রকাশ করে থাকে অহল্যার মত, নিস্তব্ধ থমথমে মুখে। তবে সে হল অন্য কারণ অন্য রকম।

অহল্যার অভিযোগ তো তাকে শুনতেই হবে! এ যে ঘর, ঘরের

ব্যাপার। সম্বন্ধ আলাদা আলাদা কারণ।

এখানেও আছে মান-অভিমান, রাগ-দুঃখ, আছে বন্ধুত্ব। তার সঙ্গে আছে দায়িত্ব, কর্তব্য। বনলতা প্রতিবেশিনী, শৈশবের বন্ধু, একসঙ্গে পাঠশালায় পড়েছে। সেখানকার বন্ধুত্বে দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই—নেই ভার।

কি করেছি, কও, মহিম অধৈর্যের সঙ্গেই বলে, কিন্তু হাসেও।

অহল্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চোখে একবার মহিমের দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ ঝেঁজে ওঠে, তোমরা ভেবেছ কি বল তো! মোরে কি পাগল করে ছাড়বা?

তা কি করেছি, বলবা তো?

বলব? দেখে মনে হয় আরও রেগে উঠেছে অহল্যা, সেই সকালে তোমাকে বলে রাখছি কি যে, ও বেলাতে পাতুর দোকান থে' মশলাপাতি আর তেলটুকুন এনে দিও। তা খুব তো দিলে?

মহিম প্রকাণ্ড বড় করে জিভ কেটে একেবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ইস, মাইরি বলছি বউদি, একেবারে ভুলে গেছি।

তো ওই রকম ভুলেই থাকো। তা হলেই রান্নাখাওয়া সব হবেখন।

বলে সে উননে আগুন উস্‌কে দিতে দিতে আপনমনে বলে, কে বলবে এ বাড়িতে দুটো পুরুষমানুষ আছে। আজ এরে বলি, কাল ওরে বলি—এটা এনে দাও। ওটা এনে দাও। কেন রে বাপু?

সাংসারিক অভিযোগ যতগুলো আছে, সবগুলো যেন হুড়মুড় করে এখনই মনে আসতে লাগল সব অহল্যার। ক'দিন ধরে বলছি ডোবাটাতে আর নামা যায় না, কোদাল কুপিয়ে ধাপ দুটো কেটে দিও। তো সে কাকে বললাম। যেমন দাদা, তেমনি ভাই। একজন বেরুল, এর পেছনে কাটি দিতে, অমুকের মাথা ফাটাতে, মামলা পড়তে। আর একজন তো ভ্যালা মাটির কারবার ফেঁদে বসেছেন।

এই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল অহল্যা, তোমরা আর জ্বালিও না বাপু। ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাই,

যেদিকে যায় দু'চোখ। এক সকালবেলা চেয়ে চিন্তে তেল-মশলার কাজ চলল কোন রকমে। চাইব আর কত মানুষের কাছে। নেও, আর জিভ বের করে মা কালীর মতো—

পেছন ফিরে হঠাৎ থেমে গেল। ওমা, কাকে বলছে সে এত কথা। যাকে বলা, সে কোন্ ক্ষণে বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ কেমন মায়া লাগে, হাসি মিশ্রিত করুণায় বুকটার মধ্যে নিঃশ্বাস একটু ভারি হয়ে উঠল তার। আহা, অমন করে না বললেই হত। সেই জিভ কেটে লাফিয়ে ওঠা দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল, মানুষটা ভুলে গিয়েছিল। আপন-ভোলা গোবিন্দ একেবারে।

কিন্তু রাগ না করে, না বিরক্ত হয়েই কি উপায় আছে অহল্যার। অত ভুলোকে নিয়ে তো সংসার চলে না। একজন যদি ভুলো হয়েছে আর একজন হয়েছে নষ্টামোর মহারাজা। মহিমকে তবু দুটো কথা বলা চলে, ভরতকে মুখের কথা বললে সে এক কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলবে! তবে সংসারের পুরুষ মানুষের কাজগুলো করবে কে? আপ্‌সে আপ্‌সে চলবে না তো। ডোবার ধার কেটে না হয় অহল্যাই নিয়েছে, নেয় না হয় ছোটখাট এদিক ওদিককার দু চারটে কাজ চালিয়ে কোনরকমে করে কম্মে। তা বলে পাতুর দোকানে ঐ মিন্‌সের মেলায় তো পারে না অহল্যা সওদা আনতে যেতে। যেতে অবশ্য কোন বাধা নেই. যেয়ে থাকে তাদের ঘরে কত বউ-ঝি বাজারে দোকানে হামেশাই। কিন্তু ভরত সেদিক থেকে ভদ্দরলোক হয়েছে। মেয়েমানুষের আব্‌রু রাখতে শিখেছে সে। শিখেছে তার বাপের কাছ থেকেই। অবস্থা-বিশেষে যে একদিন মহাজন সেজে বসেছিল গাঁয়ে। হ্যাঁ, কামিয়েছিল ভাল ভরতের বাপ দশরথ। কিন্তু রেখে তো যেতে পারেনি কিছুই। কিছু পরিমাণ জমি ছাড়া। কিন্তু ওই জমির সঙ্গেই দশরথ রেখে গেছে এই আবরুটুকু বামুন কায়েতদের মত, আর জাতছাড়া সৃষ্টিছাড়া যত ফষ্টি-নষ্টি।

কই গো, মহিম বাড়ি আছ নাকি?

বাড়ির সামনে দেবদারু গাছের অন্ধকার তলাটা থেকে মোটা ভারি

গলায় ডাক শোনা গেল। গলাটা পরিচিত, কিন্তু মানুষটাকে চিনল না অহল্যা। জবাব না দিয়ে সে চুপ করে রইল। উদ্দেশ্য, সাড়া না পেয়ে ফিরে যায় যাক্। কিন্তু আবার বলল লোকটা এবার দু-চার পা এগিয়ে এসে। ঘরে আলো রইছে দেখছি। বাড়ির লোকজন গেল কই?

কেন, কে তুমি? কেরোসিনের ল্যাম্পটা নিয়ে এবার অহল্যা রান্নাঘরের দরজাটার সামনে দাঁড়ায়।

মহিম আছে?

ল্যাম্পের আলোয় অহল্যা লোকটাকে ভাল করে চিনতে পারল না। বলল, না!

আমি বাবুদের বাড়ি থেকে আসছি। মহিম এলে পরে বাবুদের সঙ্গে একটু দেখা করতে বলো, বুঝলে? লোকটা কথা শেষ করে চলে যাওয়ার পরিবর্তে আরও দু'পা এগিয়ে এল।

বাবুদের বাড়ি মানে, জমিদারের বাড়ি। সেখানকার এ আকস্মিক ডাকে চকিত মনটা উৎকণ্ঠায় ভরে গেল অহল্যার।

কি জানি, গোলমাল বাধিয়ে এসেছে হয়তো আবার।

লোকটা হঠাৎ দ্রুত আরও কয়েক পা এসে হেসে বলল, কে, ভরতের বউ নাকি?

অহল্যা একটু চমকে উঠলো। ভাল করে আলো ধরে লোকটার মুখ চিনে এবার হাসল, কে, পরান দাদা? আমি বলি—কে না জানি। তা ঠাকুরপোরে ডাকল যে হঠাৎ তোমাদের বাবু।

হাত উলটে বলল পরান, কি জানি, কি পিতিমে না কি করবে বুঝি তাই। এমন সময় মহিমও এল পাতুর দোকান থেকে সওদাপত্র নিয়ে। বলল, কি হয়েছে পরানদা?

তোমার ডাক পড়েছে ভাই, একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করে এসোগে।

পরান চাকর, ছোট জাত, কিন্তু বড় মিষ্টি তার স্বভাব। জাতে বাগ্‌দী হলেও আজীবন বাবুদের বাড়িতে থেকে বাবুদের মতই তার

মোলায়েম কথাবার্তা ! তা ছাড়া, বাবুরা যখন কলকাতায় গিয়ে বসবাস করে, পরানও বরাবর তাদের সঙ্গী হয়।

আমার যে আবার একটু অন্য জায়গায় দরকার ছিল। ক্ষণিক দো-মনা করে আবার বলল, আচ্ছা চল দেখি ঘুরে আসি একটু।

রাতটুকুন পুইয়ে এসো না যেন। পিছন থেকে কথাটা ছুঁড়ে দেয় অহল্যা মহিমের প্রতি।

মহিম বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসি তো আসব।

॥ ২ ॥

মহিম শিল্পী।

মহিমের বাবা দশরথের অবস্থা ভালই ছিল। যৌবনে অমানুষিক পরিশ্রম করে সে তার অবস্থাকে দাঁড় করিয়েছিল স্বচ্ছল। কারণ ছিল অবশ্য এর পিছনে।

যে সামাজিক আবহাওয়ার মধ্যে দশরথ মানুষ হয়েছে, সেখানকার দীনতা-নীচতা কাটিয়ে—মাঠের মানুষ দশরথের মনে একদিন যে আলোড়ন উঠেছিল—সেই আলোড়নের সাক্ষী তার অতীত—কৃত বর্তমানের স্মৃতিগুলোতে। তার ভিটেতে সেই চিহ্নই বর্ত্তমান।

স্বার্থপর ছিল দশরথ নিঃসন্দেহেই। তা নইলে অর্থকে পরমার্থ বলে চিনেছিল কি করে। কিন্তু স্বার্থপর হলেও চাষী—আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল তার প্রবল। সকলেরই সেই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে—ছিল সব চাষীরই। কেউ-ই তার নিজের অবস্থাতে সুখী নয়। কিন্তু দশরথের মনে তা যেন ভিন্ন ভাবে দেখা দিয়েছিল।

ক্ষুব্ধ দশরথ দেখেছিল কি প্রচণ্ড ঘৃণায়-দীনতায়-হীনতায় মিশে তাদের জীবন। জাতি হিসাবে বর্ণ হিন্দুদের প্রবল প্রতাপ, ছোট জাতকে অপমান করবার মহান অধিকার নিয়েই জন্মেছে যেন এই বর্ণহিন্দুরা। প্রতিটি সামান্য কারণে তাই দশরথ চিরকাল বিদ্রোহ

ঘোষণা করেছে এই সমাজের বিরুদ্ধে, প্রতিটি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য—তাদের প্রতি বর্ণ হিন্দুদের ফিরিয়ে দিয়েছে সে অত্যন্ত রূঢ় প্রতিবাদ করে, যে জন্য তার জাতি-ভায়েরা পর্যন্ত সংকোচ আর ভয়ের সঙ্গে প্রায় ত্যাগ করতে বসেছিল তাকে।

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঘৃণায় সেদিন দশরথেরও গা'টা ঘুলিয়ে উঠেছিল। চরম দারিদ্র্যই যে এর কারণ এ কথা জানতে পেরে। সেই থেকে তার মনে কি বদ্ধমূল আশা জুড়ে বসল—বর্ণ হিন্দু না হোক, ভদ্রলোক হতে তার বাধা কোথায়?

পুরনো ইতিহাস ঘেটে লাভ নেই। তবে এই পর্যন্ত, দশরথ লড়েছিল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে। তার সেই একক প্রচেষ্টা কার্যকরীও হয়েছিল। একজন কেউকেটা গোছেরই হয়েছিল সে, অবিকল ভদ্রলোকদেরই মত অমায়িক মিষ্টি ব্যবহার। বর্ণহিন্দুদের অনুকরণে গড়ে তুলেছিল সে নিজের পারিবারিক জীবন। মূল্যও পেয়েছিল বই কি! বর্ণহিন্দুরা খাতির করেছে তাকে, দেখেছে সমান নজরে। আপনি আজ্ঞে না করলেও আর অন্যান্য জ্ঞাতি-গোষ্ঠির মত তুই তোকারিও করেনি।

ফলে যে দশরথ চাষী মাঠে লাঙল বয়েছিল এককালে, তার ছেলেদের সে কোনকালের তরেও পাঠায়নি মাঠে। খুব বড় আশা ছিল তার—লেখাপড়া শিখবে তার ছেলেরা।

কিন্তু ভরত সেদিক থেকে তাকে প্রচণ্ডভাবেই নিরাশ করেছিল সে জীবিত থাকতেই। মহিমের শিক্ষার অঙ্কুরোদ্গম দেখে গেছে সে। মৃত্যুর সময়ে শিশু-মহিম তাকে কোন আশাই দিতে পারেনি তখন।

যদি বেঁচে থাকত তা হলে দেখে যেতে পারত, তার এই ছেলেটি শুধু পড়াশুনার ব্যাপারে নয়, অনেক খেয়ালে, বিচিত্র মানসিকতার গুণে কি অপূর্ব। আর দেখে যেতে পারত, তার এই ছেলেই সেই ছোটকালটি থেকে—কেমন করে মনের রূপকে মাটিতে রূপ দেয়।

তখন মহিম শিশু। দুর্গা পূজা এগিয়ে আসছে। কুমারেরা মূর্তি

গড়ছে মাটির, সমস্ত দেবদেবীদের। স্কুল পালিয়ে মহিম তখন শুধু কুমোরবাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করছে। শিশুর সেই বিস্ময়ান্বিত চোখের সেদিন পলক পড়তে চাইছিল না মাটির পুতুল-গুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, নেই লেখাপড়া, একমাত্র কাজ মাটির পুতুল বানাবার কারিগরি দেখা। প্রয়োজনমত ব্যস্ত কারিগরদের ফাই ফরমাস-খাটা থেকে শুরু করে ইস্তক তামাক ভরে দেওয়া পর্যন্ত। কিছুই বাদ যায়নি। প্রতিদানে শুধু তাকে ভাগিয়ে না দিয়ে চুপচাপ বসে সেই মূর্তি গড়া দেখতে দেওয়া। কুমোর তুলি টেনেছে, মহিম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাকিয়ে থেকেছে তুলির ডগাটিতে। এ বুঝি সরস্বতী মায়ের চোখের একটা মণি একটু বড় হয়ে গেল। গেছেও এমন কত সময়। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছে মহিম। এ কি করলে? হ্যাঁ, বিরক্ত হয়েছে অনেক সময় কুমোর কারিগরের দল। ছোঁড়াটার অনেক কথাই তাদের অতি ক্লান্ত মেজাজে এনে দিয়েছে রাগ, রুক্ষতা, দৃঢ়তা। তার পরম গুরু অর্জুন পালও এক এক সময় বিরক্ত হয়ে দিয়েছে লাগিয়ে থাই-থাপড়, দিয়েছে হটিয়ে সেখান থেকে। তবে হ্যাঁ, অর্জুন পাল ভালবেসেছিল মহিমকে। বুঝেছিল, ছেলেটার চোখে যেন থেকে থেকে স্বয়ং বিশ্বকর্মা ভর করে।

মহিম ফিরে এসেছে ঘরে! তারপর বয়ে বয়ে এনেছে তাল তাল মাটি। মূর্তি গড়েছে ভেঙেছে, কেঁদেছে, রেগেছে, থেকেছে উপোস। মার খেয়েছে ভরতের, ধমকানি খেয়েছে অহল্যার, কিন্তু শিশুর বুকে দমভারী এক রুদ্ধ বেদনায় মুক করে দিয়েছে তাকে! মনের চেহারা, হাতের মাটিতে দেয় না ধরা। আ! সে কি অসহ্য কষ্ট আর অশান্তি যা চাই, তা কেন পাই না? আবার গেছে ছুটে ছুটে, দেখেছে কারিগরদের কাজ। আবার তৈরী করেছে মূর্তি।

পেয়েছে, অনেক কষ্টে তারপর পেয়েছে। আর কিছু নয়, হাত খানেক লম্বা দশভূজার মূর্তি একখানি, পাগল, ছেলেমানুষ। চাষা দশরথের ছেলে আবার সেই মূর্তির পূজোও করেছে। গাদা ছেলেমেয়ের

দল এসেছে আবার সেই ঠাকুর দেখতে। মহিমের হাতে-গড়া ঠাকুর। ওমা! এ যে সত্যি দুগ্‌গা পিতিমের মতই হয়েছে গো। শুধু মহিমের সঙ্গী-সাথীরা নয়, ওই ভরত অহল্যার মত অনেক ভারী বয়সের মেয়ে পুরুষের মুখ থেকেই সেদিন ওই কথাগুলো ঘন ঘন বেরিয়ে গৌরবান্বিত করেছে শিশু-শিল্পীকে।

সেই আরম্ভ হল। কয়েক বছর কাটল—শুধু ঠাকুরের মূর্তি গড়ে। এদিকে লেখাপড়া যদিও চলল, কিন্তু তার দৌড়টা এল ঝিমিয়ে। ছেলে মূর্তি গড়তে পাগল। তার প্রতিভাকে অভিনন্দন জানাল সবাই। তাই তাকে আরও পাগল করে তুলল। বহু কাগজের বহু ছবি ঘেঁটে দেখল ভাস্কর্যের নতুন পুরনো মহিমময় কীর্তিগুলো। এত মহান, এত বিরাট, এত সুন্দর এই কাজ!

এক বিচিত্র স্বপ্ন বাসা বাঁধল কিশোরের বুকে। শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন।

ঠিক সময়ে এসে জুটল বামুনপাড়ার লেখাপড়া জানা পাগল গৌরাঙ্গ সুন্দর। মহিমের চেয়ে সে বড়, কিন্তু বন্ধুত্বে আটকাল না একটুও। সে তার স্বপ্নকে দৃঢ় করলে, শোনালো দেশী-বিদেশী শিল্পীদের বিচিত্র সব জীবনের কাহিনী।

শুনতে শুনতে স্বপ্ন ছেয়ে আসত মহিমের চোখে।

আর সেই এক মাথা চুল, স্বপ্নালু চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধ'রে পাগলা গৌরাঙ্গ বলত—হবে, তোমার দ্বারা হবে।

তারপর পাগলা গৌরাঙ্গ মহিমকে নিয়ে একদিন পাড়ি জমাল কলকাতার দিকে, তার চোখের সামনে খুলে দিতে একটা জগৎকে।

সে কি অসহ্য উত্তেজনা মহিমের! রাজধানীর মিউজিয়ম, চিত্রশালা, আর্টস্কুল, কিছু বাদ পড়ল না অজস্র কৌতূহল আর বিস্ময়ে ভরা চোখ দুটোতে। উঃ কি বিরাট আর কি বিচিত্র! কৃষ্ণনগর ঘুরে প্রেরণা পেল মহির আরও বেশী। বেশী কারিগরির সেটা যেন সোনার খনি। বাবার থানের মত লুকিয়ে সে প্রণাম করেছে কৃষ্ণনগরের মাটিকে।

পাগল গৌরাঙ্গ বলল, থেকে যাও কলকাতায় আমার সঙ্গে

পৃথিবীর সেরা শিল্পী করে ছেড়ে দেব তোমাকে !

কিন্তু এত বিস্ময়, এত কৌতূহল, এত আগ্রহ, তবুও প্রাণ যে হাঁফিয়ে উঠেছে মহিমের। কলকাতার কথা কত শুনেছে, কিন্তু এ তো তার সেই মনে গড়া কলকাতা নয়। এ যে অপরিচিত দেশ, অপরিচিত পরিবেশ, অচেনা সব লোক। প্রাণ যে কাঁদছে সেই নির্জন খালপাড় গ্রামটির জন্য, সেই গ্রামের মানুষগুলোর জন্য। প্রাণ যে উড়ছে সেই উড়ো অস্থায়ী মেঘে-ঢাকা অসীম আকাশের বুকে, পড়ে আছে দিগন্ত-বিসারী মাঠের মাঝে।

সমস্ত শিল্পের খনি এ কলকাতা। কিন্তু এ খনির গর্ভে থাকতে গিয়ে নিঃশ্বাস আটকে আসবে মহিমের। এখানে সে পারবে না থাকতে।

পাগলা গৌরাঙ্গ তো—পাগলাই। সে মহিমকে যেতে দিল না। ফিরে গেল এককালে সে যে মেসে থেকে পড়াশুনা করেছে, সেই মেসে। সেখানে একখানা ঘর নিয়ে মহিমকে আটকে রাখল সে। বনের পাখী মানুষের মত কথা বলবার উদ্যোগ করতে, মানুষের খাঁচায় বাঁধা পড়ার মত হল মহিমের অবস্থা। মুখে রইল শান্ত, কিন্তু ভিতরে ঝড়। অনুরাগ কমল না শিল্পের প্রতি, কিন্তু প্রাণটা যেন জগদ্দল পাথরের চাপে পিষ্ট হচ্ছে।

পাগলা গৌরাঙ্গ টের পেল। টের পেল যে তার কিশোর শিল্পী কয়েকমাসের মধ্যেই অসম্ভব রকম রোগা হয়ে গেছে। প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, কথা বলতে পারে না। সেই স্বপ্নালু চোখ দুটোতে স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু মুখে সে কিছু বলল না। ভাবল, শিল্পচর্চা আর একটু জমে উঠলেই আবার স্বাস্থ্য ফিরে আসবে, মুখের দুশ্চিন্তার রেখাগুলো পড়ে যাবে ঢাকা। ওর গ্রাম ছাড়া, পরিজন-ছাড়া শুকনো বিষাদ মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠবে অন্যবাদের উচ্ছ্বসিত শব্দ। ভবিষ্যতে কোন একদিন পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতি। আর সেদিনও বেশী দূরে নয়।

এদিকে গাঁয়ে-ঘরে, বিশেষ করে, মহিমদের পাড়াটাতে এই নিয়ে

কথা হল বহুরকম। রাগ করল কেউ, ভয় পেল কেউ, দোষ দিল অনেকে ভরত আর অহল্যাকে পাগলের সঙ্গে ছেলেকে এরকম ছেড়ে দেওয়ায়। কৈফিয়ত চাইলে অনেকে পাগলা গৌরাঙ্গের বাপের কাছে। বামুন বলে খাতির নাই, ছেলে কোথায় বার কর।

মুখে খুব চটপট করলেও শংকিত হল পাগলা গৌরাঙ্গের বাপও। ভাল ফ্যাসাদ করেছে তার ছেলে। কলকাতার পুরনো মেসের ঠিকানায় চিঠি দিয়ে সব খবর নিয়ে তবে সে ঠাণ্ডা করল ভরতকে আর তার প্রতিবেশীদের।

শেষটায় মেয়ে-পুরুষরা মুখ টিপে হাসাহাসি করল। চোখ টিপল এমনভাবে, যেন গাঁয়ের কোন মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে কেউ কলকাতায়।

কিন্তু কান্না বাঁধ মানল না অহল্যার সে ছাড়ল খাওয়া-পরা কথা বলা। ইস্তক, ভরতের ভরা যৌবনের মধুময় রাতগুলোকে পর্যন্ত কান্নার ঝগড়ায় এ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল। যেন ভরত তার কেউ নয়, প্রাণপতিই তার হয়েছে দেশান্তরি। ভাল জ্বালায় পড়ল ভরত। স্নেহ মানে না, আদর মানে না, মানে না রাগ পীড়ন। এ এক হয়েছে অদ্ভুত দেবর-সোহাগী।

প্রায় তিন বছর কাটতে চলল।

শেষটায় একদিন আচমকাই মনে পড়ল ভরতের। তাই তো ঘরে একটা ছেলেপুলে নাই, নাই কথা বলবার লোক, মেয়েমানুষ একলা থাকে কেমন করে ঘরে?

সে পাগলা গৌরাঙ্গের বাপের কাছ থেকে কলকাতার ঠিকানা নিয়ে কলকাতা যাওয়ার আয়োজন করল। হারামজাদা ছোঁড়াকে ধরে নিয়ে আসা ছাড়া গত্যান্তর নাই। সৎ ভাই কি না! নইলে ভাই-ভায়ের বউকে ভুলে থাকে কি করে এমন দূর বিদেশে?

ভরত যাবে তো, অহল্যা বলে—আমিও যাব। সামান্য কান্না-কাটিতেই ভরতের মন থেকে বাধাটুকু ঝরিয়ে ফেলল সে। দুদিনের ঝামেলা বই তো কিছু নয়। ভরত আপত্তি করবে কেন?

ইদানীং অবশ্য সে অহল্যার কোন আবদারেই আপত্তি করা ছেড়ে দিয়েছিল, কারণ আর যাই হোক, বাল্য-বিবাহের রসও তো তার উঠেছিল পেকে। সময়টাই যে পড়েছিল তখন আত্মসমর্পণের। অহল্যার কাছে ভরতের আত্মসমর্পণ।

কলকাতার পাগলা গৌরাঙ্গের মেসে এসে উঠল ভরত আর অহল্যা, দূর বাংলার এক চাষী দম্পতি—যা তাদের চোখে মুখে পোশাকে স্পষ্টই প্রতীয়মান।

প্রায় তিন বছর পর দেখা। অহল্যা ছুটে গেল মহিমকে দেখতে পেয়ে। ছোটার বেগটা মহিমেরও কম নয়। সে-ই আগে ঝাঁপিয়ে পড়ল অহল্যার বুকে। তারপর হাসিতে চোখের জলে একাকার কাণ্ড। ভরত খানিকটা লজ্জিত দর্শক ছাড়া আর কিছু নয়। পাগলা গৌরাঙ্গ ভ্রূ কুঁচকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মুখে এ দৃশ্য দেখল। যেন বাধা পড়েছে তার একাগ্র সাধনায়।

কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

এবার ফুরসুৎ হল অহল্যা আর ভরতের ঘরটার চারদিক দেখবার—ঘরটা নিতান্তই তাদের দেশী কুমোরের ঘরের মত না হলেও তারই এক গম্ভীর ও পরিচ্ছন্ন সংস্করণ। মূর্তিগুলোরও কোন মিল নেই তাদের কুমোরের গড়া পুতুলের সঙ্গে, আগে মহিমও যে ছাঁদে গড়তো প্রতিমা।

সবচেয়ে বেশি উতলা হল অহল্যা। ঘরের চারিদিকে ঘোরে আর তার গেঁয়ো বিস্মিত চোখ দিয়ে কি এক অদ্ভুত বস্তু যেন নিরীক্ষণ করতে থাকে।

এ সবই তুমি গড়েছ? সে তার পাড়াগেঁয়ে কৌতূহল যেন ফেটে পড়বার উপক্রম করল।

হ্যাঁ। মহিমের বুকে উচ্ছ্বসিত আলোড়নের খেলা চলেছে। এই কথা, এই বিস্ময়—সবই তো তার গুণমূল্য! মুখখানি তার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

এটা আবার কোন্ দেবতা?

বুদ্ধদেব।

কে বুদ্ধদেব অহল্যা তা জানে না। তবু হাত তুলে প্রণাম করল সে। কি টানা টানা বিশাল ধ্যানস্থ চোখ, কি সুন্দর নাক, ঠোঁট, কি বাহার চুলের আর গলার মালাটির।

আর এটা ?

হর-পার্বতী।

হর-পার্বতী ? লজ্জা পেল অহল্যা, কৃত্রিম কোপে মুখটি তার অদ্ভুত হয়ে উঠল। এ কেমন হর-পার্বতী ! এক বিরাট পুরুষ, আর তার পাশে পার্বতী, খালি যৌনাঙ্গটুকু কয়েকটি মণিমানিক্যে ঢাকা, আর সবই উলঙ্গ। বিশেষ বলিষ্ঠ স্তনযুগলই আরও লজ্জা দিয়েছে অহল্যাকে।

ছোঁড়ার মাথাটা দেখছি খেয়েছে পাগলা গোরাঙ্গ। এমনি উলঙ্গ নারীমূর্তি অনেক কটাই রয়েছে। এ সব কি পাথর, না মাটির ?

মহিম হেসে উঠল বউদির কথায়। পাথর কোথায় গো ! সবই মাটির। তবে যে সে মাটি নয়, কিনে আনতে হয় পয়সা দিয়ে এ মাটি ঘরে বসে এর মসলা তৈরি করতে হয়।

মাত্র তিন বছরের অবর্তমানে যেন বহু অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে মহিম। আর সেই খালধারের নয়নপুরের চাষী দশরথের ছেলে, অহল্যার বাধ্য দেবরটি বুঝি নেই। কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠল অহল্যা। মহিম কি দূরে সরে গেছে, হয়ে গেছে অন্য মানুষ ! যার নাগাল কোন রকমেই অহল্যারা পাবে না ? এমনি পর পর, মার্জিত বাবু-ভদ্দর-লোকের ছেলেদের মত, যাদের সঙ্গে অহল্যাদের কোন সামঞ্জস্য নেই—তাদের মতই হয়ে গেছে বুঝি মহিম। মহিমের কথাবার্তাও সন্দেহ জাগায় সে যেন বড়সড় হয়ে উঠেছে অনেক। মাত্র তিনটে বছরের ব্যবধান, এর মধ্যেই কত বড় আর মানুষ হতে পারে। কিন্তু মহিম যেন স্বাভাবিক বাড়কে ছাড়িয়ে উঠেছে। কেমন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল অহল্যা। যেন সে চায় না, কোনদিনই মহিম বড় হবে। থাকবে চিরকালের সেই নরম ছোট্টটি, ছেলেমানুষ, যার উপর অহল্যার আধিপত্য থাকবে আগের মতো পুরো পরিমাণে।

হ্যাঁ, এতদিন পরে মহিমেরও তো আছে কিছু দ্রষ্টব্য, যা দিয়ে সে এই চিরকালের পাড়াগেঁয়ে দাদা-বউদিকে খানিকটা চমকে দেয়! তার উৎসাহ তো সেইখানেই বেশি, যেখানে সে যত বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারবে। তার প্রাপ্য এই চমকানি, এ বিস্ময়। সে তার কথার কাজে সব দিয়ে সবখানি মূল্য চায় ফিরিয়ে নিতে।

কিন্তু অহল্যার এ ভয় কেন?

তা তো অহল্যা জানে না। সে শুধু জানে, যে সংশয়, যে সন্দেহ তার মনে এসেছে, তাই যদি হয় কার্যকরী, তবে বুঝি বাঁচবে না। তাই যাচাই করে নেওয়ার জন্যই সে দৃঢ় গলায় গম্ভীর হয়ে বলল: মোরা কিন্তু তোমারে নিতে আসছি? ঘরে ফিরে যেতে হবে এবার তোমার।

মহিমের চোখে ফুটল যেন বহুদিন পরে মায়ের সঙ্গ পাওয়া সন্তানের ব্যাকুল আনন্দ, আমিই বুঝি তোমাদের আর একলা একলা নয়নপুরে ফিরে যেতে দিচ্ছি?

মহিম বেঁকে বসলে ভরত কি বলত বলা যায় না। এখন সে হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল, কেন, থাক না আরও কিছুদিন বিদেশে হতচ্ছাড়া কোথাকার! চল নয়নপুরে, গোবেড়ন লাগাব তোমাকে।

মহিম ভয় পেল না। আর কিছু না হোক, এটা সে বুঝেছে, তুশো-মাইল তফাৎ থেকে যারা ছুটে আসে—তারা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া মাত্র গোবেড়ন দেওয়ার পাত্র নয়।

অহল্যা বলে, হয়েছে, থাক্। তারপর একটানে সে তার জামাটা খুলে ফেলল।

এদিকে সারারাত্রি পাগলা গৌরাঙ্গের পাত্তা নেই। শঙ্কিত হল অহল্যা আর ভরত। মহিম নিশ্চিন্ত মনে বলল, ভাববার কিছু নেই, উনি ওরকম করে থাকেন।

পরদিন রুক্ষবেশে ফিরে এলো পাগলা গৌরাঙ্গ। মহিমরা তখন কলকাতার গল্পে মত্ত।

বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাগলা গৌরাঙ্গ ডাকল মহিমকে। মহিম অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

তুই নয়নপুরে ফিরে যাবি ওদের সঙ্গে ? ভীষণ গম্ভীর শোনাল তার গলা।

মহিম প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তার পর এক কথায় বলল, হ্যাঁ।

হ্যাঁ ? হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে পাগল গৌরাঙ্গ প্রচণ্ড বেগে একটা ধমক দিয়ে কিল চর মেরে মহিমকে শুইয়ে ফেলল তার পায়ের কাছে। যেন মহিমের প্রতি কি প্রচণ্ড আক্রোশ তার।

অত বড় ষণ্ডা মানুষ ভরতও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যাপার দেখে। একমাত্র অহল্যারই বুকটা দারুণ রোসে ওঠা-নামা করতে লাগল। ফুলে উঠল নাকের পাটা দুটো। বাঘিনীর মত ছিনিয়ে নিয়ে গেল সে মহিমকে।—কেন মারছ ছোঁড়াকে এমন করে, জিজ্ঞেস করি ! মগের মুলুক পেয়েছ ?

সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে পাগলা গৌরাঙ্গ হিসিয়ে উঠল। মহিমের দিকে চেয়ে, যা চলে যা। তারপর ঘরে ঢুকে মহিমের জামা-কাপড় সব ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দায়।

একমাত্র অহল্যাই বিহবল হল না। সে সব বেঁধে ছেঁধে নিতে লাগল। ভীষণ অপমানে জ্বলে যাচ্ছে সে। যাওয়ার ব্যবস্থা যখন তৈরী হয়ে গেল, তখন বহু দ্বিধা কাটিয়ে মহিম একবার ঘরে ঢুকল।

পাগল গৌরাঙ্গ তখন বুদ্ধ মূর্তিটার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, এ ঘরের কিছু তুই পাবি না। যা চলে যা। বলে আঙুল দেখিয়ে দিল সে দরজার দিকে।

মহিম দেখল, পাগলা গৌরাঙ্গের চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল।

মহিম ফিরে ফিরে দেখল সারা ঘরটা। কয়েক দিন মাত্র সে শুরু করেছিল পাগলা গৌরাঙ্গের আকণ্ঠ প্রতিমূর্তি, তা মাঝপথেই থেমে গেল।

ফিরে যাওয়ার পথে ট্রেনে উঠে মহিম কেঁদে ফেলল অহল্যার কাছে। পাগলা ঠাকুর কষ্ট পাবে বউদি।

অহল্যা মনে মনে বাঁকা ঠোঁটে হাসল। যার যেমন কর্ম তেমন ফল। কষ্ট অহল্যাও কম পায়নি।

এই হল মহিমের শিল্পচর্চা আরম্ভের প্রথম দিককার কথা। তারপর সে পাগলা গৌরাঙ্গের মূর্তি তৈরি করে রেখে দিয়েছে নিজের ঘরটিতে।

কয়েক বছর পরে পাগলা গৌরাঙ্গ ফিরে এসেছিল নয়নপুরে, কিন্তু কোন দিনও মহিমের সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা করতে গেলে ফিরিয়ে দিয়েছে।

॥ ৩ ॥

জমিদার বাড়ির সীমানায় পা দেওয়ার আগে থমকে দাঁড়াল মহিম, একটু দাড়াও পরানদা।

কি হল ?

সাঁকোটা বড় নড়বড়ে লাগছে। ভেঙে পড়বে না তো ?

পরান হেসে উঠল। অতবড় চেহারার মানুষটা, কিন্তু হাসির শব্দ যেন প্রেতের খিল্‌খিল্‌ হাসির মত শোনাল। সরু মেয়েমানুষের গলার মত। হেসে বললে, এ মচ্‌কায়, তবু ভাঙে না মহিম।

সরু একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। অন্ধকারের মধ্যে ছমছমানি এনে দিয়েছে সেই একফালি চাঁদের ক্ষীণ আলো। পূবদিকটুকু ব্যতীত চারদিকে জলে ঘেরা, দীর্ঘ প্রাচীর ঘেরা বিরাট জমিদার বাড়িটি যেন মস্ত এক প্রেত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন জানালা দরজা জাফ্‌রি ভেদ করে এক ফোঁটা আলোর রেশ পড়ে না চোখে।

বাড়িটি সত্যই অদ্ভুত। পূবদিক ব্যতীত বাড়িটির আর তিনদিকেই অর্ধ-বৃত্তাকারে একটি দীঘি তার বুকে কালো জলে হাওয়ার ঢেউ খেলছে। এ দীঘি কাটতে হয়নি। নয়নপুর খালেরই কোন এক ফ্যাক্‌ড়া এক-কালে প্রবাহিত ছিল এখান দিয়ে। কালক্রমে তা মজে যায়। কিন্তু এ অর্ধবৃত্তাকার জায়গাটুকু আর মজেনি। সে অনেক-কাল আগের কথা। তখনও এই বসু বংশ ছিল না জমিদার, ওঠেনি এই চৌমহলার ইমারত।

কিন্তু যেদিন ইমারত উঠল, সেদিন এই দীঘি দেখে বোসেরা খুশিই হয়েছিলেন। বাড়ি নয়, যেন প্রাচীনকালের দুর্গ, এই বড় দীঘি তাদের প্রহরী। চারদিক বাঁধ দিয়ে, জমি উঁচু করে বাড়ি উঠল, সেই সঙ্গে তিন দিকে তিনটি ছোটখাটো সাঁকোও তৈরি করে দিয়েছিল তারা। অপরের জন্য নয়, নিজেদের দরকারের জন্যই। শুধু তাই নয়, কঠিন নিষেধ ছিল—সর্বসাধারণের প্রতি এ সাঁকোতে পা না দিতে। দেয়ওনি অবশ্য কেউ, নিতান্ত ক্ষেপে যাওয়া নয়নপুরের শতাব্দীর ইতিহাসে কয়েকবার ছাড়া। তখন ক্ষিপ্ত নয়নপুরের প্রতিটি আক্রমণের কেন্দ্রস্থল ছিল এই প্রাসাদ। তা ছাড়া, আমলা কামলারাও তো যাতায়াত করেছে সারাদিনই। তখন ছিল নবাবী ইতিহাসের জের, বাসি দাগ, আর নতুন বিজেতা ইংরেজে প্রখর কিরণ। আলো জ্বলত প্রতিটি গবাক্ষে দরজায়, কোলাহল ছিল প্রচুর, মারধোর, হাসি-হল্লা, গান, আর্তনাদ। সে সব অনেক কিছুই চাপা পড়ে গেছে। কারণ আর কিছু নয়। কালক্রমে বোস বংশ বাড়ে নি, কমেছে আর যুগের মহিমায় রাজধানীবাসীও হয়ে পড়েছেন। জমিদারী প্রতাপ মরে যায়নি, কিন্তু মার্জিত ভদ্রলোক হয়েছেন বোসেরা।

সাঁকো পেরিয়ে পাঁচিলের গায়ে ছোট দরজা দিয়ে পরানের সঙ্গে মহিম ঢুকল। ঢুকে পরান দরজাটা দিল বন্ধ করে।

মহিমের মনে হল এমন জায়গায় সে ঢুকল, যেখান থেকে নিজের ইচ্ছায় বেরুতে পারবে না কোন দিন।

বাহিরের মহলে আলো জ্বলছে মাঝের গলি পথের দু'পাশের দুটি ঘরে। পরান না দাঁড়িয়ে মহিমকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে চলল। প্রথম মহল পেরিয়ে বিরাট চত্বরের অপর দিকের মহলের সামনের ঘরগুলো অন্ধকার। নিঃশব্দ, কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব যেন টের পাওয়া যায়।

তীব্র সুগন্ধি ও কড়া তামাকের গন্ধে দ্বিতীয় মহলের চত্বরটুকু ভরে উঠেছে। তা ছাড়া, সুখাদ্যের গন্ধও তার ফাঁকে ফাঁকে এসে লাগছে নাকে।

নীরন্ধ্র অন্ধকারে পরানের গতি-পথ ঠিক করতে না পেরে মহিম দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল ডাকবে পরানকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি মিষ্টি মেয়েলী গলার চাপা উচ্ছ্বসিত হাসিতে থমকে গেল সে। আশে-পাশে ফিরে দেখল মহিম, কেউ নেই। উপরের দিকে তাকাল, অন্ধকারে মাথা উঁচুনো নিস্তব্ধ কালো ইমারত।

কানের পাশ দিয়ে পিঠের শিরদাঁড়া পর্যন্ত কে যেন ফুটন্ত কাশ-ফুলের ডগা বুলিয়ে দিল মহিমের। ভয়ে কৌতূহলে ডাকতে ভুলে গেল সে পরানকে। কিন্তু হাসি আর শোনা গেল না। আশ্চর্য, ভয় পেয়েও মহিম আবার সেই হাসি শোনবার জন্য আকুল প্রতীক্ষা করছিল।

কই গো, আস। অন্ধকার ফুঁড়ে পরান আবার দেখা দিল।

এই যে, তোমাকে হারিয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে আছি। বলে সে আবার পরানকে অনুসরণ করল। তার মনে হল, বাড়িটাতে পা দিয়ে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে।

এবার আলো দেখা গেল কয়েকটা ঘরে। একটা ঘর থেকে পাতাল ধোঁয়ার আভাসেই মহিম টের পেল—তামাক-সেবীর সন্ধান। সেই ঘরটাতেই পরান তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল!

প্রকাণ্ড ঘর। বিচিত্র সব শৌখীন সামগ্রীতে ঘরটি ঠাসা। একটা পেলব শুভ্র বিছানা—সুন্দর একটি প্রাচীন পালঙ্কের উপর বিছানো। বিছানার শিয়রের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মহিম। আকণ্ঠ একটি বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি, পালঙ্কের গা ঘেঁষে বিচিত্র খোদাই কাঠের উপর মূর্তিটি বসানো।

পালঙ্কের পাশেই একটি আধুনিক শোফায়, আহ্বায়ক কর্তা বসে বসে গড়গড়া টানছেন।

পরান নিশ্চল, কি যেন ইশারা করতে চাইল মহিমকে। মহিম ফিরেও দেখল না সেই দিকে। সে একবার বুদ্ধমূর্তি আর একবার কর্তাকে দেখতে লাগল। কোথাও অন্য কোনও ব্যতিক্রম তার চোখে পড়ল না। কিন্তু সে তো জানে না, কত বড় একটা ব্যতিক্রম থেকে

যাচ্ছে। জানতে পারলে বুঝি এই পুরোনো বাড়িটা খিলান প্রাচীরেরই একটা গর্জন শুনতে পেত।

তবু, প্রণাম তো দূরের কথা, একটা সামান্য নমস্কারের কথা পর্যন্ত মনে এল না মহিমের।

এবার ঝিমুনি কাটিয়ে হঠাৎ মুখের থেকে নলটা সরিয়ে হেমচন্দ্র তাকালেন মহিমের দিকে।

পরান বলল, দাশু মণ্ডলের ছেলে মহিম।

ও! খুবই যেন শিষ্টাচারর সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলেন হেমবাবু। কোন রহস্য নেই, খিঁচ নেই, স্বাভাবিক সাধারণ ভদ্রলোকের মত তিনি বললেন, ও মহিম বুঝি তোমারই নাম? এস এস, বস। পাশের একটি সোফা তিনি দেখিয়ে দিলেন মহিমকে।

মহিমেরও যেন আচমকা এতক্ষণে ঘোর কাটল। জাতপ্রথাগুলো মনে পড়ল তার। তাড়াতড়ি একটি প্রণাম করে সোফাটাতে বসল সে।

শংকিত দেখাল শুধু পরানের চোখ।

মহিম লজ্জা পেয়েছে। কিছুক্ষণ আগে যে হাসি তার মনে এক রহস্যের সৃষ্টি করেছিল, যে ভাবগাম্ভীর্য এনে দিয়েছিল তাকে এই বাড়ি আর তার আবহাওয়া, তা কেটে উঠতে লাগল। কোন দিনের তরে এ বাড়িতে না ঢুকলেও মহিম বাইরে থেকে দেখে দেখে বাড়িটার ভিতরটুকু যেন এমনি ভাবে মনে মনে এঁকে রেখেছিল। এমন কিছু নতুন মনে হল না তার, শুধু নিস্তব্ধতা আর ওই হাসিটুকু ছাড়া।

এবার সে স্পষ্টই দেখল, মুর্তিটা যেন তার খুবই পরিচিত, ইচ্ছে করলে মুর্তিটার পেছনে শিল্পীর নামটা সে ছুটে দেখে আসে।

তাকে বার বার ওদিকে তাকাতে দেখে হেমবাবুই বললেন, কলকাতায় থাকতে তুমি ওই মুর্তি গড়েছিলে। আমাকে দিয়েছে গৌরাঙ্গসুন্দর। আমাকে দিয়েছে বললে ভুল হবে, আমার বউমা'কে দিয়েছে। আমার বউমা'র সঙ্গে কলেজে পড়ত গৌরাঙ্গ কলকাতায়। বলে তিনি হাসলেন মহিমের দিকে চেয়ে।

গৌরাঙ্গের সহপাঠিনীর অস্তিত্ব এ বাড়িতে আছে জেনে—আবার

ঝাপসা হয়ে এল মহিমের এ বাড়ি সম্বন্ধে ধারণা।

মহিম বুঝল, এ স্থবির ইমারতের, আর তার ভিতরের আসবাব সামগ্রীর চেয়েও তাড়াতাড়ি যুগ এগিয়ে চলেছে। যার আবর্তে, চোখে ঠেকবার মত না হলেও বোসেদের পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রাসাদ প্রাণহীন, মানুষকে তার আবহাওয়া দিয়ে ঘিরে রাখতে চাইলেও অতীত ছবির স্বৈরতান্ত্রিক দানবটার সে ক্ষমতা নেই। যদি থেকে থাকে তবে, তাকে নতুন খোলসে নিশ্চয়ই আত্মগোপন করতে হয়েছে।

হেমবাবু আবার বললেন, সত্যি, বাংলাদেশের চাষীদের যে সমাজ-ব্যবস্থা, তার মধ্যে তোমার এ আত্মপ্রকাশ একটা বিস্ময়েরই কথা। আশ্চর্য, চাষীর ঘরের ছেলে তুমি !

এতক্ষণে মহিম বুঝতে পারে ভাল করে সে কোথায় এসেছে। ওই চাষীর ঘর কথাটিতেই অসামঞ্জস্য প্রকট হয়ে দেখা দিল, এমনি, সোফাটাতে বসা পর্যন্ত তার কাছে তার স্বাভাবিক ঠেকল্ না। প্রশংসা নিঃসন্দেহে করুণামিশ্রিত। অবজ্ঞা করতে পারলেই যেন ভাল হত হেমবাবুর পক্ষে।

ব্যাপারটা কিন্তু পূর্ব জন্মের, যাই বল ? প্রতিভা নিয়েই জন্মেছ তুমি। তিনি বিশ্বাস করেন, জন্মক্ষণের আর গ্রহ নক্ষত্রের কোন এক বিচিত্র মিলনেই প্রতিভাবানরা জন্মান।

কিন্তু মহিমের মনে পড়ল পাগলা গৌরাঙ্গের একটি কথা যে, প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না। যার যে বিষয়ে অনুরাগ, মানুষ যদি তার সেই অনুরাগের মুলটিকে দিনের পর দিন হৃদয় নিংড়ানো রস দিয়ে সজীব না করে তোলে, যদি বাড়িয়ে না দেয় ডালপালা আর অজস্র পত্রপল্লবে, যা দেখে আমরা বলব প্রতিভার বিকাশ ; তবে তা দুইদিনেই মরে পচে হেজে যাবে। তুমি শিল্পী হবে, এ নির্দেশ আছে তোমার অন্তরে। সে নির্দেশ মেনে যদি কাজ না কর, 'ইচ্ছা' বলে বস্তুটা তখন খালধারের মাঠে হুঁকো নিয়ে বসার তাগিদে জমে যাবে। ঈশ্বর বস্তুর কোন স্থান নেই এখানে।

পাগলা গৌরাঙ্গ আর হেমবাবুর কোন কথারই মূল্য কম নয়

মহিমের কাছে, কারণ হেমবাবুর কথার মধ্যে তবু তার মনে গেড়ে বসা অনিচ্ছাকৃত সংস্কারগুলোর সমর্থন আছে—তাই এটাকেও সে একেবারে মূল্যহীন বলতে পারে না। আবার পাগলা গৌরাঙ্গের কথায় আজন্ম-লালিত তার সংস্কার এমন আঘাত পায় যে, সে পুরোপুরি সেই মতবাদের দড়িটাতে দৃঢ় হয়ে ঝুলে পড়তে পারছে না। পথ তার সামনে রয়েছে, মনটা ঠিক হয়নি।

তাই হেমবাবুর কথায় সে প্রতিবাদও করল না, তর্কও জুড়ল না। সে রকম অভ্যাসও তার নেই।

হেমবাবু কথায় কথায় নিজের কথায় চলে এলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি ভুলে গেছেন, কথা বলছেন তিনি দাশু মোড়লের ছেলের সঙ্গে, তাঁরই নগণ্য এক প্রজার সঙ্গে। কিংবা এ শুধুই তাঁর নিজের পরিচয় দানের ভূমিকা।

বিস্ময়ের ঘোর রইল শুধু পরানের চোখে। এমনটা সে আশা করতে পারেনি, এমনি করে মহিমের কাছে কর্তা তাঁর নিজের জীবন-প্রসঙ্গ পেড়ে বসবে, নিজের লোকের মত। আশ্চর্য, উৎসাহও তো কম নয় বলার, আর বেশ গভীরভাবেই বলছেন।

মহিম ভাবল অনেক রকমের পরিচিত লোকের মধ্যে হেমবাবু একটা রকমই। তবু তার কাছে এটা আকস্মিক বই-কি। নয়নপুরের বোসেদের অন্দরমহলের ঘরে বসে কর্তা বলছেন তাঁর জীবনকাহিনী, এক অর্বাচীন চাষার ছেলের কাছে—এ কি বিস্ময়ের নয়? ব্যাপারটা এমনি আচমকা ঘটছে যে, পরান তাদের বাড়ি যাওয়ার আগের মুহূর্তেও যে ভাবতে পারেনি—এখানে সে আসবে, আর হেমবাবু কথা বলার আগে এও বুঝতে পারেনি—বোসেদের প্রসঙ্গে এমন করে বসিয়ে কেউ তাকে বলবে।

হেমবাবু তখন বলছেন, আমি অবজ্ঞা করতে চাই না মানুষকে, তা সে তুমি যে-ই হও। যতক্ষণ পর্যন্ত না টের পাচ্ছি তুমি আমার অশুভাকাঙ্ক্ষী, ততক্ষণ তোমাকে আমি সমস্ত সত্তা দিয়ে গ্রহণ করব। তার মানে এ নয়—আমার দোষ সমালোচনা করলেই সে আমার

অশুভাকাঙ্ক্ষী হবে।

তাই একদিন আমি আমাদের এই সমস্ত বংশের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম, এদের কাজ, কথা, চরিত্র, ব্যবহার—সমস্ত কিছু আমাকে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। এ আকাশস্পর্শী ইমারত—ওটাই যেন সত্য, এ স্থবির দানবটা যেন আমাকে সর্বদাই বলত—তুমি আমার তাঁবেদার। কি রকম ? আমি কি স্থবির ? ইমারত আমাকে শাসন করবে। সমস্ত কিছুর বাধা ঠেলে একদিন বেরিয়ে পড়লাম—এ বাড়ি আর তার বেষ্টনী ছেড়ে। কিন্তু শান্তি কোথায় ? বোসবাড়ির সেই স্থবির দানবটাই আমার পেছনে পেছনে তাড়া করে চলেছে। আমাকে পেছন থেকে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করেছে। 'টাগ্ অফ ওয়ার' যাকে বলে। আমিও টানি, ও-ও টানে।

তারপর ঝাঁপ দিলাম গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। সে হল আমার কলুষ দেহটাকে পবিত্র জলে ধুয়ে নেওয়া। চোখের জলও সেদিন কম ছিল না। জেলে গেলাম ! জেল থেকে বেরিয়ে নয়নপুরে এলাম ! এখানেও চোখে পড়ল পরিবর্তন হয়েছে। মড়ক এসেছিল কি না জানি না—দেখলাম অনেকেরই নেই পাত্তা। আর বড় শান্ত সৌম্য পরিবেশ। আমার স্ত্রীও মারা গেছেন। আছে শুধু দূর সম্পর্কের বোনের কাছে আমার একটি ছেলে, আর আমার বৃদ্ধ দাদা।

মহাত্মাজীর আদর্শে গড়লাম এ বাড়ির পরিবেশ। দেশী আর বিদেশী সব কাপড় বাতিল করে দিয়ে খাদির প্রতিষ্ঠা করলাম! তখনই তো স্থাপন করলাম তোমার এই অহিংসার দেবমুর্ত্তির মূর্তি। যেদিন এ বাড়ির পরিবেশ ছেড়েছিলুম—সেদিনই আর্টের প্রতি আমার দরদ বাড়ে, বলে তিনি চুপ করলেন।

মহিম এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখল। সত্যই, কাপড়-চোপড় সবই খদ্দরের। এমন কি ঘরের পর্দা, সোফার রঙিন কাপড়গুলো পর্যন্ত !

হেমবাবু একটি শ্রদ্ধার আসনই পেলেন মহিমের মনে। কিন্তু পাগলা গৌরাঙ্গ তার হৃদয়ের যে স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত সেখানে এ আসন বড়ই টলমল।

কারণ পাগলা গৌরাঙ্গ গান্ধীজীর প্রতি রুষ্ট অত্যন্ত প্রখর ও কঠিন ভাষায় সে গান্ধীবাদকে আক্রমণ করে থাকে, যেখানে মহিম তার সমস্ত সত্তা হাতিয়েও একটা জবাব খুঁজে পায় না। গান্ধীজীর ভাগবত মাহাত্ম্যকে কী তীব্র আর করুণভাবেই না শ্লেষ করে থাকে। যা মহিমকে সময়ে রুষ্ট করলেও, উত্তেজিত করলেও পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতিটি যুক্তির ঝাপটায় তৃণবৎ উড়ে গেছে সে। সেই কিশোর বয়সে সে যে তর্ক করেছে, গান্ধীবাদের স্বপক্ষে আজ সুদীর্ঘ ছ'বছর পরেও সে নতুন কোন তীক্ষ্ণ যুক্তি শোনাতে পারেনি।

এখানেও সেই একই কথা। এখনও সে মনস্থির করতে পারেনি। গান্ধীবাদের প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে, শুনলে ভক্তির উদ্রেক হয় হৃদয়ে। কিন্তু যখনই মনে পড়ে পাগলা গৌরাঙ্গের তীব্র গলায় রূঢ় অথচ যুক্তিতে নিশ্ছিদ্র কথাগুলো, তখনই থেমে যায় সে আগে বাড়তে। সংশয় আসে মনে।

কিন্তু হেমবাবু ধরে নিয়েছেন, এতক্ষণে তিনি যত কথা বলছেন, তার এক বর্ণও বোধ হয় মহিমের বোধগম্য হয়নি। এক পাগলা গৌরাঙ্গ আর কিছুটা অহল্যা ছাড়া, কেউই তো বুঝতে পারে না মহিমকে, কি তার চিন্তাধারা, কেমন করে সে ভাবে, আর কতখানি অগ্রগামী তার মন!

দাশু মোড়লের এই রোগা শান্ত ছেলেটি যে 'দুনিয়া ডুবে যাক' গোছের চিন্তাধারায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে, প্রতিটি পলে পলে, প্রতিটি ঘটনার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে করে ভেবে ভেবে এমন একটা দীপ্ত মানবিকতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, একথা তো কেউ বুঝতেও চায়নি। এই ছেলেটির চোখে যে পৃথিবী একটু আলাদা, না জানলে একথা জেনে নেবার সাধ কারুর হয়নি আজও।

হেমবাবু তাকে জানেন শিল্পী বলে। পটুয়া কুমোরের পরিমার্জিত সংস্করণ-যা তাকে মুগ্ধ করেছে। তার বেশি কিছু নয়। আবার এও তিনি জানেন শিল্পধর্ম বজায় থাকলেই হল, তার বেশি কোন বেড়া ডিঙিয়ে শিল্পী কোন পথের শরিক হয়েছে, তা জানবার তাঁর যেমন

দরকার নেই, শিল্পীরও শিল্পরূপটুকু বজায় থাকলেই হল। শিল্পী—শিল্পী, তার বেশি কিছু নয়।

নে পরান একটু তামাক খাওয়া। কথাটা বলতে বলতেই তাঁর আবার অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বললেন, ওহো আর এক কথা তো ভুলেই গেছি। বউমাকে একটু ডেকে দে পরান।

পরান বেরিয়ে গেলে তিনি বললেন, এখানে আমি আমার পরিবারটির জন্য সত্যই গর্বিত। ছেলে আমার বিলাতে, জানি না কি রকম হয়ে সে ফিরবে। কিন্তু আমার বউমাকে দেখলেই তুমি তা বুঝতে পারবে। তোমার ওই মূর্তি দেখে সে-ই প্রথম তোমাকে দেখতে চেয়েছিল, বাধ সেধেছিল গৌরাঙ্গসুন্দর। সে তোমার উপর বড় চটা হে, তোমার নাম করলেই ক্ষেপে যায়। অথচ তোমার কথা বলতে বলতে সে নিজে ঘণ্টা কাবার করে ফেলে, বলে তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

হাসতে পারল না মহিম। কিন্তু হেমবাবুর বউমার আসার কথাতে অস্বস্তি লাগল তার। কথা তো মহিম বলতে পারে না। না, কারুর সঙ্গে সে খুব সহজভাবে কথা বলতে পারে না, তার মধ্যে সে যদি হয় আবার অপরিচিত, তার উপর আবার শিক্ষিত মহিলা।

হেমবাবুর বউমা এলেন—শ্রীমতি উমা।

পাড়াগাঁয়ে হলেও মহিমের শালীনতাবোধ কম নেই। তবু সে তখুনি চোখ নামাতে পারল না উমার দিক থেকে। খুবই সহজ ও অনাড়ম্বর বেশে সে এল। একটি কালোপেড়ে খদ্দরের শাড়ীর সঙ্গে একটি সাদা জামা। দীর্ঘ সতেজ সবল দেহ, শান্ত, কিন্তু দীপ্ত মুখ ঠোঁট দুখানিতে মমতার আভাস আছে, কিন্তু তা যেন নিয়ত কঠিন বিদ্রূপে বঙ্কিম।

এবার আর পরানকে ইশারা করবার চেষ্টা করতে হল না। মহিম নিজেই উমাকে প্রণাম করতে গেল।

উমা বালিকার মতই হেসে উঠে, দু'হাতে মহিমের হাতটা জড়িয়ে ধরল,—ছি ছি, একি করছেন?

উমা টের পেল, মহিমের হাত কাঁপছে, হয় তো সর্বাঙ্গটাই। মনে মনে হেসে হাতটা ছেড়ে দিল সে।

হেমবাবু হেসে উঠলেন। এখানে ছোটবড়র কথা নেই কিনা। ওরা যে তোমার প্রজা।

বলে তিনি আবার হাসলেন। বললেন, আমাদের হিরণ মহিমের থেকে কয়েক বছরের বড়ই হবে। তোমারই সমবয়সী হবে হয়ত মহিম। হিরণ তাঁর ছেলে, উমার স্বামী।

সে কথার কোন জবাব পেলেন না তিনি। উমা তখন বিস্মিত প্রশংসায় খুঁটিয়ে দেখছে শিল্পীকে। খুবই ছেলেমানুষ বলে মনে হল তার, আর বড় কোমল। কিন্তু দেহের কোন ভঙ্গিটাতে দৃঢ়তা ফুটে রয়েছে টের না পেলেও সে বুঝল শিল্পীর হৃদয়ে আছে একটা কঠিন দিক, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে সতেজ।

আর মহিম অন্য দিকে ফিরে যত চেষ্টা করল, যে মহিলাটি বিস্মিত প্রশংসায় তাকে নিরীক্ষণ করছে। তার মুখটা মনে আনতে ততই তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল এ ঘরের ওই বুদ্ধ মূর্তিটার মুখ। কেন? কোন মিল কিসে খুঁজে পেয়েছে উমার মুখটার সঙ্গে ওই মূর্তিটার?

ভেবেছিলাম, না জানি কতবড় আপনি। উমা বলল, গৌরাঙ্গবাবুর ওখানে আপনার গড়া সব নিদর্শনগুলোই দেখে এসেছি, সত্যি, আপনি যদি কলকাতায় থাকতেন, আপনার প্রতিভা আজ জগতের একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠত।

উত্তরে মহিম হাসল। লজ্জা ও সংকোচের হাসি। আর ভাবতে লাগল উমার কথাগুলো, ভদ্র মার্জিত স্পষ্ট কথা, যে কথাবার্তার সঙ্গে তার দৈনন্দিন জীবনের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। কিন্তু জমিদারের পুত্রবধূর আভিজাত্যের অহমিকা কোথাও ফুটে উঠতে দেখল না। সহজ প্রশংসা, অনাড়ম্বর গুণগান। তবু কোথায় যেন মহিমের মনে একটু খটকা থেকে যাচ্ছে। তা বোধ হয় ওই মমতা মাখানো ঠোঁট-দু'খানির বিদ্রূপাত্মক বঙ্কিম রেখাটি মনে করে।

গৌরাঙ্গবাবুর কাছে শুনেছি আপনার সব কথা; উমা তার শ্বশুরের

পাশটিতে বসে বলল, তবু আপনার কাছ থেকেও শুনব আপনার কথা।

মহিম চকিতের জন্য তুলে ধরল তার সংশয়ান্বিত কোমল চোখ দুটো উমার দিকে। কি কথা শুনতে চায় উমা! বলবার মত কিছু তো তার নেই, বিশেষ করে বাংলার সেরা জায়গারই এক বিদূষী মহিলার কাছে!

উমা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল মহিমের মনের কথা। তাই সে আবার বলল, শুনব, কেমন করে এ পথে এলেন আপনি। তখনকার বিচিত্র মানসিক দৃঢ়তা ভাব জ্ঞান আপনাকে এ পথে আসতে সাহায্য করেছে, তখনকার আপনার প্রতিদিনের মনের প্রতিটি সংশয় আশা ওঠা-নামা, তারই গল্প। সত্যি, যারা শিল্পী, তাদের আমি মনে করি যাদুকর। অন্য ধাতু দিয়ে গড়া মানুষ, যাদের কোন কিছুই সঙ্গে বুঝি আমাদের মিল নেই।

মহিমের মধ্যেকার গম্ভীর শিল্পটি, বিনম্র হাসিতে মাথা পেতে নিল উমার কথার মধ্যেকার বিস্মিত শ্রদ্ধাটুকু। জানবার আগ্রহটা উমার খুবই প্রবল, কথাগুলো কিন্তু হালকা! কারণ শিল্পীদের সে অন্য জগতের মানুষ বলে ধরে নিয়েছে। তার কিশোর বয়সের সাধনার কথা জানতে চাইল, কিন্তু সাধক বলতে পারল না।

সহস্র সংকোচ মহিমকে এমনি আবিষ্ট করে রাখল, শব্দ বেরুল না গলা দিয়ে পর্যন্ত একটা। নীরবতা তিক্ততার চেয়েও সব কিছুকেই এক অদ্ভুত সংকোচের হাসি দিয়ে নেওয়াকে মোটেই অস্বাভাবিক ঠেকল না। হেমবাবু আর উমার কাছে তো নয়ই, মহিমের কাছেও নয়।

হেমবাবু উমার প্রতি কয়েকবার ঘন ঘন চোখ বুলিয়ে নিলেন। তাঁর মনের কোথায় যেন একটু ক্ষোভ মিশ্রিত বিস্ময়ের আঁচ লেগেছে। তা বোধ হয় উমার এ আত্মভোলা বিমুগ্ধতার রূপ দেখে। কারণ এমনটি তিনি আর কখনও দেখেছেন বলে তাঁর মনে পড়ল না, বিশেষ উমার মত মেয়ের এ আত্মভোলা রূপ। আর এও তিনি জানেন, এমনি বিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন নীরব বিস্মিত প্রশংসায় ব্যাকুল, (হ্যাঁ, ব্যাকুলই মনে হল তাঁর) এমন অবস্থা মানুষের জীবনে তো খুব কমই আছে। তাঁর

মনে হল, এ যেন খানিকটা ভক্তের ভগবান দর্শনের মত।

উমার বোধ করি তখনও শিল্পীকে দেখা শেষ হয়নি। সে তখনও শিল্পীকে দেখছে। চোখটা সেইদিকেই, কিন্তু মনটা যে তার সেইখানেই —এমন মনে হল না। কারণ চোখে চকিতে আলোছায়ার খেলা তার মনের প্রতিবিম্ব।

আবার মহিম সেদিকে না তাকিয়েও অনুভব করল, তার প্রতিটি লোপকূপে ওই বিমুগ্ধ দৃষ্টি যেন বিদ্ধ হচ্ছে। অবস্থাটা তার অত্যন্ত কঠিন মনে হল। এই সঙ্গে তার মনে পড়ল পাগলা গৌরাঙ্গের মুখটা, তার সেই বিস্মিত চোখ। যা দিয়ে সে পাগলের মত দেখতে মহিমকে, আর বুকে জড়িয়ে ধরে বলত, হবে—তোমার দ্বারা হবে।

ক্ষণিকের এ স্তব্ধতা অস্বাভাবিক লাগল হেমবাবু আর মহিমের কাছে।

হেমবাবু বললেন, যাক্, এখন বল তো, বর্তমানে কি করছ তুমি ? কোন কাজ-টাজ হাতে নিয়েছ নাকি ?

মহিম বলল, হ্যাঁ, আরম্ভ করেছি একটা।

কি, বল তো ?

এক কথাই জবাব দিতে পারল না মহিম। একটু হেসে মাথা নোয়াল সে।

বলুন না। প্রশ্নটা যেন উমাই করেছে, এমনভাবে কথাটা বলল সে।

শিব আর সতীর। চোখের মধ্যে স্বপ্নের ছায়া নামল মহিমের। খানিকটা আপন মনেই বলে চলল সে, সেই ক্ষ্যাপা শিব যখন মৃতা সতীকে দাহ করতে চলেছে কাঁধে সতীকে নিয়ে—সেই মূর্তি।

অপূর্ব ! বিস্মিত উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন হেমবাবু !

সামনের বড় টেবিল-ল্যাম্পটার উজ্জ্বল নীরব শিখার মত দীপ্ত কম্পিত মনে হল উমাকে। কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

আবার খানিকক্ষণ নীরবতায় সকলেই যেন অনুভব করল—এই মুহূর্তের গম্ভীর সুন্দর রূপটুকু।

তোমার একটা মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতিমূর্তি কিন্তু করা উচিত। ভারতের মহামানব তো তিনি! শ্রদ্ধায় ধ্যানস্থ মনে হল হেমবাবুর চোখ দুটো। তাঁরও একটা আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ও সততায় মানসিক চিন্তার শৌর্যতায় ভরা দিক আছে, যেদিকটাকে তিনি মনে করেন আনন্দ ও বলিষ্ঠ আদর্শে মহীয়ান, যার ভাব-গাম্ভীর্য তাঁকে আচ্ছন্ন করে।

মহিম বলল, ভেবেছি অনেকবার, কিন্তু হয়ে ওঠেনি আজও।

কিন্তু সে বলতে পারল না, সমস্ত কিছুর মূলেই যে অনুপ্রেরণা বোধ তার থাকে, সে অনুপ্রেরণা সে পায়নি। কথাটা বলে সে একবার তাকাল উমার দিকে। চমকে উঠল সে। মনে হল তার সামনে বুঝি পাগলা গৌরাঙ্গ বসে আছে, এমনি কঠিন দৃষ্টি উমার। আর কি নির্মম শ্লেষে বেঁকে উঠেছে তার ঠোঁট দুটো। পাশাপাশি হেমবাবু আর উমার মুখের পার্থক্য যেন অবিশ্বাস্য মনে হল তার।

আমিও আপনাকে একটা অনুরোধ করব কিন্তু। আবার সহজ-ভাবে হেসে বলল উমা।

নিঃশব্দে মহিম তাকাল উমার দিকে।

রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন আপনি?

আঘাত পেল মহিম, তৎসঙ্গে ক্ষোভ। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না। কেবল ভাবল, শহরের এ বিদুষী মহিলা তাকে কতখানি অর্বাচীন ভেবেছে! অবশ্য তাকে বেশী দোষী করার অধিকার নেই, কারণ এটা যে নয়নপুর, বাংলা দেশের লক্ষ গ্রামের একটি মাত্র। আর তারই এক অন্ধ বাসিন্দা মহিম! সত্যই নয়নপুরে তাদের মত মানুষ, যাদের সংখ্যাই নয়নপুরে বেশি, তাদের ক'জন জানে রবীন্দ্রনাথের নাম? আর পাগলা গৌরাঙ্গের বন্ধুত্বের প্রথম দিনটি থেকে, সে কত জেনেছে, শিখেছে ভাবতে, তাই বা ইনি জানবেন কি করে?

কিন্তু সে ঘাড় কাৎ করার আগেই উমা বলল, শুনেছেন, নিশ্চয়ই। সেই কবির একখানি মূর্তি কিন্তু আপনার গড়া উচিৎ। বিশ্বকবি তিনি।

কথাটা আগে কখনো মনে হয়নি। উমার মুখ থেকে শুনে মনে হল, সত্যই তার শিল্প চর্চায় একটা ফাঁকই থেকে গেছে। কবি যে সত্যই তার বড় শ্রদ্ধার আর প্রিয়পাত্র যাঁর মানবিকতা তাকে উদ্বদ্ধ করেছে।

হেমবাবু আর উমা, তু'জনের কথাতেই সে সায় দিল। কেন যেন তার মনে হল, একই বাড়িতে এই তুটি মানুষ একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির। এদের কথায় এবং ব্যবহারে—তফাৎটাই সে আজ দেখল। শুধু তাই নয়, তার মনে হল, একটি মানুষের যে চারিত্রিক প্রভাব আছে, তা দিয়ে তু'জনেই যেন, খানিকটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে প্রভাবান্বিত করতে চাইছে মহিমকে।

এবার কাজের কথায় আসা যাক, যেজন্য তোমাকে ডেকেছি। এতক্ষণ পরে কথাবার্তার সুরে এবং চেহারায় একটু বৈষয়িক হয়ে উঠলেন হেমবাবু। বললেন, পূজো তো এগিয়ে এল, এবার আমাদের প্রতিমার ভারটা তুমিই নেওনা।

মহিম খানিকটা সংকোচের সঙ্গেই এ অনুরোধ অস্বীকার করল। বলল, সে সময়ও তো নাই, আর অতবড় কাজ আমি করতেও পারি না।

হেমবাবু অসন্তুষ্ট হওয়ার বদলে হেসে উঠলেন। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু একেবারে নিরাশ করলে চলবে না। আসছে বছর তোমাকে করতে হবে। এবারও পরিকল্পনাটা তুমিই দাও।

মহিম হাসল। বলল, আমি এবার তা হলে যাই?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত হল অনেক। পরান, একে একটা আলো দেখা।

মহিম প্রণাম করল হেমবাবুকে, তৎসঙ্গে উমাকেও।

আশ্চর্য! উমা এবার আপত্তি করল না। কি যেন বলতে চাইল তাও পারল না। একটু পরে বলল ডাকলে কিন্তু আবার আসবেন।

॥ ৪ ॥

বাড়ির বাইরে সাঁকোটা পেরিয়ে হঠাৎ পরান বলে উঠল, ভাবখানা মোরে তাজ্জব করলে। তোমারে ডাকতে যাওয়ার আগে কর্তা বললে, 'দশরথের ছেলে সেই কুমোরকে একটু ডেকে নিয়ে আয়।

মহিম আশ্চর্য হল না। কিন্তু পরানের বিরক্তি দেখে সে বিস্মিত হল। বিরক্তি নয়, পরানের কথার মধ্যে কর্তার বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ রয়েছে। পরানের জীবনে এটা নতুন কি না জানা নেই, মহিমের কানে এটা নতুন।

আর কিছু না বলে পরান ফিরল।

আকাশের একফালি চাঁদ ডুবেছে অনেকক্ষণ। জমাট অন্ধকার। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় সামান্য জল হয়ে গেছে। মহিম টের পায়নি। দীঘির কালো নক্ষত্রের ঝাপসা রেখা দুলছে।

মনে পড়ল গোবিন্দের কাছে একবার যাওয়ার কথা। দৈনন্দিন আড্ডাস্থল সেটা মহিমের। ভক্ত গোবিন্দ। ভক্ত বললে বোধ হয় ভুল হবে, সাধক গোবিন্দ।

অন্ধকার, কিন্তু পথ জানা। মহিম এগুলো। কয়েক পা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল।

সামনে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ভয় পেয়েই মহিম অস্ফুট গলায় জিজ্ঞেস করল, কে ?

আমি ভরত।

অ। তা—তুমি—

তা না এসে উপায় আছে নাকি আর কিছু। ভরত বলে উঠল, ঘরে তো থির হয়ে মোর দু'দণ্ড বসবার জো নাই। তা-কি, বিত্তান্তটা কি এতক্ষণ বাবুদের বাড়িতে ?

মহিম বুঝল, রাগটা ভরতের অহল্যার উপর। সে-ই তাকে

উৎকণ্ঠিত হয়ে এখানে পাঠিয়েছে, কিন্তু কি কথা এতক্ষণ হল, কি বলবে সে ভরতকে মহিমের কাজকে ভরত বলে, বনের মোষ তাড়ানোর কাজ। কথাকে বলে ফষ্টিনষ্টির বড় বড় কথা। আবার এ-ও ঠিক, এই ভাইটিরই জন্য গাঁয়ে-ঘরে তার ঢাক পেটানো গলাবাজিও কম নেই, নেই গৌরব-বোধেরও কম। সামনে যা-ই হোক, আড়ালে মনের মধ্যে তার কোথায় যেন অনেকখানি শ্রদ্ধা এই ভাইটির সঞ্চিত আছে। আছে বিস্মিত ভালবাসা।

মহিম বলল, ওই হল নানান কথা। বাজে কথা সব।

মহিমও বলে বাজে কথা। ভরত বোঝে, এ হল তার মন যোগানোর আড়ে তাকেই ঠাট্টা করা। আসলে তার ভাইয়ের কাছে যে সে-সব কথা মোটেই বাজে নয়, সে কথা বোঝবার মত বয়সের মিনসে সে হয়েছে। মনে মনে বলে, ছোঁড়া যদি এট্টুও খাতির করত। তা নয়, বলেছি বলে কেমন খোঁচাটা দিল।

বাজে নয় তো কি, কাজের কথা নাকি? গম্ভীরভাবে বলে ভরত।

অবাক করলে। আমিও তো তাই বলচি। অন্ধকারে মহিমের হাসি দেখতে পেল না ভরত।

বলবিই তো।

কিন্তু ভরতের মনে প্রবল কৌতূহল, কি এতক্ষণ ঘটল জমিদার বাড়িতে। না শুনলে তার পেটের ভাত হজম না হয়ে অস্বস্তি বাড়বে আর ছটফটানিতে কাটবে। তা ছাড়া, অনেক মানুষ যেমন আছে, কথাটি শুনেছে তো অমনি চাউর করে, ভরত খানিকটা সেই রকম। কথা সে যাই হোক, সাজিয়ে গুজিয়ে নিজের মতটি করে নিয়ে চালু করবে সে। কৌতূহল ভরতের সেইখানেই বেশি, যখনই মনে হচ্ছে. কথাটা নিয়ে গাঁয়ে-ঘরে ঘুরে বেড়ান যাবে খুব। আর সে রকম কথা হলে বুকে ঠোকার বাহাদুরিটাও পাওয়া যাবে কম নয়।

বলছি এতখোন ধরে ,কথাটা কি হল? বলে দাঁড়িয়ে আছি তো সেই ক' দণ্ডকাল ধরে। তারও খানিকটা উৎকণ্ঠা এসে পড়েছে মনে।

মহিমও বুঝল, মুখে যতই নীরস হোক, ভরতের মনে আছে উৎকণ্ঠিত ছটফটানি।

উৎকণ্ঠারই ব্যাপার। যাদের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে শুধু অপমান, উৎপীড়ন, যাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে অত্যন্ত তিক্ত, তাদেরই এ আকস্মিক ডাক কেন? প্রশ্নটা বিস্মিত এবং উৎকণ্ঠিত। নয়নপুরের কত মানুষের ডাক পড়েছে এমনি অতীতে কতদিন। এখন গল্প হলেও শোনা গেছে, সে ডাকে হাজিরা দিতে গিয়ে জোয়ান মদ্দরা অনেকে ফিরেও আসত না। যদি বা আসত, কথায় বলে 'বাঁশডলার' রক্তাক্ত দেহ নিয়ে নিজের দাওয়াটিতে এসে চিরদিনের মত চোখ বুঝত। নয়নপুরের ওই প্রাসাদ নয়নপুরের শতাব্দীর কোটি প্রশ্নের জবাবে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের কাছে জিজ্ঞাসা। পাথর কোন দিন কথা বলেনি। ওই মৌন প্রাসাদ নয়নপুরের কাছে আজও বিভীষিকায়, লোভে, হাসি-কান্নায় এক বিচিত্র রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে। ওই প্রাসাদের মানুষের পরিবর্তন আজকাল চোখে পড়ে, প্রাসাদটার পরিবর্তন চোখে পড়েনি কোনদিন, মানুষের নীরব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়নি আজও।

শ্মশান পবিত্র, কিন্তু শ্মশানের আতঙ্ক কি দুর্নিবার! যেন কোন বিভীষণ রহস্যে ভরা, কণ্টকিত ভাবনায় মূঢ় করে দেয়, এনে দেয় আড়ষ্টতা।

ভরত উৎকণ্ঠিত হবে ব-ই কি! নয়নপুরের মাটিতে যার জন্ম, নয়নপুরের ওই প্রাসাদ তো এক বিশিষ্টতা নিয়ে আছে তারও মনে। তার রক্তের ধারায় মিশে আছে ওই প্রাসাদের কথা, ওই রূপ। কোনদিন যেখানে ডাক পড়েনি, না পড়াটাকেই সৌভাগ্যের কথা বলে জেনে এসেছে, সেখানেই ঘরের মানুষ প্রহর কাটিয়ে এল। উৎকণ্ঠা হবে না ভরতের? অহল্যার মুখে এ কথা শুনে প্রথমেই তার মনে যে উৎকণ্ঠা এসেছিল, তা-ই শেষটায় ক্রোধে পরিণত হয়েছিল তার। পরানের কথায় বিশ্বাস কেন করেছিল অহল্যা, আর মহিমই বা এক কথায় রাজী হয়েছিল কেন? জীবনে যাদের সঙ্গে কোন দিন খাজনা,

আর প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কারবার নেই, যাদের আহ্বানকে লোক সন্দেহের চোখে দেখে, যেখানে লোকে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় মনে করে—অমঙ্গলকর কিছু ঘটতে পারে বলে, সেখানে এ ভর সন্ধ্যেবেলা ডাক পড়ার কি কারণ থাকতে পারে ?

নয়নপুরের মানুষ মহিমও। তাই তো তার বোসেদের সাঁকো পেরিয়ে পাঁচিলের আড়ালে গিয়েই মনে হয়েছিল, যেখানে সে এল, সেখান থেকে নিজের ইচ্ছায় বুঝি আর কোনদিন বেরুতে পারবে না। তাই তো তার সেই দ্বিতীয় মহলের অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে মেয়ে-মানুসের হাসি শুনে কত উদ্ভট কথাই মনে হয়েছিল—এখানকার বিচিত্র রহস্যের মত পরানও বদলে গেছে বুঝি। শিউরে উঠেছিল সে!

তারপর মানুষের সঙ্গে কথা বলে সে ভুল তার ভেঙেছে, সহজ হয়েছে মন।

সহজ হয়েছে ভরতের মনও, যখনই মহিমকে পেয়েছে সে। তবু নিভে আসা উৎকণ্ঠার মধ্যেই কৌতূহল তার বেড়েই উঠল।

বলল, তা, বাবুরা ডেকে কি বললে, বলবি তো সেটা ?

বলছিল পিতিমে গড়ার কথা বাবুদের বাড়ির।

হ্যাঁ ? উল্লসিত মনে হল ভরতকে। বলল, তোরে চেনে তা'লে বাবুরা ? অ' সবই জানে তা'লে তোর ওই পুতুল-পিতিমে গড়ার কথা ?

হ্যাঁ, তাই মনে হল।

মনে হল ? ভাইটার কথায় উদাসীনতার বিদ্রূপের আভাস খুঁজে পেল ভরত। ছোঁড়া রেয়াৎ করে না মোটে। কিন্তু সে রাগ করল না। বলল, তা না হবে কেন ? কত্তা তো শুনেছি খুব ভদ্দরনোক মানুষ। কলকাতায় থাকে কি-না ? নেকাপড়ার গুণ আলাদা। আবার পাশ করা বউ এনেছে।

কথাটাতে চমকে উঠল মহিম। ও, গাঁয়ের সকলেই তা হলে উমাকে জানে। একমাত্র তারই জানা এতদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সত্যই, উমা তো আর পুরোপুরি অন্দরবাসিনী নয়। গাঁয়ের লোকে

তাকে চিনবে বইকি ! এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

তা তুই কি বললি ? গড়বি ?

নিস্পৃহ গলায় বলল মহিম, না।

না ? কথাটা অপ্রত্যাশিত। বরং ভরত ভেবেছিল, মহিম হ্যাঁ বললে সে দু-একটা খোঁটা দিতে পারবে ভাইকে। কিন্তু সেটা হত নিতান্তই মৌখিক। আসলে সে আচমকা ভয়ানক নিরাশায় খেপেই উঠল কথাটা শুনে।

না কেন বললি ?

সময় কোথা ? সময় নেই। আর পিতিমে গড়া—ওসব আমার দ্বারা হবে না আর।

কেন ? তাজ্জব হল ভরত। বলল ওই দিয়েই তো তুই হাত পাকালি।

কথাটা শুনে রাগ হল মহিমের। দিন কি মানুষের সমান যায় গো, না, মনটা চিরকাল একরকমই থাকে ! আজ যা মানুষের মন ভোলায়, কাল আর তা ভাল লাগে না। কবে কোনকালে ঠাকুর গড়তে ভাল লেগেছে, তাই বলে অ-আ-ক-খ কি মানুষের চিরকালই পড়তে ভাল লাগে। মহিম বেদনা বোধ করে, রুষ্ট হয় ভরতের উপর। ভরতের কাছে শিল্পবোধের কোন মূল্য নেই। জবাব দিল না সে।

ভরত বলল, ঠাকুরের মূর্তি তো তুই গড়িস, তবে পিতিমে গড়বি না কেন ?

মন চায় না ?

ভ্যালা রে তোর মন ! প্রায় ধমকের মত বলে উঠল ভরত। তা কেন চাইবে মন ? এতে যে এট্টু ঘরের সাচ্চয় হত। তা, তোর সইবে না।

আচমকা আঘাতে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল মহিম। কথাটা নির্মম সত্য, কিন্তু বেদনারও। আরও কয়েকদিন মহিমকে সোজাসুজি না হোক প্রকারান্তরে এরকম কথা বলেছে। সত্যই, মহিম এখন বড় হয়েছে, সংসারের ভার তাকেও খানিক বইতে হবে বই কি ? চিরদিনই

কিছু আর এমনি স্বপ্নছায়ার তলে জীবন কাটবে না। মহিমও তা জানে। জানে বলেই বেদনা তার এত বেশি। এ বেদনাবোধের জন্যও আছে কিছু বিক্ষোভ। বেদনাই বা কেন ? কেমন করে দিন চলে, কবে আর সে খবর সে রেখেছে ! কবে আর ভেবেছে, কোনো দিনেকের তরে জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে তাকে আর দশটা মানুষেরই মত বাস্তবের জীবনযুদ্ধের পথে শরিক হতে হবে। ভাবতে হবে কত ধানে কত চাল, স্বপ্ন দিয়ে পেট মানে না ! সে তো পরম নির্ভরশীল, পরের কাঁধে ভর করে আছে। আজ না হোক কাল—একদিন না একদিন মুখের কথা খসবেই, আর সেই খসাতে যদি মুখের গরাস খসার কারণ হয়ে ওঠে, সেদিনের ভাবনা কি নয়নপুরের খালের জলে খাবি খেয়ে ডুবেই শেষ হবে ? তা তো হবে না।

কিন্তু এও আবার সত্য যে, ভরত বলে অনেক কথা, মহিমকে তার ভেতরের মনটার ছায়াতলে সে-ই তো রেখেছে ঘিরে। সাতে পাঁচে থেকেও সাতে পাঁচে না থাকার মত মানুষ ভরত। মুখে অমন কত কথাই বলে সে। রাগের সময় রাগে, হাসির সময় হাসে। মনে যা আসে তাই বলে। আর না বললেই বা চলবে কেন ? শত হলেও ছোটভাই তো ! তা, সে সৎ হোক আর সহোদর হোক।

কিন্তু এখন মহিমকে চুপ করে থাকতে দেখে ভরত বুঝল, কথাটা লেগেছে মহিমের। ছোঁড়ার লাগেও আবার বেশি। কি এমন কথাটা বলেছে সে যে একেবারে গুম্ মেরে যেতে হবে ! অন্যায় কথা তো কিছু বলেনি সে। বাবুদের বাড়ির পিতিমে পড়লে, কোন্ না আজ পঞ্চাশটা টাকা আসত ঘরে। কিন্তু ভাইয়ের তার সেদিকে টান নেই মোটে। উদাসীন বড়। উদাসীন থাকলে চলবে কেন চিরকাল ? জীবনটারে নিতে হবে তো গুছিয়ে গাছিয়ে। হ্যাঁ, হিসেবী মানুষ ভরত। সেধে লক্ষ্মী আসতে যদি চায় ঘরে, তা সে কষ্ট স্বীকার করেও আনতে হবে। তার মানে, ভাই তার আপন-ভোলা হোক, কিন্তু পয়সার বেলা আপনভোলাগিরি চলে নাকি ? তখন নাকি চলে একটু চনমনে না হলে ?

বললে, রাগ করলি বুঝিন ?

না।

না কেন, রাগই তো করেছিস ? কথাটা কিছু অন্যায্য বলছি বুঝিন্ আমি ? গুলা পঞ্চাশ টাকা তো—

মহিম শান্তভাবেই বলে উঠল, বলব বাবুদের। কথা ফিরিয়ে নিতে আর কতক্ষণ।

হ্যাঁ, কথা ফিরিয়ে নেবে না, ছাই করবে। বলে ফেলেছিস, চুকে গেছে। দেখা যাবে আবার বছর ঘুরলে। এরকম কথা বললেই আবার খটকা লাগে মহিমের। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কথাটা রাগের না অরাগের। বলল, তাতে কি হইছে, মান তো আর বয়ে যাবে না।

ভরত বলে উঠল—যাবে না তো কি ? মুখের কথার দাম নেই নাকি ? বাবু বলে তো পীর নয় তারা !

আশ্চর্য ! লোকটা পাড়া ঘুরে ঝগড়া বিবাদ করে ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গি করে, সদরে মামলা করতে ছোটে। বাড়িতে চেঁচায়, তম্বি করে, সে এক রকম। বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এ আবার কি ? হঠাৎ মুখে একটা শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভরত। আ-মলো, এ-যে পশ্চিম পাড়ায় চলে আসছি।

এসেছে মহিম। আর কথার ফাঁকে ভুলে তাকে অনুসরণ করে চলে এসেছে ভরত।

তোর বউদি বোধ হয় আবার এতক্ষণ হা-হুতোশ করছে, ফিরে চল তাড়াতাড়ি।

পশ্চিম পাড়ার শেষ সীমানায় গোবিন্দের ঘর। বৈষ্ণবী বনলতাদের আখড়ার কাছাকাছি।

মহিম বলল, এসেই পড়েছি যখন, একবার ঘুরে আসি গোবিন্দের কাছ থেকে।

হ্যাঁ, তা না হলে আর পাগলের মেলা জমবে কেন ? ভরত ধমকে উঠল। —চল্ চল্, সে আবার ভাত নিয়ে বসে আছে।

গোবিন্দকে ভরত পাগল মনে করে। যেমন পাগল মনে করে বামুনদের গৌরাঙ্গসুন্দরকে, তেমনি। কারণ, এসব লোক তথাকথিত পাগলের মত গালাগালি দেওয়া অথবা হিংস্র প্রকৃতির আর দশটা পাগলের মত নয়। এরা নায় খায় শোয় হাসে কথা বলে, তবু এদের নাগাল পাওয়া দায়। বহু দূর ফারাক যেন রয়েছে এদের সঙ্গে আর সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে। সংসারের মধ্যে থেকেও এরা সংসার থেকে দূরে। ভরত বলে পাগল, কিন্তু ওদের পাগলামো সমীহ জাগায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নীচতায়-হীনতায় কলহে-ঝগড়ায় ওরাই একমাত্র শান্তির ধ্বজাধারী। পাগল বলে, কিন্তু বিদ্বেষ, উপেক্ষা, অসামাজিকতার সুর নেই তাতে।

তবু মহিম বলল, মোর পিত্যেশ করে বা বসে আছে গোবিন?

তা বলে এত রাতে যেতেই লাগবে, এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে নাকি? ছ্যাখো দেখি কাণ্ড।

বন্ধুত্ব বড় ভারী। দিনেকের তরে বাদ যায় না তুই বন্ধুর ক্ষণেকের মিলন। প্রতিদিনের দেখা, প্রতিদিনে নতুন করে আগ্রহ বেড়েই চলে, উদগ্রীব উদ্বেলতা, ব্যাকুল আবেগের সঙ্গে মিশে থাকে প্রতিদিনের মিলনের সময়টিতে। একে খানিকটা বলতে গেলে লোকচক্ষে বন্ধুত্বের বাড়াবাড়ি, ঈর্ষাকাতরও করে বই-কি মানুষকে এ বন্ধুত্ব! বলতে ছাড়ে না লোকে যে, এটা খানিকটা নেড়ানেড়ীর ভাবে ঢলাঢলি কাণ্ড। মনের মিলের হদিস সেই দেখন্ চোখে এই দু'জনে। তর্কবিতর্ক দৈনন্দিন, কাজকর্মে আলাদা, অমিল যেন পর্বত সমান। তবু নিয়ত ছিন্নোম্মুখ সুতোটির কোনখানের গেরোটিতে যে এ শিল্পী আর সাধক বাঁধা—তা কেউ খুঁজে পায় না।

আজ সত্যিই ব্যতিক্রম দেখা দিল, যে ব্যতিক্রমের সূত্রপাত আজ জমিদার বাড়ির ডাক করেছে। রাত্রি অনেক হয়েছে, তৎসঙ্গে অহল্যার কথাও মনে পড়ল মহিমের। সে ভরতের সঙ্গে ঘরের দিকেই চলল! কিন্তু অত্যন্ত অস্বস্তি নিয়ে।

॥ ৫ ॥

বাড়ি থেকে অনেকটা দূর থেকেই তারা দেখতে পেল, বাইরের দরজায় একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে পথটা আলোকিত করে। আর পথের মাঝে আলোর কম্পিত ছায়া ফেলে বউ একটি দাঁড়িয়ে আছে—এদিক পানে চেয়ে।

মহিম-ভরতের চকিতে একবার চোখাচোখি হল। ভরতের চোখে অভিযোগ, মহিম সেই অভিযোগ মেনে অপ্রতিভ। কারণ তারা উভয়েই বুঝতে পারল রাত্রের নির্জন পথে উদ্বেগ দাঁড়িয়ে আছে অহল্যাই।

তাদের দু'জনকে চোখে পড়া মাত্র আলো নিয়ে অহল্যা অন্তর্ধান হল। তাতে তার ক্রোধের মাত্রা পরিস্ফুট হল আরও বেশি।

মহিম আর ভরত বাড়ি ঢুকে হাত মুখ ধুয়ে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হল। অহল্যা থালায় ভাত বেড়ে প্রস্তুত। কেউ-ই কোন কথা বলল না। মহিম আর ভরত কথা বলতে ভরসা পেল না।

তারা বসা মাত্র ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে অহল্যা হেঁসেল গুছোতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভরত জিজ্ঞেস করল, খাবে না তুমি ?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু ভরতের খাওয়া আটকাল না তাতে। সে খেতে খেতেই বলল, পথে আবার একটু কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। এ ছোঁড়া আবার এত রাতে বলে—গোবিনের ঠাঁয় যাবে।

গেলেই তো হত। নিস্পৃহ গলায় বলল বটে কথাটা অহল্যা, কিন্তু তাতে রাগের মাত্রা প্রকাশ পেল আরও বেশি।

মহিম হাত গুটিয়ে নিয়ে কিছু একটা বলবার উদ্যোগ করতেই মানিকের গলা শোনা গেল। ছেলেমানুষ, বছর ষোল বয়স। বাপ-মা নেই বলে এই বয়সেই কামলার কাজ ধরেছে। ডাকা-বুকো

ডানপিটে, ভূতপ্রেতের দোসর বেহ্মদত্যির হুকুমে চলা মানিক। কোন কিছুতে প্রত্যয় নেই। বড় মানে না, ছোট মানে না, মানে না জাত-বিজাত—মানে খানিকটা অহল্যাকে। এই মানার মধ্যে আছে হয়তো কিছু বিচিত্র মনের রঙ, যার হদিশ অহল্যারও জানা নেই বুঝি।

মানিক উঠোন থেকেই বলে উঠল, কাকী গো, মহিমকাকা বাবুদের বাড়ি থেকে তো চলে আসছে অনেকক্ষণ! বলতে বলতে কাছে এসে তাদের দেখতে পেয়েই বলে উঠল, হেই ছ্যাখো, ভরতকাকাও এসে পড়েছে। তোমাদের লেগে কেমন করতেছিল কাকী। বাইরে গেলে তোমরা ঘরে ফিরতে ভুলে যাও কেন বল তো বাপু?

হ্যাঁ, এমনি পাকা পাকা কথা মানিকের। কিন্তু ভরত তো সাধারণত রাত্রি করেই আসে, আজকের ব্যাপারটা মহিমের জন্য। এবং আজকের ব্যাপারটা, এই উদ্বেগে ভয়ে মানিককে পাঠানো, আর সেটা ধরা পড়ে যাওয়া, বিশেষ করে এই মুহূর্তেই, তাতে সে খানিকটা লজ্জা পেল। কিন্তু লজ্জায় সে অপ্রতিভ হতে চাইল না।

বলল মানিককে, নে হয়েছে। ঘটি ভরে জল নিয়ে বোস দি নি। ভাত ক'টা খেয়ে নে।

বটে, সে আশায় হেঁসেল নিয়ে বসে আছ কাকী তুমি? মানিক বলল, পাগলা বামুনদের বাড়িতে যে আজ পেট ঠেসে খাওয়ালে। ওদের সেই গড়পারের হিজল গাছটা আজ একা একাই কুপিয়ে নামিয়ে দিলাম কি না।

বেশ করেছিস্। অহল্যা বলল, তা বলে পেটে তোর চাড্ডি ভাতের জায়গা নাই নাকি রে!

কথার শেষে সে লক্ষ্য করল মহিম খাচ্ছে না। ভরত ভীষণ গম্ভীর। মাঝে মাঝে সে লক্ষ্য করছে মানিককে। বুঝতে পারল, এ হতচ্ছাড়া হারামজাদা ছেলেটা তার ঘরের হাঁড়ি থেকে নির্ঘাৎ কিছু গিলবে! এ নিয়ে অহল্যাকে বহুদিন কথা বলেছে, কিন্তু তার প্রতি বউটির মায়া দেখলে গা জ্বলে। নিজে না খেয়ে খাওয়ায় সে মান্‌কে ছোঁড়াকে।

আর মহিম বুঝল মানিককে যে চাট্টি ভাত খাওয়ার জন্য অহল্যা,

ডাকছে—সে ভাত অহল্যার নিজের জন্য রাখা। রাগ হয়েছে, তাই নিজে না খেয়ে সে খাওয়াতে চায় মানিককে।

চিরকাল যেমন সে করে আজও তাই করল। হাত গুটিয়ে বলল, বলছে তো ওর পেট ভরা আছে। তুমি খাবে না?

কোন জবাব দিল না অহল্যা।

ভরতের খাওয়া প্রায় শেষ। এসব রাগ-অভিমানের দিকে সে বড় একটা খেয়াল করে না। নিতান্ত গম্ভীর ভারী মানুষ, ঘরের কর্তা। মান-অভিমান সাধাসাধি ওসব মহিম-অহল্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভরতের তা নেই, আর মনে করে বোধ হয় সে যে, তা থাকতেও নেই। কেবল বলল, নেও নেও, খেয়ে নেও।

বলে আল্‌গা করে ঘটি ধরে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে উঠে পড়ল সে।

কই, ভাত বাড়ো? মহিম আবার বলল, ইচ্ছা করে দেরি করছ নাকি?

না, ইচ্ছা করে নয়। তাই এত রাতে আবার পশ্চিম পাড়ায় যাবার সাধ হইছিল।

তা বটে, মহিম বুঝল এত রাতে আবার আড্ডার ইচ্ছাটা অপরাধ। সে বলল, যাই নাই তো! তবে?···খেয়ে নেও।

বড় অল্পেতে অহল্যা রাগে। বড় সহজে তার দাবি আদায় করতে চায় সে। অভিমানিনী বেশি, মন তার কিছুতেই যেন তুষ্ট হতে চায় না। এমনি সাধারণ সরল চাষী বউ। তবু এক একসময় আসে—তার একটা চরম পরিণতির সময়, তখনকার ভাব কথা হাসি গান কিছুরই কোন হদিস পায় না কেউ। মহিম নয়, ভরত নয়। কঠোরতায় বিহ্বলতায় সে এক অপূর্ব অহল্যা। কলকাতায় পাগলা গৌরাঙ্গের চোখের জলের কথা শুনে অহল্যা বি[illegible] কঠিন রূঢ়তায় বলে উঠেছিল, যেমন কর্ম তেমন শাস্তি। পাগলা গৌরাঙ্গের প্রতি তার নিষ্ঠুরতা দেখলে মহিম আশ্চর্য হয়। হ্যাঁ, সেদিন মহিমকে নিয়ে ফিরে আসার পথে উমার মত সেই বিদ্রূপ আর ডঙ্কা বাজিয়ে ফেরার মত হাসিতে বঙ্কিম রেখায় বেঁকে গিয়েছিল তার ঠোঁট। কিন্তু মহিম তো চোখের

জলই ফেলেছিল। সেদিন এ সাধারণ বউটির কোন মায়ার উদ্রেকের লক্ষণ দেখা যায় নি মহিমের কান্নায়। বরং রাগ করেই বলেছিল, তবে ফিরে যাও তোমার পাগলা বামুনের কাছে।

অহল্যা দেখল, অপরাধ স্বীকারে কি করুণ আর শিশুর মত হয়ে উঠেছে মহিমের মুখখানি। নিছক মাটির মন তার, তাও বুঝি খালের জলের ধারে নরম মাটির মত! হাওয়ার টানে শুকোয়, রৌদ্রে জমে যায়, আবার জোয়ারের এক ধাক্কাতেই গলে গলে মিশে যায়, একেবারে তলিয়ে যাওয়ার মত!

আর এমনি গলে যাওয়ার মুহূর্তে তারই অজানতে তার চোখ দুটো পলকহীন হয়ে পড়ে। সে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে মহিম মনের হদিস পায় না অহল্যার। এ চোখের মধ্যে জমিদারের পুত্রবধূর উচ্ছ্বাস আর তীব্রতা না থাকলেও বিস্মিত বিমুগ্ধতায় আচ্ছন্ন।

কই, খাও, মহিম বলল।

অহল্যা যেন আচমকা নিঃশ্বাস ফেলে আরও গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, আর যমের বাড়ি গিয়ে খাবো।

ও। রাগ তা হলে কমেনি অহল্যার এখনও। মহিম সোজা বাঁ হাত দিয়ে অহল্যার একটা পা চেপে ধরল। এই পা ছুঁয়ে বলছি আর দেরি হবে না।

অহল্যা হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। ছাড়ো ছাড়ো, হয়েছে।

আগে, খাবে কি না। বল।

খাচ্ছি খাচ্ছি। অত দরদ দেখাতে হবে না।

বলে, খাবে না। হ্যাঁ! বলে মহিম আবার খেতে শুরু করল।

মানিকও হাসছিল। অহল্যা মাথা নিচু করে তখনও বুঝি হাসছিল, তাই তার শরীরটা দুলে দুলে উঠেছিল দমকে দমকে। মাথা নিচু করেই সে ভাত বাড়তে লাগল দুটো থালায়। একটা মানিকের, একটা তার।

মহিম খেয়ে ওঠবার সময়ও দেখল অহল্যা মাথা নিচু করে আছে। বললে, তুমি খানিক পাগলও বটে বউদি।

বলে সে বেরিয়ে গেল।

সামনের বাড়া ভাতের থালায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরতেই তাড়াতাড়ি চোখ মুছল অহল্যা।

ও! অহল্যা বুঝি কাঁদছে। কেন?

তা বুঝি কেউ জানে না। এ তার সেই বাঁধা বীণার তারের বেসুর? যে স্বগত বেসুরের ধ্বনি আর রূপ বাইরে ঢাকা পড়ে থাকে? যার তরঙ্গ কোথাও কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে না, নিতান্তই একলার?

—নে মানিক, ভাত ক'টা নি বাইরে বোস। থালাটা এগিয়ে দিল।

তার চোখের জল দেখে বিস্মিত বিমূঢ় মানিক থালাটা নিয়ে গিয়ে বাইরে বসল। কিছু বলতে পারল না।

হাত মুখ ধুয়ে মহিম আবার এদিকে আসতেই অহল্যা তাকে ডাকল জমিদার বাড়িতে কি কথা হল বললে না?

বলব। বলে মহিম বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চেপে বসল ঘরের দরজাটির গোড়ায়।

ঘুমন্ত ভরতের নিঃশ্বাসের উচ্চধ্বনি শোনা গেল।

॥ ৬ ॥

পরদিন প্রভাতবেলা। তখনও সূর্য ওঠেনি। পূর্বাকাশে তার রক্তিম ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে মাত্র। আর সমস্ত আকাশটা জুড়ে শাদা যাযাবর মেঘের দল উড়ে উড়ে চলেছে। ঋতু শরতের রূপ, আলো ছায়ার খেলায় বিচিত্র শরতের রূপ। ঘন সবুজে ভরা ঝাড় বন গাছের পাতাগুলো অল্প শিশিরে ধোয়া নতুন কাজলে যেন চক্‌চক্ করছে।

মাঠে মাঠে সবুজ শস্যের মেলা। মেলা নয়, ঋতু শরতের খাসা সবুজ ওড়ানর লুটোপুটি খেলা। গোবিন্দ ঘুম থেকে উঠতেই প্রথমে তার মনে পড়ল মহিম গতকাল আসে নি। না আসার ব্যতিক্রমটা নতুন নয়, কিন্তু কারণ জানান দেওয়া থাকত আগে। আর ব্যতিক্রমটা

এতই কম যে সে কথা মনেই থাকে না। নিতান্ত অসুখ-বিসুখ না হলে শত ঝামেলা ঠেকিয়েও তো মহিম ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে গেছে। দু-দণ্ড বসবার সময় না থাকলে বলে গেছে, মনে বিঘ্ন নিয়ে গেছে কথা বলতে না পাবার জন্য। দৈনন্দিন জীবনের ব্যত্যয়টা এত বড়, ঘুম ভাঙ্গতে মহেশ্বরের করুণা ভিক্ষার আগেই তা মনে পড়ল। মহিম কাল আসেনি।

বর্ষা শেষ, ম্যালেরিয়া জমে ওঠার সময়, সেই সঙ্গে আরও নানান্ রোগ। গোবিন্দ শঙ্কিত হল, মহিমের মঙ্গল কামনা করে মহেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল সে।

গোবিন্দ তরুণ। তার আধ্যাত্ম বিশ্বাস অজস্র দেবদেবীর ভারে আর ভিড়ে ঝামেলায় ঝালাপালা নয়। তার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মিশেছে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা। যে আধ্যাত্ম জগৎ বিচিত্র এক রহস্যে ঘেরা, যা এ পৃথিবীর আড়ালে থেকেও নিয়ত বিরাজমান, তার পরিচালক এবং পরিচালনার রহস্য সম্বন্ধে সে শিশুকাল থেকেই অনুসন্ধিৎসু।

এর কারণ আছে। তার বাবা ছিল তান্ত্রিক, তন্ত্রোপাসক। মহাশক্তির পূজারী। জীবনের শেষ কতগুলো বছর তাঁর শ্মশানে মশানেই কেটেছে।

রাত্রিদিন ভাবে বিভোর, ধ্যানস্থ, সিন্দুরচর্চিত কপালে, সিন্দুরের মত লাল চোখ ছিল তার বাবার। ঝড় বন্যা—কীট পশুর বিষ্ঠার আস্তাকুড়ে ছিল যাযাবর জীবন। সাধনায় সে ছিল মহান গোবিন্দের কাছে। এ জগতে থেকেও ছিল না এ জগতে। জগৎ ছিল তাঁর আলাদা। সাধারণের অদৃশ্যে সে—সেই জগতের মানুষের সঙ্গেই কথা বলেছে, খেলা করেছে। তাদেরই সঙ্গে জীবনের অবশিষ্টাংশ কাটাতে গিয়ে—ঘরের ভাত খায়নি কোনদিন, স্পর্শ করেনি কোনদিন এই ভিটে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য কোন বস্তু!

খেয়েছে মড়ার খুলিতে করে মৃতের মেদ মজ্জা মাংস। মহাদেবের মত উলঙ্গ হয়ে যোগ-সাধনার জন্য পড়ে থেকেছে—নরকে। উজাড়

করেছে পাত্রের পর পাত্র কারণ। চোখে না দেখলেও শুনেছে গোবিন্দ —এই সবই নাকি দেবত্ব প্রাপ্তির আনুষ্ঠানিক কর্তব্যের খাতিরে। দেবত্ব প্রাপ্তি অর্থে শক্তি-সাধনা একমাত্র কর্ম। সিদ্ধিলাভ অর্থে নিজের মধ্যেই সর্বভূতকে অনুভব করা। আরও শুনেছে, যা শুনে তার কিশোর হৃদয় প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল আর কি, বিশেষ করে তখনও অর্ধজীবিতা তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে। তার মা তখন ক্রমাগত মোটা পাটের দড়ির গা থেকে এক এক পরত খুলে নেওয়ার মত জীর্ণ ও ছিন্নোন্মুখ হয়ে উঠেছিল। মুখে কিছু না বললেও, মায়ের এ ক্রমাগত অন্তিমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণটা প্রায় আঁচ করে নিয়েছিল সে। বোধ হয় সবই সয়েছিল তার মায়ের, সইল না, যখন শুনল তাঁর প্রৌঢ় তান্ত্রিক স্বামী শ্মশানে ভৈরবী জাগিয়ে শিবত্ব লাভে তন্ত্রসায়রে নিমজ্জিত।

কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না শুধু নয় উপরন্তু মহাদেবের অংশ প্রাপ্তির এ মহান সাধনাকে প্রকাশ্যেই অভিনন্দন জানাল।

ভৈরবী? সে আবার কে? রাজপুরের চক্রবর্তীদের লুণ্ঠিতা ধর্ষিতা—সমাজের প্রান্ত থেকে বিতাড়িত এক আধা-রূপসী বউ।

কিন্তু তান্ত্রিকের স্পর্শে, সেই ধর্ষিতা পেয়েছিল সেদিন রক্তজবার অঞ্জলি ধার্মিক জনতার আকুল প্রসারিত হাত থেকে, যা নাকি গোবিন্দের মাকে নিঃসন্দেহে একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু পিতার উপর পুরোপুরি বিদ্রোহ করতেও কোথায় যেন তার একটা দ্বিধা ছিল। দুঃখটা মায়ের নিজের সৃষ্টি, প্রকাশ্যে না হোক, প্রকারান্তরে সে একথাই ধরে নিয়েছিল।

তারপর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তার মা তাকে সঙ্গে করে খালপারের শ্মশানে গিয়ে উঠল।

মহাদেবের মত তখন তার বাবা হাড়গোড়ের মধ্যে আধশোয়া অবস্থায় শিব-নেত্রে বসে। অদূরে ছাই-গাদায় অর্ধ উলঙ্গ শায়িতা ভৈররী। উভয়েই ভক্তবৃন্দ-পরিজনে ঘেরা।

সবই মনে হল গোবিন্দের বীভৎস। চোখ দুটো তার বুজেই গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু ভক্তিও কম ছিল না। এবং কারুর নির্দেশ ব্যতীতই সে হাত তুলে দেবতাদের নমস্কার করেছিল।

ছেলের এই কাণ্ড দেখে, যেটুকু উৎসাহ আর আশা নিয়ে তার মা স্বামীর কাছে এসেছিল, তা যেন গেল আরও স্তিমিত হয়ে। ভয় পেয়েছিল পুত্রের মধ্যে এ ভক্তির সঞ্চারণ দেখে।

তবুও সে লজ্জার মাথা খেয়ে তার স্বামীকে ডাকল। আপত্তি না করে ভোলানাথভক্ত হেসে উঠে এল তার স্ত্রীর কাছে। সরে গেল তারা একটু আড়ালে—একটু দূরে।

সব কথা যেন মনে নেই গোবিন্দের। খালি মনে পড়ে তার মা ডুক্‌রে উঠে বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল, মোরে খানিক চিকিচ্চে করিয়ে, মোর শরীলটারে ভাল করে তুললে না কেন? চিরকালই তো, আর আমি এমনি-কুৎসিত ছিলাম না। তোমার সঙ্গে শ্মশান কেন, যে-কোন নরকে গিয়েও তোমার ভৈরবী হইতাম।

গোবিন্দেরও বুকটা ফেটে যাচ্ছিল মায়ের ডুক্‌রানিতে। কিন্তু সেদিন তার অতি অল্প রেখান্বিত গোঁফে ক্রোধও দেখা দিয়েছিল মায়ের এ ধর্মবিরুদ্ধ অর্বাচীনতায়।

কিন্তু আশ্চর্য। তার বাবা রাগ করেনি। কেমন এক রকম পড়ার মত হেসে বলেছিল, এ কথা আজ আর কেন বলতে এলি ন-বউ। ছোঁড়াটাকে নিয়ে ঘরে যা।

আর একটিও কথা না বলে চলে গিয়েছিল তার বাবা। তাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল তার মা। কিন্তু কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক থেকে গেল গোবিন্দের বুকে, যে ফাঁকটার মধ্য দিয়ে আজও হাহাকার শোনা যায়। যে হা হা শব্দ আজও তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে—অজানা নিরুদ্দেশ কোন এক পথে।

কয়েক দিন পরে মায়ের মৃত্যু সেই ফাঁকটাকে আরও বড় করে দিয়ে গেল, এল তার এক পিসিমা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে।

কিন্তু গোবিন্দের জীবনের নীলাকাশে সেদিন এমনি শরৎ মেঘের

ভিড়। কোথাও স্পষ্ট কোথাও দ্বিধা। কৈশোর জীবনটাকে এক অদ্ভুত গাম্ভীর্যে আর ছটফটানিতে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল।

তাই আচমকাই সে একদিন শ্মশানে গিয়ে হাজির হল। ভৈরবী নেই বাপ তার একলা। স্বস্তি পেল সে।

বাপও দেখল, কিশোর ছেলের কঠিন মুখ, জীবনের কোন এক আদিম নির্মম প্রশ্ন নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করল, বল বাবা, কি তোমার সাধনা?

বাপ বলল, সাধনা শক্তির, মহাশক্তির।

সে শক্তি কে, কোথায়?

সে সর্বভুতেষু। তাকে আপন ক্ষমতায় নিজের মধ্যে টানতে হয়।

তার কোন আকার নাই?

আকার আমি নিজে, আমি আধার। আমিই সব। মহাশক্তির জন্য আমার সংগ্রাম, সংগ্রামই সাধনা।

সে সংগ্রাম কি?

যমুনার উজান বইয়ে যাওয়া। মানুষের মন নিয়ত নীচের দিকে, তারে উঠতে হইবে উঁচু দিকে। ক্ষণজীবনের সব পরীক্ষায় তাকে পাশ করিতে হইবে। মানুষ নররূপে পশু, সে জন্য তাকে পাশবাচার করেই হজম করিতে হইবে পশুশক্তিকে। বিষপান করিয়াই নীলকণ্ঠ হইতে হইবে। তারপরেই বস্তু ও মানুষ ছাড়াই একলার মধ্যে সমস্ত আনন্দের অনুভব। তাই এখানে মন্ত্রের চেয়ে ক্রিয়া বেশি, বিচার থেকে আচার প্রধান।

গোবিন্দ সব না বুঝলেও এটা বুঝল যে, বীভৎস হলেও এগুলোই সাধনযোগ। বলল, তবে তো তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ?

শক্তি উপাসকের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। চোখ লাল। যেন এখুনি জল বেরুবে চোখ ফেটে। বলল চাপা স্বরে, না, আমার সিদ্ধিলাভ হয় নাই।

তবে এসব?

এ সবের সে উদ্দেশ্য করল, এ শ্মশান বাস, ভৈরবী, কারণ পান,

মৃতদেহ ভক্ষণ ইত্যাদি। ক্ষণিক বিমূঢ় রইল তার বাবা, তারপরে আচমকা গর্জন করে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলের উপর। এ সব তোর মাথা হারামজাদা। বেরিয়ে যা এখান থেকে।

মার খেয়ে সরে গিয়ে গোবিন্দ বলল, আর এক কথা বল। আমার মা কেন মরল?

আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

বুকের সেই ফাঁকটা দিয়ে আর্তনাদ করে উঠল গোবিন্দের। বুঝল, ধর্মে নামে বাপ তার পাপ করেছে এবং শৈশবের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস থেকেই সে বুঝল, প্রায়শ্চিত্ত তাকেই করতে হবে। বলল, তুমি মরেও তো মা'র কাছেই যাবে। ব'লো, তোমাদের তুজনের সদ্‌গতির সাধনা আমিই করব।

তান্ত্রিক কেঁদে উঠেছিল কি চেঁচিয়ে উঠেছিল, বোঝা যায়নি। বোঝা গিয়েছিল খালি তার কথা, জাহান্নামে যা—

সেইদিন রাত্রেই সাপে ছুবলে মারল গোবিন্দর বাবাকে।

তাতেও খানিকটা শান্তি পেল গোবিন্দ, কিন্তু সে শান্তি এক অসহ্য বেদনায়, বুকটা ভেঙে যাওয়ার মত প্রায়। এর অন্য কোন অর্থ গোবিন্দ করলেও আসলে এটা স্বজন-হারানোর শোক ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ হারানোর বিচিত্র রকমটাই রইল গাঁথা তার মনে!

ফলে এক অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে সে আত্মনিবেদন করল মহেশ্বরের পদপ্রান্তে। বাপের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই বোধ হয় সে আশ্রয় করল ব্রহ্মচর্য। মধ্যাত্মবাদের সুর লয় তাল, ভক্তিতে শিহরণে রহস্যাবৃত গাম্ভীর্য তাকে আচ্ছন্ন করল, তাকে টান দিল। যেমন টান পড়ে একতারার তারে, এক বিচিত্র সুরশব্দের সঙ্গে তার কাঁপে, কিন্তু স্থান বিচ্যুত হয় না। তা সে তুমি হৃদয় দিয়ে যে সুর বাজাও, অনুক্ষণ বাজানোর ঝঙ্কার আর কম্পন সে যতক্ষণই থাকুক, একতারায় কানে তো সে বাঁধা। সুর এক সময়ে থামে, তার তখন অকম্পিত স্থির। গতিহীন। গোবিন্দ তাই সুরে আচ্ছন্ন বেপথুমান, কিন্তু বাঁধা রইল।

এবার দেখে শুনে কষে টঙ্কার দিল গোবিন্দের একতারাটায় রাজপুরের সাধক বিরাজ গোঁসাই। গোঁসাই তখন অলৌকিক সাধনায় গুরু ব্যক্তি, তার কালী কৃষ্ণ সমান, তার ধর্মালোচনা ব্যবহারিক জীবনেও যোগসূত্র রক্ষা করে। তার ভাবে ও কর্মে সমন্বয় ঘটেছে, তাই ইহজগতে মন-প্রাণ তার ইচ্ছাধীন। তার যেমন কর্ম তেমনি মন্ত্রও আছে। সে মন্ত্র দেয় লোককে। এ সাধনজয়ীর সবচেয়ে বড় যা ছিল তা হচ্ছে মানুষের কাছে তার সাধক-স্বীকৃতি। গোবিন্দ তার শিষ্য কিন্তু বড় সংশয়ান্বিত, বিনাতর্কে বিশ্বাস নেই। তবুও গুরু।

একবারও ভেবে দেখেনি, ক্রমাগত টঙ্কারে সুরের তরঙ্গগুলো একের পর এক পেরিয়ে সপ্তমের ধাক্কায় তার না আবার ছিঁড়ে সুরভঙ্গ হয়। অবশ্য আজ পর্যন্ত সুরভঙ্গের লক্ষণ কিছু দেখা যায়নি। সুর এখনও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেই চলেছে।

ক্বচিৎ কখনো বাইরের ধাক্কা এসেছে, তাবে সে ধাক্কা তারে আর সুরের চেয়ে—একতারাটার আত্মার উপরেই এসেছে বেশি, আত্মাটাকেই তার জয় করতে চেয়েছে। এবং এখানেও সেই পাগলা গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। ধাক্কাটা এসেছে তার কাছ থেকেই অত্যন্ত বিদ্বেষ আর বিক্ষোভের সঙ্গে। কিন্তু ধর্মের উচ্চ মান সেই আত্মজয়ীকে অবহেলাই করে এসেছে।

আধ্যাত্মবাদের প্রাচীন পুঁথিতে ঘরটা ঠাসা গোবিন্দের। দৈনন্দিন সেগুলো থেকে যা সে সঞ্চয় করে, তাই আলোচনা হয় তার সঙ্গে মহিমের। কিন্তু মহিম তো পাগলা গোরাঙ্গেরই আনাড়ি অনভিজ্ঞ রূপ, তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে সে। গোবিন্দও এগিয়েছে, সে জবাব দেয় অদ্ভুত শান্ত আর ধৈর্যের সঙ্গে। নাস্তিকতাকে সে এক অদ্ভুত সৌম্য স্নিগ্ধতার সঙ্গে, অবাধ্য শিশুর গালে চুমু খেয়ে শান্ত করার মত ঠাণ্ডা করে দেয়।

মহিম শান্ত হয়, তৃপ্তি পায় না। ছেলে-ভুলানো চুম্বনে তৃপ্তি নেই তার। কিন্তু অশান্ত হয়েও উঠতে পারে না।

গোবিন্দ কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরুল।

পিসীমা উঠোন নিকোচ্ছে আর প্রাত্যহিক বিড়বিড়ানিও শুরু হয়েছে। কান পেতে না শুনলে শোনা যায় না সে কথা।

ছেলে-মেয়ে নেই পিসীমার। নেই আর বিশেষ কোন আত্মীয়-স্বজন। চিরকাল তাকে খেটে খেটেই খেতে হয়েছে। ঘরে মাঠে গোয়ালেই তার জীবনটা প্রায় কেটে এসেছে, মাঝে এখানে আসার কিছুদিন আগে স্বামীর ভিটেয় থেকে গাঁয়ে শাকপাতা বিক্রি করেও কেটেছে। অভাবকে তাই সে বড় বেশি ভয় করে, ঘৃণা করে।

কিন্তু বিধি বুঝি বাম। চিরকালটা দুঃখের সঙ্গে মোকাবিলা করে, যৌবনের ভরা বয়স থেকে বৈধব্য জীবন কাটিয়ে অভাব অনটনের বিরাট ময়ালটার পাক থেকে যদিও বা পাওয়া গেল রেহাই—তাও বুঝি সইল না অনামুখো দেবতার। পিসীর কাছে দেবতা আজ অনামুখো কানা ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে অমন ভাইপো নাকি তার বিরাগী বাউণ্ডুলে হয়! বাপ ছিল এক ধারার, ছেলে হল আর এক ধারার। বাপের ব্যাপার দেখেও ছেলের প্রত্যয় হল না। তাই আবার নতুন বিপর্যয়ের শঙ্কায় বৃদ্ধ বয়সেও শঙ্কিত হতে হয় পিসীকে। যদ্দিন বেঁচে আছে সঙ্গে আছে পেট। এ বয়সে যদি আজ আবার নিশ্চিত গরাসটুকু খসে পড়ে, কোন্ আস্তাকুঁড়ে আবার ছিঁড়ে খাবে শকুনে।

চাষীর ঘর, কিন্তু গোবিন্দের বাপ ছেড়েছিল সে পথ। পথ ছাড়ার মূল্য হিসাবে, জমিজমা বেহাত তো কম হয়নি, কম হয়নি হারাতে।

অবশিষ্ট যেটুকু আছে, তাও বোধ হয় গোবিন্দই শেষ করবে। চাষবাস নেই, চাষীর ঘরের নেই সে জেল্লা, ধানে মানে ভরা সংসার। জমি রইল ভাগে দেওয়া, খোঁজখবর না নেওয়া আপদ বিশেষ! হায়, ও-আপদ না থাকলে কোথায় থাকত তোমাদের দুনিয়ার বেহ্মজ্ঞান!

গোবিন্দকে দেখে পিসীর বিড়বিড় করা থামল। উঠোন নিকোতে নিকোতেই বলল, হরেরামের কাছে একবার যেতে নাগবে আজ সোমবচ্ছর সেই গোলমাল, আগে থাকতেই একটু হিসেব-নিকেশ করে রাখা ভাল বাপু।

হরেরামের কাছেই গোবিন্দের জমি ভাগে দেওয়া আছে।

—আচ্ছা, আজ যাব। বলে গোবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল।

—যাব টাব নয় বাপু! রোজই তো বলছিস যাবি। নয় তো ওকে ডেকে নিয়ে আয় মোর কাছে। আমিই সব জিজ্ঞেসাবাদ করে নিচ্ছি।

—তা যদি কর পিসী, বড় ভাল হয়।

পিসী জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল।

গোবিন্দ বেরিয়ে গেল। তাদের বাড়ির পিছনের ডোবাটার ধার দিয়ে আখড়ার পিছনের ঘন কচুবনের পাশ দিয়ে যে স্যাঁতস্যাতে সরু পথটা খানিকটা ঝোপেঝাড়ে ছাওয়া অন্ধকারে এঁকেবেঁকে গেছে, সেটাই মহিমদের যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ।

গোবিন্দ সেই পথে চলল বন্ধু মহিমের সঙ্গে দেখা করতে। শরৎকালের এ সকাল বেলাটা—বিশেষ এই নির্জন ডাহুকের আস্তানার ধারে পথটিতে এক অনির্বচনীয় গম্ভীর আনন্দে প্রাণটা ভরে উঠতে চাইছে তার, কিন্তু মহিমের কথা মনে করে—একটা বিশ্রী নীরব প্রশ্নে মথিত হয়ে উঠছে মনটা।

হঠাৎ মৃদু ঠুনঠুন্ শব্দে চমকে মুখটা তুলতেই বজ্রাঘাতের মত নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল গোবিন্দ। যেন হঠাৎ চকিতের জন্য টাল খেয়ে উঠল তার সর্বশরীর। ব্যাপারটা তাকে এক রুদ্ধশ্বাস অস্থিরতা ও বিস্ময়ে (বিস্ময় কেন) আড়ষ্ট করে দিল।

দৃশ্যটা আখড়ার মেয়ে বনলতার কাপড় ছাড়ার দৃশ্য! ব্যাপারটা সত্যিই বজ্রাঘাতের মত কিছু নয়। আঁচলের শেষ প্রান্তটুকু তখন বুকের উপর দিয়ে টেনে দেওয়া ছিল বাকি! কিন্তু এ কচুবনে ডাহুকের নির্জন আস্তানায় সে তাড়া ছিল না বনলতার। ঘরের লোকজনের ভিড় কাটিয়ে তাই তো এসেছে সে কচুবনের ধারে, দিনের বেলাতে ও আধো-অন্ধকার ঝোপের ছায়াতে।

গোবিন্দকে বিস্মিত আড়ষ্ট করল কি তবে—বনলতার উদ্ধত

যৌবন। হ্যাঁ, বনলতা শ্যামাঙ্গিনী হলেও সুন্দরী। সাত বছরে তার প্রথম বিয়ে আবার তেরো বছর বয়সে, তারপর উনিশ। কিন্তু তার জীবনের প্রজাপতির পাখা ঝাপটায় মৃত্যুই এসেছে বার, বার তিনবার তার তিনটি স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবু ভেঙে পড়বার লক্ষণের বদলে, একুশ বছর বয়সে তার বলিষ্ঠ দেহে বিদ্রোহের ছাপটাই চোখে পড়ে। পড়ে বোধ হয় একটু বেশি করে।

মুহূর্ত মাত্র। গোবিন্দ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে গেল। সে মেনে নিতে চাইল না তার যৌবনের বিপর্যয়কে, অনিচ্ছাকৃত আচমকা একটা বিরক্তিকর দৃশ্য ছাড়া। একমেবাদ্বিতীয়মের এ সাধকটি তার সৌন্দর্যপিপাসু সুন্দর চোখ দুটোকে মনে মনে খুব কষে খোঁচাল। মনে মনে বলল, জীবনের বিঘ্নগুলোর এটা একটা।

কিন্তু চোখ এড়াতে পারল না বনলতার। চকিতে কাপড়টা টেনে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল সে। ডাকল, সাধু, সাধু, শোন।

গোবিন্দকে সে বলে সাধু। প্রতিবেশী হিসাবে, গোবিন্দের কাছে তার প্রগল্‌ভতার বাড়াবাড়ি লোকচক্ষুর আড়ালে নয়। বিদ্রোহের যত প্রকাশ তা এই শান্ত সাধকটির কাছেই তার বেশী। সে ভালবাসে শান্ত সাধকটির নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় বাধা দিতে। তার সাধনাকে ভীরু বলতে। সে ভালবাসে সাধকটিকে বিরক্ত করতে, মনোকষ্ট দিতে, জ্বালাতন করতে, কঠিন বিদ্রুপে আঘাত করতে। এমন কি, পিসীর হয়ে কোমর বেঁধে গোবিন্দের সঙ্গে ঝগড়া করতেও দেখা যায় তাকে। পিসির সঙ্গে গলা বাড়িয়ে অনুযোগ করে, ধর্ম উদাসী বাউণ্ডুলেগিরির জন্য। কত রূঢ় কথাই তাকে বলেছে গোবিন্দ, সবই ধুয়ে গেছে যেন জলতরঙ্গে, অত মান-অপমানের ধার ধারে না বনলতা।

বনলতার ডাকে গোবিন্দ দাঁড়াল, কিন্তু ফিরে তাকাল না।

মুখ টিপে হাসল বনলতা। বলল, কাছে এস।

বল্‌ না, কি বল্‌বি? গোবিন্দ দূর থেকেই বলল।

অত চেঁচাতে পারব না, কাছে এস।

মোর সময় নেই।

ওঃ, কি একেবারে মাঠে তুমি পাকা ধান ফেলে আসছ!

ঠাট্টা হলেও কথাটার মধ্যে একটা পারিবারিক খোঁচা ছিল, যে কথা বলার অধিকার বনলতার নেই বা তাকে কেউ দেয়নি। তবে তাকে দেওয়ার দরকার হয় না, অধিকার সে নিজেই নিতে পারে। কেন না, গোবিন্দের কাজ সংসারের কাজ নয়, মানুষের দৈনন্দিন ছোঁয়াচ তায় নেই বললেই হয়। তার কাজ, তারই কাজ, আর কারুর নয়।

বনলতা নিজেই কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ বোঝা গেল, রুদ্ধ হুষ্টুমিতে তার চোখ দুটো কি অদ্ভুত খেলায় নাচছে। বলল, বলছি, তুমি যেন সাপ দেখে চমকে উঠলা।

সাধকের মনে খানিকটা ঘৃণাবোধই হল। জেনে শুনে নিজের গোপনতম লজ্জার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত তো হলই না এ বৈরাগীর মেয়েটি, উপরন্তু সেই লজ্জার কথাকে নিয়ে দুর্নিবার কৌতুকে হাসছে। তবুও কথাটা নেহাৎ খাবাপ বলেনি বনলতা, তাতে মনের তার যে ভাবেই প্রকাশ পেয়ে থাক। কেন না, সাপের মত কুটিল হীন পরিহার্য দৃশ্য ছাড়া সেটা সত্যই তার কাছে আর কিছু নয়।

গম্ভীর হয়ে বলল সে, সাপের চেয়েও বুঝি খারাপ। কিন্তু তোর কি লজ্জা নেই বনলতা?

—তোমার কাছে? চকিতের জন্য যেন সমস্ত হাসি মস্করা কাটিয়ে বনলতা অদ্ভুত গাম্ভীর্যে থমথমিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই হেসে বলল, নাই আবার! এত লজ্জা যে মোর রাখবার ঠাঁই নাই গো সাধু—

বাক্‌পটিয়সী দানবী বৈষ্ণবী, লজ্জা না থাকায় বাহাদুরিতে যেন ফেটে পড়ছে বলে মনে হল গোবিন্দের। বলল, তবে?

তবে আবার কি? কোথাও মোর ঠাঁই নাই বলেই তো ঠাঁই রাখি তোমার কাছে।

আশ্চর্য অসতীর কথাই বটে। এমন স্পষ্ট দুর্নীতির কথায় মনটার কোণে কালি লাগল গোবিন্দের। সে চাইল না আর এ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে। এর পরের কথার প্রসঙ্গ যে কিভাবে টানবে বনলতা, তা আন্দাজ করে কোন কথা আর সে বলল না, ফিরে চলল। বনলতা

মুখে কাপড় চেপে হাসল। তারপর বলল, সাধু, তুমি মহিমের ঠাঁই যাবে।

—কেন ?

—যাও তো তারে বলে, আমি ডাকছি। কাল তো সে আসে নাই! আর আবার সে গোবিন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, যে পথে যাচ্ছিলে, সে পথেই যাও। কালনাগিনী সরে গেছে।

এবার হেসে উঠতে গিয়ে যেন খট করে বাজল বনলতার। কালনাগিনী! সে কথা বনলতা নিজে বলবে কেন, সবাই বলে। কালনাগিনী বনলতা, অনেক খেয়েছে, অনেক ছুবলেছে, কালনাগিনীর নিঃশ্বাসের বজ্র-ভয় কার নেই। কালনাগিনী বনলতা ফণিনী মাথায় মণি ধরে বিচিত্র রূপবতী, কিন্তু কি সাংঘাতিক, গাঢ় নীল বিষে অনুক্ষণ মৃত্যু বয়ে বেড়ায়! তার রূপ-যৌবন, সবই বিষ! নিঃশ্বাসে বিষ! তার রূপের নীরব টান, উগ্র লোভাতুর করে, নয়নপুরের কত উষ্ণ বুকে দমকা নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে, কিন্তু ত্রাস। ভয়, প্রাণের ভয়, কালনাগিনীর নিঃশ্বাসের ভয়।

কিন্তু গোবিন্দ তটস্থ হল বনলতার কম্পিত ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে। ছলের তো অভাব নেই বনলতার। এই হাসি, এই কান্না, আবার কোন নতুন পরিস্থিতি তৈরি করবার ফিকির করেছে হয় তো। তবু নিষ্ঠুর সাধকের মনের কোণেহাতের তালুতে মোটা চামড়ায় ছোট্ট বেত কাঁটা সামান্য বেঁধার মত একটু লাগল—আচমকা বনলতার ঠোঁট কাঁপানিতে আর চোখের কোণে উদ্‌গত জল দেখে।

আর কোন কথা না বলে সে কচুবনের ভিতর দিয়েই চলে গেল।

গেল না বনলতা। কাপড়ের আঁচলটা সজোরে মুখে চেপে কান্নায় সে ভেঙ্গে পড়ল। কেন ? কেন এ কান্না ? কেন এমন করে কাঁদতে হয় ? কান্নার বুক যে বুকফাটা। কেন এ অসহ্য কান্না ?

কেন, এ প্রশ্ন বুঝি বনলতারও। তাই অস্ফুট আর্তনাদে এ ডাহুকের আস্তানা মথিত হয়ে উঠল, কেন, কেন, কেন,? হৃদয়ের অন্ধ বদ্ধ-কারাকক্ষের দেওয়ালটাকে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে চোখের জলে ডুবে

গেল বনলতা। তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, ভগবান, আমার এই বুকটাকে ছেঁচে-কুটে ধ্বংস করে দাও, আমাকে মুক্ত কর।

হঠাৎ পিঠে একটি আলতো স্পর্শে চমকে উঠল বনলতা। তাকিয়ে দেখল বৈরাগী নরহরি। লম্বা রোগা সুগায়ক নরহরি, বনলতার বাবার পালিত পুত্র-বিশেষ। গানই তার পেশা। শুধু নয়নপুর নয়, নয়নপুরের ওপার রাজপুর থেকে শুরু করে বহু দূর বিস্তৃত অঞ্চলে নরহরি পরিচিত। উদাসীন, সাতে পাঁচে না থাকা নরহরি—সকলেরই প্রিয়পাত্র। এমন কি পাগলা গৌরাঙ্গেরও।

বনলতা তার বান্ধবী।

—কাঁদ কেন সই? নরহরি জিজ্ঞেস করল।

কেন কাঁদে বনলতা। নরহরির এ স্নেহ-স্পর্শে কান্না যেন বেড়ে উঠতে চাইল।

মনে পড়ল নরহরির, গোবিন্দ গেল এই কিছুক্ষণ আগেই। বনলতাকে বুঝি দুঃখ দিয়ে গেছে সেই পাষণ্ড সাধক।

বলল, সই জগৎ আর মানুষ, সবই বুঝি মাটির, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে লাগে তাতে। কেঁদো না, ঘরে যাও। মানুষের জীবনের সাধনা নাই নাকি? আছে, সাধনা আছে, কেঁদে তো লাভ নাই।

ও, নরহরি বুঝি বনলতার অন্ধ বদ্ধ-কারাকক্ষের সেই বন্দিনীটিকে চেনে, কার আত্মার পথচলার অলিগলিগুলোর নীরব দর্শক।

বোধ হয় শান্তি পেল বনলতা, লজ্জাও পেল বোধ হয় একটু এ নির্জন ডাহুকের আস্তানায় কান্না ধরা পড়ে। তবু নরহরিই তো, মনের কথা অকপটে খুলে বলার একমাত্র মানুষ তার। যা বলতে পারে না, তা নরহরি পুরুষ বলে। কিন্তু নরহরিকে তা বলতে হয় না।

নরহরির কথার জবাবে বলল চোখ মুছে বনলতা, জীবনটার ভার আর সইতে পারি না, পরানটার যেন দাম নাই আর।

—ছি সই, ও কথা ক'য়ো না। যুগ যুগ ধরে অজগরের মাথায় যে মণি গজায়, তা যে দেখে সে রাজা হয়। কজনা তা দেখতে পায় কও! যেদিন সেই আলোয় নিজেরে চিনবে রাজা। পরানের দাম

নাই তোমার ? তোমার পরান তুমি দেখালে কারে, আর দেখলেই বা কে ? যাও ঘরে যাও।'

বনলতা সামলে উঠল অনেকটা। হেসে বলল, কথা তুমি খুব কইতে পার গোঁসাই। বলে কচুবনের মধ্যে দিয়ে আখড়ার দিকে চলল সে।

সেদিকে তাকিয়ে নরহরি হাসল। তার বলিষ্ঠ ঘাড় নুয়ে এল। গুন্ গুন্ করে উঠল সে, 'ভনয়ে বিদ্যাপতি—কৈছে নিরবহ, সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।'

বার বার করে পদটি গাইল সে। তার সেই গুন্‌গুনানি কাপড়ের আঁচলে আটকা-পড়া মৌমাছিটির মত বনলতার সঙ্গে আখড়া পর্যন্ত গেল। সেও গুন্ গুন্ করে উঠল : 'সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।'

॥ ৭ ॥

বনলতার বাবা নসিরাম তামাক খাওয়া শেষ করে হুঁকোটি রেখে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। বৃদ্ধ হয়েছে কসিরাম। কোমর খানিকটা বেঁকে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে শরীরটা।

একগলা কণ্ঠির মালা তেলে আর জলে কালো হয়ে উঠেছে। কপালে গায়ে কুঞ্চিত চামড়ায় বাসি তিলকের দাগ।

আগে নসিরাম খুব শান্ত ধীর ছিল। হাসিখুশি গান কথকতা—সমস্ত কিছুতে সৌম্য? কিন্তু আজকাল তার মেজাজ সর্বদাই খানিকটা ক্ষিপ্ত। কথা বলে অল্প, হাসে না মোটেই। বেশি গোলমাল সইতে পারে না। একমাত্র গানের সময় যা একটু প্রফুল্ল থাকে সে। ইদানীং তার সাধনার রূপরসটা কেটে গিয়ে কঠোর হয়েছে বলা চলে।

তার প্রৌঢ় সেবাদাসী হরিমতী উঠোন নিকোচ্ছে। হরিমতীর বালিকা মেয়ে স্নান করে ঠাকুরের দাওয়ায় বসে গাঁথছে ফুলের মালা। ষণ্ডামার্কা বৈরাগী প্রাণেশ সমস্ত দেহটি তেলে ডুবিয়ে এবার শুরু করেছে

মর্দন। আর মাঝে মাঝে হরিমতীর মেয়ে রাধার দিকে চোরা চোখে দেখছিল। রাধা অবশ্য মাত্র বালিকা, তবু প্রাণেশের চোখের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টার মধ্যেও যেটুকু ফুটে উঠেছিল—সে ভাবগতিকটুকু রসের। আর এও সে জানে রাধাকে দেখে তার বুকে এ রসের সঞ্চার টের পেলে কেউ রক্ষা রাখবে না আর। বিশেষ করে হরিমতী যদি টের পায়, আর হরিমতীর খাণ্ডার বলে যা সুনাম আছে, তাতে কোন্ না সে একটা পোড়া কাঠ দিয়েই প্রাণেশের এ রসের ভাণ্ড পিটিয়ে ভাঙবে।

তবু এ চোখকে নিয়ে বড় জ্বালা প্রাণেশের। হাজার ফেরাও চোখ, তবু ঠাকুরঘরের এই জলে ধোয়া ধবধবে ফুলটির দিকেই নজর যাবে তার।

সরযূ এল স্নান শেষ করে, কাঁখে জল ভরা কলসী নিয়ে। সরযূ প্রায় বনলতারই সমবয়সী, নসিরামের সর্বশেষ সেবাদাসী। এ আখড়ার মধ্যে সে খানিকটা অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে তার কথায় ব্যবহারে। বৃদ্ধ নসিরামের সঙ্গে মিল তো তার নেই-ই, তা ছাড়া, আখড়ার ভাব গাম্ভীর্যকে তার তরল হাসিঠাট্টায় বড় ক্ষুণ্ণ করে সে। কিন্তু বাল-কৃষ্ণের সেবার দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রায় সবই তাকে করতে হয়। ভোগ রান্না থেকে ঠাকুরের শয়ন পর্যন্ত সরযূর কাজ। এত কাজ তবু এরই ফাঁকে ফাঁকে কথা হাসি গানে ভরপুর।

সরযূকে ঢুকতে দেখেই নসিরামের কোঁচকানো ভ্রূ কুঁচকে উঠল আরও। বলল হরিমতীকে লক্ষ্য করে, পোহর বেলা না কাটালে কি ঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গানো হইবে না? আর কখন খোলা হইবে দরজা ঠাকুরের—শুনি?

সরযূ ভেজা কাপড়ে ছপ ছপ শব্দ করে ঘরে ঢুকে যায়।

রাধার তাড়া পড়ল। এখুনি তাকে কুটনো কুটতে যেতে হবে—ভোগের। প্রাণেশও তেলের বাটি রেখে উঠল লাফ দিয়ে।

হরিমতী সরযূর দিকে তাকিয়ে একবার ঠোঁট বাঁকাল। কিন্তু কাজ থামল না তার।

এমনি সময় কানে গেল বনলতার গুনগুনানি ঃ সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

সকলেই একটু তাজ্জব হল, তাকাল বনলতার দিকে। কিন্তু কাজ থামল না কারুর।

নসিরাম বলল বাসি কাপড় ধুয়ে এলি, নাইলি না?

—না, শরীরটা কেমন গন্ গন্ করছে।

অর্থাৎ গরম গরম ভাব। নশিরাম শঙ্কিত হয়। নিজের বলতে তো তার আর কেউ নেই এক মেয়ে বনলতা ছাড়া। আজকাল এও একটা চিন্তা হয়েছে তার। কেউ-ই তার আপন নয়, সবই পর। জীবন ভরে সে কৃষ্ণের আরাধনা করেছে. কিন্তু সে কৃষ্ণ সার করেছে গৃহ। শুধু তাই নয়, বুড়ো বয়সে তার ভীমরতিও হয়েছে। বনলতার মায়ের মৃত্যুর পর ধর্ম ও বয়সের ভাঁড়ামোতে সে প্রথমে আনল হরিমতীকে। কিন্তু শেষের দিকে সরযূকে আনতে দেখে বনলতাও ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি। এটা নসিরামের ধর্মের আড়ে বিকৃত মনের হীন লোভ। সে বোঝে যে, বনলতার তার উপরে যেমন টান নেই, তেমনি কোন টান নেই এ আখড়ার উপর। এ আখড়ার কারুর সঙ্গেই প্রায় তার কথাবার্তা নেই। বরং নরহরির প্রতি মেয়ের খানিক টান আছে মনে করে তাকেই সে বিশ্বাস করে, কিন্তু নরহরির হাবভাব আখড়া রক্ষা করবার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। বনলতার হাতেই এ সমস্ত কিছু একদিন তাকে তুলে দিয়ে যেতে হবে। বনলতা তার একমাত্র সম্বল। বলল ঃ

—তবে আর এত বিহানে উঠলি কেন, খানিক বেলা বিছানায় থাকলেই পারতিস্।

—সে মোর সয় না। বলে এক লহমায় চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বনলতা বেরিয়ে যায় আবার ভেজা কাপড়টা টাঙানো বাঁশে মেলে দিয়ে। এসে উঠল গোবিন্দদের বাড়িতে।

পিসীর তখন নিকানো শেষ হয়েছে। ওদিকে বকবকানির ধ্বনিটাও হয়েছে উচ্চ।

—হায় মোর মরণ নাই, যম কি কানা গো? এ ঘরে নাকি মানুষ থাকে। না-নোক না জন, এ আখড়াতে মানুষ থাকে কি করে —বল তো? শরীলে নাকি সয় এ সব আর। মরবার দিনেও কাঠ ঠেলতে হবে চুলোয়। কানা যম কানা মিনসে (অর্থাৎ স্বামী) চোখে কি দেখতে পাও না।

বলতে বলতে ক্ষেপে উঠল পিসী। দেখলেও না বনলতা এসেছে!

—হক করলাম আজ ও ছাই পুঁথিসুথি সব যদি না পুড়িয়ে শেষ করি। ঢং। চাষার ছেলে হবে পণ্ডিত, সৃষ্টিছাড়া যত অকাজ কুকাজ। বিয়ে নাই, সাদি নাই, নাই একটা ছাওয়াল পাওয়াল, ঘরভরা মরণ-পুঁথি। শ্মশানে-মশানে কালে ছুবলে মারল বাপটাকে হায় পোড়া-কপাল এটারও কোন্ দিন যে কি হইবে। মরতে মরতে না জানি কি দেখে যেতে হইবে আমারে। পাপ, পাপ করিয়াছি অনেক এ পিত্থিমিতে মরা যম সব শোধ তুলবে! না খাবে আমারে, না খাবে এ চোখজোড়া।

এবার খিল খিল করে হেসে উঠল বনলতা। বলল, কি হল গো পিসী?

এই এক মেয়ে। জ্বলে যায় দেখলে পিসীর সর্বাঙ্গ। বলে কত কথা ভাল করে দেব তোমার গোবিন্দেরে, ঘরমুখো করে তবে ছাড়ব তোমার ভাইপোর। পিসী ভাবে, বলে তোরই সেই মুখ ঘুরিয়ে দিল গোবিন্দ। হ্যাঁ, পিসীরও আছে আতঙ্ক এই সোয়ামীর পর সোয়ামী খাগীর সম্বন্ধে, বিশ্বাস করে, বজ্র ঝরে ওর নিঃশ্বাসে, শেষে টান আছে এ ডাইনী ছুঁড়িটার, শুষে শুষে খায় ও। তবু পিসী যে ওকে আস্করা দিয়েছিল, সে খালি ছুঁড়ি যদি পারে তার ভাইপোর এ পাখুরে ধর্মজ্ঞানে ফাটল ধরাতে। তারপর ভাইপোরে কেড়ে নিয়ে ঘর জমাতে কতক্ষণ। কিন্তু তা হবার নয়। সবাই হার মেনেছে, মনের আর সে ঢিলে ভাব নেই বনলতার প্রতি, বিশ্বাস করে না আর পিসী তাকে। মুখেই ফুটোফুটি কথার বেলা তো দেখা যায় গোবিন্দের একটু দর্শন লাভই যেন ছুঁড়িকে পাগল করে।

সময়ে সময়ে গুলিয়েই যায় পিসীর কাছে গোবিন্দের মত

বনলতাও। কারুরই কোন ধারা ধরা পড়ে না! সব যেন কেমন।

পিসী জবাব দিল না বনলতার কথার।

বনলতা জিজ্ঞাসা করল, পিসী, কোথা চললে?

—যমের দক্ষিণ দোরে।

ছি, ছি, তা কেন যাবে। বলে গম্ভীর গলায়, কিন্তু হাসে মুখ টিপে। আবার বলে, সামনে তোমার সুদিন, ভাইপোর বউ আনবে, শুয়ে বসে খেয়ে আরাম করে মরবে।

বড় খুসি হয় পিসী, বড় আনন্দ পায়। কথাতেই তার আনন্দ, জীবনের এইটুকুই সম্বল। এইটুকুই যে তাকে বনলতা ছাড়া আর কেউ দেয় না। সেই জন্যই তো বনলতার প্রতি পিসী কঠিন হলে নরম হতে দেরি লাগে না বেশি। হতে পারে ডাইনী, কথাগুলো তো ভাল বটে। বলে, ফুলচন্দন পড়ুক তোর মুখে, মরবার আগে আমি যেন তাই দেখে যাই; কিন্তু এ ছোঁড়ার ধম্মোজ্ঞান যেন রোগ, না-সারবার ব্যামো গো। সেই এসে ছোট্টবেলাটি থেকে দেখছি এই ধারা।

কিন্তু বনলতা তো জানে গোবিন্দকে! সাধক গোবিন্দ, নিষ্ঠুর গোবিন্দ, কি এক প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে টানছে তাকে। ধর্ম আর জ্ঞান মিলিয়ে সে যে কিসের টান তার হদিস জানে না বনলতা। শুধু বোঝে—পিসীর আর তার—তাদের সকলের থেকে বহুদূরে—এক দুর্ভেদ্য বর্মে আবৃত গোবিন্দ, যে পাথুরে বর্মের গায়ে বনলতার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা মাথাটা ঠোক্কর গায় বার বার, ক্ষতবিক্ষত হয় মাথাটা।

তবু পিসীমা মনগড়া কথাই বলে সে হেসে, তা একটা সোন্দর কন্যে-টন্যে কিছু দেখাও না ভাইপোরে? পিসী অমনি হাতের ন্যাতা ও বালতি রেখে বনলতার কাছে এসে, চোখদুটোকে বড় বড় করে বলে ফিস্‌ফিসিয়ে, দেখে আসছি। টুকটুকে ছোট্ট এক কন্যে, পয়সাও দেবে মেলা, সচ্ছল মানুষের মেয়ে। দিনক্ষণ দেখে একদিন নেমন্তন্ন করব করব ভাবছি। হ্যাঁ, সে মেয়ে পারে বোধ হয় ভোলাতে মোর

গোবিনেরে।

—কি গো? বনলতাও তেমন ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে।

চকিতে সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এল পিসীর চোখে। অমনি মুখখানি ভার করে সরে গিয়ে বলে, সব কথা শুনতে চাওয়া কেন বাপু? সে আমি মরে গেলেও বলব না।

—হ্যাঁ, সেই ভাল পিসী, সব কথা সবাইকে বলতে নাই। আমারই বা কি কাজ বাপু শুনে, অ্যাঁ?

চকিতে কি অদ্ভুতভাবে মুখ টিপে হেসে ন্যাকামোটুকু করে বনলতা, সাধ্য কি পিসী টের পায় একটু।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। বলে পিসী বালতি নিয়ে ডোবার দিকে যেতে যেতে ফিরে বলল, ডোবাটার ধার যা পেছল হইছে, সঙ্গে একটুকু আয় তো লতি!

বনলতা হাসল। ডোবার ধারে গেল সে পিসীর সঙ্গে। দিব্যি শুকনো খটখটে ডোবার ধার। নীচের ঢালু অংশটুকুও সিঁড়িকাটা।

পিসী বলল, রাজপুরের দয়ালঘোষকে চিনিস তো? বুড়ো দয়াল? বনলতা বুঝল এ কিসের ইঙ্গিত। তবু সে মাথা নেড়ে চুপ করে রইল।

অনেক দ্বিধা কাটিয়ে পিসী বলল, সেই দয়াল ঘোষের নাতনির সঙ্গেই—বুঝলি? কথাবার্তা খানিক কয়ে আসছি। বলিস নে যেন কাউকে।

না না। সে তো খুব ভাল কথা গো পিসী। হাসি চেপে বলল বনলতা!

বনলতারও একবার মনে হল. দেখাই যাক না একবার পরীক্ষা করে। গোবিন্দের পরীক্ষা হয়ে যাবে—মেয়েটিকে দেখে সে কি বলে।

গোবিন্দের পরীক্ষা? পরমুহূর্তেই যেন বজ্রাঘাতের মত শক লাগল বনলতার বুকে। ছি ছি, একি, সে ভাবছে! গোবিন্দের পরীক্ষা। কোন্ পরীক্ষার বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে আজও গোবিন্দ? সে তো বহু দূর উদ্দাম ঝড়ের বেগে ডানা-মেলে-দেওয়া পাখী। কোথায় সে থামবে, আর কি নিশ্চয়তা আছে তার নাগাল পাওয়ার?

বাইরে থেকে হরেরামের হাঁক শোনা গেল,—কই গো গোবিনের পিসী কোথা গেলে ?

—ঐ এসেছে মুখপোড়া। বোঝা গেল, পিসী এই হাঁকের জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। বলল, বস, যাই। বলে—সে টুক্‌টুক করে দ্রুত নেমে গেল ডোবার ধারে।

বনলতা বলল, পেছল যে, অত তাড়াতাড়ি যেও না। বলে মুখে কাপড় চেপে হাসে।

—আর পেছল। গেলেই বাঁচি।

সরে এসে প্রাণভরে একটু হাসল বনলতা। তারপর বাড়ির সামনে হরেরামের কাছে এসে দাঁড়াল।

হরেরাম একটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে, উঠোনের একধারে গুটিসুটি বসেছে। ক্লান্ত থমথমে মুখটা বের করে রেখেছে শুধু। কোটরে ঢোকা চোখ দুটো লাল টকটকে।

বনলতা জিজ্ঞেস করল, কি গো, অমন করে বসে আছো যে! অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি ?

—আর বল কেন দিদি। ধুঁকে ধুঁকে বলল হরেরাম, শালার জ্বর আর ছাড়তে চায় না গো! দু-দিন ধরে পেটে নাই কিছু। তার মধ্যে আবার—

—তো এলে কেন ?

—এলাম, গোবিন বললে কি জন্যে নাকি ডাকছে ওর পিসী। ভ্যালা যন্তন্না এক হয়েছে মোর, ছাড়তেও পারি না, রাখতেও পারি না। বলে একের তাড়া সয় না, এর আবার—

কথা বলতে আরম্ভ করলে আবার জ্বরের ঘোরে কথা বলতেই ইচ্ছে করে হরেরামের।

বনলতা বলল, কি রাখা ছাড়ার কথা বলছ ?

—ওই তোমার গো—গোবিনের জমি। বিরক্তি দেখা যায় জ্বরো থমথমে মুখটায় হরেরামের। বলে, লাভ তো কিছু নাই—কিন্তু কি করব! তবু যা হোক—বিচালিটা মাস দুয়েকের খোরাকিটা হয়, কিন্তু

সে দেখতে গেলে চলে না। ভাগে খাটি বাবুদের জমিতে, আর দুই পচ্চিম থেকে এ্যাক্কেবারে পূবে যেতে লাগে গোবিনের মাঠে যেতে। একলা মানুষ পারি না। অথচ কাজের সময় চুপ করে বসে থাকাও তো যায় না। সেই আমার ছুটতেই হয়।

হরেরাম ভাগচাষী আধিয়ার। নিজের জমি নাই তার, ভূমিহীন চাষী। বংশপরম্পরায় এ অবস্থা ছিল না তার। বাপ মরার পরও কিছুদিন ছিল খালের ধারের সাত বিঘা জমি। কিন্তু এই নয়নপুরের আরও বহু চাষীর মত একদিন দেখা গেল—বাবুদের বাড়ির সেই লাল কাপড়ের মলাটের মোটা মোটা রাক্ষুসে খাতাগুলোর পেটে হরেরামের খালের ধারের জমিটুকু লেখা হয়ে গেছে। সে যাওয়া যে কী ভীষণ, কি সাংঘাতিক, তা নয়নপুরের ঘরে ঘরে জানা আছে। আজও জানছে, জানবে ভবিষ্যতে।

গোবিন্দের পিসী প্রথমেই হামলে পড়ে এসে :—বলি, দেখা নাই কেন, দেখা নাই কেন তোর আর—অ্যাঁ? কি করলি না করলি, ধান কেমন হল না হল—

বনলতা বলল : ওর যে জ্বর হইছে গো। আসবে কেমন করে?

—ও ঢঙের জ্বর ঢের দেখছি। পিসি গরম হয়েই বলে, গত বছর, ক আঁটি বিচুলি দিয়ে তো নিস্তার পেলি, আর যে বিচুলিগুলান্ রইল, তার কি করলি!

হরেরাম নিস্তেজ গলাতেই বলল, তার কি করব বল? একলা মানুষ, পারি না। দরিদ্দের ঘর, পড়ে রইছে, খরচ হয়ে গেছে তেমনি।

—মরে যাই আর কি? ভেংচে উঠল পিসি—মোর সোয়ামীও আধিয়ার ছিল রে, মোর সোয়ামীও ছিল।- এমন ছ্যাঁচড়া বিত্তি দেখি নাই কভু! বিধেন তো বিধেন। ন্যায়ের কাম করে মানুষটা মরে গেল। দরিদ্দ তো কি, জোচ্চোরি করবে তাই বলে?

হরেরাম চুপ করে রইল। বনলতা বুঝল, হরেরাম গত বছরের বিচুলিটা গোলমালই করে ফেলেছে। তাই অমন অপরাধীর মত চুপচাপ। কিম্বা হয় তো গ্রাহ্যই করছে না পিসির কথার।

কিন্তু এ চুপ করে থাকাতে পিসি দমল না। বলল, এবার আমি সেই বিচুলি চাই, নয়তো টাকা মেটাতে হবে। হ্যাঁ, বলে দিলাম।

হরেরাম নির্বিকারভাবে বলল, ও নিয়ে আর গোলমাল কেন বাপু। ছেড়ে দাও না। এ বছর তোমার সব কড়ায় গণ্ডায় মেটাব।

—কিছু শুনবো না আমি। বলতে বলতে পিসি আবার গোবিন্দের প্রসঙ্গে চলে এল।—সেই হতচ্ছাড়াই তো যত গোলমালের রাজা। দেখল না বলেই তো গেল! বলে চাষার ছেলে, কাস্তে কুড়োল না ধরলে এমনিই হয়। আমি কোন কথা শুনবো না। বজ্জাতেরা মজা পেয়ে খুব লুটছ, না।

হরেরাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নেও বাপু, অসুখ শরীলে আর গালমন্দ শুনতে পারব না অখন।

—তা পারবি কেন? জমিতে এবার একটুকুন সারও তো দিসনি, না এট্টুখানি পাঁক, না গোবর। তবে কি তোর রূপ দেখে ভাগে দিয়েছি। রাগছিস, গালমন্দ শুনবি না?

—ঘাট হয়েছে বাপু, ঘাট হয়েছে। কাঁথাশুদ্ধ হাত দুটো কপালে ঠেকাল হরেরাম,—এই শেষ, আসছে বছর তোমরা অন্য কাউকে দেওগে জমি, ও আমি আর পারব না।

গোঙাতে গোঙাতে চলে গেল হরেরাম। এদিকে তার ওই কটি কথাতেই ঘৃতাহুতি পড়ল আগুনে। পিসি শুরু করল সারা উঠোনময় দাপাদাপি, গালাগালি আর শাপমন্যি। এ শাপমন্যি যদি সোজাসুজি কাজ করে, তবে হরেরাম নিশ্চয়ই এতক্ষণ ঘরে যেতে যেতে পথেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেছে।

আখড়ায় খোল-করতালের ধ্বনির সঙ্গে নসিরামের বৃদ্ধ গলার গান শোনা গেল।

জাগোহে জাগোহে, সখা, জাগোহে প্রাণনাথ, জাগোহে, বাল-নীলমণি জাগোহে, জাগাও জগৎ হে, জাগাও জগৎ, মনকৃষ্ণ হে, জাগাও ভক্তহৃদয় হে।

বনলতা ঢুকলো গোবিন্দের ঘরে।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতগুলো বই। এলোমেলো বিছানা! ময়লা কাঁথা বালিশটার কাছেই নেভানো প্রদীপটা যেন বুড়িয়ে-যাওয়া জীর্ণ কালো তেলের গাদে আর কালিতে ঝুলে পড়েছে। তা সত্ত্বেও ঘরটা অপরিষ্কার মনে হয় না। সমস্ত ঘরটাতেই সাধকের গাম্ভীর্য যেন অবিচলিতভাবে ফুটে রয়েছে, যেখানে বনলতার প্রবেশ খানিকটা অনধিকার বলে মনে হল। আশ্চর্য, এ ঘরে ফুলের গন্ধও আছে, ঠিক তাদের বালকৃষ্ণের ঘরের মতই নির্মল আর পবিত্র গন্ধ।

বনলতা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে দু-একটা বইয়ের গায়ে একটু হাত বুলায়, অক্ষর তো সে চেনে না। এ যেন গোবিন্দের সাধনার বস্তু-গুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে গোবিন্দের মনটাকে স্পর্শ করার বাসনা। সে যেন জানতে চায়, এ ঘরের আত্মাটার সঙ্গে যোগাযোগের পথের নিশানাগুলো কোথায়, তার সাধনা যেন এ ঘরের সঙ্গে একাত্মবোধের সাধনা।

জীবনের এ গতি পালটানোর দিনক্ষণগুলো মনে নেই লতার। কিন্তু এটা খানিকটা সে বুঝতে পারছে জীবনটা তার গতি পাল্‌টে অন্য কোন দিকে চলেছে। বোধ হয় ঝড়ের বেগে সেই ডানা-মেলে-দেওয়া পাখীটার মত, সেও অসীম শূন্যে গন্তব্যহীন কোন একটা পথের শরিক হয়ে পড়েছে। সে জানে না, এ ঝড় তাকে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবে, ভেড়াবে কোন্ কিনারায়। অনিশ্চয়তার পাড়ি জমিয়ে আজ আর বুঝি ফিরে যাওয়ার উপায় নেই বনলতার। বুকের অদৃশ্য ঝড়ে ডালপালা কাঁটা অনুক্ষণ ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে, তবুও একেবারেই অপরিতৃপ্ত জীবনের এই যেন শান্তি, এই ঘরের বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলোকে হাত বুলানোও একটা তৃপ্তি।

অথচ এক এক সময় বনলতা কি দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, জীবনটাকে দু হাতে দলে মুচড়ে ইচ্ছে করে ভেঙে ফেলতে, তছনছ করতে। কেন না, সে তো চায় আসুক জীবনের দুঃখ পীড়ন নিষ্পেষণ। ভাঙুক ঘর, পড়ুক জল, ভাঙুক বাঁধ, ডুবুক মাঠ, ফাটল ধরুক মাঠে জ্যৈষ্ঠের রোদে

আর নিঃশ্বাসে, আসুক তার এই বিস্তৃত গর্ভ থেকে নাড়ী ছিঁড়ে খুঁড়ে সন্তান, আসুক জীবনের পথে জমা সব সংকট, সব দুঃখ, সব অপমান, ক্লেশ, সবই বুক পেতে নেবে, বনলতা ; সব সব সব, বনলতার সমস্ত বলিষ্ঠ দেহ দিয়ে সে সব নেবে, ঠেকাবে, ক্ষয় করবে নিজেকে পলে পলে।

কিন্তু হায়, কালনাগিনীর বিষাক্ত মসৃণ গা থেকে জীবনের সে রূপটাই যে ঝরে যায় বার বার। জীবনের সেই খোলা সংগ্রামের দিকটা এল না তার। শিউরে উঠল বনলতা। দু-হাত দিয়ে মুখটা চেপে ধরে অত্যন্ত আতঙ্কের সঙ্গে সে চোখ দিয়ে লেহন করল নিজের দেহটাকে। ইচ্ছে করল, প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এখুনি আছড়ে শেষ করে দেয় ঘরের মেঝেটাতে। বড় অসহ্য হয়ে ওঠে এক এক সময় তার প্রাণটাকে জড়ানো রং-বেরং-এর ইন্দ্রিয়গুলোর বিচিত্র খেলা। ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে ঘরের মাচাটা ধরে ঝুলে পড়ে, ধ্বসিয়ে দেয় ঘরটা, ভেঙে ফেলে তছনছ করে।

হ্যাঁ, এমনি তার জীবনের ঝড়ের বেগ, এমনি অসহ্য হয়ে ওঠে।

॥ ৮ ॥

অহল্যা ইতিমধ্যেই ভাত নামিয়েছে উনুন থেকে। ভরত আজ সদর কাছারীতে যাবে। মামলার দিন আজ। এ-রকম মাঝে মাঝেই সে যায়।

গোবিন্দ ঢুকে অহল্যাকেই জিজ্ঞেস করল, মহী কই বৌঠান ?

অহল্যা ফ্যান গালতে গালতে আগুনের আঁচে লাল মুখটা টিপে হেসে বলল, কেন ঘুম হয় নাই বুঝিন্ কাল রাতে ?

না হওয়ারই সামিল, বৌঠান ! দেওর তোমার ভাল আছে তো ?

ভাল কি মন্দ বলতে পারি না। তারও তো তোমারই মত রাত কেটেছে। যাও, সে তার ঘরে কাজ করছে, দেখ গে।

গোবিন্দ বুঝল, মহিম সুস্থই আছে। সেদিকে তাড়াতাড়ি না করে সে জিজ্ঞেস করল, তা তোমার রাত না পোহাতেই ভাত নামল যে?

সদরে যাবে আজ মহির দাদা। খানিকটা উৎকণ্ঠা দেখা দিল অহল্যার মুখে চোখে। এক মামলা করেই সব যাবে দেখছি। কাল সারা রাত ঘুমোয়নি মহীর দাদা। সকালে উঠেও থম ধরে বসেছিল। এই এখুনি নাইতে যাবার আগে বলে গেল, এবার মামলায় যদি হারি বড় বউ, মাঠে নামতে হবে নাঙল নিয়ে।

এতে অহল্যার দুঃখ নেই। দুঃখ তার ভরতের বিভ্রান্তিতে। যে আভিজাত্যের বীজ ভরতের বাবা চাষী দশরথ বয়ে এনেছিল এ ভিটেয়, সেই বীজেরই মহীরুহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ভরতের মনে। মাঠে লাঙল দিতে ভরত দুঃখ পাবে, মুখে নাকি তার কালি পড়বে, সম্মান হবে ক্ষুণ্ণ।

তাই অহল্যার বাপ-ভাই ভরতের বাড়িতে আসিতে সংকোচ করে, জামাই তাদের ভদ্রলোক। তাদের ঘর-দোরে বিছানায় মাঠের ধুলো, গায়ে মাথায় পায়ে মাঠের ধুলো, তারা মাঠের চাষী। অহল্যার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হয়নি, জাতটাই পালটে গেছে খানিক। হ্যাঁ, ভরতও কোন দিন শ্বশুরবাড়ির লোককে তেমন তোয়াজ করেনি, আর তা কেবল ঐ মিথ্যে ভদ্রলোকী আভিজাত্যের জন্য।

অথচ অহল্যা তো চাষীর ঘরেরই মেয়ে। বাপ্-ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরেছে সে জন্মের পর থেকে। কিন্তু ভরত আজ বিভ্রান্ত।

কিন্তু গোবিন্দ সম্পূর্ণ অন্য রকম ভাবল। দুনিয়াব্যাপী মানুষের এ স্বার্থান্ধ রূপটা তার মনকে কালো করে। এইটুকুই কি জীবনের পরিধি—এই স্বার্থ আর হানাহানি? এই মামলা আর মারামারি, দৈনন্দিন জীবনের সুখটুকু কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য কামড়াকামড়ি! মানুষের পবিত্রতম প্রার্থনারত চেহারাটা তো সে কখনও দেখতে পায় না! মানুষের জীবন, তার ধর্ম তার ধর্মের ইতিহাসের নেই কোন খোঁজ। যে ঈশ্বরকে ঘিরে আর নিয়ে মানুষের জগৎ সে ঈশ্বরকে এমন দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে দূরে দাঁড়ানোর এ

জঘন্য শিক্ষা মানুষ কোথা থেকে পেল ? কেন পেল ?

সে জিজ্ঞেস করল, আজই বুঝি রায় বার হইবে ?

না, আজ নয়। তবে দেরিও নাই আর।

মেজিস্টর বিচার করবে বৌঠান, তবে মহেশ্বরেরই হাত সবকিছুতে। তুমি তাঁকে ডাকো।

তাঁকে তো রাতদিনই ডাকছি ভাই!

যেন ডেকেও কিছু হল না। গোবিন্দ আঘাত পেল অহল্যার কথায়, ধমক দিতে ইচ্ছে করল অহল্যাকে।

মনে মনে ভাবল, তোমরা কোনদিনই ডাকনি। ছবি আর মূর্তি পূজো করেছ কেবল তোমরা, দেবতার নাম করে খেয়েছ গোগ্রাসে খাদ্য-অখাদ্য, কিন্তু সেই একক মহেশ্বরকে জানবার চেষ্টা তোমরা কেউ করনি। তার রূপ দিয়েছ কোটি কোটি, গল্প বলেছ হাজার রকম, তোমরা মজে আছ জীবনের ঘৃণ্য পাঁকে। মহেশ্বরকে ডাকলে না, তার কাছে চাইলে ধান, জমি, অর্থ, ঐশ্বর্য, সুখ-শান্তি। অথচ মহেশ্বরেরই সৃষ্টি এরা। বিচিত্র মহেশ্বরের সৃষ্টি।

কিছু না বলে সে চলে গেল মহিমের কাছে।

মহিম তো তখন পাগল। অন্য জগতে চলে গেছে। উন্মত্ত ক্ষিপ্ত শিবের মূর্তির গা থেকে মাটি খুঁটে খুঁটে তুলছে, ভরছে, কখনও সামনে যাচ্ছে, কখনও পেছিয়ে আসছে, কখনও মাথা নাড়ছে, অস্ফুট শব্দ উঠছে মুখ থেকে। কখনও মুখে ফুটছে হাসি, কখনও গম্ভীর, কখনও-বা একেবারেই স্থাণুর মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ছে।

আছে সর্বক্ষণের একজন মাত্র দর্শক। সে হল কুঁজো কানাই মালা। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, পিঠে মস্ত বড় একটা কুঁজ। সে কুঁজের ভারে সে অনেকখানি নত হয়ে পড়েছে। ফলে, হাত দুটো সব সময় বাতাসে দোল খাওয়ার মত দোলে। ঘাড় উঁচু করতে কষ্ট হয় বলে চোখের মণি দুটো উপরের দিকে ঠেলে উঠেছে তার। কুঁজো কানাই মালা। গাঁয়ের শিশুদের কল্পনারাজ্যের বীভৎস পথে তার গতি। অশান্ত দামাল শিশু কান্নায় বাধা না মানলে কুঁজো

কানাইয়ের নাম ধরে ডাক দেয় মা, যেমন ডাকে জুজু বুড়িকে। বয়স্কদের কাছে সে জন্তুবিশেষ, ভয়েরও বটে। নয়নপুরের মেয়েমানুষ কাউকে শাপ-শাপান্ত করতে হলে বলে, আর জন্মে তুই কুঁজো কানাই হবি। পুরুষ হিসেবে মেয়েমানুষের কাছে কুঁজো কানাই যে এক মস্ত বিভীষিকা। অভিশপ্ত কুঁজো কানাই।

কিন্তু মূর্তি গড়ার সময় মহিমকেও ছাপিয়ে ওঠে তার পাগলামি। ঠেলে-ওঠা চোখ দুটোতে তার কী গভীর উত্তেজনা, আর সমস্ত রুক্ষ, শক্ত পেশীবহুল চেহারাটা যেন আবেগে থরো থরো। কখনও ঘাড় এদিকে কাত করছে, কখনও ওদিকে কখনও এদিকে যায়, কখনও ওদিকে। যখনই তার মনোমতটি হচ্ছে তখনই একটা বিচিত্র শব্দ বেরিয়ে আসছে তার মুখ থেকে।

সত্য কথা, শিল্পীর হাত আজ কিছুটা বাঁধা পড়েছে কুঁজোর আবেগভরা দৃষ্টির মাঝে। মহিম তার এই সৃষ্টি-সঙ্গীর যাচাইয়ের চোখকে আজ আর অবহেলা করতে পারে না। কাজ করে আজ জিজ্ঞেস করে, বল তো কানাইদা, কেমনটি হইল ?

কুঁজো কানাই তার কুৎসিত মুখে বিচিত্র হাসি নিয়ে বলে, ভাল। কিন্তক—

শিল্পীর পরের কাজের দিকেই ঝোঁক তার বেশি ? অর্থাৎ এর পর কি হবে ?

গোবিন্দ সাধক, কিন্তু মহাশক্তির। তার কোন নাম নেই, নেই মূর্তি। তার ধ্যান ধারণা শক্তিরই উপাসনা, কিন্তু উপচারবিহীন। তবু প্রেমিক, উন্মত্ত শিবের যে মূর্তি মহিম গড়ছে তা তাকে মুগ্ধ না করে পারল না। যে হাতে শিব সতীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরেছে, যে ঘৃণা ও দৃঢ়তা শিবের মুখে ফুটে উঠেছে, এই উভয় ভঙ্গির পার্থক্য গোবিন্দর সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে দিল। হাতের দিকে তাকালে মনে হয়, মৃত প্রিয়াকে কী আকুল আবেগেই আঁকড়ে ধরেছে। যেন ঐ হাত থেকে জগতের কোন শক্তিই প্রিয়াকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর ত্রিনয়নের সেই অগ্নিদৃষ্টির মাঝে গোবিন্দ দেখল, কোথায় যেন অশ্রুর

বাষ্প জমে উঠেছে। আহা! শেষে তার সমস্ত আবেগ জমে উঠল বন্ধুর প্রতিভার প্রতি; মহিমের এই গভীর অনুভূতি ও দৃষ্টির তল খুঁজতে সে আকুল হয়ে ওঠে। হ্যাঁ, মহিমের প্রতি তার বন্ধুত্বের যে টান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, সে বুঝি তার এই আকুলতা, মহিমের হাত আর চোখকে এতখানি শক্তি ও দৃষ্টি দিয়েছে যে মন, সেই মনটাকে স্পর্শ করার আকুলতা।

সে ডাকল, মহী!

জবাব পাওয়া গেল না। তখন মহিমকে ডাকা বুঝি ঐ মাটির মূর্তি ক্ষিপ্ত শিবকে ডাকারই সামিল। একটা মস্ত দোমড়ান গাছের গুঁড়ির মত ফিরে ইশারায় ডাকতে বারণ করল কুঁজো কানাই। তারপর গোবিন্দের একটা হাত ধরে খানিক দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার মাথাটা হাত দিয়ে ধরে নিজের মুখের কাছে নামিয়ে নিয়ে এল কানাই। কয়েকটা দাঁতে বিচিত্র হেসে ফিসফিস করে বলল, ভগবানের বেব্‌ভোম। নইলে মায়ের এমন খুনে বাপের বাড়িতে আসতে কেন সাধ হইবে, বল?

কুঁজোর কথার ধারা ধরতে পারল না গোবিন্দ। বলল, কি বলছ?

ওই গো, তোমার দক্ষ রাজার মেইয়ের কথা বলছি। সতী মায়ের কথা বলে সে তার ঠেলে-ওঠা চোখ দুটো দিয়ে শিবের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাং—গ্যাঁজার মানুষ তুমি ঠাকুর, মায়ের নীলা দেখে ভুললে। আমি হইলে—

কথা শেষ না করে সে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে লাগল। গোবিন্দের বড় ভাল লাগল কুঁজো কানাইয়ের এই সরল হৃদয়ের আফসোস। জিজ্ঞেস করল, তুমি হইলে কী করতে?

মুই? কানাইয়ের কালো কুব্জ দেহ ঘৃণায় যেন সোজা হয়ে ওঠার জন্য কেঁপে উঠল। সমস্ত চোখ মুখ দারুণ ক্রোধের অভিব্যক্তিতে উঠল থমথমিয়ে। মুই হইলে, অমন শউরের ঘরে বউ পাঠাইতাম না। হুঁ, হক কথা বললাম। দু-দিন উপোস করে আড়ি দিত বউ, তবু—

গলা বন্ধ হয়ে এল কুঁজো কানাইয়ের। গোবিন্দ দেখল তার ঠেলে-ওঠা চোখ দুটোতে দু-ফোঁটা জল চক চক করছে। হায়! তবু এই বিকটদর্শন কুঁজো বউ নিয়ে ঘর করা দূরের কথা, জন্মাবধি গর্ভধারিণী মা থেকে শুরু করে কোন নারীর মিষ্টি কথাও শোনেনি। তার বুকে আজ গুমরে ওঠে কান্না শিবের বউ সতীর বিরহে। আশ্চর্য জগৎ। তার চেয়েও আশ্চর্য জগতের মানুষ। সাধকের সাধনায় জমে ওঠা মস্তিষ্কে যেন টঙ্কার পড়ে। মানুষ! মানুষকে তার পুরোপুরি চিনে ওঠার মধ্যে কোথায় যেন মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। সে ভীত হয়, যখন তার নিরাকার ঈশ্বর সাধনা এমনি কোন মুহূর্তে চমকিত হয়। সেও তো মানুষ। কুঁজো কানাইও মানুষ। তবু মানুষের সমাজ তাকে মানুষ বলে মানতে বাধা পায়। কুঁজো কানাইয়ের আবদার আর দশজনেরই মত। আর সেই মানুষের সঙ্গে তার সাধনার যেন এক মস্ত গড়মিল। মানুষ তার কাছে বড় কিঞ্চিৎ।···না না, মানুষের তো সে মঙ্গল কামনা করে দিবারাত্রি তার ঈশ্বরের কাছে। মানুষ তো তাঁরই সৃষ্টি, সেই তাঁর সাধনার চেয়ে মহিমময় আর কি থাকতে পারে।

তবু কুঁজো কানাইয়ের এ বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা তার পরমেশ্বরের কাছে এক বিচিত্র প্রশ্নের মত ছোট্ট একটি দাগ কেটে রাখল মনের কোণে।

সে দেবতার বহুরূপ ও তার জন্মান্তরে বিশ্বাস করে না। তবু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল কুঁজো কানাইয়ের কুঁজের উপর আলতো করে একখানি হাত রেখে, এ তো দেবতার লীলা ভাই কানাইদাদা, এর জন্য তুমি দুঃখ কোর না।

কিন্তু এ কথা মানবার পাত্র নয় কুঁজো কানাই। গোবিন্দ মানুষ না-চেনার হাল্‌কা দুঃখতে যেন দারুণ বিদ্রূপ করেই কুঁজো কানাই আচমকা গর্জনের মত চিৎকার করে উঠল, না না না, কক্ষনো নয়।

সে চিৎকারে মহিমের সম্বিৎ ফিরে এল। ফিরে দেখল, বন্ধু গোবিন্দ অপ্রতিভ শঙ্কিত মুখে কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। কুঁজো কানাই দুর্নিবার বেগে মাথা নেড়ে চলেছে। বুঝি ঘাড়টাই

ছিটকে পড়বে ধড় থেকে, এতই তার বেগ। ছিটকে পড়ছে লালা তার মুখ থেকে।

মহিম হাত ধরল কুঁজোর। জিজ্ঞেস করল, কি হইছে কানাইদা ?

কানাই তার ঠেলে-ওঠা রক্তবর্ণ চোখে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, এটারে কয় বেব্‌ভম্‌, হঁা, তোমার দেবতার বেব্‌ভোম।

—বেব্‌ভোম্‌ ? আশ্চর্য ! গোবিন্দের চাপা-পড়া গলা কেঁপে উঠল।

—লয় ? বিকলাঙ্গ কানাই চকিতে যেন খ্যাপা জানোয়ারের মত হয়ে উঠল। বুঝি বা ঝাঁপিয়ে পড়বে গোবিন্দের উপর। তবে তোমার মুনি দেবতার এত বিবাদ কেন, জগতে এত দুঃখক্‌ কেন গো ? কালু মালার সোন্দরী টুকটুকে মেইয়ে বুড়ো ভাতারের ঠ্যাঙ্গানি রোজ খায় কেন ?

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে দরজার কাছে গিয়ে বুনো মোষের মত ফিরল কুঁজো কানাই। জিভ্‌ দিয়ে লালা চেটে নিয়ে বলল, তোমার সবার বড় ভগবানের বেব্‌ভোম যদি না হইবে, তবে মোরে কেন জন্ম দিল সম্‌সারে ?

বলতে বলতেই তার নিষ্ঠুর চোখ ছাপিয়ে হু হু করে জলের ধারা বইল। বলল কপালে চাপড় মেরে, এ কি লীলা তোমার ভগবানের, এ কি খেলা মোরে নিয়ে ?

বলেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল সে হাত ঝুলিয়ে, তেমনি তীব্র বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে। আর ছুঁচলো কুঁজটা যেন ক্লান্ত জানো-য়ারের পিঠে নিশ্চল নিষ্ঠুর সওয়ারের মত তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তার তীব্র মাথা নাড়া যেন জগৎটাকেই অস্বীকার করার অনিরুদ্ধ বেগ।

এস্ত অহল্যা এসে দাঁড়াল। মহিম ও গোবিন্দকে নির্বাক দেখে বলল, কি হইল, কুঁজো মালা অমন ফেপল কেন ?

গোবিন্দ বলল, ওরে আমি দুঃখুক দিইছি। কিন্তুক অজানিতে।

সকাল থেকে অহল্যার মন ভার। তবু একটু হেসে বলল, একে-

বারে সামলানো দায়, তায় তিন পাগল একত্র হইছ। দেখো বাপু, মাথার চালটাকে ভিটেয় ফেল না।

বলে দরজার কাছ থেকেই সরে গেল সে।

মহিম বলল, ওরে ফুঃ‌ফুক দেওয়া তো বড় চাট্টিখানি কথা নয় গোবিন। তবে ঈশ্বরের গুণের কথায় ও বড় খ্যাপা। তাই বুঝিন্ বলছ ?

—আমি বুঝতে পারি নাই মহী ভাই।

তার ঠোঁটে কান্নার আভাস দেখা দিল। বনলতার নিষ্ঠুর সাধক আর সবার কাছে, সব কিছুতে বড় নরম। মনটা তার তুলোর মত। রোদে হাওয়ায় ফোলে, জলে নেতিয়ে যায়। টানলে বাড়ে, টিপলে গুটি মেরে যায়। পরমেশ্বরের দিকে ছুটে চলার সাধনাটা যেন তার বালিশের খোলের বেষ্টনীর মধ্যে আশ্রয় নেওয়া যেখান থেকে কেউই তাকে টেনে বার করতে পারবে না।

মহিম তাড়াতাড়ি বলল, বুঝেছি।

ব্যাপারটাকে হালকা করে দেওয়ার জন্য বলল, তা তুমি হঠাৎ আসলা যে সকালবেলা ?

—কাল রাতে তো তুমি যাও নাই ? ভাবলাম বুঝি—

—সে এক কাণ্ড গোবিন ভাই।

কাল রাতের কথা মনে হতেই সব কথা গোবিন্দকে বলার জন্য প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল মহিমের। বলল, কাল একটু বাবুদের, মানে, ওই জমিদার বাড়ি থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কাণ্ডখানা বড় তাজ্জবের।

সে বলে গেল সব কথা। প্রতিমা গড়ার কথা, হেমবাবু ও উমার মত দুইজন বিচিত্র অপরিচিত নরনারীর কথা। কি তার মনে হয়েছিল, কেমন করে তারা কথা বলেছিল। হ্যাঁ, সেই নাম-না-জানা গদীটাতে বসবার কথা পর্যন্ত সে বলে গেল গোবিন্দকে। উমা যে পাগলা বামুনের সহপাঠিনী, সে কথাটিও বলতে ভুলল না সে। তারপর কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত বন্ধুকে বলল, সে কেন প্রতিমা গড়তে চাইল না। নিজের

অনিচ্ছার কথা নানানখানা বলে সে শেষে বলল :

—আর তা কি আমি পারি গোবিন ভাই ? অর্জুন পাল মশাই চিরদিন বাবুদের পিতিমে গড়ে আসছে। আর পালমশাই আমার গুরুজন। ছোটকালথে তার কাজ দেখেই যে প্রাণে অমোর সাধ হইছিল। সে কথা আর কেউ না জানুক, আমি আর আমার গুরু তো জানি। পালপাড়ায় যে আমার কতখানি মান। আমি কি তা পারি ?

এত কথাতেও গোবিন্দের মুখের কোন ভাব পরিবর্তন না দেখে বলল মহিম, শরীল কি তোমার খারাপ হইছে ?

গোবিন্দ বলল, না, মনটা বড় খারাপ হইছে মহী ভাই। তবে তুমি পিতিমে গড়ার ভার না নিয়ে ভালই করছ। অন্যান্য কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বলল, সন্ধ্যেবেলায় আসছ তো ? আমি এখন যাই। এসো কিন্তু।

সাধকের মগজে কানাই কুঁজোর শেষ কথা প্রচণ্ড কলরব তুলে দিয়ে গেছে। বেব্‌ভোম্‌ যদি না হয়, তবে মোরে নিয়ে ভগবানের এ কি খেলা! ভগবানের বিভ্রম! তা হলে ভগবান ভগবান কেন ?

যেতে যেতে হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে বলল, হ্যাঁ, বনলতা তোমারে ডাকছে।

—মোরে ? মহিম বলল, তার সঙ্গে তোমার দেখা হইছে ?

চকিত কুণ্ঠায় মুহূর্তে চুপ থেকে গোবিন্দ বলল, হ্যাঁ। যেয়ো কিন্তু, নইলে মোরে জ্বালাতন করবে।

মহিমের ঠোঁটে চকিতে এক ঝিলিক হাসি খেলে গেল।

পথে যেতে যেতে গোবিন্দের মাথায় হঠাৎ ভাবনা এল, সকালের এ বিভ্রাট কি তবে প্রভাতে বনলতার দর্শন!

॥ ৯ ॥

মহিম তার কাজের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বেরোবার উপক্রম করতেই হঠাৎ আবার অহল্যা এসে ঢুকল। মহিমকে সব গুছোতে দেখে অহল্যা

ভ্রূ তুলে গম্ভীর মুখে বলল, একজন তো মামলা লড়তে বের হইলেন। আর একজনের নিশানা কোন দিকে ?

মহিম বলল, দেখি একবার কুঁজো মালা গেল কুনঠাঁই। আর যাব একবার লতার ঠাঁই।

তাই ভাল, বাঁকা ঠোঁটে হেসে রহস্য করে বলল অহল্যা, কাল বলছিলে রাতে, কোন্ এক অপরূপ সোন্দরী নাকি দেখে আসছ। মুখ নাকি তার তোমার-গড়া বুদ্ধদেবতার মত মিষ্টি। ভাবি, বুঝি রাত পোয়াতেই সেই মুখের খোঁজে চললো।

সহজ জবাব না দিয়ে মহিম বলল, কেন, আমাদের ঘরের বউ বুঝিন কুচ্ছিত ?

—পোড়া কপাল অমন সোন্দরের !

কথা বলতে গিয়ে কথা আটকায় বুকে অহল্যার। বুকের মধ্যে কোথায় যেন কিসের এক ত্রাস জমিয়ে বাসা বাঁধে। কথা নয়, যেন চোরাবালুতে সন্তর্পণে পা ফেলে চলেছে। মুহূর্তের এদিক ওদিক বুঝি চিরদিনের জন্য তলিয়ে যেতে হবে বসুমতীর গর্ভে।

হেসে তেমনি রহস্য করে বলল, নিজের জন্য একটি খুঁজে আনতে হবে তো। না, কি চিরদিনই ভায়ের বউয়ের মুখ দেখে চলবে !

চলছে না নাকি ! তা যা-ই বল, ও পরের মেয়ের ঝামেলায় আর যাচ্ছিনে বাপু।

আমি বুঝি পরের মেয়ে নই ?

তুমি ? মহিম চোখ তুলল। অহল্যা তার তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টি চকিতে নিল সরিয়ে।

মহিম বলল, সে কথা মোর মনে লয় নাই কোন দিন। তুমি আবার পরের মেয়ে হলে কবে ? তুমি যদি পরের মেয়ে, তবে আর মোদের আছে কে ?

কশাঘাত নয়, তবু যেন কিসের আচমকা আঘাতে অহল্যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তেই মুখে হাসি টেনে নিজেকে মনে মনে গাল দেয় সে, মুখপুড়ি, পাষাণী আর কি শুনতে চাস বল তুই এ নরম

মানুষটার কাছ থেকে? বলল, হ্যাঁ মোর ছাড়া তো তোমাদের জগৎ সম্‌সার খা খা করতেছে।

পরের কথা নয়, মোর কথা বল। শুনি, জন্ম দিয়ে মা মরেছিল, বাপকেও মোর মনে নাই। দাদা হল অন্য মানুষ, তার মনের তল পাই না। তোমার মনের হদিসও আমি হারিয়ে ফেলি মাঝে মাঝে! তবু, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সেই ছোটকালে তোমারে যদি না পেতাম, তবে বুঝিন জ্যান্ত থেকে এত বড়টা হইতাম না।

চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে অহল্যা দু-হাতে মহিমের মুখে হাত চাপা দিল। থাম—থাম, খুব হইছে মোর মস্‌করা। এ কি কথার ছিরি?

তারপর তার সমস্ত হৃদয়কে মুচড়ে দিল মহিমের চোখে দু-ফোঁটা জল। মহিমের এক মাথা চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়ে অহল্যা চোখে জল নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, মস্‌করা বোঝ না বাপু তুমি। বড় নরম মানুষ।

চোখ মুছে মহিম বলে, আর তুমি বুঝিন্ পাথরের? তবে পাথরের চোখে জল কেন? পর বলে বুঝিন্?

নেও হইছে, কোথা যাচ্ছিলে যাও। দেখ, বেলাটুকুন কাটিয়ে আস না যেন।

আসি আসব, তুমি বসে থেকো না, বলে মহিম বেরিয়ে যায়।

আশ্চর্য! অহল্যার ঠোঁটে এক বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে। চোখ পলকহীন। সে দৃষ্টি, সে হাসি সুখের না দুঃখের, কিছু চাওয়া না পাওয়ার—তা বুঝি সে নিজেই জানে না। তারপর আরও আশ্চর্যতর, যখন আচমকা দমকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা ফুলের পাপড়ির মত কেঁপে উঠল তার ঠোঁট, চোখে ছুটে এল বন্যা। অদমিত তার বেগ। কেন?

এ কি সেই তার নিজের হাতে বাঁধা বীণার তারে বেসুর?

॥ ১০ ॥

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

মহিম সারা নয়নপুর ও তার আশেপাশে আতিপাতি করে খুঁজল কুঁজো কানাইকে। কিন্তু কোথাও দেখা পেল না তার। না, এতে নয়নপুরের বুকে কোন দুশ্চিন্তা, তার চলতি জীবনে কোন ব্যতিক্রমই দেখা দেয়নি। শুধু মহিমের ঘুচেছে নাওয়া খাওয়া, চোখে মুখে অনুক্ষণ দুশ্চিন্তা, বুকের মধ্যে এক অজানা শংকা তাকে বড় মুষড়ে দিয়েছে, কুঁজো কানাইয়ের প্রাণের হদিস্ তো আর কারুর জানা নেই! সকলের চোখে সে জানোয়ারের সামিল। জানোয়ারের আবার প্রাণ কিসের! সত্য, কুঁজো কানাইয়ের কিছু নেই, তবু আর দশজনের হিসেবনিকেশ যে তারও হিসেবনিকেশ। 'সুখ-দুঃখ', ভাল-মন্দ সব কিছুতে আর দশজনের চেয়ে তার প্রাণের বোধ যে আরও বেশি। তার প্রাণের শিশু-বৃদ্ধের যুগপৎ বিচিত্র খেলা আর কেউ না জানুক, মহিম তো জানে। আর জানে বলেই তার উৎকণ্ঠা।

মালাপাড়ার নামকরা সুন্দরী মেয়ে সে কালু মালার মেয়ে। টাকার লোভে কালু মেয়ে দিয়েছিল ঘাটের-দিকে-এক-পা বাড়ানো এক বুড়োকে। তাইতেই কুঁজো কানাইয়ের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। মহিমকে এসে বলেছিল, পিশাচ শুধু নয়নপুরের শ্মশানেই থাকে না, ঘরেও থাকে।

এই ক্ষোভই একদিন ফেটে পড়েছিল কুঁজো কানাইয়ের—যেদিন চোখের সামনে দেখল, সেই মেয়েকে তার বুড়ো সোয়ামী এলোপাথারি পিটছে। ছুটে এসে তার সেই মস্ত হাত দিয়ে বুড়োকে সাপটে ধরে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল উঠোনে, বুড়ো হারামজাদা, তোর ওই নোনা-ধরা, ও পোড়া কাঠের হাতে ঠ্যাঙ্গাস্ কচি মেইয়াটারে।···মালাপাড়ার মালারা সেদিন বেধড়ক মার দিয়ে বার করে দিয়েছিল কুঁজো কানাইকে।

কানাই এসে মহিমকে বলেছিল, মোরে বেড়ন দিলে, সেটা বড় লয়। মালাদের এ মতিগতি দেখতে এ ছার পরান আর রাখতে ইচ্ছে যায় না।

আর সেই হল মহিমের সবচেয়ে বড় ভয়। এসব পাগলেরা থাকে একরকম, কিন্তু বিগড়ে গেলে এক মস্ত সমস্যা। মানুষের মতিগতিতে যায় নিজের প্রাণের স্বাদ বিস্বাদ, তাকে নিয়ে খেলা করেছে যে ভগবান, সেই ভগবানের বিভ্রমের প্রতিশোধ তুলতে যে সে প্রাণত্যাগ করে বসবে না তার ঠিক কি ?

মহিম শিল্পী, কিন্তু হাত চোখ আর মন আজ বেয়াদপ ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে বসল। হাতের মাটি হাতে রইল প্রাণ রইল নিঃসাড়।

অবস্থাটা বুঝল মাত্র একজন। মহিমের সব কিছুই, প্রতি গ্রন্থিটি যে ধরতে পারে—অহল্যা। যমুনার মত উপরে শান্ত, তলে তার খরস্রোতের তীব্র বেগ। অহল্যার হল তাই। সে ডাকল তার প্রিয় অনুচর মানিককে। বলল, যেখান থেকে পারিস্ কুঁজো মালার খোঁজ নিয়ে আয়। এ জগতে তো তোর কোন ঘাট-অঘাটের বেড়া নেই। এ খবরটা মোরে এনে দে বাবা, নইলে সোয়াস্তি নাই তোর কাকার পরানে।

ব্যাপারটা বড় ছোট নয়। মানিক ছুটল কোমরে চিঁড়েগুড়ের পোঁটলা বেঁধে।

ভরত এসবের কোন খোঁজ রাখে না। সে একথা জানতে পারলে সামান্য দরদ তো দূরের কথা, এ পাগলামিকে সে তার স্বাভাবিক বিষয়ী ও রূঢ় ভাষায় শাসনই করবে।

এ অবস্থায় পথ চলতে হরেরাম একদিন ডাকল মহিমকে। দুপুর গড়ায়। উঠোন থেকে উঠে এসে হরেরাম ডাকল মহিম নাকি গো ?

মহিম ফিরল। বলল, কিছু বলছ হরেরামদা ?

বলতে ভাই ইচ্ছে করে অনেক কথা। ঠিক বিদ্রূপ নয়। কেমন যেন একটা চাপা আফ্‌সোস ফুটে উঠল হরেরামের গলায়। বলল, যেতে পারিনে কোথাও। জ্বর-জারিতে শরীলএ বশ থাকে না। আর—

কথা শেষ করল না হরেরাম। মহিম দেখল কেমন বিতৃষ্ণায় ঠোঁট জোড়া কুঁচকে উঠেছে হরেরামের। বলল, আর কি বল ?

তোমার দাদার ভিটেয় পা বাড়াতে মনটা বড় ছোট হয়। নইলে গাঁ জোড়া যার এত নাম, একবার কি প্রাণে সাধ যায় না, তার হাতে গড়া কাজ দু-দণ্ড দেখে আসি ?

কথাটি বড় সত্য। সেজন্য মহিমের শুধু লজ্জা নয়, ক্ষোভও বড় কম নেই। মামলাবাজ, রূঢ়ভাষী ভরতের উপরে গ্রামের মানুষ, বিশেষ জাতভাই চাষীরা সকলেই মর্মাহত, ক্রুদ্ধ। বুঝি ঘৃণাও করে। মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় তিক্ত, জ্ঞাতিকে করে হেয়জ্ঞান! অথচ কিসের অহঙ্কারে, তা বোধ হয় ভরতই জবাব দিতে পারে। এ কথা নিয়েই দাদা বউদি'র মাঝখানেও যেন এক মস্ত প্রাচীর উঠেছে খাড়া হয়ে।

তবু অনেকেই তো যায় মহিমের কাছে। কত মানুষকে মহিম হাতে ধরে ডেকে নিয়ে যায় নিজের কাজ দেখাতে, কেউ আসে ডাকের আগে। এই নয়নপুর, ওপারে রাজপুর, আশেপাশে মহিম তো কোথাও পর নয়। মহিম বলল, আমার কাছে তো সকলেই যায় হরেরামদা।

যায়, সে তোর টানে ভাই।

নয় কেন ? তা ছাড়া, ভিটে তো একলা দাদার নয়।

কথাটা বলে ফেলে বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল মহিমের। কেন যেন তার মনে হল সে বুঝি চীৎকার করে লোককে তার অধিকারের কথা জানিয়ে দিচ্ছে, যেন ভরত বিস্মিত ক্রোধে বাকহারা, তার দিকে তাকিয়ে আছে অহল্যা। না না, মহিম তো তাই ভেবে ওকথা বলেনি।

যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতন হরেরামকেই বলল সে, দশজন ছাড়া আমি নয় হরেরামদা। তোমরা কেবলি দাদার কথা বল, আমি কি কেউ নই ?

হঠাৎ হরেরাম অত্যন্ত আপনভাবে বলে উঠল, আয় না কেন,

খানিকটা বসবি।

মহিম দ্বিরুক্তি না করে ঢুকল বাড়িতে। যে ঘরে নিয়ে এল তাকে হরেরাম, সেখানে এসে চমকে উঠল মহিম। দেখল, গাঁয়ের চাষী, মালা, কামার সকলেই এসে সেখানটিতে ভিড় করেছে। রাজপুরেরও কেউ কেউ এসেছে। আশেপাশের গাঁগুলিও বাদ যায়নি। কি ব্যাপার! এমন একটা পরিবেশের কথা মহিম কল্পনাও করতে পারেনি। সকলেই তাকে বাবা, ভাই বলে ডেকে বসাল। এক কোণে অহল্যার বাবাকে বসে থাকতে দেখে মহিম উঠে গিয়ে প্রণাম করল। অহল্যার বাবা পীতাম্বর তাড়াতাড়ি মহিমের হাত ধরে বলল, থাক্ থাক্ বাবা, বেঁচে বর্তে থাকো, পায়ে হাত দিও না।

পায়ে হাত দিও না কথাটা অভিমানের। নিজের জামাই যাকে ভুলে কোন দিন নমস্কার করে না, তারই বিমাতার সন্তান প্রণাম করলে মনে আর লাগে না কার? তবু পীতাম্বর শুধু তুষ্ট নয়। মনে প্রাণে আশীর্বাদ করল মহিমকে আর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। মেয়ের মুখে তার এই দেবরটির অনেক কথাই শুনেছে সে। মেয়ের বড় স্নেহের দেবর শুধু নয়—কথায় আঁচ করেছে পীতাম্বর. বুঝি বড় সোহাগের।

পীতাম্বরের কথার প্রতিবাদ করল দয়াল কামার। বলল, এ তোমার রাগের কথা পীতু ভাই। গুরুজনকে পেন্নাম করবে না। এ তোমার কোন্ শাস্তরের কথা?

ও সব শাস্তর ফাস্তরের কথা ছাড়, এখন কাজের কথা বল, নয় তো বল ঘরে যাই।

কেবল চেঁচানি নয়, কথাটা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ধমকানির মত শোনাল। সকলেই তাকিয়ে দেখল বক্তা পীতাম্বরের বড় ছেলে ভজন। কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এতক্ষণের সমস্ত ব্যাপারটা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। এবং এ ক্ষিপ্ততার বর্তমান কেন্দ্র মহিম হলেও আসলে ভরতই। ভগ্নীপতির সঙ্গে ভজনের সম্পর্কটা এমনই তিক্ত যে, অনেক-দিনই তার ইচ্ছে হয়েছে ভরতকে পথে-ঘাটে ধরে অপদস্থ করে দেয়।

কিন্তু অহল্যা তার বড় আদরের বোন। ভরতের উপরে আঘাত যে বোনের উপরে গিয়েই শেষ পর্যন্ত পড়বে এটা সে জানত, জানত বলেই নীরব। ভরতের জন্যই ভজন কোন দিন মহিমকে ডেকে কথা বলেনি। অহল্যার কাছে তার দেবরের গুণপনা শুনলেও রাগটা ভজন মনে মনে জমিয়ে রেখেছে, শত হলেও একই ঝাড়ের বাঁশ তো! আর চাষীর ছেলে কুমোর হল, তাও কি না শহরের লেখাপড়া জানা বাবুদের স্কুলে শেখা কুমোরগিরি। একটা ফারাক ভজন কিছুতেই ভুলতে পারে না। সে মাটিতে চাপড় মেরে বলল, চাষী চাষীর পেন্নাম লেয়, আর কারুর লয়!

মহিম চকিতে ফিরে দু-হাতে ভজনের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিল, দাদা বইসে আছেন, দেখি নাই।

ভজন দু-হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে কি একটা বলতে গেল, কিন্তু মহিমের দিকে তাকিয়ে মুহূর্ত স্তব্ধ রইল সে। ঘরের আর সবাই ভজনের গোঁয়ারপনার কথা স্মরণ করে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। না জানি ভজন কিছু ঘটিয়ে বসে।

হাত জোড় করে মহিম বলল, ঠিকই বলেছেন দাদা, চাষীর পেন্নাম চাষী নেয়, মোর তো অপরাধ নাই। এট্টু ঠাঁই দেন মোরে বসবার।

সকলেই জায়গা দেবার আগ্রহে নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ভজন মহিমের জোড় হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে নিল। বলল, বস বস ভাই, মোর ভুল হইছে। মানুষ তো বাঁশের ঝাড় নয়। মানুষ—মানুষই।

মহিম ছাড়ল না। ভজনকে আরও খানিক যাচাই করে নেওয়ার জন্যই বলল, চাষীর ছেলের মূর্তি গড়া কি অপরাধ দাদা? মাঠে লাঙল দেওয়া ছাড়া চাষীর ছেলে কি আর কিছু করবে না কোন দিন? মেলা লেখাপড়া শিখি নাই, কিন্তু যা করছি মোর সে সাধনা কি অন্যায়? আমি কি চাষীকুলের কলঙ্ক?

ভজন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছি, ছি, সে কি কথা ভাই? তোমার নাম যে ঘরে ঘরে।

মহিম বলল, মোর কাজ দশজনার। আপনাদের জন্য আমি কাজ

করতে চাই। বোঝা গেল ঘরের সকলেই তুষ্ট হয়েছে তার কথায়। দয়াল কামার উঠে এসে মহিমের মাথায় হাত দিয়ে বলল, মুই আশীর্বাদ করছি, তুমি আরও উন্নতি কর বাবা, বেঁচে থাক। তুমি চাষীকুলের রত্ন।

সকলেই বলে উঠল নিশ্চয় নিশ্চয়।

রাজপুরের জহীর মিয়া বলে উঠল, নইলে বাপজান মোর এক কথায় জমিদারের কথায় পিতিবাদ করে আসল পিতিমে গড়তে পারবে না বলে!

শ্রদ্ধায় বিস্মিত সকলের চোখ গরীয়ান করে তুলল শিল্পীকে। মহিম বুঝল, এটা গাঁ-ঘরে ভরতের ঢাক-পেটানো রটনা। উঠে হাত জোড় করে বলল সে পিতিবাদ নয় জহীর চাচা। যা মোর মন চায় না, তা আমি অস্বীকার করছি।

সেই হইব বাপজান, সেই হইব। সে হিম্মতই বা ক'জনার আছে।

কথাটা দয়ালের ছেলের গায়ে লাগল। সে ফুঁসে উঠল, আছে। আছে বলেই আজ হরেরামদার ভিটেয় সব একত্র হইছি।

জহীর হেসে বলল, কথাটা মোর ভুল বুইঝ না কামারের পো। জমিদারের সোহাগ আর চাঁদির লোভ সামলানো বড় চাট্টিখানি কথা লয়, বুঝলা? বাপজান মোদের সে পথ মাড়িয়ে দিয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা টিকটিকির টিক টিক শব্দের সঙ্গে একত্রে কয়েকজন মাটিতে টোকা দিয়ে বলে উঠল, সত্য সত্য সত্য।

অদৃশ্য টিকটিকির এ দৈব ঘোষণা যেন সমস্ত সত্যকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে গেল। এ ঘরের সমস্ত মানুষগুলোর কাছে ওই জীবটি ঈশ্বরের প্রতিনিধির মতনই।

মহেশ মালা বলল, আর তো দেরি করা যায় না হরেরাম, বেলা যে গড়ায় ওদিকে।

মহিম বলল, মোরে কি থাকতে হইবে হরেরামদা?

হরেরাম বলল, তা তো হইবেই ভাই। সকলের কাজ, সকলের কথা। জোড়া জোড়া মহকুমার চাষী-মুনীষরা আজ একটা পিতিবিধেন

করতে বসছে। তোমার কথা তোমারে বলতে লাগবে না? কেন, শরীলটা কি বেগতিক বোঝ?

শরীল না, মনটার বড় হুতাশ রইছে। কুঁজো মালা তার উপর গাঁ ছাড়া। সে বড় দুঃখু পেয়ে গেছে। যদি কিছু করে বসে—বলতে বলতে তার চোখ উঠল ছলছলিয়ে।

হরেরাম হেসে উঠল। ও হরি, এই কথা!

সকলেই প্রায় উঠল হেসে। দয়াল বলল, এরেই বলে পাগল। পাগলে পাগলে কেমন জোড় বাঁধে দেখছ তোমরা! তা মোদের জিজ্ঞেস করতে লাগে তো?

মহিমের চোখ যেন আলোর রেখা দেখা দিল, বলল, তা হইলে—

বাধা দিয়ে হরেরাম বলে উঠল, তোমার কানাইদা যে কাজে বার হইছে গো। তারে যে মোরা ন'হাট মহকুমায় পাঠাইছি।

বটে কুঁজো মালা গেছে কাজে? আর এরাই তাকে পাঠিয়েছে? হায়! মহিমের মনে হল কুঁজো কানাই বুঝি আজও তার কাছে তেমনি দুর্জ্ঞেয় রয়ে গেছে। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম কুঁজো কানাইয়ের উপর মহিমের একটু অভিমান হল। কই, কানাইদা তো তাকে কিছু বলে যায় নি!

একটি নিঃশ্বাস ফেলে সে ভাবল, যাক। প্রাণটা তবু আশ্বস্ত হল। হরেরাম প্রথমে কাজের কথা শুরু করল। তার আগেই পিছনের দিকে অল্পবয়স্ক কয়েকজন যোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল সে, তোমরা এবার হাসি কথায় একটু চুপ দেও ভাই। তারপর অখিল চাষীকে বলল, অখিলদা, ধার দেনা কি তোমার কিছু কম আছে যে, মাটিতে দাগ কাটতেছ?

অখিলের এটা অভ্যাস। বসলে নানান রকম দাগ কাটা। সে লজ্জায় হেসে হাত গুটিয়ে নিল। প্রচলিত প্রবাদ মাটিতে দাগ কাটলে নাকি দেনা হয়।

পেছনের যোয়ানের দল হেসে উঠল। ভজনের পাশে বসে মহিমও মুখ টিপল। দেখল হরেরামের গাম্ভীর্যের আড়ালে ঠোঁটে রয়েছে

চোরা হাসি।

ঘরটা মানুষে আর তামাকে ধোঁয়ায় ভরপুর। সকলেই নীরব।

হরেরাম বলল, কুঁজো মালা আজই কি-বা আসবে, না, হাট মহকুমা অরাজী হইবে না। শোনেন দাদাভাই দশজনায়, নিজে না চষে, পরকে দিয়ে চাষ করার এমন মানুষও যখন এখানে আসছেন, তখন মনে লয় মোদের বেগার বন্ধের লড়ায়ে জয় হইবে।

পেছনের যোয়ানের দল থেকে হঠাৎ একজন উঠে বলল, পাগলা বামুন না আসলেই শুরু করলা যে?

হরেরাম বলল, পাগলা বামুন আসতে পারবে না, খবর দিছে। তবে সে যা যা বলে দিছে সব কথাই আপনারা শোনবেন।

বলে সে আরম্ভ করল, 'জমিদারে ফাঁকি দিচ্ছে এ্যাদ্দিন সরকারের খাজনা। সে ফাঁক ধরা প'ড়ে জমিদার তার দেনা শুধতে চায় মোদের মাথা কেটে। কথা নাই বাত্তা নাই, হুট বলতে খাজনা বেড়ে গেল, কিন্তুক মোরা কেন তা দিব? এ বাড়তি খাজনা না দিলে জমিদার হুজ্জোৎ করবে। করুক, মোরা তবু মানব না। তা ছাড়া, জমিদারে আজকাল আমাদের হাত থেকে জমি নিয়ে একুনে হাজার হাজার বিঘা অন্য লোকের হাতে তুলে দিচ্ছে। চাষ-জমির খাজনার বিধেন তার আলাদা। তার ফলে আমরা উচ্ছেদ হইলাম। এই জমিদারে আর মালিকে মিলে যা শুরু করেছে তার এট্টা পিতিবিধেন না করলে মোদের কম্মো সারা। বলে সে, এমন কি শত শত বছরের পুরনো প্রথা, ঈশ্বরের বিধানরূপে যা সকলের মনে শিকড় গেড়ে বসেছিল, সেই শিকড়ে টান পড়তে অনেকে কিছুটা সংশয়ান্বিত হয়ে উঠল। কিন্তু হরেরামের অকাট্য যুক্তি ও উদাহরণ সাপের মত কুটিল এই অবুঝ সংশয়ের মাথা দিল নত করে। এই চাপানো বিধানের প্রতিরোধের নীতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা করে গেল, কথায় কথায় অভিমত চাইল সকলের। সম্মতি পেল, প্রতিজ্ঞা শুনল, পেল আশা ও উৎসাহ। সগৌরবে জানিয়ে দিল, আর নয়নপুরই প্রথম শুরু করবে তিনটি মহকুমার মধ্যে। এবারকার হেমন্ত নয়নপুরের বুকে নতুন চেহারায়

পদক্ষেপ করবে, নতুন তার স্বাদ গন্ধ। শুধু তাই নয়, আগামী বছরে এই সূত্র ধরেই আসবে ভাগচাষীর ভাগের লড়াই, সেকথাও ঘোষণা করা হল।

ভজন দেখল, মহিমের চোখ দুটো যেন মোটা সল্‌তের প্রদীপের মত জ্বলছে।

জ্বলবে না! তার মনে পড়ছে একটি উজ্জ্বল মুখ, একটি আবেগ-দীপ্ত কণ্ঠ। লক্ষ গ্রামের এ অনাগত গৌরবের কাহিনী একদিন সেই কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। নয়নপুরের খালের জলে জোয়ার আসার মত প্লাবিত করেছিল তার অন্তর। কিন্তু ভাটা আসতে দেরি হয়নি। আজ আবার জোয়ার এসেছে। কিশোরের সেই কানে শোনা কথা আজ চলেছে কাজে হতে। আর শুনেছিল, শিল্পসাধনা আপসের পথ ধরবে যদি না তুমি এ মানুষের বাঁচার তাগিদে ভাস।

সে কণ্ঠ, সে মুখ পাগলা গৌরাঙ্গের। বুঝল সে মানুষটি তার কাজ করে চলেছে অহর্নিশ। কোন কিছুই তাকে দমাতে পারেনি। আর এই প্রথম সে অনুভব করল,গাঁয়ের সমস্ত কিছু থেকে সে কতখানি দূরে। মূর্তি গড়ায় কাজের মাঝে সে সবাইকে সবরকমে ভুলে বসে আছে, অথচ তার খবর এরা সবাই রাখে সবটুকু। ভরত হয়তো একথা জানে, কিন্তু তার স্বার্থ থাকলেও দায়ে পড়েই বোধ হয় নীরব। মহিম কাজের ফাঁকে অনেকের সঙ্গে মেশে, কিন্তু গাঁয়ে ঘরে সে দিনে দিনে কত কাণ্ড ঘটছে, সে কথা কেউ তাকে বলেনি, জেনে নেয়নি সেও কারুর কাছ থেকে। মনে হল, সে যেন বহুদিন পরে হঠাৎ দেশে ফিরে এসেছে, এসেছে আপন মানুষদের কাছে। আর এই হরেরামদা! নিজের উপর শুধু ধিক্কার নয়, বুকটা ভরে উঠল মহিমের। নয়নপুরের চাষী মনিষ্যিরা আজ সকলেই নিধনের জাগ্রত শিব। সমাহত, ক্রুদ্ধ। চোখে চোখে আগুন, সে আগুন ছড়িয়ে পড়ল মহিমের বুকে।

ঘরের মধ্যে তখন নানান জনে নানান কথা বলছে। মহিম এগিয়ে গেল হরেরামের কাছে। বলল স্বপন দেখছিলাম হরেরামদা, কথা শুনছি অনেক কিন্তু এ মনটার ছিরিছাঁদ নাই, তাই চোখ পথ দেখতে

পায় না সব সময়। মোর কি কোন আলাদা কাজ নাই?

নাই কেন? হরেরাম বলল, ধম্মোঘটের পূজো দেব মোরা, তোমারে তৈরি করতে হইবে সেই ঘট আর ধম্মোদেবের মূর্তি। তোমার মনের মত বানাবে।

কে একজন হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল:

নতুন কন্যের গর্ভে সন্তান
ঢ্যালামাটি মাঠে ধান,
অনাবিষ্টির আকাশে জল;
দিন কখনো সমান যাহে না,
(ও) তোমার গত বিধেন না ভাঙ্গিলে
নতুন বিধেন হবে।
জোর হাতে বলি একবার কর পিনিধান।

পথ চলতে চলতে মহিমের মনে সেই অতীতের পাগলা গৌরাঙ্গের কথাগুলো গুন গুন করতে লাগল। সেই কথার পাশাপাশি অহল্যার কথাগুলোও মনে পড়ল তার। মোর ভাবনার অন্ত নাই তোমারে নিয়া। কেবলি ডর লাগে মোদের ছেড়ে চলে যাবে তুমি, এ গা-ঘরের আপনজন বুঝি তোমার পর। এ কথার সঙ্গে পাগলা বামুনের ফারাক কোথায়, বিচার-কষা মন মহিমের খুঁজে পায় না তা। অথচ কি ছিষ্টি-ছাড়া রাগে ও ত্রাসে বউদি বলে তার, পাগলা বামুন তোমারে কেড়ে নিতে চায় পর করবে বলে।

না। অহল্যা বউয়ের একথা ভুল। ভুল মনে হতেই তার প্রাণে নতুন আকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধল—তার জীবনের একই নির্ঝর থেকে বয়ে-চলা এই ধারা দুটিকে একত্র করতে হবে।

॥ ১১ ॥

আকাশে ঘন মেঘের ভিড় দক্ষিণ থেকে পাড়ি জমিয়েছে উত্তরে। আকাশে তাকিয়ে মনে হয়, বুঝি ভূমণ্ডলই চলেছে দক্ষিণদিকে। হালকা

হাওয়ায় শীতের আভাস। দিবাগতিকে আপনা থেকেই মনে হয় গা যেন ম্যাজ্‌মেজে লাগছে। এ ঘোর কাটলেই বোধ হয় হেমন্তের উজ্জ্বল আকাশ দেখা দেবে।

আখড়া থেকে খোল করতাল সহযোগে নসিরামের বৃদ্ধগলার গান শোনা যাচ্ছে ঃ 'প্রাণ ভরিয়ে প্রাণনাথ তোমায় ডাকি হে, প্রাণে আশা, প্রাণে আমার তোমায় পাব হে।' মাঝে মাঝে সেই গলাকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রাণেশের মোটা গলা, পাব হে, পাব হে। পাব হে কথাটা যেন তার গলায় জেদের মত শোনাচ্ছে।

আগল ঠেলে বনলতা ঢুকল গোবিন্দের বাড়িতে। ডাকল, পিসি!

সাড়া না পেয়ে গোবিন্দর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল সে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ! গোবিন্দর দরজা বন্ধ। এত বড় ব্যতিক্রম আর কোনদিন চোখে পড়েনি বনলতার। সামান্য অসুখে বিসুখে তো কখনো সাধুর দরজা বন্ধ দেখা যায়নি। তবে কি কোন ভারী ব্যামো হল তার?

ভাবতেই বনলতার বুকের মধ্যে শংকায় ভরে উঠল। সে দাওয়ায় উঠে ডাকল, সাধু, সাধু ঘরে আছ।

জবাব পেল না। তাকিয়ে দেখল, পিসির ঘরের দরজায় শিকল তোলা। গোবিন্দর দরজায় সামান্য ঘা দিতেই দরজা খুলে গেল। দেখল, গোবিন্দ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়! বাসি বিছানা কেমন যেন বড় বেশি দোমড়ানো এলোমেলো। ঘুম, না, অচৈতন্য গোবিন্দ? কাছে গিয়ে বনলতা ডাকল, সাধু, সাধু।

গোবিন্দ নিশ্চুপ নিথর।

এবার অসহ্য উৎকণ্ঠায় বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল বনলতার, সে গায়ে হাত দিয়ে ডাকল গোবিন্দকে। সাধু, কি হইছে? বেলা যে পোহর গড়ায়।

একটা বিরক্তির শব্দ করে গোবিন্দ উঠে সরে বসল। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে সাধুর! আচমকা ভয়ে ও বিস্ময়ে বনলতার প্রাণ কেঁপে উঠল। চোখ লাল, গাল বসা। সমস্ত মুখে একটা যন্ত্রণার

চাপা আভাস। কেন ? জিজ্ঞেস করল সে, কি হইছে তোমার সাধু ? অসুখ বিসুখ করল নাকি ?

বনলতার আকুল মুখের দিখে তাকিয়ে মুহূর্ত স্তব্ধ রইল গোবিন্দ। এই দুর্জয় বৈরাগীর মেয়েটির চোখ রুদ্ধ দুষ্টামির আভাস পেলে সাধক মন খুলে তবু যা খুশি তাই বলতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তেই এই সুরটি তাকে বড় থমকে দেয়। সে অস্বস্তি বোধ করে এই ভেবে যে, এ বুঝি দামাল মেয়েটার নতুন কোন কিছু ঘটানোর ভূমিকা। যত ভাবে মন কষে গোবিন্দ। বলল, কিছু হয় নাই মোর। কিন্তু তুই এই সাত সকালে এখেনে কেন ?

মুখের অন্ধকার ঘুচল না বনলতার। বলল, তোমার 'কেন' শুনলে মোর গা জ্বালা করে সাধু! কি হইছে কও। শরীর কি খারাপ করছে ?'

গোবিন্দ বলল, না।

কিন্তু কি এক গভীর দুশ্চিন্তা যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে গোবিন্দকে। মুহূর্তে চোখের দৃষ্টি অন্তরাবদ্ধ হয়ে উঠল, বুঝি ভুলেই গেল বনলতার কথা। তার শান্ত সাধক জীবনের কোথায় যেন একটা অশান্তির দুর্ঘটনা ঘটে গেছে! মনটাকে তার দু-হাত বেড় দিয়ে রেখেছে যেন এক গভীর সমস্যা—যা নাকি তার দৈনন্দিন জীবনে এনে দিয়েছে ব্যতিক্রম।

এ ব্যতিক্রম ও অশান্তির ধোঁয়া যে বনলতার নিঃশ্বাস আটকায় তা বোধ হয় গোবিন্দ জানে না। বনলতা বলল, কোন কিছুর মধ্যে নাই, তোমার আবার এত ভাবনা কিসের ?

অর্থাৎ গোবিন্দ এ সংসারের বাইরে, জীবন তার ভাবনাহীন। খোঁচাটা তার দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মগজে বাজল বড় রূঢ়ভাবে। বুঝল, তার চিন্তার কাজের কোন মূল্য নেই এদের কাছে। বলল, তোর কি কোন কাজ নেই ঘরে আখড়ায় ?

চোরা হাসি ফুটল বনলতার ঠোঁটে। ভ্রূ তুলে বলল নাই আবার ? কত কাজ। শেষ নাই তার। হাসিটুকু চোখে না পড়লেও মনের হাসির

আঁচ পায় গোবিন্দ। বলল, তবে মোর ঘরে কেন তুই?

মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করল বনলতা। চেষ্টা করল গম্ভীর গলায় বলতে, তাই তো বলি তোমার ওই কেন শুনলে গা জ্বলে মোর। ঘর আখড়া মোর এইটাই।

স্তম্ভিত হল গোবিন্দ। তার দিকে মুখ ফেরাতেই ত্রাস ফোটে গোবিন্দের চোখে। বনলতার গায়ে জামা নেই, শাড়িতে ঢাকা। তবু গোবিন্দের মনে হল তার বলিষ্ঠ উদ্ধত যৌবন যেন সব টুকুই উন্মুক্ত, সুস্পষ্ট। যেন তার ভারে আর সমস্ত কিছুকে সে দলে দিয়ে যাবে। চন্দন কাঠের কণ্ঠি তার শ্যামল নিটোল গলার হার মানিয়েছে সোনার হারকে। তার চোখ মুখের এই বিচিত্র নাম-না জানা হাসি, আর সাংঘাতিক নির্লজ্জ উক্তি, সব মিলিয়ে গোবিন্দের গভীর দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মনে নতুন বিপর্যয় সৃষ্টি উপক্রম করল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, কুকথা বলতে কি তোর বাধে না বনলতা?

মোর কথা কুকথা, তোমারই সব সুকথা বুঝিন্?

তোর কথা মেয়েমানুষের মুখে শোভা পায় না।

কেন কও তো? সত্য কথা বলে?

ছিঃ! সত্য নিয়া খেলা করিস না।

সাধু, সে খেলা কর তুমি। মিছের কারবারে সাধ ছিল না কভু, আজও নাই।

গোবিন্দ আজ উত্তেজিত হল আরও বেশি। বনলতার কথা বুদ্ধি এতখানি আর কোনদিন বাজেনি তার। বলল, সত্য নিয়া খেলা করি আমি?

নয়? বনলতার কথার ধার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বলল, মোর কথা মেয়ে মানুষের মুখে শোভা পায় না, তুমি মোরে গালি দিলে! তোমার কথা কি পুরুষের মুখে শোভা বাড়াইছে?

বনলতার এ কণ্ঠ ও মূর্তি এতখানি চমকপ্রদ যে গোবিন্দ তার নিজের উপর মিথ্যা দোষারোপের কথা ভুলে বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল।

বনলতা আবার বলল, মোর কথা মেয়েমানুষের নয়, মুই নই

মেয়েমানুষ। তবে বলি, তোমার এ ভগবানের পিথিমিতে পুরুষ নাই, নাই, নাই!

সমস্ত ব্যাপারটাই অবুঝ ও অভাবনীয়। তাড়াতাড়ি এটাকে চাপা দেওয়ার জন্য গোবিন্দ ডাকল, লতা!

হ্যাঁ, ওই মোর নাম। রাতবিরেতে লোকে নাগিনীর নাম করে না, বলে লতা। তুমি মোরে তাই ভাব।

গোবিন্দ অসহায়ের মত বলে উঠল, থাম্, থাম্, বনলতা! কাল পাগলা বামুন বুকটারে মোর টুণ্ডা করে দিছে। আজ আর মুই সইতে পারছি না কিছু।

বনলতা থামল, কিন্তু দারুণ কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল তার শরীর, বিশাল তরঙ্গের মত বুক দুলে উঠল। বার বার মরণ কামনা করল সে। সে কান্না আর কামনা বুঝি থামতে নেই কোনদিন। এ পোড়া দেহ ও মনের দৌরাত্ম্য আর সয় না।

পরমুহূর্তেই লজ্জায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেল তার। কই, এমন করে তো সাধুকে সে বলেনি কখনও, ভাবেনি কোনদিন! ছি, এ মুখ বুঝি আর দেখান যাবে না সাধুকে। তাড়াতাড়ি কাপড় গুছিয়ে ঘোমটা টেনে বনলতা উঠে দাঁড়াল। বলল অন্যদিকে মুখ করে, মুই অভাগিনী, মোর কথায় কান দিও না। পাগলা বামুন তোমারে দুঃখ দিছে, তোমার যাতনা দেখেই তো চুপ থাকতে পারি নাই। তুমি মোরে খেদাই দিলা।

বলতে বলতে তার গলায় আবার কথা আটকাল। গোবিন্দ স্তব্ধ। একবার প্রতিবাদ করতে চাইল বনলতার কথার। কিন্তু বাধা পেল। উঠোন থেকে নরহরির মিষ্টি আবেগমাখা গলা গুন্‌গুনিয়ে উঠল:

আমি অভাগিনী রাই,
কাঁদিয়া বেড়াই
কানু সঙ্গ আশে।
মজিয়ে কুলমান
সে তো পলাইছে

মোর হিদয় ভরিয়া বিষে।

বনলতা বেরিয়ে এল। চোখে তার তখনও জলের দাগ, মনের স্পষ্ট ছাপ মুখে। সেই মুখে ছড়িয়ে পড়ল নরহরির গানের সুর। বৈরাগী যেন তার অন্তর্যামী, কিছুতেই তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। নরহরির ঠোঁটে বেদনামুগ্ধ হাসি। বলল, তাই ভাবি, সই গেল কুনঠাঁই। চল বাইরে যাই।

বনলতা বাড়ির বাইরে এল। নরহরি বলল, তোমার চোখের জল যে শুকায় না সই। পরানটা খানিক কঠিন কর।

বনলতা বলল, পরান যে মোর বশ নয়।

কিন্তুক্ পরান বশ না হইলে আর যে বশ হইবে না।

তবে এ ছার পরান শেষ হউক।

ছি, বে-রীতির কথা বল না। পরান যে অনেক বড় বস্তু। চাই বললে আসে না, যাও বললে যায় না। তার একটা ধর্ম আছে তো?

তারপর ক্ষণিক নিশ্চুপ থেকে সে বলল, বাপ বলছিল তোমার, বেটি বড় মুষড়ে থাকে নরহরি, তোমার সঙ্গে যদি ভিক্ষায় বার হয় তো ওরে নিয়ে যেও।

যাবে সই?

কি আকুল আগ্রহই না ফুটে উঠল নরহরির জিজ্ঞাসু চোখ ছুটোতে। একটি জবাবের জন্য বুঝি তার সর্বাঙ্গই উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

এ হল দেশগাঁয়ের রীতি। বোষ্টম-বোষ্টমী গান গাইতে আসে। বাড়ির ভাল জায়গাটিতে ছুখানা আসন পেতে দেয়। তারা জগৎ ভুলে কৃষ্ণগাথা, বিরহ-মিলনের গানে গানে হাসিতে বেদনায় মানুষের মনকে ক্ষণিকের জন্য আতুর নিষ্কর্ম করে দিয়ে যায়।

আগে যেত বনলতা। আজকাল আর সচরাচর যায় না। নরহরিও ডাকে না বিশেষ।

বনলতা বলল, শরীর অবশ লাগে, তুমি যাও। তাছাড়া, সাধুর কি যেন হইছে।

নিমিষে নরহরির চোখের সমস্ত আলোটুকু নিভে গিয়ে অন্ধকার

চোখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, সে-ই ভাল সই। আমি যাই।

হন্ হন্ করে পথ চলে, তেপান্তরের বুকে একবার দাঁড়ায় নরহরি। একতারাটার তারে ঘা দেয় কয়েকবার। তারপর উজোন ফিরে চলে খালের মোহনার দিকে। সারা দিনমান আজ তার সেখানেই কাটবে, গান গাইবে। আর নির্জনে গান হবে তার স্বগতোক্তি।

॥ ১২ ॥

বনলতা চলে যাওয়ার পর ক্ষণিক বিমূঢ় বসে রইল গোবিন্দ। মহিম এল এই সময়। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি দুহাত বাড়িয়ে মহিমকে টেনে নিয়ে বলল, মহী আসছিস! এক্ষুনি ছুটতাম তোর কাছে।

কেন, কি হইল?

মুই কোন কিছুর দিশা পাই না মহী। জগৎ বড় বেতাল লাগে মোর কাছে।

মহিম দেখল, গোবিন্দর মুখে একটা দুশ্চিন্তা ও চাপা যন্ত্রণার ছাপ। দিশেহারা চোখ। বলল, রাতে ঘুমাস নাই নাকি?

ঘুম মোরে ত্যাগ দিছে—গোবিন্দ বলল—বুকে মোর পাষাণ। দুঃখ দিয়া কানাই মালারে গাঁ-ছাড়া করলাম।

মহী বলল, সেই নাকি তোর ভাবনা?

বলে সে কুঁজো-কানাই ও হরেরামের বাড়ির সমস্ত ঘটনা বলল গোবিন্দকে। আশা করেছিল, গোবিন্দের চোখেও আশা-আনন্দ ফুটে উঠবে তার মতো। কিন্তু অন্ধকার ঘুচল না তার মুখ থেকে। বলল, পাগলা বামুন মোর মাথায় বাজ ফেলেছে।

পাগলা বামুন? মহিম জিজ্ঞেস করল, কি হইছে?

গোবিন্দ বলল, মুই গেছলাম পাগল বামুনের কাছে কুঁজো-কানাইয়ের কথা বলতে। ভাবলাম, পাগলা বামুন এত কথা বলে। গাঁয়েঘরে জ্ঞানী বলে তার কত নাম। সে কি বুঝবে না কুঁজো

কানাইয়ের এ দুঃখের দায় মানুষের নয়, মানুষের হাত নাই এতে। কিন্তু···বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোবিন্দ। অসহায়, চিন্তাচ্ছন্ন।

মহিমের শোনবার আকাঙ্ক্ষা অদমনীয় হয়ে উঠল। যেন, এ প্রশ্নের জবাবটা তারই পাওনা। বলল, তারপর ?

পাগলা-বামুন দু-হাতে সাপটে ধরে আদর করে বসাল মোরে। বলল, গোবিন্, দুঃখ পাসনি। কুঁজো-কানাইয়ের ছিষ্টিকত্তা মানুষ, দায়টাও মানুষেরই। মুই ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে বললাম, মিছে বল না পাগল ঠাকুর, পাপ হবে। পাগলা বামুন হাসল। মহী, মিথ্যুক আর পাপী কখনও হাসতে পারে না অমন করে। এ আমি হলপ করে বলতে পারি। হেসে বলল, মোরা দৈব দুর্ঘটনা দেখে ভাবি কেমন করে ঘটল। উপায় না দেখে সেই এক নাড়ার মা ভাড়া ভগবানের দোহাই পেড়ে খালাস পাই। কিন্তু তাই কি ? না খুব সম্ভবত জন্মসময়টিতে কানাই কুঁজো হয়েছে, নয় তো মায়ের পেটে থাকতেই। হুতোশে মোর ঘাম ঝরল। বললাম, কেমন করে ? ঠাকুর বলল, সে যে অনেক কথা গোবিন্। তারপর খানিক কাদা-মাটির ড্যালা নিয়া আঙুলের ফুটো দিয়ে বার করে দিল, সোজা বার হইয়া আসল। আবার গলিয়ে আবার বার করল, দেখলাম বেঁকে গেছে। ঠাকুর বলল, দেখলি গোবিন, এই হইল কাণ্ড। মায়ের পেট থেকে কানাই প্রমাণ দরজা পায়নি। কুঁজো অর্থে, কানাইয়ের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে।

মোর পুরো পেত্যয় হইল, হায়, পাগলা বামুন সত্যি পাগল। কিন্তক্ অন্তর্যামীর মত বলল ঠাকুর, ভাবছিস বুঝি পাগলের কথা বলছি ? না রে, না। এ মোদের জীবনের অভিশাপ, অন্ধকারে মোদের বাস। দেখলাম, ঠাকুরের চোখে আলোয় আলো, যেন কোন্ জগতে চলে গেছে। বলল, কানাইয়ের মা যদি সেই দেশের মেয়ে হত যেখানে সন্তান প্রসবের সমস্ত বাধা উচ্ছন্নে গেছে, সেখানে কানাইয়ের জীবনে এ অভিশাপ নেমে আসিত না। নয়তো বলি, কানাইয়ের বাপ জবর অত্যাচার ছিল নিজের বৌয়ের উপর, গতিক

বোঝেনি। কিন্তু দোষ কার? কুঁজো কানাই এ অভিশাপের বোঝা কি একলা বইবে? না, মোদেরও বইতে হইবে, তেমন দেশটি মোদের বানাইতে হইবে? সেই বানানোর তাগিদ চাই, বাধা থাকলে তারে সরাইতে হইবে? গোবিন মানুষ হইয়া খামোকা ওই ভগবানের ঘাড়ে সব চাপিয়ে হাঁটু মুড়ে থাকিস না। শুনে বুকের মধ্যে মোর ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল। হায়, এ কি মানুষ, ভগবানের সব বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে প্রাচিত্তি করতে চায়। কিন্তু সে মুখের দিকে তাকিয়ে সাধ্যি কার বলে, তুমি মিছে বলছ। ঠাকুর যে কত কথা বলে গেল, আমি তার সব কথার মানে বোঝলাম না। আর বারবার বলল, দুঃখ পাসনি, মানুষের কুসংস্কার একটা সোনার শেকল। হোক্ শেকল, সোনার যে! যাদের চোখে সে সোনা চটে গেছে, তাদের ওই শেকল-টুকু ছাড়া সবই গেছে। তাই তারা আজ ঘোর বিবাদ লাগাইছে শেকল ভাঙবে বলে।

মুই আর থির থাকতে পারলাম না। বললাম ঠাকুর, বামুনের ছেলে ঈশ্বরে পেত্যয় নাই তোমার? আবার হাসল। মোরে উপহাস্য করে নয়, বড় দুঃখে। বলল, আমি তোর মনের উপর জুলুম করতে চাই না। মোর কথা যদি বলিস, তবে বলি, যা দেখতে পাই না, ছুঁতে পাই না, যার কোন হদিস্ই পাই না, তার কথা ভাবি না আমি। আমি সব কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তোর ঈশ্বরের সাধনা, তবু সে কিছু তো? বললাম, নিশ্চয়। বলল, একবার চোখ বুজে বল, সে কিছুটা কি?

আমি চোখ বুজে দেখলাম, কিছু পেলাম না। আবার বুজলাম, দেখলাম, ছাইভস্মমাখা বাবা শ্মশানে বাসে আছে। আবার বুজলাম, দেখলাম, রাজপুরের আচায্যি বসে বসে হাসছে। মোর মাথা ঘুরতে লাগল। বসে থাকতে পারলাম না। মোরে ধরে বসাল আবার, তারপর মানুষের জন্মের কথা শুরু করল পাগলা ঠাকুর। কিন্তুক্ মোর যেন কি হইল শুনতে শুনতে, দিশা রাখতে পারলাম না। ছুটে বার হইয়া আসলাম।

গোবিন্দ স্তব্ধ হল। বলতে বলতে তার সে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা

আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু মহিমেরও প্রাণটা এ ঘরে আছে বলে মনে হল না। চোখ দুটো তারও শূন্যে নিবদ্ধ অথচ অনুসন্ধিৎসু। সে অনুসন্ধান মনে মনে। গোবিন্দ দেখল, মহিমের চোখে আলোর ছড়াছড়ি, কি যেন সে খুঁজছে। কিন্তু তার চোখে জল জমে উঠল বড় বড় ফোঁটায়। মহিমের কাঁধে মাথা পেতে বলল, মহী, এ সব যদি সত্য হয়, তবে মোর বাপ জীবনভোর এ কি করল? সে কি সব মিছে?

মহিম তাড়াতাড়ি দু-হাতে গোবিন্দর মুখ তুলে ধরে বলল, সত্য-মিথ্যা তো বিচারের বিষয় গোবিন্ ভাই, তার জন্য তুই উতলা হইস কেন?

গোবিন্দ বলল, সেই তো হইল গেরো। ছুটে গেলাম রাজপুরে আচায্যির কাছে, বললাম সব। তিনি তখন খাওয়ায় ব্যস্ত। বললেন, কাল আইস, জবাব দেব। কিন্তু পাগলা ঠাকুরকে কেবলি গালাগাল দিতে লাগল। সে মোর সইল না। বড় খারাপ লাগল আচায্যিকে। চলে আসলাম।

মহিম বলল, বেশ তো, এর সন্ধান তো মস্ত বড় কাজ গোবিন ভাই। সকলের কথা শোন তুই। বলল, কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝল পাগলা বামুন কোথায় যেন গোবিনের মনে এক মস্ত ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। অপরের মনে হয়তো লাগত না এত, গোবিন বলেই এতখানি লেগেছে। কেন না, তার ধর্মবিশ্বাস তো আর দশজনের মত নয় সে যে তার জীবনের আর সব কিছুকে অন্ধকারে রেখে দিয়ে একটা শক্ত বেড়ার মধ্যে আটক রেখে দিয়েছে।

গোবিন্দ চোখের জল মুছে বলল, মহী, বাবার সব যদি মিছে, তবে মোর মায়ের দুঃখ বুঝি বুকের রক্ত দিয়েও শোধ করা যাবে না। মাকে মোর সবাই মিলে মেরে ফেল্ছি।

উঠোন থেকে পিসির গলা শোনা গেল। গোবিন্ আছিস রে, গোবিন্! পর মুহূর্তেই গলার স্বর রুক্ষ হয়ে উঠল। তুই ওখানে কি করছিস্ লা?

মুহূর্ত নীরব।

গোবিন্দ মহিম বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলদরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বনলতা, খানিকটা অপ্রতিভ ভাবে। চকিতে সেটুকু কাটিয়ে সে বলল, মহীরে ডাকতে আসছি।

সেই মুহূর্তেই সকলের চোখে পড়ল, পিসির সঙ্গে একটি ফুটফুটে শাড়িপরা ছোট্ট মেয়েকে। নাকে নোলক, পায়ে মল। বিস্ময়াম্বিত দুটো বড় চোখ। যেন জন্ম অবধি বিশ্ব দেখা হয়নি তার। আর এক মাথা ঝাঁপানো কালো চুল।

মহিম জিজ্ঞেস করল, পিসি, ও কে?

পিসি সে কথার জবাব না দিয়ে বলল ভারী তুষ্ট হয়েছে, মাকে মোর এ উঠোনটিতে কেমন মানিয়েছে দেখ দিকিনি, যেন সাক্ষাৎ নক্ষ্মী। পর মুহুর্তেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছলছল চোখে বলল, পরের মেয়ে দু-দিনের জন্য নিয়ে আসলাম বেড়াতে। চেরদিনের জন্য ঘরে তোলা যাবে কি?

মহিম তাকাল বনলতার দিকে, বনলতা তাকাল গোবিন্দের দিকে। গোবিন্দের চোখ আর মন তখন এখানে নেই, এ জগতেই কি না সন্দেহ।

বনলতার নিঃশ্বাস পড়ল একটা। তা স্বস্তির না সুখের সে-ই জানে।

সবাইকে এ রকম নির্বাক দেখে পিসি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ঠ হয়ে মেয়েটির হাত টান দিয়ে বলল, আয় তো মা, মোর ঘরে উঠে আয় তুই।

পিসির নবীনা কিশোরীর চোখে চাপা সংশয় ও অস্বস্তি দেখা গেল। গোবিন্দর দাওয়ায় মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তার চোখ যেন বলল, মোর পানে তাকিয়ে! কিন্তুক্ হাসো না কেন তোমরা?

॥ ১৩ ॥

ভর দুপুরবেলা পরান এল মহিমকে ডাকতে।

অহল্যা খাওয়ার শেষে এঁটো থালা-বাসন নিয়ে ডোবার দিকে যাচ্ছিল। পরানকে দেখে ঘোমটাটা একটু বাঁ হাতে টেনে দিয়ে বলল, পরানদা যে!

পরান বলল, হ্যাঁ, আসলাম তোমার দেওররে ডাকতে। মহী কুনঠাঁই!

ঘরে আছে। কে ডাকল, কত্তা নাকি?

না। ছেলের বউ।

অহল্যা পরানের দিকে তাকাল। পরানও তাকিয়ে হেসে বলল, তোমাদের মত তো নয়, শহুরে বউ। বাপ তার একেবারে সাহেব। দেখ নাই কভু ছেলের বউকে?

অহল্যা বলল, দেখছি। তা, বউ ডাকল যে?

সে কথা মুই জানব কি করে বল? হয় তো ফরমাস আছে কিছু। বলেই পরানের মুখে এক গাল হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমার দেওর ছাওয়ালটি বড় সোজা নয় বউ। দেখলাম তো সেদিন তারে টলানো বড় কঠিন। ফরমাস মত কাজ সে করবে না।

অহল্যা নীরব রইল!

মহিম বেরিয়ে এল কাদামাটি হাতে। কি খবর পরানদা?

একবার যেতে হবে ভাই, বউমা ডাকছে তোমারে।

অহল্যা তাকিয়েছিল মহিমের মুখের দিকে। মহিম ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, চল যাই। তারপর অহল্যাকে বলল, তা হইলে একবার ঘুরে আসি বউদি।

অহল্যা বলল, যাও। দেখো আবার খুঁজতে পাঠাতে না হয়। এবং তার চোরা হাসিটুকু মহিমের চোখ এড়াল না।

মহিম সেদিনের অন্ধকারের যমদূতের মত ইমারতের মধ্যে আজ দিনের বেলা ঢুকল পরানের সঙ্গে। সেদিন মনে করেছিল রাত্রের রূপের সঙ্গে দিনের তফাৎ থাকবে। কিন্তু না। কেমন যেন একটা তমসাচ্ছন্নভাব নিয়তই এখানে বিরাজ করছে। নিস্তব্ধ, খাঁ খাঁ। প্রথম মহলের সব দরজাগুলোই বন্ধ। দ্বিতীয় মহলের অবস্থাও তাই। তবে সব বন্ধ নয়।

পরান হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। বলল, দাঁড়াও একটু, আসছি।

এ মহলের চত্বরে হাওয়া বয়ে যায় না। ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে যায় আবার। আর এক বিচিত্র শব্দ তুলে দিয়ে যায়! সে হাওয়া দেয়ালে খিলানে থামে আঘাত লেগে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত হাহাকার শব্দ তোলে।

মহিমের মনে হল, এতবড় প্রাসাদ, কিন্তু কি সাংঘাতিক নীরব। আর যেন প্রতিটি বন্ধ দরজা-জানালার আড়ালে আড়ালে জোড়া জোড়া চোখ উঠোনের মাঝখানে তাকে উগ্র চোরা দৃষ্টিতে দেখছে। সে তাড়াতাড়ি খোলা আকাশের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে দেখল, সেই একেবারে উঁচু আল্‌সে থেকে একরাশ দীর্ঘ চুল এলিয়ে ঝুলে রয়েছে।

কে ওখানে, কার ওই চুল? মহিম চোখ নামাতে পারল না, তাকিয়ে থাকতেও তার বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে এল। এখনি কি চলে যাওয়া যায় না এখান থেকে। পরানদা আসে না কেন হঠাৎ চুল নড়ে উঠল আর আলসের মাথায় একখানি মুখ উঁকি মারল। সে মুখের বিশাল দুই চোখের খরদৃষ্টি তারই দিকে। পরমুহূর্তেই সেদিনের মত নারীকণ্ঠের খিল খিল চাপা হাসি শুনে তার কানের পাশ দিয়ে শিরদাঁড়া পর্যন্ত কি একটা সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেল।

পরান এসে ডাকল, কই, আস। কিন্তু মহিমকে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পরান হঠাৎ বজ্র ফাটানো গলায় একটা চীৎকার করে উঠতেই হাসি থেমে গেল। সেই মুখ ও চুলও হল অদৃশ্য।

মহিম এসে জিজ্ঞাসু চোখে পরানের দিকে তাকাল। পরান শান্ত গলায় বলল, 'পাগল একটা! আস, বউমা এসে বসে আছে।' বলে তার মুখের ভাবটা এমনই হয়ে উঠল যে, মহিমের মনে হল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন এখানে নিরর্থক।

সেদিন হেমবাবু যে ঘরে বসেছিলেন, সেই ঘরের ভিতর দিয়েই পরান মহিমকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল। মহিম আশ্চর্য হল ঘরে এত আলোর ছড়াছড়ি দেখে। অথচ বাইরে থেকে মনে হয়, এ প্রাসাদের ঘর বুঝি সব অন্ধকার।

উমার ঘরে মহিমকে পৌঁছে দিয়ে পরান অদৃশ্য হল। একটা অদ্ভুত সুগন্ধ মহিমের নাসারন্ধ্র আচ্ছন্ন করে দিল। এ ঘরটিও আসবাব-পত্র সব কিছুই হেমবাবুর ঘরের সঙ্গে মূলত তফাৎ। দুটি মস্ত বড় জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দিগন্তবিসারী মাঠ, খাল, ওপার, রাজপুরের সুস্পষ্ট রেখা। আর জানালা যে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়, তা বুঝি আগে কখনও জানত না মহিম।

মস্তবড় খাটের শিয়রের দিকে রেলিং-এ কারুকার্য খচিত কাঠের ফ্রেমে যুগল দম্পতির ফটো। একজন উমা, পুরুষটি হেমবাবুর ছেলে হিরণ। আরও নানান্ রকম মস্ত বড় বড় ছবি দেয়ালে রয়েছে। কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ রাইফেল হাতে, মাথায় পাগড়ি, বিচিত্র টুপি নানান্ রকম। তার মধ্যে নবাব সিরাজদ্দৌলার চিত্রটিই মহিমের চোখে একমাত্র পরিচিত মনে হল।

উমা এমনটিই আশা করেছিল মহিমের কাছ থেকে, এই বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি। কিন্তু শিল্পী তো তার দিকে একবারও তাকাল না। এ রুচি-বোধের যে অধিকারিণী, ওই দৃষ্টি কি তারও প্রাপ্য নয়? ভাবল, এ হল নয়নপুরের চাষীর ছেলের সঙ্কোচ! কিন্তু সে একবারও এই শিশু-শিল্পীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারল না। শিশু, একেবারেই শিশু! ওর চোখেও শিশুরই অতল রহস্য গভীর দৃষ্টি। ঘাড় অবধি বেয়ে পড়া কোঁচকানো চুলের এখানে-ওখানে কাদামাটির দাগ। পরনে একখানি ফতুয়া, মাটির দাগে ভরা ছোট ধুতি। শ্যামল নরম মিষ্টি শিল্পী। এক

বিচিত্র রঙের আঁচ লাগিয়ে দিয়েছে শহুরে অভিজাত ঘরের বিদুষী উমার মনে। তবু ওর ঋজু শিরদাঁড়াটা চোখে যেন বড় লাগে! খাড়া, কঠিন, যেন নমনীয় হতে সে জানে না।

উমা বলল, বস!

সম্বোধন শুনে চম্‌কে ফিরল মহিম। সেই বঙ্কিম ঠোঁট, তবু মমতার আভাস, আবেগদীপ্ত চোখ, অনাড়ম্বর বেশ।

উমাও বুঝল, সম্বোধনে চমক লেগেছে মহিমের। হেসে বলল, তোমাকে 'তুমি' বললাম জমিদারের ছেলের বউ বলে নয়। এত ছেলে-মানুষ মনে হয়, কিছুতেই আপনি বলতে ইচ্ছে করে না।'

উমার চোখ দেখে সে কথা বিশ্বাস করল মহিম। সে প্রণাম করতে গেল উমাকে। কিন্তু আজ আবার উমা দু-হাতে তার হাত ধরে ফেলল। বলল, ছি, বারেবারে পায়ে হাত দিও না। আমি তো তা বলে তোমার বড় নই।

মহিমের বিস্ময় বেড়েই উঠল। অথচ সেদিন বিদায়ের সময়ে নিঃসঙ্কোচে উমা প্রণাম গ্রহণ করেছিল। সেটা ভেবেই উমা বলল, সেদিন তুমি দুঃখ পাবে ভেবে আর বাধা দিইনি। বস।

কিন্তু সে বলতে পারল না, সেদিন তার মনে এক বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠেছিল শিল্পীর হাতের স্পর্শ তার পায়ে লাগার জন্য।

এ ঘরে খদ্দরের কোন চিহ্ন নেই। মহিম বসল একটি সোফায় সঙ্কোচ আর অত্যন্ত লজ্জায়। উমা তার খুব কাছেই একটি সোফায় বসে বলল, তোমার কথা সব আমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে লিখে দিয়েছি। তোমার কলকাতার কাজের কিছু চিহ্ন আমাদের বাড়িতেও আছে। আমার ভাইবোনেরা তো সবাই তোমাকে দেখতে চেয়েছে।

মহিমের চোখে বিস্মিত আনন্দ লক্ষ্য করে উমার চোখেও খুশি ঝলকে উঠল। অভিমানের সুরে বলল, আমার শ্বশুর পূজোয় যেতে দিলেন না আমাকে। নইলে আমরা সকলে বিদেশ বেড়াতে যেতাম।

তবে পুজোর পর নিশ্চয় যাব। তোমাকে নিয়ে গেলে ওরা ভারী খুশি হবে। বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে আমার যে-বোন থাকে, সে তো লাফাবে। হঠাৎ একটু থেমে মুখ টিপে হাসল উমা। তার সপ্রতিভ মুখে একটা লজ্জার আভাস দেখা দিল। বলল, আমার সে বোনটি বড় ফাজিল। চিঠিতে লিখেছে, তোমার ওই নয়নপুরের শিল্পী আবিষ্কার তোমার জীবনে এক মহান কীর্তি। কামনা করি, শিল্পী যেন তার এ একান্ত ভক্তিমতীর প্রাণে আরও সাড়া জাগায়। তবে একলা নয়, ভাগ দিও।

না শোনালেও হয়ত চলত, কিন্তু একথাটুকু শোনানোর লোভ উমা কিছুতেই সম্বরণ করতে পারল না।

গুণমূল্য নিঃসন্দেহে কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় আনন্দে ও কৌতূহলে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সে। কথা বলতে পারল না। ভক্তিমতী কথাটি তার প্রাণে এক এক অনুভূতির সৃষ্টি করল আর কলকাতার এক আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে তার সম্পর্কে আলোচনা ও পত্র-বিনিময় গৌরবের নয় কি? তবু আরও কিছু ছিল উমার বোনের পত্রলেখায়, যে কথা উমা মুখে স্পষ্ট না বললেও এক অচেনা প্রতিক্রিয়া হল মহিমের মনে।

উমা তার লজ্জার ভাবটুকু কাটিয়ে খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গে বলল, সত্যি সকলে কি মনে করে জানিনে, কিন্তু এতখানি প্রতিভা নিয়ে তুমি নয়নপুরে পড়ে থাকবে, এ ভাবতে আমি কিছুতেই পারিনি। তুমিই বল, এতবড় দেশে সকলে তোমার কাজের পরিচয় পাবে একি তোমার কামনা নয়?

অন্যদিকে তাকিয়েছিল মহিম। বলল, এমন করে তো ভাবি নাই কোনদিন।

কিন্তু কেন ভাব না? কেমন যেন উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিল উমার মধ্যে। বলল, শুনেছি এ দেশে শিল্পীর দুঃখের শেষ নেই, তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ বন্ধ। এ আমি বিশ্বাস করিনি। প্রতিভাবান যে, তার মূল্য মানুষকে দিতেই হবে, কিন্তু শিল্পী নিজে তার পথ

করে না নেয় বা চেষ্টা না করে তাহলে কেমন করে তা বিকাশ পাবে? তোমার স্থান হল কলকাতা, তুমি পড়ে রইলে নয়নপুরে, তবে কেমন করে তুমি দশজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে? আমার কথাগুলো হয়তো তোমার ভাল লাগছে না, কিন্তু তুমি দেখ, যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সকলেই আজ রাজধানীর বুকে জমিয়ে বসে আছেন।

একেবারে অস্বীকার করার মত কথা নয় অথচ কি জবাব দিতে হবে একথা খুঁজে না পেয়ে অসহায়ের মত উমার দিকে তাকাল মহিম। একটু পরে বলল, মোরে কি করতে হইবে, বলেন ?

উমা তার আরও কাছে সরে এল। নিজের এই আবেগকে সে নিজেই বোধ হয় চেনে না। বলল, তুমি নয়নপুর ছেড়ে চল, চল কলকাতায়।

উমার নিজের কানেই কথাগুলো ভীষণ ঠেকল। কিন্তু নিজেকে সে কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারল না, চোখ ফেরাতে পারল না মহিমের উপর থেকে।

কিন্তু মহিমের বুকে যেন বাজ পড়ল। 'নয়নপুর ছেড়ে চল'— একথার চেয়ে নির্দয় বুঝি আর কিছু নেই। সে আবার অসহায়ের মত তাকাল উমার দিকে। সেই আবেগদীপ্ত চোখ, সেই বঙ্কিম ঠোঁটে মমতার আভাস শুধু নয়, আরও যেন কি রয়েছে। তার শরীর ঝুঁকে পড়েছে। আঁচল খসা, প্রশস্ত কাঁধ ও বুকের অনেকখানি জায়গা খোলা জামা। সুগঠিত বুকের মাঝখানে এক অন্ধ রহস্য উঁকি মারছে। হৃৎপিণ্ডের শব্দ বুঝি শোনা যায়। স্পন্দিত সোনার হার।

নয়নপুরের খাল থেকে মাঠের উপর দিয়ে হু হু করে দমকা হাওয়া ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। এলোমেলো করে দিল সব যেন মনটার মধ্যে।

মহিম মুখ ফিরিয়ে সমস্ত ঘরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, মোরে খানিক ভাবতে দেন।

প্রশান্ত হ'য়ে উঠল উমার মুখ। ঠিক হয়ে বসে বলল, রবীন্দ্রনাথের একখানি মূর্তি তোমাকে আমি গড়তে বলেছি। শান্তিনিকেতনে গেলে

তাঁকে দেখতে পাবে। তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করবেন।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাদের ঘরে এমন একটি ছেলে থাকলে তাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনতাম।

মহিম বলল, আমি তা হইলে যাই?

উমা সে কথার জবাব না দিয়ে বোধ হয় তার আবেগকে সংশোধন করার জন্য বলল, আমার কথাগুলো তোমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগল, না? আমার শ্বশুরকে ধন্যবাদ, তিনি তোমাকে ডেকে এনেছিলেন।

এতক্ষণে মহিম জিজ্ঞেস করল, কর্তা কই?

তিনি গেছেন কয়েক দিনের জন্য এক দূরের তালুকে। তিনি তোমাকে এখানে এনে রাখতে চান।

মহিম জিজ্ঞেস করল, কেন?

জবাবে উমা বলল, শুনেছি, এ বাড়িতে আগের কালে একজন সাহেব ছবি-আঁকিয়ে ছিলেন মাইনে করা। এ ঘরের সব ছবি তাঁরই আঁকা। তেমনি এই এস্টেটে তোমাকে আমার শ্বশুর এনে রাখতে চান। আসবে তুমি?

মহিম জানে, রাজা-মহারাজার বাড়িতে এমনি মাইনে-করা অনেক বড় বড় শিল্পী থাকেন। বলল, তা তো জানি না! আমার দাদা বউদি রইছেন, অর্জুন পাল মশাই আছেন, আমার গুরুমশাই, তাঁরাই বলতে পারেন।

যদি আস—বলে হঠাৎ চুপ করে গিয়ে মহিমের দিকে তাকিয়ে রইল। এতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই বোঝা গেল না।

মহিম উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে কিছুতেই উমার চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। তার প্রাণে হাওয়া লেগেছে। বুঝি নয়নপুরের তেপান্তরের দমকা হাওয়ার মত।

উমা জিজ্ঞেস করল, গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

উনি তো মোর সঙ্গে দেখা করেন না। মোরে বুঝি ভালবাসেন না আর।

একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল উমা, সেজন্য তোমার

দুঃখের কিছু নেই। আমরা কি ভালবাসি না?

বাসে। কিন্তু সে ভালবাসা মহিমের কাছে অপরিচিত। সে নীরব রইল।

উমা বলল, তুমি এখন কি কাজ করছ? দেখতে ভারি ইচ্ছে হয়। সেই দক্ষনিধনের ক্ষিপ্ত শিব নাকি।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মহিম বলল, হ্যাঁ। কিন্তু সে এখন থেকেই যে ধর্মদেবের ঘট তৈরি করছে সে কথা বলতে বাধল। সে আবার প্রণামের জন্য ঝুঁকে পড়তেই উমা তার দু-হাত ধ'রে ফেলল।—এ কি, বারণ করলাম না পায়ে হাত দিতে। তাহলে তো 'দেখ্‌ছি' আপনি করে কথা বলতে হবে।

বলে সে হাত ছেড়ে না দিয়ে যেন সত্যই ভক্তিমতীর মত ঈশ্বর-অবলোকন করছে এমনিভাবে তাকিয়ে রইল।

আর উমার সর্বাঙ্গ থেকে বিচিত্র সুগন্ধ তার অনুভূতিতে এক অনবদ্য আবেগের উন্মাদনা এনে দিল, তার হাত কাঁপল উমার হাতের মধ্যে। এত কাছাকাছি উমার দিকে তাকাতে গিয়ে তার চোখের পাতা যেন অসম্ভব ভারী হয়ে এল!

উমার চোখ উজ্জ্বল, নির্নিমেষ, দুর্বোধ্য হাসি। বলল, তুমি আমাকে হাত তুলে নমস্কার কর, আমিও তাই করব। ডাকলে এসো কিন্তু।

হাত ছেড়ে দিল সে।

মহিম দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল। সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, একটা কথা মোরে বলেন।

উমা কাছে এল। মহিম জিজ্ঞেস করল, মুই একটা হাসি শুনছি এ বাড়িতে, মেয়েমানুষের হাসি। উনি কে?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে চমকে উঠল উমা,—তুমি হাসি শুনেছ?

হ্যাঁ। ওনারে দেখেছি আমি।

কোথায়?

এ মহলের একেবারে উঁচা আল্‌সের ধারে।

মুহূর্তে নীরব থেকে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল উমা, এ কথা তুমি

আমাকে জিজ্ঞেস কর' না। আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, যদি তোমায় কখনো কলকাতায় পাই সেদিন বলব।

উমার চোখের মিনতি প্রায় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল মহিমকে যে, মহিলাটি নয়নপুরের জমিদারের বিদুষী পুত্রবধু।

সে বেরিয়ে গেল, গেল মনের মধ্যে এক নতুন প্রতিক্রিয়ার ঝড় নিয়ে। প্রথম দিনের চেয়ে আজ তা আরও বিচিত্র। উমার নতুন ভাব এবং এ বাড়ির সমস্ত কিছুই।

॥ ১৪ ॥

পরান সঙ্গে ছিল না। মহিম প্রথম মহল পেরিয়ে কাছারিবাড়ীর ভিতর দিয়ে আসবার সময় কে একজন হেঁকে বলল, কে যায়?

মহিম বলল, আমি মহিম।

আমলা দীনেশ সান্যাল বেরিয়ে এসে বলল, দাশু মোড়লের শেষ পক্ষের ছেলে না তুই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এদিক থেকে কোথায়?

মহিম জবাব দেওয়ার আগেই পেছন থেকে পরান বলে উঠল, বউমার কাছে আসছিল।

অ! একটা অর্থজ্ঞাপক শব্দ করে চশমাটা তুলে দিয়ে দীনেশ সান্যাল বলল, কোন পুতুল-টুতুলের ফরমাস ছিল বুঝি?

মহিম পরানের দিকে ফিরে তাকাল। পরান বলল, সে খোঁজে কি দরকার তোমার, স্যানেলবাবু। ওরে যেতে দাও।

বোঝা গেল, আমলা কর্মচারীদের কাছে পরানের মান অনেকখানি। দীনেশ সান্যাল বলল, তোমার যেমন কথা পরান, আমি কি আটকেছি না কি। দেখে নিলাম, দাশুমোড়লের ছেলের কপালটা সত্যিই বড় চক্‌চক্ করছে। হুঁ!

কথাটার মধ্যে কি যেন ছিল। মহিম মুখ ফিরিয়ে এগোল। যেতে যেতে শুনতে পেল, চাষার বেটা নাকি আবার আর্টিস্ট হয়েছে। আঁটি বাঁধা ছেড়ে এবার আমের আঁটির ভেঁপু ফুঁকে বেড়াচ্ছে।

কানের মধ্যে পেরেক ফুটিয়ে দেওয়ার মত কথাগুলো বিঁধল মহিমের কানে। তাড়াতাড়ি এ বাড়ির সীমানা পেরুতে পারলে যেন সে বাঁচে। এখানকার সবই অপমানকর, ভীতিপ্রদ এবং অস্বাভাবিক যেন।

কাছারিবাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণে অর্জুন পালকে হুঁকা টানতে দেখে মহিম তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলো নিল। মহিমের গুঁরু অর্জুন পাল। অর্জুন পাল বুড়ো হয়েছে এখন। লোক দিয়ে কাজ করায় কিন্তু নিজেও হাজির থাকে সব জায়গায়। চোখে মোটা পাথরের চশমা সূতো দিয়ে বাঁধা। মহিমের চিবুকে হাত বুলিয়ে ঠোঁটে ঠোট ঠেকিয়ে বলল, মহী নাকি গো! ভাল আছ তো বাবা? বস।

মহিম বলল, ভাল থাকবার কি যো আছে পালকাকা।

তা বটে! মহিমের গায়ে হাত দিয়ে বলল অর্জুন, 'গাঁয়ে ঘরে তোমার বড় নাম হইছে। শোনলাম বাবুরা তোমারে দিয়া কাজ করাতে চায়। তুমি নাকি গররাজী?

পালকাকা, গুরুর ভাত মারা বিদ্যে মোর জানা নাই। গুরুর দরকার পড়লে ছুটে আসব সেখানে রাজা-মহারাজার কথা মোর কাছে তুচ্ছ।

সে কি কথা বাবা, সে কি কথা। বলল বটে তাড়াতাড়ি অর্জুন পাল কিন্তু বোঝা গেল, বুকটা তার ভরে উঠেছে খুশিতে। তারপর খানিকটা আত্মগতভাবে ফোগলা দাঁতে হেসে বলল, সকলে বলে, বড় জবর শিষ্য হইছে তোমার পাল। সবদিকে দুরন্ত। মুই বলি, ওটা ভগবানের ছিষ্টি, মহীরে মুই কোন দিন হাতে ধরে শিখাই নাই কিছু।

মহী বলল, তা বলল, তা বললে মুই শোনব না পালকাকা। আপনার কাজ, ধৈর্য দেখেই মুই শিখছি।

অর্জুন পাল হা হা করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, পেথম পেথম মোরে কতজনায় কত কি বলেছে। পাগলা বামুন যখন তোমায় কলকাতা নিয়ে গেল, পরানটা মোর হুতোশে ঠেসে রইল। লোকে বলল, ওই পালপাড়াই ছোঁড়ার মাথাটা খাইছে। আর তুমি যেদিন ফিরা আসলা—

মহিম বলল, আপনি মোরে বুকে তুলে নিলেন।

পাল আবার হেসে উঠল। বলল, কিন্তু বাবা বারবার বলছি, আবার বলি অহঙ্কার করিস্ না কখনো। বাবুরা তোরে ডাকছে শুনে মোর বুক দশ হাত। মোদের কাজ আলাদা, তুই রাজা-মহারাজার ঘরে তাদের শকের কাজ করবি, রাজবাড়ি সাজাবি। তোর মান আলাদা।

দু'জন কারিগর প্রতিমা গড়ছিল। একজন বলে উঠল মহিমকে লক্ষ্য করে, কুমোর হইলেও তোমার কাজ বিশ্বকর্মার।

আর একজন হেসে হুঁকো দেখিয়ে ইসারায় ডাকল মহিমকে। মহিম মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। তারপর প্রণাম করল আবার পালকে। আমি যাই তা হইলে পালকাকা ?

পাল যেন কি ভাবছিল। বলল, হ্যাঁ, আস গিয়া একটু তামাক খাবে না ?

এ হল এক মস্ত সম্মান। যুবক পড়শী হোক আর শিষ্য হোক, বুড়ো মানুষের এ আমন্ত্রণ বড় কম নয়। বলল, ওটা আর ধরি নাই !

বেশ করছ, বাবা বেশ করছ। এসব যত না ধরা যায় ততই ভাল। মোদের বাড়ী এসো না কেন একবার ?

যাব।

আমলা দীনেশ সান্যালের কথার পর পালের সাক্ষাৎ যেন সদ্য ঘায়ে মলমের প্রলেপের মত শান্তি পেল সে।

বেলা গড়িয়ে গেছে একেবারে। সন্ধ্যা নামে।

সাকো পথে না গেলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হয় জমিদারবাড়ি থেকে মহিমের পাড়ায়। বাড়ি আসতে একটু দেরিই হল তার। বাড়ির মুখেই ভরতের সঙ্গে দেখা হল মহিমের।

ভরত বলে উঠল, এ্যাই যে বাবু আসছেন। যাও, ওদিকে আবার ভাবনায় হাঁড়ি ফাটছে।

অর্থাৎ অহল্যার দুশ্চিন্তা। হঠাৎ কেমন রাগে মহিমের ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল। বলল, মুই কি ছেলেপান যে ভাবনায় তোমাদের হাঁড়ি ফাটে কেবলি?

ভাবনা যে ভরতেরও একেবারে না ছিল তা তো নয়। তবু সে নিজের কথা না বলে বলল, যার ফাটছে তারে গিয়া বল্, মোরে নয়। থেমে বলল, তা তুই চটিস কেন?

সত্যিই, চটবার কি আছে! তবু মহিম বলল, চটব না? বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই তোমাদের ভাবনা, আর মোর ভাল লাগে না বাপু!

কি তোর ভাল লাগে তবে শুনি? ভরত বলল, কিছু মোটা টাকার ফরমাস পেলি নাকি জমিদারের ছেলের বউয়ের কাছ থেকে অত মেজাজ দেখাচ্ছিস?

থম্‌কে গেল মহিম। এ-কথার থেকে যে ভরত একেবারে এ-কথায় আসবে সে তা ভাবতেই পারেনি। বলল, তা হইলেই তুমি তুষ্ট হও, না? টাকা ছাড়া কিছু কি চিন না?

ভরত অত্যন্ত রুক্ষ হয়ে উঠল। বলল, চিনি-কিনা-চিনি, সে কথা তোরে বলতে চাই না। চাষার ছেলে পুতুল গড়িস্। অকর্মার ধাড়ি, এ-কথা বলতে তোর লজ্জা করে না?

জীবনে যা কোনদিন বলেনি, আজ হঠাৎ এ অবুঝ রাগে মহিম তীব্র গলায় বলে উঠল, গরীবের ছটাক-কাঁচ্চা জমির পানে শনির মত নজর দিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সেই মোর ভাল।

ভরত দারুণ রোষে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিল মহিমের গালে। হারামজাদা, মোরে তুই শনি বলিস? জমিদারবাড়িব ছোঁয়া নিয়া

আসছে তুমি মোর কাছে তেজ দেখাতে?

অহল্যা ছুটে এসে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়াল। উৎকণ্ঠার ত্রাসে কাঁপছে সে। ভরতকে বলল, ছি, ছি কি করলা তুমি, ঠাকুরপো'কে মারলা?

চুপ কর তুই! ধমকে উঠল ভরত? তুই মাগী লাই দিয়ে ছোঁড়ার মাথা খেয়েছিস্। ফের দেওর-সোহাগ দেখাতে এলে তোরে টুণ্ডা করব আমি।'

তারপর বাড়ির ভিতর গিয়ে নিজের মনেই সে বলতে লাগল হা রে ভ্যালা তোর। ভাল কথা বললাম তো উনি চোট দেখাতে আসলেন। তোর চোটের কি ধার ধারি রে আমি। আমি কি কারুর পিত্যেশ করি। সোজা কথা জেনে রাখছি, মোর কেউ নাই—কেউ না।

স্তব্ধ নির্বাক একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে মহিমকে ঘরে যেতে দেখে অহল্যা দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন মুখে গেল রান্না ঘরে।

মহিম টলতে টলতে নিজের ঘরে উঠে এল। গায়ের জ্বালার চেয়েও বুকের মধ্যে একটা দারুণ বেদনায় মুচড়ে উঠল তার। কি যেন একটা ঠেলে আসতে চাইছে গলার কাছে। দক্ষনিধনের শিবের গায়ে দু-হাত রেখে সে বার বার মনে মনে বলতে লাগল, আমি ছেড়ে দেব একাজ, পুতুল আমি গড়ব না আর। এ মোর কাজ নয়। মাঠ মোর জায়গা। আমি আর তোমাদের গড়ব না।···

চোখের কোল ছাপিয়ে জল এল তার। শিবের গা বেয়ে পড়ল সেই জল।

খাওয়ার আগে সারাক্ষণটি ভরত বক্‌বক্ করল। কখনো দুঃখে কখনো রাগে। খেতে বসে খেতে পারল না সে। মনটায় শুধু অশান্তি নয়, মহিমের মুখটা বারবারই মনে পড়তে লাগল তার। ছোঁড়ার যেন কি হয়েছে। কই, এমন করে তো আগে কখনো বলে নি সে ভরতকে। হয় তো জমিদারবাড়ি থেকে দুঃখ পেয়ে ফিরে এসেছে

কোন কারণে। শত্রুপুরী যে! আর ভাই কিনা তার বলে, ভাবনা ক'রো না তোমরা।

কিন্তু মহিমকে ডাকতে যেতে পারল না সে। বলল অহল্যাকে, ছোঁড়ারে ডেকে এনে খাওয়াও। বলে সে শুতে চলে গেল।

অহল্যা এসে দেখল মহিম বেড়ায় হেলান দিয়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। ডাকল, ঠাকুরপো! মহিম মুখ তুলল। চোখ লাল, কান্নার আভাস তাতে। কেঁদেছে বুঝি। অহল্যার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সমস্ত ঘটনাটার জন্য নিজেকেই দায়ী মনে হল তার। কেন সে ভরতকে জানাতে গিয়েছিল মহিমের জমিদারবাড়িতে যাওয়ার কথা, কেন-বা দুর্ভাবনায় খোঁজ করতে বলেছিল স্বামীকে। কিন্তু, মহিমের বা কি হয়েছে আজ? ভাবনায় হাঁড়ি ফাটে কি আর কিছু ফাটে সে কথা জানে অহল্যাই। তা বলে অহল্যার দুর্ভাবনায় মহিমের এত রাগ-বিরাগের কথা তো সে জানত না। আর সেই কথাই অহল্যার মনে দম ফেলানো ফানুষের মত কান্নায় আর অভিমানে বিরাট হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে নতুন এক রুদ্ধশ্বাস দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছে তাকে, না জানি মহিম এর পর কি করবে। যদি ছেড়ে যেতে চায়!

সে ডাকল, ঠাকুরপো, খাবে চল।

নির্বিকারভাবে বাধ্য ছেলের মত তাকে উঠতে দেখে অহল্যার দুশ্চিন্তা গভীর হয়ে উঠল। এত নির্বিরোধী মহিম, এ ঘটনার পর এক কথায় খেতে উঠল?

খেতে বসে কয়েক গ্রাস খেয়েই মহিম উঠে পড়ল। অহল্যাও উঠল।

মহিম বলল, খাবে না তুমি?

মোর জন্য ভেব না কিন্তুক, এই কি তোমার খাওয়া?

দিন তো সব সমান নয়, অনিচ্ছাও তো হয় মানুষের। তুমি উপোস থাকবে ভেবেই বসেছিলাম।

মোর উপোসের জন্য? হাহাকার করে উঠল অহল্যার বুকের মধ্যে।

কান্না চেপে বলল সে, তাই যদি, তবে চল দুটো কথা বলে আসি পরে ভাত খাব।

মহিম হাত মুখ ধুয়ে এল। অহল্যাও এল। বলল, তুমি ছেলে-পান নও জানি, কিন্তুক মোরে ভাবনায় যে তোমার এত রাগ তা তো জানতাম না?

মহিম নীরব। অহল্যা আবার বলল, জেনে রাখলাম সে কথা। তবে সে ভাবনা মোর, মোর বললেই এ অঘটন ঘটত না। মোর কাছে যে কথা, যা তুমি আর কাকপক্ষীরেও বল' না। আর এক কথা—

কিন্তু কথা আটকায় অহল্যার গলায়, বুক ফাটে। বলল, এ নিয়ে যদি তোমরা দু-ভায়ে বাড়াবাড়ি কর,তবে গলায় দড়ি দিতে হবে মোরে। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাক।

মহিম বলল, থাকব। কাল থেকে মুই মাঠে যাব, মোরে কাজ ধরতে হবে।

কি বললা? গলার স্বর অহল্যার ছিঁড়ে গেল। বলল, যা নয় তা বল না।

দাদা তাই বলছে।

বলুক। অহল্যার যেন আসল মূর্তি খুলে গেল। বলল, যার যা, তার তা। মূর্তি তোমারে গড়তেই হইবে। তেমন দিন আসলে এই করেই খেতে হইবে তোমারে। এ ছাড়া তোমার পথ নাই।

আশ্চর্য! মহিম জানত এমন কথা পাগলা গৌরাঙ্গই বলতে পারত। কিন্তু পর-মুহূর্তেই অহল্যার চোখে হু হু করে অশ্রুর বন্যা এল।—এমন বুদ্ধি তুমি ছাড় ঠাকুরপো। এতে তুমি নিজেরে ভাঙবে, অপরকে মারবে। এ যে তোমার সাধনা! এ কি তুমি ছাড়তে পার? তারপর চোখের জল মুছে বলল, তেমন দিন যদি ভগবান দেয়, তবে তোমারে ভিক্ষে করে খাওয়াব আমি।

এবার স্তম্ভিত বিস্ময়ে নির্বাক মহিম অহল্যার দিকে তাকিয়ে রইল। সে শিল্পী, তার সাধনা আছে। কিন্তু তার সাধনার পেছনে এতবড়

একটা শক্ত খুঁটি আছে, তা বুঝি সে জানত না।

কয়েকটা দিন এমনি কাটল! মহিম মাটির কোন কাজেই হাত দিল না। সেই সকাল হলেই বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে প্রায় বেলা শেষে। কোনরকমে দুটি খায় আবার বেরোয়। অহল্যা খবর নিয়ে জেনেছে; মহিম রীতিমত মাঠে যাতায়াত করছে, চাষের খবর নিচ্ছে। মাঠে তো এখন বিশেষ কোন কাজ নেই, ধান পাকার সময় এখন। বিকালে বেরিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ি আসে সে।

পরিণামে তার নিজের প্রতি পীড়ন যে আর একজনের প্রতি দ্বিগুণ প্রতিক্রিয়া করছে একথা সে বোধ হয় জানত না। শুধু তাই নয় ব্যাপারটা অহল্যার সহের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। এমন কি একদিন জমিদারবাড়ি থেকে পরান উমার ডাক নিয়ে এসেও ফিরে গেল। মহিম শুনল কিন্তু গেল না।

॥ ১৫ ॥

এর মধ্যে একদিন মহিম বাড়ি ফিরছিল। বেলা তখন নাবির দিকে, আকাশে মেঘের ভিড় নেই, সূর্যের তেজ বড় প্রখর। কেমন যেন মাথা ধরিয়ে দেয়।

অক্ষয় জোতদারের বাড়ির পিছনে ডোবাটার ধারে থমকে দাঁড়াল মহিম। এ কি! দেখল, হাড্ডিসার মোষ একটা চার পা মুড়ে ঘাড় সামনের দিকে বাড়িয়ে মাথা পেতে পড়ে আছে। চোখ দুটো নিষ্পলক। সেই মোষের পিঠের উপর একটি মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে ফুলে ফুলে উঠছে। বোধ হয় কান্নায়।

মহিম তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে এল। দেখল মোষটা মৃত। কে গো?

যন্ত্রণাকাতর চোখের জলে ভরা মুখটা তুলল অখিল। মোষের পিঠ থেকে বলল, মোর কালাচাঁদেরে মেরে ফেলছে ভাই। বলতে বলতে তার কান্না বেড়ে উঠল।

মহিম বসে পড়ল অখিলের পাশে। জিজ্ঞেস করল, কি হইছে অখিলদাদা ?

অখিলের বক্তব্যে মহিম বুঝল, অক্ষয় জোতদার দেনার দায়ে অখিলের জীবনভর সঞ্চয়ের ক্রীত কালাচাঁদকে নিয়ে আসে। কালাচাঁদের ভরণ-পোষণের দায় থাকে অক্ষয়ের। তার জন্যেও অবশ্য একটা আলাদা সুদ হিসাবে দেনা ধরা হবে তার। কিন্তু সে চুক্তি প্রতিপালিত তো হয়ইনি, তো হয়ইনি, উপরন্তু না খেতে দিয়ে মেরে ফেলেছে।

অখিল বলল, মহী রে, তোরা দেখছিস্ দশটা যোয়ান মুনিষ কালাচাঁদেরে দেখে কাছে ঘেঁষত না, যেন চারটে ষাঁড়ের সমান। আশা ছিল, জীবনে যদি আর একটা হয় তবে কালাচাঁদের ভাই শ্যামচাঁদ—এ দুজনারে নিয়া কোন-রকমে দুটো চাকা বানিয়ে গাড়ি চালিয়ে খাব। সে গেল, কিন্তু কালাচাঁদ যে মোর কি ছিল, সেকথা কেউ বুঝবে না! রোজ জোতদারের গোয়ালের পেছনে এসে আদর করে যেতাম, আর কালাচাঁদের সে কি ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস। মাঠে ঘরে কোথাও মোর শান্তি ছিল না। ঘুমিয়ে সেই নিঃশ্বাস শুনতাম মুই।

বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল অখিল। তার কালাচাঁদের সুখ্যাতি ও সোহাগের কথা মহিম শুনেছিল। কান্না বড় অসহ্য লাগল তার। বলল ছেড়ে দেও অখিলদাদা, ঘরে যাও, মুই ডোমপাড়ায় একটা খবর দিয়া যাই।

দেখ্ মহী অক্ষয়ের গোলা আর বিচুলির গাদা দেখিয়ে বলল অখিল, কত খাবার, বুঝি কয়েক বছরের, তবু মোর কালাচাঁদের দিনে দুটো আঁটিও জুটল না।

এমন সময় অক্ষয় জোতদার হেঁকে উঠল, ও সব কান্না-মান্না রেখে যাবি ডোমপাড়ায়, না কি ধাষ্টামো করবি ? এর পর আবার পাওনা-গণ্ডার হিসাব-টিসাব গুলান দেখে যা, ন্যাকামো রাখ্।

কথাগুলো যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল মহিমের মাথায়। সে অখিলকে উঠতে বলেছিল। কিন্তু বলে উঠল, না, ও থাকবে এখানে অক্ষয়কাকা, ওরে কাঁদতে দেও। তাতে তোমার পাওনা কমবে না।

মুই যাই ডোমপাড়ায় লোক ডাকতে।

বলে সে উঠে পড়ল। যেতে যেতে শুনল অক্ষয়ের কথা, চাষার ব্যাটা কুমোর, ছুতোর হল বামুন—কতই দেখব। কিন্তু অক্ষয় ওসব থোড়াই কেয়ার করে।

মহিমের সামনে পথ মাঠ। কিন্তু মরা মোষটার মত নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি তার শূন্যে নিবদ্ধ। বার বার হোঁচট খেল, খেয়াল রইল না তার। এক দারুণ প্রতিক্রিয়া করেছে সমস্ত ঘটনাটা তার মধ্যে। শিল্পীর মন যেন কোথায় ছুটে চলেছে।

ডোমপাড়া ঘুরে বেলা শেষে সে বাড়ি ফিরে এল।

ভরত বাড়ি নেই? অহল্যা আজ সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে একটা বোঝাপড়া করার জন্য দৃঢ় অন্ধকার মুখে মহিমের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। বলল, আজ যদি এতখানি পর হয়ে গেছি তবে বলি তোমার জন্য কি মোর খিদে তেষ্টা নাই?

আচমকা আঘাতে আড়ষ্ট মহিম জিজ্ঞেস করল, মোর জন্য রোজ তুমি বসে থাক?

সে কথা থাকুক। চুলোয় যাক খাওয়া। আজ তোমাকে একটা বোঝাপড়া করতে লাগবে, নইলে অনাছিষ্টি করব মুই। বলতে বলতে মহিমের চোখে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে চম্‌কে উঠল সে। কি যেন দেখছে মহিম। সমস্ত মুখে বেদনার আলোর বিচিত্র খেলা। মহিমের এ মুখ, এ চোখ অহল্যা চেনে। বলল, কি হইছে তোমার?

বুঝি কান্না পেয়েছে মহিমের। ফিস্ ফিস্ করে বলল, মুই কাজ করব বউদি, কাজ করব।

কিসের কাজ?

মহিম অখিলের সমস্ত ঘটনা বলে গেল। পরে বলল, সে মুই ভুলতে পারি না। কালাচাঁদের পিঠে পড়ে অখিলের কান্না, এ দুইয়ের মূর্তি গড়ব আমি।

মহিমের মাথার চুলের গাদায় দু-হাত ঢুকিয়ে অহল্যা তাকে কাছে টেনে নিল। বলল, ছি, কেঁদ না। তোমার কাজ তো তোমারে

করতেই হইবে। কিন্তু তার বুক ভরে উঠল আনন্দে। সে আনন্দের বেগ বুক ফাটিয়ে চোখে জলের ধারা বইয়ে দিল তার। আর এ জলের ধারাই বুঝি এ-কদিনেব সমস্ত সঙ্কট জ্বালা-যন্ত্রণাকে ধুইয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বলল, পাগল নিয়ে কারবার। না জানি আবার কবে বেঁকে বসবে।

বলে মহিমের মুখের দিকে মুহূর্ত তাকিয়ে পেছন ফিরে চলে গেল সে। যেন ভয় পেয়েছে সে এমনি ভাব। তারপর রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল সে। না, এ দুরন্ত কান্না বুঝি থামতে নেই, থামতে নেই। কেন?

॥ ১৬ ॥

তারপর শুরু হলো কাজ। কিন্তু এ কী কাজ! একে বোধ হয় বলা চলে কাজের উন্মত্ততা। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বুঝি অন্য পরিবেশ নেই, জগতও নেই। মহিম মাথায় করে কিনে নিয়ে এল বিলাতী মাটি তার সঙ্গে মিশাল নরম মাটি। তার এ কাজকে সে দীর্ঘদিন স্থায়ী রাখতে চায়। তাই দিনের পর দিন চলল শুধু মাটির অবিকল ছাঁচ গড়া, অখিল আর তার মোষের সেই আলিঙ্গনের মর্মন্তক ছবি। সেই ছাঁচে ঢালা হবে বিলাতী মাটি, কাদামাটি ও আরও নানান বস্তুর মিশ্রিত মশলা! তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, কলকাতার ময়দানে বড় বড় মূর্তি, সবই ফিরিঙ্গি সাহেব মেমদের! মনে হয়েছিল, বুঝি বাংলা দেশ নয়, দেশ সাহেবদের। সেসব নাকি ঢালাই ধাতুর তৈরী। কিন্তু হাঁ, কারিগর বটে! কি সুন্দর কাজ! আর মহিমের এ কালাচাঁদ আর অখিলের মূর্তি কোথায় থাকবে? কোন্ ময়দানে, কোন্ পথের ধারে?

যাক্ সে ভাবনা, তার উঠোন তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

মহিম বুঝি পাগলই হয়ে গেছে। কাজ আর কাজ। নিষ্পলক-চোখ, কখনো ঘাড় বাঁকায়, আপনমনে কথা বলে, হাসে, আবার গুম্

হয়ে বসে থাকে। প্রহর গড়ায়। কখনো মনে হয় সে যেন নয়নপুরে নেই, অন্য কোথাও চলে গেছে। কখনো দেখে বিরাট একটা মোষ আকাশের কোল ঘেঁষে ভয়াল বেগে ছুটে চলেছে! যার দিকে চায় তাদের সকলকেই যেন অখিল বলে মনে হয়। কাজের মাঝেই এক অদ্ভুত আবেগে সে হঠাৎ কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে। সেটা পলায়ন নয়, যেন মায়ের কোলে স্তন পান করতে করতে হঠাৎ শিশু আনমনা হয়ে স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকে, আবার স্তন মুখে গুঁজে দেয়, তেমনি এক খেলা। কখনো কখনো আপনমনেই তীক্ষ্ণ চোখে যেন লক্ষ্য করে, একটা মানুষের টুকরো টুকরো হাড় পড়ে আছে তার কাছে, তার প্রতিটি গ্রন্থির সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধতে গিয়ে সে যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। দেহের থেকে আলাদা করে নেওয়া সমস্ত তন্ত্রী জট পাকিয়ে গেছে, কেমন করে সেসব সারা অঙ্গে ঠিক করে পরিয়ে দিতে হবে, যেন খেই হারিয়ে ফেলছে তার। তারপর আচমকা তার চোখের সামনে একটা জ্যান্ত মানুষের ভেতরটা যেন ধরা পড়ে যায়। একটা অদ্ভুত কল্‌কল্‌ শব্দে দিকে দিকে রক্তের ওঠা নামা, বিচিত্র ভাঁজ মাংসের, তার ভেতরে একটা অন্ধ গুহা। সেখানে কিছু বা দেখা যায়, কিছু যায় না। এমনি সব অদ্ভুত চিন্তা।

অহল্যা তাড়া দেয়, ধরে নিয়ে যায় ধমক দেয়।—যাও নেয়ে এস, না হইল সব গোবর গণেশ করে দেব।

খাওয়া ভুললে রেখে দেব কিন্তু রান্নাঘরে পুরে কুলুপকাটি এঁটে।

ভরত দূর থেকে উঁকি মারে, হুঁকোটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নেয়, বাঁ হাত থেকে ডান হাতে। ভাবে, ছোঁড়ার চোখেমুখে কি যেন রয়েছে। এতই আপনভোলা যে, ভরত গিয়ে তার স্বাভাবিক মর্যাদায় একটু টিটকারি দেবে, তাও প্রাণ চায় না। মনে মনে বলে, পাগল কি আর গাছে ফলে?···কিন্তু পরমুহূর্তেই নিঃশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে তার বুক! সমস্ত ছোটখাটো মামলা গুলোতে তার গো-হারা হয়েছে। সত্য, সে পরকে ঠকিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল, মহিম তাকে শনি বলে গাল দিয়েছে। কিন্তু আজ সরাসরি জমিদারের সঙ্গে মামলায় যদি তার

পরাজয় হয়, তবে এ ভিটে যে ছাড়তে হবে ! সবই তো গেছে জমিদারের গর্ভে, বাকি খুব সামান্যই। তাকে ঠেকোজোড়া দিয়ে রাখতে কি ভরত পারবে !

তবে এ হল তার নিতান্তই একলার ভাবনা। নিতে চাইলেও এর ভাগ সে কাউকে দেয়নি। সে একাকীত্বের কথা মনে করে নিঃশ্বাস সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না।

এর কিছু দুশ্চিন্তা অহল্যারও আছে, তবে তার কিছু করবার নেই। সে দেখে মহিম এত সমস্ত কাজের মধ্যে ও মাঝে মাঝে কেমন যেন উন্মনা হয়ে ওঠে, আশেপাশে কেবলি তাকায়।

অহল্যা জিজ্ঞেস করে, কারে খোঁজ, কি চাই ?

বার বার এড়িয়ে গিয়ে শেষটায় মায়ের কাছে শিশুছেলের মত বলে কুঁজো মালা তো আসল না বউদি, সে কি নয়নপুরে আসে নাই ?

ও মাগো। অহল্যা হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, এই কথা ? তুমি কি তুমি আছ যে দেখবে ? সে আসল, দেখল, হাত মাত ঝুলিয়ে কত রঙ্গ করল। তা এতক্ষণে সে বোধ হয় রাজ্য মাতিয়ে বেড়াচ্ছে।

বটে। কুঁজো কানাই এর মধ্যে ঘুরে গেছে ! কিন্তু সে তো কিছু বলল না মহিমকে। তার আবেগদীপ্ত চোখের দিকে তাকালে যে মহিম অনেক কিছুর হদিস পায়। মানুষটা পাশে থেকে বকবক করে বিচক্ষণের মত কখনো বা চোখ কুঁচকে ভ্রূ তুলে মহিমের কাজ দেখে হাসে, মাথা নাড়ে। মহিমের মত সেও যেন পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাধনায় আত্মসমর্পণ করেছে। সামলে থাকনে টের পাওয়া যায় না সে কতখানি। না থাকলে বড় ফাঁকা লাগে।

সেই রাত্রেই কুঁজো কানাই এল। রাত্রি তখন গভীর। ভরত অহল্যা শুয়ে পড়েছে। মহিমের ঘর অন্ধকার সে বসে আছে দাওয়ায়। ঘুম নেই তার চোখে। না, কখনোই নয়। হ্যাঁ, এমনিই তার কাজের দুরন্ত বেগ যে, আবেগ ও চিন্তা বলে বস্তুটা যতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে না পড়ছে ততক্ষণ ঘুম নেই তার।

অন্ধকারে হাত আর মাথা দুলিয়ে কানাই আসছে দেখেই মহিম

চিনতে পারল। পেছনে পাড়ার কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে আসছে। পেছন ফিরে কানাই তাড়া দিতে কুকুরগুলো খেপে ওঠে আরও। কানাই তাড়া দিয়ে হাসে।

মহিম তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে কুকুর তাড়িয়ে কানাইয়ের হাত ধরে! এখন আসলা যে কানাইদা?

মহিমের কোমরে হাত দিয়ে কানাই বলল, 'চিনি তো তোমারে। জানি যে ঘুম নাই তোমার চ'কে। তা দেখ না, পাছে লাগছে পাজী-গুলান।' দাওয়ায় উঠে বলল, 'রাতে-বেরাতে তো বার হই না। কুকুর তাড়া করে, গাঁয়ে-ঘরে মেইমানুষরা ভয়ে ডুকরায়, গালি দেয় লোকে। কিন্তুক্ না আইসে পারলুম না একটুস্‌খানি।' তারপর খাড়া হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে মহিমের কাঁধে হাত দিয়ে মাথাটা তার নামিয়ে নিয়ে আসে নিজের মুখের কাছে। বলে অ'খলে আর তার মোষের পিতিমে গড়তে লাগছ দেখে পরান মোর কেবলি বল্‌ছে, তুমি তুমি যেন দেবতা?

কেন কানাইদা?

দেবতা মানুষকে কি এত ভালবাসে? সে যদি তোমার ছটাক-খানেক ভালও বাসত, অ'খলের তবে বুঝিন এমনটা হইত না।

এ যে কুঁজো কানাইয়ের পোড়ো প্রাণের জ্বালা, তা জেনে বিস্মৃত বেদনায় স্তব্ধ রইল মহিম। দেখল, কানাই নিজের মনে মাথা দোলাচ্ছে। বলল, দেবতা নয়, সে কান্না, সে ছবি যদি তুমি দেখতে কানাইদা।

'জানি জানি, মোরে বলতে হইবে না।' বলে আরও চিন্তামগ্নভাবে মাথা নাড়ে কানাই।

একটু চুপ থেকে মহিম বলল, মোর চোখে ঘুম নাই সে তুমি জান তো, কি বলে খবর না দিয়ে গাঁ ছাড়লে তুমি?

কানাই হেসে তাড়াতাড়ি মহিমের হাত নিয়ে নিজের গায়ে মাথায় বোলাতে লাগল। বলল, খানিক লজ্জায়, সে মোরে সবাই বলছে তুমি নাকি পাগলাপনা হইছিলে। তারপর চোখে দ্যুতি ফুটিয়ে ফিসফিস

করে বলল, সেও এক মস্ত কাজ। এবার যে-যার ধান কেটে নিয়ে আসবে, ঝাড়াই মাড়াই করবে। সে জমিদারই হোক্ আর যাই হোক্। তোমার জমিতে খাটি, তোমার জমিতে বাস করি, তা বলে কি তোমার গোলাম থাকব? কাজ নাও, দাম দাও, হ্যাঁ। শুধু এই লয়, বাড়তি খাজনাও বন্ধ। গাঁয়ে-ঘরে ওরা মোরে দেখতে পারে না, জানোয়ার বলে। কিন্তুক্ যখন কাজের কথা বলল, মহা, পরানটা মোর জেগে উঠল। খবরদার, বলো না যেন কারুকে এসব কথা, মানা আছে।

কুজো কানাইয়ের গোপন কথা যে মহিম জানে, তা সে প্রকাশ করতে চাইল না। মহিল বলল, তা তুমি আস নাই কেন এতদিন? নয়নপুরে কি ছিলে না?

কানাই যেন মহিমকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত বলল, ছিলাম গো ছিলাম। গাঁয়ে-ঘরে ঘুরে ঘুরে ভাবটা দেখছি একটু, মনিষ জনে কি বলে। আর, সবারে বললাম তোমার নতুন কীর্তির কথা! আবার মহিমের ঘাড়ে হাত দিয়ে বলল চোখ বড় বড় করে, কাল হইল বোধন সবাই পিতিমে দেখবে। তোমার কালাচাঁদের পিতিমে দেখতেও যে আসবে সবাই। কাজ তোমার শেষ হইবে কবে?

এইবার শেষ হইবে। তুমি না আসলে মোর ভাল লাগত না।

'বটে কথা।' মাথা দুলিয়ে হাসল কানাই। বলল, 'তুমি শুধু মোরে লয়, অ'খলের মোষটারেও ভালবাস। তবু তুমি কুঁজো লও।' বলে, আর একদফা মহিমের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আসব কাল আসব।

তারপর ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করে আবার ঘুরে দাঁড়াল কি ভেবে মাথা দুলিয়ে হাসল নাল ঝরল খানিক হাঁ করা তার মুখের থেকে! চোখ ঠেলে উঠল কপালে। বলল তবে বলি একটা কথা।

মহিম বলল কি কথা কানাইদা?

কানাইয়ের ঠেলে-ওঠা চোখের দৃষ্টি অন্তরাবদ্ধ হয়ে উঠল। ফিস্-ফিস্ করে বলল কালু মালার সোন্দরী মেইয়ে সোয়ামীর বেড়ন খেয়ে

কুরচিতলায় পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে, সে মূর্তি কি গড়া যায় না ?

হাসতে গিয়ে হঠাৎ বুকের কাছে খচ করে কি যেন বিঁধে গেল মহিমের, কথা বলতে পারল না।

পরমুহূর্তেই কানাই হো হো করে হেসে উঠল। মিছিমিছি কেমন খেপালাম তোমারে, পাগল খ্যাপা !

বলতে বলতে অন্ধকার-উঠোনে নেমে ছুটে চলে গেল সে। সে অন্ধকারেও মহিম স্পষ্ট দেখতে পেল একটা মানুষের পিঠে যেন কালো কুৎসিত অপদেবতা বোঝার মত চেপে তার নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে। যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে একটা ভারবাহী পশু।

ওদিকে খুট করে একটা শব্দ হল। অহল্যা বেরিয়ে মহিমের কাছে এসে বলল, কে কুঁজো মালা আসছিল বুঝি ?

হ্যাঁ।

অহল্যা বলল, নেও, পরানটা ঠাণ্ডা হইছে ?

অন্ধকার থেকে চোখ সরল না মহিমের। বলল, পরান যে ঠাণ্ডা হয় না কভু ; সেখানে মোর কেবলি আগুন-আগুন। তারপর অহল্যার দিকে তাকিয়ে বলল, বউদি, এ জগতে শবার পরানেই বুঝি আগুন। কুঁজো মালারও।

আগুন ! অহল্যা দেখল অন্ধকারেও মহিমের চোখ যেন জ্বলছে। হ্যাঁ, বুঝি সবার পরানেই আগুন। সে আগুন কি, কিসের, কখন কেমন করে, কিরূপ মানুষের প্রাণের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে ওঠে তার কোন হদিস জানা না থাকলেও আগুনের আঁচ লাগে নির্বাক অহল্যার। সে তরতর করে দাওয়া থেকে উঠোনে নেমে গিয়ে মুহূর্তে থেমে বলল, রাত মেলাই, শুতে যাও। তারপর উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। এ বিশ্বসংসারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন, আগুন মানুষের বুক ভরা, পেট ভরা, সে কথা কি বলে দিতে হবে অহল্যাকে ? না, ওগো না ! অহল্যাকে তোমরা যে-যাই ভাবো, তার বুকভরা আগুনকে যে নজরেই দেখ, সে জ্বালা যে শুধুই তার। নিরন্তর দহন যে মাত্র একলার।

॥ ১৭ ॥

পরদিন গড়ানবেলায় ভরতের উঠোনে মানুষের মেলা লেগে গেল। সকলেই মাঠের আর খালের মানুষ। সকলেই ঢুকে একবার করে হাঁক দিল, মহিমের নাম ধরে। এমন কি রাজপুরের মানুষরাও বাদ যায়নি। মহিম কাজ ছেড়ে সবাইকে আপ্যায়ন করল, বসাল।

কিন্তু কাজ তো মহিমের শেষ হয়নি! না হোক, নিজের মনের কাছে মহিমের গোপন রইল না, প্রাণ তার পেখম তুলে নাচতে চাইছে, বুকটা তার ভরে উঠেছে। নিজেকে সে জিজ্ঞেস করল, একেই কি বলে সৌভাগ্য। তার মনে পড়ল উমার আহ্বান, কলকাতায় চল! কলকাতা! সত্য, কলকাতা চুম্বকের মত সমস্ত কিছুকে টেনে নিয়ে থরে থরে নিজের বুক সাজিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই মানুষ, অখিল, তারা তো কলকাতায় নেই। নেই কোন পরিচয়, তার কোন নাড়ীনক্ষত্রের সন্ধান। সে টান, সে আত্মীয়তা কোথায়? সবটাই যেন এক বিরাট চাঞ্চল্য, অথচ প্রাণহীন। যেন ফেল কড়ি বোলের মত সবটাই বিকানোর মর্যাদায় উজ্জ্বল। হৃদয়ের রক্তে সেই উচ্ছ্বাসের ধারা নয়নপুরে যত অনাবিল, কলকাতায় তার অন্তস্রোতের গতি খোঁজার চেয়ে ওতে প্রাণভরে ডুব দেওয়া অনেক শান্তির। এই কাদামাটিমাখা, মা ধরিত্রীর গায়ের গন্ধমাখা মানুষের এই প্রাণখোলা অভিনন্দন।

মহিমের বিনয়বাক্য গ্রাহ্য না করে সবাই তার প্রায়-সমাপ্ত কাজ দেখার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগল। দেখা তো সবে শুরু। কবে তার শেষ, মহিম তার কি জানে!

অহল্যা মানুষজন দেখে আর উঠোনে বেরুতে পারে না। এদের মধ্যে অনেকেই তার শ্বশুর-ভাসুর সম্পর্কের জ্ঞাতি এবং পড়শী আছে। সে ঘোমটা টেনে রান্নাঘরের বেড়া-কাটা জানালা দিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল দখিন ভিটার ঘরের ধারে সকলের

আড়ালে পিপুল তলায় ভরত হুঁকো টানা ভুলে ভিড় দেখছে। অমনি বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল তার। যেন এ উৎসবের আসরে তার আসতে নেই। যেন অনাহূত, তবু না এসে পারেনি। কেন? এখানে ভরতের অধিকারই তো সবচেয়ে বেশি। তবু সে কোন পরবাসীর মত আড়ালে রয়েছে?

হ্যাঁ ভরত খানিকটা তাজ্জব, অসন্তুষ্ট, খানিকটা সন্তুষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে আর ভাইয়ের এ কেরামতিটা তারিফ পাওয়ার যোগ্য কি-না তাই বোধ হয় ভাবছে। তার হঠাৎই মনে পড়ে গেল, তার বিয়ের পর এত মানুষ এ ভিটেয় আর কোনদিন পা দেয়নি। তারপর বাড়ির দোরগোড়ায় ওর শ্বশুর ও সম্বন্ধিকে দেখে সে চমকে উঠল এবং তার বিস্ময়কে পাহাড়সমান তুলে দিয়ে মহিম তাদের উভয়কে প্রণাম করে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। ইস্! ছোঁড়া মানুষ ভোলাতে একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছে। তার মনের মধ্যে ছোট্ট একটা কাঁটা হঠাৎ যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এই মনে করে, কই, সে তো কোনদিন পীতাম্বর বা ভজনের পায়ের ধুলো নেয়নি। যেন আসল সম্বন্ধটা তাদের তার ভাইয়ের সঙ্গেই।

তারপর হঠাৎ আমলা দীনেশ সান্যালের গলার স্বরে সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। সান্যালের মুখে এক অদ্ভুত ব্যঙ্গহাসি। মহিম সামনে এসে দাঁড়াতেই বলল, কি রে, কি এমন জানোয়ার গড়লি যে, সব গ্রাম ভেঙে পড়েছে উঠোনে?

লোকটার আবির্ভাবে ও কথায় সকলেই রুষ্ট হয়েছে বোঝা গেল। মহিম বলল, কাজ তো শেষ হয় নাই, শেষ হলেই দেখতে আসবেন। নিমন্ত্রণ রইল।

সান্যাল হো হো করে হেসে উঠে উঠানের মানুষগুলোকে দেখিয়ে বলল, এরা বুঝি অনিমন্ত্রিত? তুই ব্যাটা কথা শিখেছিস্ বেশ। চল্, না দেখি, কি আর্ট ফলালি? বাবুরা তোকে আবার আর্টিস্ট বলে।

সান্যাল দু-পা এগুতেই মহিম স্পষ্ট গলায় বলল, এখন দেখানো যাবে না সান্যাল মশাই।

মহিমের পাশ থেকে ভজন বলে উঠল। জানোয়ার পুরো তৈয়ারী না হইলে আপনি বুঝতে পারবেন না সানেলমশাই কেমন জানোয়ার ওটা।

বটে ? সান্যালের মুখে মুহূর্তে কয়েকটি ক্রোধের রেখা ফুটে আবার মিলিয়ে গেল। হেসে বলল, ভজন বুঝি ? তা ভগিনীপতির সঙ্গে সব গোলমাল কাটিয়ে নিয়েছিস ? বেশ করেছিস্। শুনেছিলাম ভরতকে পেলে নাকি তুই ঠেঙ্গিয়েই একশ' করবি। আবার সেই ভিটেই চাটতে এলি যে বড় ?

মহিম অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, সান্যালমশাই, ভজনদাদা আমার অতিথি।

দ্যাখো ব্যাটার মরণ। আমি কি বল্‌ছি অতিথি নয় ? জিজ্ঞেস করছি বিবাদ মিটে গেল নাকি ?

ভজনের চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। বলল, কথা তোমারে শিখোতে পারি সানেলমশাই কেমন করে কথা বলতে হয়। তবে ভাবি ; একেবারেই না, তোমার বাক্ থ' মেরে যায়।

বলে, সে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সান্যালের জিভটা সে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভরত পিপুলতলা থেকে সামনে এসে হাজির হল। বলল, সান্যেলমশাই, 'কাজ যদি তোমার শেষ হইয়ে থাকে, আপন কাজে যাও গিয়া। বেথা সময় নষ্ট।

সান্যাল তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, এই যে ভরত। তোমার কাছেই এসেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে। কর্তা বল্‌ছিল, তুমি যদি আপসে একটা মিটমাট করতে চাও, তা হলে একবার কাছারিতে যেও। এমনিতেও তো তুই—

ভরত বাধা দিয়ে বলে উঠল, তোমার কর্তারে যেয়ে বলো, ভরত নিজের কাম করতে জানে, অপরের পেয়োজন নাই।

এই তোমার জবাব ? সান্যালের মুখ আরও কুটিলতায় ভরে গেল। বুঝতে পারলা না ?

তা পারব না কেন ? আবার হাসল সান্যাল। মহিমকে বলল,

কর্তা তোকে একবার কাল সকালে যেতে বলেছে, বুঝলি? উনিই পাঠিয়েছিলেন তোর আর্টের নমুনা দেখতে, তাই এসেছিলাম। বলে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিজের মনেই সান্যাল বলল, হুঁ ব্যাটারা খুব বেড়েছে। তারপর লাঠি ঠুকে ঠুকে সে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সকলে চমকিত এবং কিছুটা মুগ্ধও হয়েছিল বটে ভরতের কথায়। মনে হয়েছিল, ভরত যেন সত্যই আর তেমন দূরে নয়।

ভরত তাকাল ভজনের দিকে। ভজনও তাকিয়েছিল। মনে হল তারা উভয়েই বুঝি কথাবার্তা শুরু করবে। এমনি স্তব্ধ অপেক্ষমান রইল।

কিন্তু না। ভরত হঠাৎ মহিমের দিকে ফিরে বলল, যত সব অনাছিষ্টি, আকাম। কিন্তু কোন বিদ্বেষ নেই তার গলায়।

আর একটি কথাও না বলে সে সেখান থেকে সরে গেল।

সকলেই নির্বাক এবং কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল, ভরত কাছে এসে সরে গেল বলে। ভাবটা কতক্ষণ থাকত বলা যায় না। এই সময় অখিলের দশ বছরের ছেলে ছুটে এসে মহিমকে কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, মহিকাকা, কালাচাঁদটারে মোরে দিতে হইবে।

মহিম হাসল।—কেন রে?

মুই রোজ ঘাস কেটে এনে খাওয়াব। নাওয়াব খালে। মরে গেলেও আর দিব না কাউকে!

সকলেই হেসে উঠল, কিন্তু আনন্দে নয়, দুঃখে।

এই দিনই সন্ধ্যাবেলা পরান এল মহিমকে ডাকতে। উমা ডেকেছে মহিমকে। অহল্যা তখন তাড়াতাড়ি কুড়োল দিয়ে খানকয়েক মোটা কাঠ ফেঁড়ে নিচ্ছিল। হঠাৎ উমার ডাক নিয়ে পরানকে আসতে দেখে আজ সে শুধু চমকালো না, মনের মধ্যে যেন প্রশ্ন আজ অন্যরকম ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে উৎকর্ণ হয়ে রইল মহিমের জবাবের জন্য।

মহিম আর কুঁজো কানাই তখন ঘরের মধ্যে। মহিম বেরিয়ে এসে

বলল, আজ আমি যেতে পারব না পরানদা, কাল সকালে কর্তা ডাকছে, সেই সময় যাব।

পরান ফিরে গেল। কিন্তু সে বড় বিমর্ষ।

পরদিন সকালে এক ঝাঁক বিস্ময়ের মত উমা এসে হাজির হল মহিমদের বাড়িতে, সঙ্গে পরান। খালি উঠোন দেখে পরান ডাকল মহিমকে। বেরিয়ে এল অহল্যা।

দুটি নারীই পরস্পরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ক্ষণিক চোখে চোখে তাকিয়ে রইল। যেন বহুদিনের দুটি চেনা মানুষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছে। পরমুহূর্তেই পরান কিছু বলার আগেই অহল্যা ঘোমটা তুলে দ্রুত এগিয়ে উমার পায়ের ধুলো নিল। বলল বৌঠাকুরানীরে মুই চিনি।

জীবনে কোনদিন উমাকে চোখে না দেখলেও যেন তার অন্তরই এ নারীটির পরিচয় বলে দিল তাকে।

উমা বললে, থাক্ থাক্। তোমার দেওর কোথায়?

অহল্যা জবাব দেওয়ার আগেই মহিম তরতর্ করে তার ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমে এল। ভুলক্রমে পায়ে হাত দিতে গিয়েও সে সামলে নিয়ে কপালে হাত ঠেকাল। বলল, আপনি আসছেন। আমি যে যেতাম এখনি?

গম্ভীর্য-সরল—উমার মুখ, চোখ হল ভক্তিমতীর। চোরা অভিমানে বলল সে, যেতে বলেই এসেছি। এসেছি তোমাকে শায়েস্তা করতে। কোথায় তোমার ঘর?

শুধু বিস্ময় নয়, সকলে কিছুটা বিভ্রান্তও বটে। ভরত পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে হুঁকো হাতে।

মহিম হেসে তাড়াতাড়ি বলল ঘর দেখিয়ে, এইটে। আসেন।

কিন্তু উমা আর সবাইকে যেন ভুল ভাঙ্গার জন্য বলল, কি নাকি এক কাণ্ড করেছ তুমি যে, জগতে টি টি পড়ে গেছে। তাই দেখতে এলাম।

বলেই সে মহিমের সঙ্গে তার ঘরে এসে ঢুকল। ঢুকেই স্তব্ধ-বিস্ময়ে

সে সমাপ্তি অখিল ও তার মোষের মূর্তি দেখে থমকে গেল মুহূর্তে। পর-মুহর্তেই তাড়াতাড়ি মুর্তির কাছে গিয়ে যেন পাথর হয়ে গেল। একি গড়েছে তার শিল্পী! মৃত মোষ, তার উপরে মুখ গুঁজে পড়া মানুষ! সমস্তটা যেন নিষ্ঠুর কান্নায় ভরা। এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় বুকে নিঃশ্বাস আটকে দেয় যেন কালো মোষটার অসহায় ঘাড় এলিয়ে পড়া ভঙ্গি, আর তারই মত কালো মুখ থুবড়ে-পড়া মানুষটার হাড়পাঁজরা। হাড়পাঁজরার অভিব্যাক্তি যে অবুজকান্নার বুকের মধ্যে টেনে নেওয়ার বেগ, তা সুস্পষ্ট।

সমস্ত পরিবেশটাই যেন যন্ত্রণায় ও কান্নায় ভরে তুলেছে মূর্তিটা। দেখতে দেখতে মহিমও সম্বিত হারাল।

অনেকক্ষণ পর উমা চোখ ফিরিয়ে সমস্ত ঘরটা খুঁটে খুঁটে দেখল। এক মুহর্ত বেশি চোখ আটকে রইল তার আবক্ষ গৌরাঙ্গসুন্দরের মূর্তির দিকে। তারপর ফিরল সে মহিমের দিকে। সে আত্মভোলা শিল্পীর দিক থেকে চোখ আর সরলো না। সরলো না নয়, উমা সরাতে পারল না। বুঝি উমা নিজেকেই চেনে না।

মোষের মূর্তি আড়াল করে উমা এসে দাঁড়াল তার সামনে। মহিমের সম্বিত ফিরল, চোখের পাতা নাড়ল, দৃষ্টি রইল স্থির। এত কাছে উমার সেই চোখ, আজ তাতে বিচিত্র আবেগ, ঠোঁটে মোহিনী হাসি। এত কাছে, স্পন্দিত বুকে আবরণের কম্পন দেখল আর শুধু নাসারন্ধ্র নয়, চিন্তার অনুভূতিটুকুকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলল উমার সর্বাঙ্গের বিচিত্র মধুর গন্ধ। প্রাণে সাহস যুগিয়ে মহিম স্পষ্ট তাকাল উমার চোখের দিকে।

উমা বলল আস্তে আস্তে, কি দেখছ, আমাকে গড়বে?

আপনাকে? কথার স্বর আবার যেন মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল মহিমকে। বলল আপনার মূর্তি?

কেন, গড়বার মত নয়? যেন উৎকণ্ঠা এসে পড়েছে উমার কণ্ঠে, বুঝি জীবন-মরণের প্রশ্ন! শিল্পীর সামনে তার মতোটি করে তুলে ধরবার জন্য উমা দু হাত শাড়ী থেকে মুক্ত করে, ঘোমটা সরিয়ে আঁচল টেনে দিল একটি সরু নির্ঝরের মত, দুই উন্নতস্তনের মাঝখান দিয়ে।

নীল জামার প্রতিটি রেখার সুস্পষ্ট সযত্ন রক্ষিত যৌবন। ঘাড় বাঁকিয়ে ঈষৎ পেছনে হেলিয়ে বঙ্কিম ঠোঁটে হাসল সে। বলল, বল, আমাকে গড়বে?

মহিম স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল, গড়ব।

তবে এখানে নয় কলকাতায়।

আবার স্বপ্ন ভাঙ্গে মহিমের। কলকাতায়?

হ্যাঁ, উমা আরও সামনে এসে বলল, যাবে না? আমার শ্বশুর তোমাকে টাকা দিয়ে রেখে দিতে চান তার হুকুম তামিলের জন্য, তুমি তাই থাকবে?

না।

তবে চল কলকাতায়।

ঠিক সেই মুহূর্তেই অহল্যা এসে ঢুকল! মুখে সামান্য হাসি। কিন্তু সে নিজেই বোধহয় জানে না তার চোখের দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ সন্ধানী হয়ে উঠেছে।

উমা নিজেকে সামলে বলল হেসে, তোমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও মণ্ডল-বউ, নয়নপুর ওর জায়গা নয়।

অহল্যা হাসল। নিঃশব্দ, নিষ্ঠুর সে হাসি। উমা তার জীবনেও কি এমন তীব্র শ্লেষের হাসি দেখেছে! মহিমের সে হাসি দেখে মনে হল, এক দারুণ ঝড় পাকিয়ে ওঠার মত আকাশের কোন্ এক কোণ থেকে হু হু করে কালো মেঘ অজানতে কখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সারা আকাশে।

অহল্যা বলল, 'পাগলাঠাকুর নিয়ে গেছিল ওরে কলকাতা, রাখতে পারে নাই বৌঠাকুরানী।'

'আমি পারব।'

অহল্যা তেমনি হেসে বলল, 'বৌঠাকুরানী, মোরা হইলাম গরীব চাষী গেরস্থ, একটুকুন নাই যে বসতে দেই। আপনাদের কাছে ও দুদিন বই তিনদিন থাকতে পারবে না।'

তারপর হঠাৎ সে বড় সরলভাবে হেসে উঠল। বলল, মোর

হতভাগা দেওরের আপন-পর চেতনও বেশি ঠাকুরানী। পাগলা ঠাকুর ওরে ধরে রাখতে পারল না বলে কি বেড়ানটাই দিছিল, এই মোর চোখের সামনেই।

সেই স্মৃতিতে আবার অহল্যার চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলে উঠল। উমার চোখেও বিস্মিত অনুসন্ধান। ঠিক যেন চিনে উঠতে পারছে না অহল্যাকে। এ যেন কিষানী মণ্ডল-বউ নয়, আর কেউ। চিন্তায় বুদ্ধিতে শাণিত প্রখর। অহল্যা চকিতে একবার মহিমকে দেখে বলল, তবে দেওর তো মোর আর ছেলে-পান নাই, যায় তো ওরে আটকায় কে? তবে মোরা পারি না ছাড়তে পরান ধরে।

বলে সে উমার মুখে ছায়া ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কি সরল আর সাদা উক্তি। উমা ফিরল সে ছায়া নিয়ে মহিমের দিকে। বুঝল শুধু তার শ্বশুর নয়, শিল্পীকে তার প্রশস্ত মর্যাদায়, আলোকিত আশ্রয়ে টেনে নিয়ে যেতে আর যে বাধা আছে তা বোধ হয় দুর্লঙ্ঘ্য। তবু নিরাশ সে মোটেই হল না। বলল, পুজোর ক'দিন নয়, কোজাগরী দিন পরানকে পাঠাব সন্ধ্যায়, ফিরিও না যেন ওকে। অনেক কথা আছে তার, মনস্থির করতেই হবে তোমাকে। যেও কিন্তু সেদিন?

মহিম তাকাল উমার দিকে। না, এখনও ওই চোখের সামনে প্রতিবাদের ভাষা সে কিছুতেই জিভে যুগিয়ে তুলতে পারছে না। একি স্বপ্ন, না সম্মোহন! সে বলল, যাব।

উমা ফিরল। কিন্তু মুখের ছায়া মনেও চেপে বসতে চাইছে যেন।···

পুজোর ক-দিন মহিম অন্য কিছু ভাববার সময় পর্যন্ত পেল না, এমনই একটা ভিড় লেগে রইল বাড়িতে। এমন কি নহাট মহকুমা থেকে কেউ কেউ এসেছিল তার কাজ দেখতে। পেল না সে গোবিন্দকে, বনলতাকে। তার প্রিয় দুটি বন্ধুকে। আর অখিলকেও সে আজ পর্যন্ত পায়নি তার উঠোনে। আর একজন···সে বোধ হয় কোন দিনই আসবে না! সে হল পাগলা গৌরাঙ্গ।

আর খানিকটা বিস্ময়ের ঘোর লেগে রয়েছে তার মনে, অহল্যার

নিস্তেজভাবও থেকে থেকে অপলক অনুসন্ধানী চোখে মহিমের দিকে চেয়ে থাকা! কেন?...

॥ ১৮ ॥

কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন বিকালবেলা গোবিন্দ আচায্যির বাড়ি থেকে রাজপুরে ফিরছিল। এখনও সে তেমনি আত্মহারা যন্ত্রণার ছাপ সুস্পষ্ট মুখে। যে জগৎ তার কাছে বেতাল লেগেছে, তার তালই যে শুধু আজ পর্যন্ত পায়নি, তা নয়। সমস্ত বেতালটা আজ তার মস্তিষ্কে অগুণতি হাতুড়ি পেটানোর মত পিটিয়ে চলেছে। পাগলা বামুনের সঙ্গে তার নিত্য কথা বাদ-প্রতিবাদ জানাজানি চলেছে। ভগবান নেই বা না-মানার স্বপক্ষে নয়, বাস্তব জগৎ সম্পর্কেই লক্ষ কথা। শেষটায় পাগলাবামুন তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, গোবিন্দ বিনাশ্রমে ফাঁকি দিয়ে খায়। সে ধর্ম নিয়ে থাকুক, ভগবানকে পাওয়ার জন্য যাক যেথায় খুশি, কিন্তু সংসারের হাড় কালি-করা মানুষের শ্রমের খাবারে সে কেন উদরপূর্তি করবে? মানুষের সবটাই হাতে-নাতে। সে তার মগজে আর শরীরে খাটে, তাই সে খায়। তার কাজের শেষ নেই। কিন্তু গোবিন্দ! বুঝলাম, হয়তো সে মানুষের চিত্তশুদ্ধির দায়িত্ব নিতে চায়, কিন্তু তা ধর্মের নামে কেন? দেশবাসী নিরক্ষর, ক্ষুধার্ত। ধর্ম দিয়ে কি তা ভরাট হবে? ঘরে-বাইরে কেবলি কলহ, বিবাদ, হানাহানি, মারামারি, ঘৃণা আর নীচতা। তার মূল তো ধর্ম নয়, তার অভাব, তার সমাজব্যবস্থা। যার পায়ের তলায় মাটি নেই, ধর্ম তার মাথায় কি ফুল ফোটাবে আপ্‌সে। সে যুক্তি এমনই নিশ্ছিদ্র যে বিভ্রান্ত গোবিন্দের মুখে একটা কথা যোগায়নি। আরও বলেছে গোবিন্দর চিরকাল ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের সম্পর্কে যে, এটা হল রাজপুরের আচায্যির নিজস্ব কার্য-সিদ্ধির স্বার্থের জন্যই। আচায্যি সেই পুরানো ধর্মের দোহাই তুলে তার প্রচার এবং নিজের আচায্যিপনাকে জাহির করবার জন্যই তার দরকার গুটিকয়েক নির্বিকার অবিবাহিত সংসারে কোন-কিছুতে-না-মজা

কিছু যুবকের। আচার্যের বিবাহ তো দোষের হয়নি! তারপর আচায্যির ধর্মের আন্দোলনের যে মূলটা, সেটা কি দক্ষিণভারতে ইসলামের অনুপ্রবেশ ও উত্থাপনের মুখে শঙ্করাচার্য্যের উদার ধর্মবিপ্লব এবং শ্রীচৈতন্যের জাতিহীন ধর্ম আন্দোলনের সম্পর্কে গভীর আলোচনা এবং ভারতীয় সমাজের এই বিংশ-শতাব্দীর প্রায় অর্দ্ধেকের মুখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পাগলাবামুন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে যে, আজকের আচায্যির এ আন্দোলনের উৎস মঙ্গলজনক তো নয়ই, ধর্মের তীর হলাহলে জাতির আত্মহারানোর পথ। কি মূল্য আছে আজ মসজিদের আদর্শে কতকগুলো একেশ্বরাবাদীর ভজনাগার খুলে? আচার্য বলেছে তার কালী আর কৃষ্ণ এক, তার মন্দিরে কেন মূর্তি নেই। বলে, নিজের মনের দিকে তাকাও। ভাল। কিন্তু মন্দিরে কেন? কেন আলৌকিকতাবাদ? কেন পেশা আর পয়সা। একটা সময় গেছে যখন হিন্দু ভদ্রপরিবার সমাজের নিষ্পেষণ সইতে না পেরে ব্রাহ্ম হয়েছেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মনীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু আজকের মানবসমাজকে এক ইঞ্চি এগিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও যে মানুষের আছে, ধর্মের দোহাই তুলে তা নিতান্তই অসম্ভব। একে বলে খোদার উপর খোদগিরি করা। মানলাম, ভগবানই যদি তোমাকে গড়ে থাকে, তবে গড়েছে তো মানুষ করে? তবে মানুষের মত মানুষ না হবো কেন? আমি করব আমার কাজ, অনাচার বাদ দিয়ে। বাঁচার পথে আছে অত্যাচার, অবিচার, আমি রুখব তাকে। তাতে যদি মরি, সে তো সবার বড় মরণ। যে আগুন লাগায়, আমি তাকে পরাস্ত করে নেভাব আগুন। সে-ই তো বলি তবে সেবা। ভগবান যদি মঙ্গলময়, তবে এই তার নির্দেশ নয় কি? নাকি আমাকে টানতে যেতে হবে তারই দোয়ার? কেন রে বাপু?

হ্যাঁ, স্তব্ধ নির্বাক থাকতে হয়েছে গোবিন্দকে। কেবলি ছুটে ছুটে গেছে আচার্য্যির কাছে। যুক্তি দাও, যুক্তি চাই। কিন্তু সেখানে যুক্তি নেই, কেবলি বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস। অন্তরে দুর্বার ঝড় নিয়ে তবু গোবিন্দ আচায্যির ভজনাগারে বসছে, ধর্মসভায় যাচ্ছে প্রচারে যাচ্ছে,

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। কিন্তু সেই তেজ আবেগ বিশ্বাস কই!

আর এ চিন্তারই গাঁটে গাঁটে মিশে আছে বনলতার মুখ, বনলতার কথা। এরই ফাঁকে ফাঁকে চমক লেগেছে বনলতার এক-একটি তীব্র কথা। বামুনের কথা জ্ঞানের মহিমায় গভীর, মার্জিত। বনলতার জীবনের ধ্যানের ভাষা অমার্জিত কিন্তু মূলত এক! সে হল, জীবনকে ছিনিয়ে নিতে হবে সব বাধা থেকে, প্রাণভরে বাঁচাতে হবে। আর নিজেকে সে কেমন করে চোখ ঠারবে যে, বনলতার বলিষ্ঠ জীবন-আকাঙ্ক্ষা ও উদ্ধত যৌবনের কাছে কেবলি তাঁকে মাথা নত করে পালিয়ে আসতে হয়েছে, কখনোই বুক টান ক'রে দাঁড়াতে পারেনি। অথচ শৈশবে মহিমের সঙ্গে তার বনলতাকে নিয়ে যে বউ দাবির বিবাদ হয়েছে, সে কথা মনে করে তার বুকের মধ্যে যে রঙ্গরসের জোয়ার, তা কি স্তব্ধ হয়ে গেছে? হায়, বনলতার অপলক চোখ আজ তার মত পুরুষকে পীড়ন করে। সে কি পলায়মান, সে কি কাপুরুষ বলে!

এমনি গোবিন্দের জীবনে চিন্তায় ধারণায় এক তুমুল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেই আবর্ত ঠেলে উঠতে গিয়ে প্রাণ তার ওষ্ঠাগত। অথচ মানুষ বলেই এ অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকাও চলে না।

এসব ভাবতে ভাবতেই খালের খেয়াঘাটে এসে দাঁড়াল নয়নপুর যাবে বলে। সূর্য অস্ত যায়, পশ্চিম আকাশ লালে-ধূসরে গোধূলির লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। পূবে এর মধ্যেই মস্ত বড় চাঁদখানি উঁকি মারছে। দিনটির ঝলমল বাহার দেখে কাকপক্ষীর এখনো ঘরে ফেরার কোন তাড়া নেই যেন। আজ লক্ষ্মী-পূজো ঘরে ঘরে, সাড়া পড়েছে তার। নৌকা তখন ও-পারঘাটে যাত্রী নিচ্ছে।

ঘাটে খেয়াযাত্রী মাত্র একটি মেয়েমানুষ নয়নপুরে যাবার। গোবিন্দকে দেখেই মেয়েমানুষটি মস্ত একটি ঘোমটা টেনে দিয়ে সরে গেল। কিন্তু চকিতে সে মুখ দেখে চমকে উঠল গোবিন্দ। তার শৈশবের স্মৃতিপটে ও-মুখ আঁকা আছে, তা তো ভোলবার নয়! এক দারুণ উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসল। সে বলল, ঠাকরুন, কোথায় যাবে তুমি?

ঘোমটার আড়াল থেকে জবাব এল, নয়নপুরে হাটের ধারে মালী-পাড়ায়।

কুণ্ঠায় মনটা দেবে গেল গোবিন্দের। মালীপাড়া যে খারাপ মেয়েমানুষের পাড়া। তবু বলল, রাজপুরের চক্কোত্তিদের ভাদ্দরবউরে চেন তুমি ?

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। জবাব এল, চিনি।

তুমি কি ঠাকরুন সেই বউ ?

ক্ষণিক নিশ্চুপ। মেয়েমানুষটি ঘোমটা খুলে গোবিন্দের দিকে ফিরে বলল, কিছু কি বলবে বাবা ?

মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে আড়ষ্ঠ হয়ে গেল গোবিন্দ। হ্যাঁ, সেই মুখ সেই বিশাল চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, টকটকে রং। বয়সের ভারে সবই বিবর্ণ ভগ্ন। রাজপুরের চক্রবর্তীদের ধর্ষিতা ভাদ্রবউ, গোবিন্দের বাবার ভৈরবী শ্মশানচারিণী। আজ হাটের ধারে মালীপাড়ায় তার বাস। কেন, সেদিনের মত রক্তজবার অঞ্জলি কি আর তার পায়ে পড়ে না ? গোবিন্দ বলল, মোর খানিক কথা ছিল তোমার সাথে।

এখানেই বলবে ?

না হয় মোর ঘরে চল।

ছি, মোরে ঘরে ডাকতে নাই।

তবে মালীপাড়ায় চল।

সেখানে কি পারি তোমারে নিয়া যেতে ? বলে এক মুহূর্ত চুপ থেকে সে বললে, না বলে যদি শান্তি না পাও তো, চল নয়নপুরের খালের ধারে শীতলাতলায়। সেখানে কেউ থাকবে না।

খেয়া পেরিয়ে গোবিন্দ চক্রবর্তীদের ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে খালের ধারে দিয়ে হেঁটে শীতলাতলায় চলে এল। জায়গাটা শুধু নির্জন নয়, এত নিস্তব্ধ এবং ঝোপে ছাওয়া যে গা ছম্ ছম্ করে। একটি মস্ত হিজল-গাছের তলা মাটি উঁচু করে পাথরের নুড়ি দিয়ে তাতে শীতলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানুষ নেই. কিন্তু দেখে মনে হয় নিয়তই কেউ শীতলা-তলা লেপে পুছে পরিষ্কার করে রাখে। সেখানেই তারা উভয়ে এসে

বসল।

গোবিন্দের মনে ঝড়ের এতই বেগ যে সে কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল তার বাবার সাধনার কথা, ভৈরবী জাগানোর মাহাত্ম্যের গূঢ় স্তোত্র, কারণ পান। সে শ্মশানের বীভৎস ছবি কথায় কথায় জীবন্ত হয়ে উঠল।

চক্রবর্তীদের ভাদ্রবউ শুনল সব কথা, শুনে জ্বলতে লাগল তার চোখ। তবু সামান্য হেসে বলল, এর মধ্যে ভগবানের কি লীলা আছে আমি তো জানি না বাবা! সেখানে কোন দিন ঈশ্বরও দেখি নাই, মহেশ্বরও দেখি নাই। মোর চোখে ঘোর কিছুই অনাচার ছাড়া চোখে পড়ে নাই। দেখে মনে হইত তোমার বাবার চেয়ে ঘোর ঈশ্বর অবিশ্বাসী বুঝি আর নাই। তবে, তোমার মায়ের কঠিন ব্যামো না থাকলে বাপের তোমার কি সাধ্যি ছিল আপন জীবনটারে নিয়া এমন খেলা করে?

গোবিন্দর মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি গলা দিয়ে ঠেলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বলল, তবে ঠাকরুন্ তুমি কি ছিলে, কেন ছিলে? তোমার পায়ে সেদিন এত ফুল চন্দনই বা কেন পড়েছিল?

ভাদ্রবউয়ের চোখে হঠাৎ আতঙ্ক দেখা দিল, আবার মিলিয়ে গেল সে তার অতীতের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। তারপর বলল, ফিস্-ফিস্ করে কান্নাভরা গলায়, তখন মোর শেষ সব্বোনাশ হয়ে গেছে। পাছদুয়ারের পুকুরঘাটে ভর সন্ধ্যেয় আমার গামুখভরা সমস্ত রূপের গরব দলে মুচড়ে একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল। গেছিলাম গা ধুতে, সেই সময় আচমকা ধরে আমাকে পুড়িয়ে গেল। কিন্তু বেঁচে রইলাম ভূত হয়ে ঝোপেঝাড়ে আঁধারে আঁধারে ফিরি গাঁ-ঘরের বাইরে, মানুষের চোখের আড়ালে। শেষটা স্বামীকে লুকিয়ে সব বললাম, কত অনুনয়-বিনয়, পাথর গলল না। তখন তোমার বাবা একটা আচ্ছয় দিল, ধম্মের আচ্ছয়। ইস্। কি ধম্ম। শ্মশানে মদমাংস খেলাম, তোমার বাবার ভৈরবী হইলাম, শিবের সাথে দেবী হইলাম। কি সাংঘাতিক! গাঁয়ে-ঘরের মানুষ গেছে রোগ শোক মনস্তাপ নিয়ে

আশীর্বাদ ওষুধ নিতে। ফুল-চন্দনের কথা বলছ ? কেউ দিয়েছে বুঝে কেউ দিয়েছে না বুঝে। বুঝে যারা দিছে তারা আজও যায় মালী-পাড়ায় মোর কাছে। পাপ যে এতবড় হইতে পারে তা জানতাম না।

শুনতে শুনতে হঠাৎ গোবিন্দর কাছে ভাদ্রবউয়ের দুঃখই সবচেয়ে যন্ত্রণা-দায়ক ও রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠল। সে নির্বাক, যন্ত্রণায়-বেদনায়-ক্রোধে দিশেহারা।

ভাদ্রবউয়ের চোখে স্বপ্ন নেমে এল যেন হঠাৎ পূবের গাছপালার আড়ালে চাঁদ উঠতে দেখে। ফ্যাকাসে চাঁদ সোনা হয়ে উঠছে, আগুন-ধরা আকাশ। শীতলাতলার গাছ ঝোপঝাড়ের ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে যেন অনেক অশরীরি আত্মার মত। ভাদ্রবউ বলল, পিতি বছর এই দিনটাতে আসি রাজপুরে ঘোমটা টোমটা টেনে। আসতে আসতে মনে হয় পাপ তো কই করি নাই, আমি তো সোনা! হ্যাঁ, এমন দিনেই বাপের বাড়ীর গাঁয়ে সদর-পুকুরের ধারে গেছি পাথরবাটি ধুতে, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর চিত্তির দেওয়ার পিটুলি গুলব বলে। গড়ান বেলা ধুয়ে উঠবার মুখে দেখি এক সুন্দর পুরুষ, এ্যাই বুক, এ্যাই হাত আর কি সোন্দর চোখমুখ। কচি আম পাতার নধর শ্যাম। আইবুড় মেয়ে আমি, বুক কাঁপল, পরান চমকাল। ভয়ে ভয়ে নয়, সে যেন আর কিছু। পুরুষটিরও সেই দশা। অপলক চোখে কেবল দেখল কোন বাড়িতে ঢুকি। তারপরেই বিয়ের সম্বন্ধ গেল রাজপুর থেকে। পুরুষ হল চক্রবর্তীদের ছোট ছেলে, আমার সোয়ামী। বাপ মোর পূজো-আচ্চা করে খেত, তাই নিয়ে কথা উঠল। কিন্তু চকোত্তিদের ছোটছেলের জেদের কাছে তা হার মানল। বিয়ে হল। তারপর…

চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠল ভাদ্রবউয়ের চোখের জল। বলল, বছরে এ দিনটাতে না এসে থাকতে পারি না। একবার তাকে দেখব বলে। সে দিনটি যে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

হাহাকার করে উঠল গোবিন্দবাবুর বুকের মধ্যে। বলল, বল ঠাক্‌রুন, বলতে হইবে মোরে। কে তোমার এমন সব্বোনাশ করছিল।

বিদ্রূপের জ্বালায় চোখ জ্বলে উঠল ভাদ্রবউয়ের। কঠিন হেসে

বলল, শুনি সে নাকি এখন ব্রোহ্মজ্ঞানী হইছে, ধম্মো করছে। লোককে কালীকেষ্ট দেখায়, শিষ্যি নিয়ে মঠ-মন্দির গড়ে। দলের পাণ্ডা ছিল সেই রাজপুরের আচায্যি।

আচাযিয়? আচমকা পৃথিবী ফেটে চৌচির হয়ে গেলেও বোধ করি গোবিন্দ এতখানি বিস্ময়ে চমকে উঠত না। তারপরই এক সাংঘাতিক বোবা ক্রোধে তার সমস্ত শিরা-উপশিরায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল! আচাযিয়! ধর্মগুরু আচাযিয়র এই সর্ব্বনাশা কীর্তি। আর তার বাক্‌স্ফুরণ হল না, আর কিছু শুনতে ইচ্ছা করল না। শান্ত সাধকের হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠল, নিস্‌পিস্‌ করে উঠল হাত। এখুনি কি সেই ধর্মের ষাড়টার মাংসলো গলাটা টিপে শেষ করে দেওয়া যায় না!

ভাদ্রবউ শঙ্কিত হল গোবিন্দর মুখ দেখে। ভাবল, না জানি কি সব্বোনাশই করেছে সে গোবিন্দকে সব কথা বলে। কিন্তু গোবিন্দ আর কোন কথা না বলে বিদায় নিয়ে গ্রামের পথ ধরল। পেছন থেকে ভাদ্রবউয়ের গলা তার সঙ্গে এগিয়ে এল, অস্থির হয়ে কোন সব্বোনাশ ক'রো না বাবা। কেবল দেখো, আর কোনো আবাগীর না মোর মত কপাল ভাঙ্গে!

পূবের কোল থেকে চাঁদ খানিক উপরে এসেছে। শরৎপূর্ণিমা। ধোয়া আকাশ। নীল নয়, যেন কালো কুচকুচে! গাছপালা সব চক্‌চক্‌ করছে, তবু তবু ঝুপসিঝাড়ে আঁধার যেন জমাট। আলোও গভীর, ছায়াও গভীর। হেমন্তের গন্ধ পাওয়া যায় সামান্য হাওয়ায়। এমনি সময় মনে হয়, এ আলোছায়া, শরতের ওই চাঁদ, এই বর্ণ—সবাই যেন এক দুর্বোধ্য অজানা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি নিয়ে চেয়ে আছে।

বাড়ির ফণীমনসার বেড়ার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল গোবিন্দ। কে? শাড়ীপড়া মেয়েমানুষ, মাথায় ঘোমটা নেই, অবিন্যস্ত বুকের আঁচল, যেন বুকের দিশা নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি মাত্র বঙ্কিম বিচিত্র আলোর রেখায় এক রহস্যময়ী যৌবনের ছবি আঁকা। ছায়ায়-ঢাকা বাঁকা শরীরে অস্পষ্ট রেখা আরও তীব্র রহস্যঘন। গোবিন্দ

দেখল বনলতা। কিন্তু একি চোখ, একি দৃষ্টি বনলতার! একি কান্না, ক্রোধ, নাকি আর কিছু? মুহূর্তে চোখ বুজল গোবিন্দ। সারা মুখে দরদর ধারে ঘাম বইছে, যেন জ্বরের ঘোরে কপালের শিরাগুলো স্ফীত। আহা, ভাদ্রবউয়ের সে মুখ তো ভোলা যায় না। আবার চোখ খুলল। ঝুঁকে পড়ল বনলতার মুখের কাছে। কই, মনে তো হয় না, এ মেয়ে ধর্মবিরুদ্ধ, অর্বাচীন, অসতী!

গোবিন্দের ভাব দেখে হঠাৎ শান্ত হয়ে আসে বনলতার চোখ, উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে বুক। দু-হাতে গোবিন্দর হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, কি হইছে সাধু, কি হইছে তোমার?

না, আজ চোখ ঠারল না গোবিন্দ নিজের। কুণ্ঠায় ত্রাসে প্রাণে তার ধরিত্রীর অন্ধ-গর্ভ খুঁজল না। নাই-বা থাকল মহিম, এখুনি নাই বা পাওয়া গেল পাগলা বামুনকে। এ মেয়ের কাছেই আজ সে সব কথা বলবে। এ মেয়ে কি তার পর?

ঘরে পিসীর লক্ষ্মীপূজো। লোকজনের সাড়া পাওয়া যায় বাড়ির ভিতরে! বৃদ্ধ নসীরামও আজ মেতেছে। সেবাদাসী সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সে গান ধরেছে।

বনলতার সঙ্গে গোবিন্দ এল আখড়ার পিছনে ডাহুকের আস্তানায় ডোবার ধারে। সেখানে বসে উত্তেজনায় আবেগে সব কথা সে বলে গেল বনলতার কাছে। বলতে বলতে আবার বোবা ক্রোধে থমথমিয়ে উঠল গোবিন্দ। বলল, আচায্যিরে খুন করব মুই।

আশ্চর্য শান্ত আর মমতাময়ী হয়ে উঠেছে বনলতা। শঙ্কিত গলায় বলল, ছি, খুনের কথা বল না। আচায্যিরে ত্যাগ দেও তুমি। ওর ধম্মের ভোল ভেঙ্গে দেও।

কিন্তু আবার কান্নায় ভরে উঠল গোবিন্দের গলা। বলল, মায়ের কথা মোর মনে হইলে বুকটা ফেটে যায় রে লতা। সে পাপের বুঝি প্রাচিত্তি নাই।

এর প্রাচিত্তি আর কি হবে সাধু। বলে বনলতা হাত রাখল গোবিন্দের উষ্ণ কপালে।

সাধু নয়, মোরে গোবিন্দ বলে ডাক্ লতা।

ও নাম মোরে নিতে নাই।

সহসা যেন নতুন গলার স্বরে চমকাল। নিঃসীম আকাশে শরতের চাঁদ যেন কুহেলিকা। তার আলোয় বনলতার মুখও কুহেলিকা পূর্ণ। ঠোঁটে হাসি ফুটল বিচিত্র, চোখে মোহিনী লীলা। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস লাগল গোবিন্দর গলায় গালে। তার সারা শরীর কাঁপল। বুঝি চকিতে সেই কুণ্ঠাও এল। কেবলি মনে হল, এ মেয়ে কি তার পর? বলল, ছোটকালে তুই তো মোরে নাম ধরে ডাকতিস্?

ছোটকাল যে আর নাই। বলতে বলতে সেই দুরন্ত মেয়ে বনলতাও আজ গোবিন্দের চোখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

গোবিন্দ বলল, কি আছে?

মোরা আছি।

সেই তেমনি?

না। নতুন ধারা।

বনলতার পাতা হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে যেন বহুদূর থেকে বলল গোবিন্দ, জগতের তালটা ধরতে পারি না, মোরে খানিক তুলে ধর্ তো বনলতা।

বনলতা তার প্রজাপতির ঝাপ্টা খাওয়া খালি বুকটায় গোবিন্দর মাথাটা চেপে ধরল। গোবিন্দর এ আত্মসমর্পণে কান্নায় বুকটা ভরে উঠল তার। জড়ানো দু'হাতে তার সতেজ বনলতার মহীরুহ বেষ্টনীর উল্লাস!

এমনিভাবে বুঝি ধরিত্রীর গর্ভে নতুন ভ্রূণ সঞ্চারিত হয়।

ঝোপের ছায়ায় আখড়ার বেড়ায় হেলান দিয়ে বনলতার অন্তর্যামী নরহরি সে দৃশ্য দেখল। অন্তর্যামী বলেই বোধ হয় তারও মুখ হাসিজলে মাখামাখি। গলায় সুর কেঁপে উঠল তার। কিন্তু না, সখী বাধা পাবে গলার স্বরে। আখড়ায় ঢুকে সকলের আড়ালে একতারাটি নিয়ে সে তেপান্তরের পথ ধরে খালের মোহনার দিকে এগোল। বিরহ নয়, বুক উজাড় করে মিলন গাথাই গাইবে সে আজ।

কিন্তু ভাদ্রবউয়ের অনুরাগে-ভরা এ রাত্রি যেন কি খেলা শুরু করেছে।

এমনি সময় মহিম উমার ঘরে, উমার পাশে অর্ধচেতন বিহ্বল মূক হয়ে বসে উমাকে উদ্বেলিত আবেগ উত্তেজনার কাকুতি শুনছে।

তেপান্তরের ধারের সেই জানলা দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে। রাজপুরের ধূসর রেখা, দূর আকাশে হেমন্ত কুয়াশার পাতলা আভাষ। প্রাণবন্ত শারদরাত্রি, শরতের শ্রেষ্ঠ দিনই। শিউলী-ফুলের মোহিনীগন্ধ যেন লেপ্‌টে রয়েছে সর্বত্র। দিন ভেবে পাখী ডাকে আলোভরা বাসা থেকে। ভেসে আসে লক্ষ্মীপূজোর কাঁসরঘণ্টার শব্দ। এ বাড়িতেও আজ পূজো। নীচে চলেছে সে উৎসব, ঝি-চাকরের হাতে সব ভার। খাটছে আমলা-কামলারা। গৃহিণী লক্ষ্মী অভিসারে মত্ত।

উমা আজ সশস্ত্র। মারণাস্ত্র তার সর্বাঙ্গে, চোখে মুখে বেশে। সে অস্ত্র অদৃশ্যে অন্তর ঘায়েল করে। আজ পাড়াগাঁ নয়নপুরের শিল্পীকে ঘায়েল করার জন্য এই আয়োজন। কিন্তু কেন? শিল্পীর জীবনকে উন্নত মর্যাদাময় আসনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য? দেবতার জন্য ভক্তিমতীর একি আয়োজন! হ্যাঁ, বর প্রার্থনার কৌশলই বুঝি এই যে, দেবতার সমস্ত চেতনাকে গ্রাস করতে হবে।

ঘরের এক কোণে নিষ্কম্প স্তিমিত আলো। দরজা বন্ধ। সমস্ত মহল নিস্তব্ধ, কেবল যেন অনেক অদৃশ্য মানুষের পদশব্দে ধুপধাপ শব্দ শোনা যায়।

উমার সর্বাঙ্গে একটিও গহনা নেই, বাঁধা নেই চুল। সবই যেন চোখে বহ্নি, প্রাণে বহ্নি, বহ্নিময়ী উমা। সেই বহ্নি ডাক দিয়েছে মহিমকে উমা বলে চলেছে শিল্পীর জীবনের ভবিষ্যৎ দুনিয়া জোড়া যার নাম, পথে পথে যার পরিচয় ঐশ্বর্য সুখ একটানা সুখের জীবন। গ্রাম নয়, শহরে। নয়নপুর নয় কলকাতা। বোধ করি ও মন্ত্রেরই পাশে পাশে যে কথাটি চাপা আছে তা মণ্ডল-বউ অহল্যা নয়, শহরের ধনী বিদুষী উমা।

কিন্তু মহিমের অসহায় বুক ত্রাস, অবিশ্বাস। বিদ্যুতের মত চম্‌কে উঠছে অহল্যার চোখ, নিষ্ঠুর বঙ্কিম ঠোঁট অথচ কান্নাভরা। কলকাতায় পাগলা গৌরাঙ্গের কাছ থেকে চলে আসার দিন সেই চোখের জল, আলিঙ্গন। শৈশব থেকে যৌবন এক বিচিত্র বন্ধন গড়ে উঠেছে। কি জানি, কি সে বন্ধন। তবু নাড়ির টান যেন! দুর্বোধ্য মন শুধু বলে, অহল্যা, বউ যে! আর এই নয়নপুর রাজপুর, খাল, মাঠ, সবার বড় তার মানুষ, হরেরামদী, অখিল, পীতম্বর ভজন, কুঁজো কানাই, অর্জুন পাল, গোবিন্দ, বনলতা, আখড়া—এমন কি তার দাদা ভরত, তার প্রাণকেন্দ্রের বেড়া। যেখান থেকে হাত বাড়ালে মাটি পাওয়া যায়।

সে বলল মাথা নীচু করে, না নয়নপুর ত্যাগ দেওয়া মোর হইবে না।

সে কথায় বহ্নিশিখা আরও লেলিহান হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরে চাঁদের আলো নিয়ে দাঁড়াল উমা। বঙ্কিম ঠোঁটে মর্মঘাতী হাসি, বিলোল কটাক্ষ করে এক হাতে মহিমের চিবুক তুলে ধরে বলল, ভয় পেয়েছো? কেন? তোমার জীবনটা বড় হোক, আমার এ চাওয়া কি ভুল?

না।

তবে?

মহিম তাকালে চোখে তুলে। বুকের মধ্যে ধ্বকধ্বকিয়ে উঠল তার। সামনে যেন তার আগুনের শিখা জ্বলছে। আব্‌ছায়াতে অধো-আড়াল করা উমার সুগঠিত বুকের অতল রহস্যের ঢেউ উঁকি দিচ্ছে। হাত দিয়ে মহিমকে টেনে ধরে উমা বলল, আমি তোমার শিল্পের ভক্ত, নয় কি?

হ্যাঁ!

তুমি প্রতিষ্ঠা চাও না?

চাই।

আমাকে চাও না?

মহিম নীরব।

উমা বলল, আমার ভক্তি তুমি চাও না?

চাই।

তবে তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে কিছু করতে দেবে না?'

দেব।

তবে চল কলকাতা।

মহিম নির্বাক। কিন্তু উমা শিল্পীর গুণটুকু ছেড়ে শিল্পীকেই গ্রাস করতে চায় যেন। একি প্রাণের লীলা যে, শিল্পীকেই টেনে নিতে চায় সে! বিদুষী, ধনী, জমিদারের পুত্রবধূ উমা, নিজেকে চেনে না। কিন্তু অজপাড়াগাঁয়ের এ চাষী ছেলেকেই কি চেনে?

উমা বলল, জমিদারের মাইনে নিয়ে থাকতে চাও তুমি?

না।

তবে কিসের প্রত্যাশা তোমার এখানে? কি সুখের আশায়?

মহিম অসহায় নিরুত্তর। কোন সুখের প্রত্যাশাই তো তার নেই।

হঠাৎ উমা তীক্ষ্ণ গলায় ঢেউ দিয়ে বলল, তোমার বউদি দুঃখ পাবে, তাই।

মহিম বলল, নয়নপুর মুই পারি না ছাড়তে।

উমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। বলে উঠল, নাঃ ছোটলোক কখনো মানুষ হয় না। নিজেদের ভাল-মন্দও কি তোমরা বুঝতে পার না?

শুধু চমকাল না মহিম। বিস্মিত বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে জ্বলে গেল অপমানে, সিঁটিয়ে গেল ঘৃণায়। একটু চুপ থেকে বলল, আমি যাই তা হইলে?

আমার উমা পেথম খোলে। বলল, আমি তোমার বন্ধু, বোঝ না?

বুঝি।

তোমাকে ডেকে আনি জানলে আমার শ্বশুর রুষ্ট হবে, তবু ডাকি, জান তুমি?

জানি।

তবে আমাকে কি খারাপ মানুষ ভাব?

মহিম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, ছিঃ, তা কি করে হয়?

তবে?

মোরে মাপ করেন।

না, সুন্দরের ভক্ত মহিম, উমার কাছে সে রুষ্ট হতে জানে না।

উমা বলল, বাইরে পরান আছে, দরজা খুলে যাও। তারপর আপন মনেই বলে উঠল, চাষার পো, মাটি কাটা ছাড়া আর কিছু হবে না। শুনল সে কথা মহিম।

উমা তাকিয়ে রইল মহিমের চলমান শরীরটার দিকে। নরম শ্যামল মিষ্টি শিল্পী, কিন্তু দেহের কোথায় যেন একটা কঠিন ভঙ্গি ফুটে রয়েছে। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে আচমকা ছুটে গিয়ে দু'হাতে জাপটে ধরল উমা মহিমকে। বলল, প্রণাম করলে না আজ?

মহিম রুদ্ধশ্বাস, অগ্নিদগ্ধের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেই বাহুবেষ্টনীর মধ্যে। তাকালো। চোখে যেন দেখল, তাকে নিয়ত আড়াল করা অহল্যা বউয়ের মুখ ঝুঁকে পড়ল সে পায়ে হাতে দেওয়ার জন্য। বাধা দিয়ে উমাই দু'হাত আটকে রাখল তার বুকে। বলল, ডাকলে আসবে তো?

আসব।

হাত ছেড়ে দিয়ে উমা ভাবল, এটা তার নিয়তি।

বিস্ময় আর অপমান শুধু নয়, এক দুর্বোধ্য বোবা জ্বালায় প্রাণটা পুড়তে লাগল মহিমের। কান দুটো এখনো জ্বলতে লাগল উমার কথাগুলো মনে করে। একবার মনে হল, সবটাই প্রলাপ। উমার আবেগ, রাগ সবই। আবার মনে হল না, তাকে অপমান অপদস্ত করাই জমিদারের ছেলের বউয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু তার সমস্ত বুক, হাত যেন জ্বলে যাচ্ছে। আগুনের আলিঙ্গন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কি যেন ঠেলে আসছে গলার কাছে, বুঝি কান্না পাচ্ছে। একি অভাবনীয় ব্যাপার। এমন অবাস্তব, এমন অসম্ভব হল কি করে যে উমার মত মেয়ে তাকে আলিঙ্গন করতে চায়?

না, সে কথা বুঝবে না মহিম। যে-উমা তাকে অমন করে চেয়েছে সে বিদুষী নয়, অভিজাত নয়, বুঝি জমিদারের পুত্রবধূও নয়। সে এক প্রেম-কাঙ্গালী মেয়ে। কিন্তু তার ভয় বেশি, ক্ষুধা তার সর্বগ্রাসী,

সংসারের প্রতি তার অবিশ্বাসই শিল্পীকে মূল থেকে উপড়ে টেনে তোলার উত্তেজনা জুগিয়েছে।

পরান গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল তাকে। মহিম টলতে টলতে ঘুরপথে বাড়ি ফিরে চলল।

কি রাত! উমার ঘর থেকে দেখা রাত্রির কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ল না মহিমের।

কিন্তু এ রাত যেন ভাদ্রবউয়ের প্রাণের হাহাকার ভরা রাত্রি।

মহিম দেখল, একটা ঝোপঝাড়ের অন্ধকার ছায়ায় কি যেন নড়ছে। দেখল, হাত তুলিয়ে মাথা নাড়ছে কুঁজো কানাই। অদূরে কালুমালার মেয়ে উঠোনের নিকনো কুরচিতলায় বসে কাঁদছে এই লক্ষ্মীপূর্ণিমার ভর রাত্রে। লুকিয়ে তাই দেখছে কুঁজো কানাই।

মহিম কোন কথা বলল না, ডাকল না কানাইকে। কেবল তার বুকের যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও ভরে উঠল জ্বালায়। আরও দ্রুত মহিম পা চালাল ঘরের দিকে।

উঠোনে এসেই দেখল অহল্যা তার ঘরের দাওয়ায় এদিকে তাকিয়েই বসে আছে! মুহূর্ত স্তব্ধতা। যেমন করে কলকাতায় পাগলা গৌরাঙ্গের ঘরে ছুটে গিয়েছিল মহিম অহল্যাকে দেখে, আজও তেমনি শিশুর মত ছুটে গিয়ে অহল্যার কোলের উপর দুহাতে মুখ ঢেকে নীরব দুরান্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে।

আশ্চর্য! অহল্যা চমকাল না, বিস্মিত হল না। যেন সবটাই তার জানা ছিল। দু-হাতে মহিমের পিঠে মাথায় গভীর স্নেহে হাত বোলাতে লাগল সে, আর ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শক্ত করে রাখল নিজেকে। কেবল চোখ দুটোকে কিছুতেই স্বচ্ছ রাখতে পারল না।

এমনি কাটল কিছুক্ষণ···মহিম রক্তিম ভেজা চোখ তুলল, অহল্যার দিকে। মাথায় কাপড় নেই অহল্যার, কাঁধ খোলা। বিশাল বুক ঢাকা কাপড় বগলের পাশ দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছে। কপালে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। নির্নিমেষ চোখে জল। মহিমের গালে হাত বুলিয়ে বলল, মোরে কিছু বলতে হইবে না।

হ্যাঁ, বল্‌তে হইবে।

মহিমের গলার স্বর শুনে চম্‌কে তাকাল অহল্যা। বলল, কি বলবে?

মহিম বলল, শরীরটা জ্বলে যাচ্ছে।

অহল্যা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল। হায়, একি সর্বনাশা চোখ হয়েছে মহিমের। শিশু নয়, কিশোর নয়, দুর্দম যুবক। চোখে তার আগুন। দুরদুর করে উঠল অহল্যার বুক, মুখটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। সে ডাকল তীব্র চাপা গলায়, ঠাকুরপো!

মহিম নির্বাক, আতুর।

অহল্যা ডাকল, মহী!

যেন ন'বছরের বউ পাঁচ বছরের দেবরকে শাসনের ডাক দিল।

মহিম বলল. কি?

অহল্যা দু'হাতে মুখ ঢেকে বলল, মোরে গলায় দড়ি দিতে হইবে?

চম্‌কে পেছিয়ে এল মহিম।—কেন?

নয় তো কি?

কি যেন হৃদয়ঙ্গম করে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ফিরে মহিম তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

অহল্যা ভেঙ্গে পড়ল কান্নায়। বাঁধভাঙ্গা পূর্ণিমার আলোর মত কান্নায় ডুবে গেল সে।

তারপর অনেকক্ষণ বাদে উঠে সে ডাক দিল, ঠাকুরপো, খাবে না? ভেতর থেকে জবাব এল না। কান পেতে শুনল মহিমের ঘুমন্ত নিঃশ্বাস।

অহল্যা এল নিজের ঘরে। ভরত ঘুমোচ্ছে। কিন্তু অহল্যার চোখ যেন শ্বাপদের মত জ্বলছে অন্ধকার ঘরে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বিছানার কাছে এসে হঠাৎ ভরতের বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে।

ভরতের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বলল, কি রে বউ?

অহল্যা নীরব।

ভরত বলল, মহী আসে নাই জমিদার বাড়ি থে'?

আসছে।

তবে কি মানিক ছোঁড়া ভাত খেতে আসে নাই?

আসছিল।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভরত বলল, কাল আদালত থে' আসবার সময় লবপুরের ধনাই ফকিরের মাদুলী একটা নিয়া আসব, সেধে তোর ছাওয়াল আসবে।

এবার অহল্যার অবুঝ কান্নায় বুক ভাসল ভরতের।

আহা, বাঁধা বীণার তারে বেসুর কি গভীর!

॥ ১০ ॥

শুক্লপক্ষ কেটে গিয়ে কৃষ্ণপক্ষ এল। শীতের আমেজ লাগা দিনের পরে রাত আসে আকাশ ভরা হেমন্তের হাল্কা কুয়াশা নিয়ে। সেই কুয়াশায় আকাশের তারা ঝাপ্সা। এখন আর চোরা হিম নয়,রীতিমত শিশিরে ভিজে ওঠে সব। যারা এ হিমকে ভয় পায়, বুড়োরা তাদের বলে, ভাদরের রোদ আর আশ্বিনের ওষ, খামকা লোকে দেয় কার্তিকের দোষ।'...মাঠে মাঠে আর সবুজের নামগন্ধ নেই, সবই সোনার বরণ হয়ে উঠেছে। ধানখেগো পাখীর দৌরাত্ম্য বাড়ে। পাকা ধানের গন্ধ ছড়ায় বাতাসে। ছোট বড় সকলের চোখেই স্বপ্ন, গরু মোষের ড্যাবা চোখে।

কামারের ঘরে হাপরটানের কামাই নেই। শুধু কাস্তে কুড়ুল তো নয়। এসময়ে জল উনো। ভরা ডোবা শুকোয়, পথঘাট সব খটখটে হয়ে ওঠে। বাজারে হাটে গরুর গাড়ী চলেছে, গাড়ীর চাকাও তৈরী হয়।

খালের জলে জোয়ার-ভাটা খেলে, কিন্তু বর্ষার অথৈ জল নয়, নামতে শুরু করেছে। আর জলও কাঁচের মত টলটলে।

গতানুগতিক হেমন্ত নয়, নতুন হেমন্ত। আশার সঙ্গে নতুন প্রতীক্ষা। গ্রামে গ্রামে ঢোল পেটানো হয়েছে, বাড়তি খাজনা বন্ধের ও বেগার কাজের। তার সঙ্গে আর একটি কথাও ছিল যে, নজরানা বন্ধ। যে দেবে সে হিন্দু হলে গরু খায়। মুসলমান হলে শুয়োর খায়। ভাগের কথায় সাব্যস্ত হয়েছে, বীজ লাঙ্গলে খাটুনি ফসল ফলানো—এ দায় রইল চাষীর। তারপর যে যায় ভাগ নেও আপন আপন খাটুনি ঝাড়াই মড়াই করে। লোক চাইলে মজুরি দিতে হবে তার। মোদ্দা কথা হল, না খাঁটি তো দাঁতছড়কুটি আর পাই খাটি তো পাই চাই। গতর বলে কথা।

মহাজন জোতদারে সলাপরামর্শ করে, আকাশ ভাঙ্গে জমিদারের মাথায়। বেগার ছাড়া তো জমিদারীই অচল। নজরানা ছাড়া ঐশ্বর্য্য কোথায়!

হ্যাঁ, গ্রামে গ্রামে মহকুমায় জেলায় আলোড়ন পড়েছে খুব।

দিন যায় নয়, দিন আসে।

কিন্তু মহিম যেন ঝিমোয়। প্রায় নিঃসাড়, গতি স্তব্ধ। হাসে না, কথা বলে না, মূর্তি গড়ে না! কি যেন হয়েছে, কি যেন ভাবে। সেদিন আর নেই। সব সময়েই লোকজন আসে, নানান কথা বলে, জিজ্ঞাসাবাদ করে, কি হয়েছে ?

কি হয়েছে, তা কি মহিমই জানে। কোথায় যেন সব বিকল হয়ে গেছে।

অহল্যা সব বুঝতে পারে। তা ছাড়া বুঝবার আর তার কেউ নেই বোধ হয়। তাই সে সামনে সবসময়ই সপ্রতিভ সরস। বুঝি বা একটু বেশিই। একেবারে বিলুপ্ত না হোক, ছায়া দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে মহিমের মনের গত সব দুর্ঘটনার যন্ত্রণার বেদনার ছবিগুলো। কিন্তু আড়াল আবডাল থেকে দু-চোখ মেলে উদগ্রীব হয়ে মহিমকে দেখে সে। দেখতে দেখতে কখনো কান্নায় কখনো নিষ্ঠুর হাসিতে ঠোঁট বেঁকে ওঠে তার।

ভরত দেখে সবই, থাকে চুপচাপ। ভাবে ছোঁড়ার যেন আবার কি,

হয়েছে। মনে করে হয়তো বা বউদি-দেওরে কোন বিবাদ মান-অভিমান চলেছে। তবু অহল্যারে নিরলস কাজের ফাঁকে ফাঁকে থম্‌কানো কান্না দেখে বুকটা তার ভারী হয়ে ওঠে। আবাগীর বুকটা খালি কি-না অফলা গাছ। কিন্তু ঝাড় ফুঁক মাদুলী জলপড়া কোনটাই তো বাদ গেল না। এ গেল এদিকে, আসলে ভরতের প্রাণ পড়ে আছে আদালতে, যেখানে তার জীবন-মরণের হদিস পড়ে আছে।

বনলতা ও গোবিন্দকে দেখে মহিম শুধু চমকায়নি, থম ধরা ভাব তার গভীর হয়েছে। প্রিয়বন্ধু গোবিনের চোখে স্বপ্ন, নতুন আমেজে সজীব। তাকে দেখলে আজকাল আর উদাসী ধার্মিক বাউল বলে ঠিক মনে হয় না। তার গেরুয়াতে যেন কিসের রং লেগেছে! সে প্রায়ই মাঠে যায়, এতদিন যেন স্বপ্নের ঘোরে ফেলে রাখা ক্ষেত জমির হদিস পড়েছে। রাজপুরের আচায্যির কথা বলেছে সে ঘরে, উল্‌টে আজ আচায্যির মুখোস খুলে তার সর্বনাশের পথ তৈরী করছে। সে বলেছে সব কথা মহিমকে, পাগলা বামুনকে। আচায্যিও পড়েছে খুব বেকায়দায়। সে নাকি বলতে শুরু করেছে, এ পাপের দেশ ছেড়ে চলে যাবে বৃন্দাবন।···গোবিন্দ আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছে জোতদার জমিদারের সঙ্গে বিবাদে।

কিন্তু মহিম চমকায় বনলতা ও গোবিন্দকে দেখে। ভাবে ওদের যেন কিছু একটা বোঝাপড়া হয়েছে।

বনলতার ঠোঁটে বিচিত্র হাসি সব সময় লেগেই আছে। মনে হয় বিজয়িনী বনলতা। কিশোরীর চাঞ্চল্য কেটে গিয়ে যৌবনের ভয়ে ধাধসে চলে সে। অস্থির নয়, সুস্থির। ভরাট প্রাণের গভীরতা তার চলনে বলনে। মহিম দেখে, হাসিতে তার গভীর অর্থ। শুধু চমৎকার নয়, মহিমের চাপাপড়া প্রাণে যেন ঘা লাগে আরও।

এই সময় একদিন হঠাৎ ভোরবেলা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল একটা কথা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে; মহকুমায়, জেলায় হরেরামের হত্যার কথা!

হরেরামদা খুন হয়েছে। মহিমের পায়ের তলায় মাটি টাল খেয়ে

উঠল। বিশ্বাস করা যায় না যেন। হরেরামদা খুন! কেন? কার, কাদের এতবড় শত্রু হরেরামদা? নয়নপুরের চাষী যোদ্ধা, নতুন দিনের সবার চেয়ে এগুনো মানুষটা। মহিমের মনে পড়ল সেই সভার কথা, হরেরামদা'র একহারা শক্ত শরীরটা তেজে প্রতিজ্ঞায় খাড়া, মুখভরা হাসি আর, কি কথা! সবার মুখে এক নাম, ছোট বড় সবার মান্যিতে যে সারা তল্লাটে গণ্য হয়ে উঠেছে, সেই হরেরাম। চিরটাকালই মানুষটা পথের ক্ষেতের তরকারী বিক্রী করেছে হাটে বাজারে, পরের গাড়ী চালিয়েছে, পরের মাঠ চাষ করেছে নিজের পরিবারটিকে জিইয়ে রাখবার জন্য! নিজের কিছুই ছিল না। সেই মানুষের এমন শত্রু কে?

গত ক দিনের সব কথা চাপা পড়ে গেল মহিমের মনের তলে। সে ছুটল হরেরামের বাড়ির দিকে।

প্রথম হল্লাটা কাটিয়ে উঠে সারা নয়নপুর, রাজপুর তখন থম্ থম্ করছে। চোখে চোখে চাপা আতঙ্ক সন্দেহ, কান থেকে কানে কথা চলছে ফিস্‌ফিসিয়ে। যেন হাওয়ায় গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে সবাই। দু-চারজনের চোখ স্থির জ্বলন্ত, কঠিন। যেন সেই গোপন হত্যাকারীকে চিনে ফেলেছে তারা।

গাঁয়ের মেয়েরা ঘিরে আছে হরেরামের বউকে। কিন্তু আশ্চর্য। হরেরামের বউ তো কাঁদছে না। একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে দাওয়ায় বসে আছে। সন্তান-শোষিত অবনমিত বুক খোলা, কাপড় ঢাকা পেট মস্ত উঁচু হয়ে আছে। পোয়াতি বউ। কোলের ছেলেটা বিস্মিত চোখে মেয়েদের দেখছে থেকে থেকে, আর মুখের মধ্যে মুঠি পুরে দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে।

এর মধ্যেই দেখা গেল, কেউ কেউ প্রেতযোনির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। অসময়ে, রাতের কোন বিশেষ প্রহরের অন্ধকারে বেলতলা, শ্যাওড়াতলা, বাঁশঝাড়ে যে অশরীরি আত্মারা বাগ পেলে ঘাড় মটকে দিয়ে খায়, কে না জানে একথা। আর হরেরামকে পাওয়াও গেছে বাঁশঝাড়েই। কোথাও কাটাকুটির দাগও নাকি নেই। এখন কথা হল, কার পাপে, কার দোষে? বউয়ের পাপ সোয়ামীতে বর্তায়,

সবই জানে। হয় তো ভরা পেট নিয়ে ওই মাগী কোন বেচাল করেছে। সাঁঝে দাঁড়িয়েছিল বা ছেঁচতলায় নয়তো মাঠেঘাটের হাওয়া নিয়ে এসেছে বলে। তবে বেহ্মদত্যির পথে পড়লে দোষী-নির্দোষীর প্রশ্ন নেই ?

একজন জিজ্ঞেস করল বউকে, পায়খানা ফিরতে বার হইছিল নাকি রাতে ?

চোখ না তুলে ঘাড় নাড়ল বউ।

তবে ?

স্থির ভাবলেশহীন চোখ তুলে সবাইকে দেখে বউ আবার মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, চোখে মোর আধঘুম, অনেক রাত তখন! কে যেন তাকে ডেকে নিয়ে গেল।

ডেকে নিয়ে গেল ? সবাই কণ্টকিত হয়ে উঠল। মহিমও। যারা 'বেহ্মদত্যি'র হদিস পেয়েছে তারা চোখ বড় বড় করে পরস্পরের সঙ্গে গভীর অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টি বিনিময় করে ঘাড় দোলাল। অর্থাৎ আর কোন সন্দেহ নেই। একজন জিজ্ঞেস করল, গলার স্বরটা চেনা মনে হইল।

এবার বউয়ের চোখ দারুণ অস্বস্তি ও যন্ত্রণায় থম্‌থমিয়ে উঠল। বলল, চিনি। চিনি কিন্তুক্ মানুষট্যারে চিনতে পারছি না।

মহিমের মনে হল, এ দিশেহারা স্মৃতির জন্যই যন্ত্রণায় বউ কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেছে।

বাড়ির পিছনে খানিক দূরে বাঁশঝাড়ের ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল মহিম। মৃত হরেরামকে চোখে পড়তেই মহিমের মনে হল আর তার হৃৎপিণ্ডটা যেন টিপে ধরেছে কেউ।...একি মরা মানুষের মুখ! এ তো মেরে ফেলা মানুষের মুখ। খোঁচা গোঁফদাড়ি হরেরামের মুখে। ভ্রূকুটি গোল চোখ, স্থির, নির্নিমেষ চোখের মণি। যেন হঠাৎ রাগে কটমট করে তাকিয়ে আছে। মুখ খানিক হাঁ করে ফেলেচে বলেই বোধ হয় জিভটা বাইরে এলিয়ে পড়েনি। তামাকের ধোঁয়ায় হল্‌দে ছোপ লাগা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। চোখের কোণে পিচুলিতে লাল রং গোলার মত খানিক রক্ত।

মহিম যেন দিব্যচোখে দেখতে পেল, ব্রহ্মদত্যির মত ষণ্ডা মানুষ হরেরামদার গলাটা টিপে ধরেছে। টিপছে—আরো জোর টিপছে, প্রাণপণ টিপছে। তাই হরেরামদার গলাটাও যেন খানিক লম্বা হয়ে গেছে।

না,—কিছুতেই যেন তাকানো যায় না ও মুখের দিকে। একবার তাকালে ত্রাসে ভরে যায়। আবার তাকালে বুকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তারপর সমস্ত বুকের মধ্যে আগুন জ্বলতে থাকে। নিরীহ, ঠিকে জমির উপর ভিটে যার, পরের কাজ-করে খাওয়া মানুষ হরেরাম-দা'র এ মুখ যেন মরা মুখ নয়, মনে হয় শত্রুর আক্রোশে নিষ্ঠুরতাই সমস্ত মুখটায় ভরা। বীভৎস, কুৎসিত।

এ মুখ যে ভোলা যায় না।

সামনে মানিককে দেখে মহিম বলল, তোর মণ্ডল কাকী কোথা? অর্থাৎ অহল্যা।

মানিক বলল, হরেরাম কাকার বউয়ের ঠাঁই গেল।

মহিম বলল আস্তে আস্তে মোর ঘরে যা তো। পশ্চিম বেড়ার তক্তার বড় হাঁড়িতে কাপড় জড়ান ঠোঙ্গা আছে একটা। শুঁকে দেখিস রবারের গন্ধ। নিয়ে আয় গে। দেখিস, ওজন আছে মালটার।

মানিক বলল চোখ বড় বড় করে, তোমার সেই মূর্তি গড়ার মশলা?

হ্যাঁ। যা ঝট্ করে। মহিম আবার ফিরল হরেরামের দিকে। না এ হরেরামদা'র মুখ নয়, মরা মানুষের মুখ নয়। সে ভিড় করা মানুষ-গুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। কই, মরা মানুষের মুখ দেখে তো কারুর চোখ মুখের ভাব এমনটি হয় না। এ মুখ এক নারকীয় ঘটনার ছবি, সারা মুখটায় এক ষড়যন্ত্রের পরিণতি যেন থম্ থম্ করছে—কে একজন বলে উঠল, মোর ঠাকুরদারেও মেরে ফেলেছিল ওরা। তবে বড় বাঁশ-ঝাড়ে লয়, ডেকে নিয়ে কাছারি ঘরে বাঁশডলা দিয়ে।

এখানকার ভিড় করা মানুষগুলোর জোড়া-জোড়া চোখগুলোর মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠল শিল্পীর চোখ। সে ভুলল এ ভিড়্। এখানকার ফিসফিসনো আর গেল না তার কানে। তার সারা মুখে নতুন জ্যোতি।

ভজন এসে ধরল মহিমের দুই হাত।—কি ভাবছ মহী ?

মহিম বলল, ভাবছি ওই মুখের কথা।

ভজন দু-হাতে আলিঙ্গনের মত মহিমের কাঁধ ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, ওরা বুঝি ভাবছে, হরেরামেরে মেরে ফেলে মোদের চুপ মারিয়ে দেবে। কিন্তুক্ আগুন ওরা জ্বালল ভাল হাতে। হরেরামের মন্তর মোরা ভুলব না। একটু থেমে তারপর বলল, ক-দিন আগে যখন জমিদার কাছারিতে ডেকে নিয়ে হরেরামরে শাসায়ে দিল তখনই মুই বুঝছি বেগতিক কিছু হইবে। কিন্তুক্ সে যে এতবড় সব্বোনাশ—

বন্ধ হয়ে গেল ভজনের গলার স্বর।

মহিমের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এল। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল হরেরামের মুখের দিকে।

ভজন বলল, মানিকরে কুনঠাঁই পাঠালে।

ঘরে, প্লাস্টার আন্‌তে।

পেলেস্টারটা কি ?

মূর্তি গড়ার মশলা।

হরেরামের ওই মূর্তি গড়বে তুমি ? শুধু আনন্দে নয়, বিস্ময়ে জ্বলে উঠল ভজনের চোখ।

মহিম বলল, এ তো মুখ নয় ভজনদাদা, শত্তুরের সব্বোনাশা কীর্তি। চাষী মনিষ রে চেরকাল মুই এ মূর্তি দেখিয়ে বেড়াব।

মহিমকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ভজন হাসি-কান্নায় ভরা এক বিচিত্র শব্দ করে উঠল। সকলেই ভিড় করে এল তাদের দুজনকে ঘিরে। এ খবর ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ে ঘরে !

মানিকও এল মাটি নিয়ে। মহিম দেখল পুরুষের ভিড়ের পেছনে দুটি চোখ একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছে, কপালে তার কাচ-পোকার টিপ্, মাথার ঘোমটা সরানো। সে চোখে কি ছিল না জানলেও মহিমের সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ল সেই অচেনাভাব ! ও মুখ অহল্যার। গত দুর্ঘটনার এতদিন পর মহিম প্রথম হাসল ছায়া সরলো।

তার মুখ থেকে। একবার ভাবল সে যাবে অহল্যার কাছে। কিন্তু লজ্জা করল মনে মনে। সে কাজ আরম্ভ করল।

ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস লাগতে মহিম তাকিয়ে দেখল, গোবিন্দ। অনুরাগে ভরা দুই চোখে বন্ধুর অন্তস্থলকে স্পর্শ করার বাসনা। মহিম হাসল।

ইতিমধ্যে খবর এল নয়নপুরে পুলিশ এসেছে সদর থেকে। পুলিশ পাগলা বামুনদের বাড়িতে ঢুকে তল্লাসী করছে। তার নামে নাকি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে! কিন্তু পাগলাঠাকুর যেন হাওয়ায় গায়েব হয়ে গেছে নয়নপুর থেকে। তারপর পুলিশ এখন গেছে জমিদার বাড়িতে, অক্ষয় জোতদার গেছে সঙ্গে সঙ্গে। খানিক বিশ্রাম করে পুলিশ আসবে এখানে। খবরটা নিয়ে এল নয়নপুরের হাবু চৌকিদার।

হাবুকে ঘিরে ধরল সবাই খবরের জন্য। পাগলাঠাকুর কি করল।

হাবু চৌকিদার বলল, কে জানে। শুনি এলাম, ঠাকুর নাকি সরকার বাহাদুরের শত্তুর। লোক খারাপ সে।

আর হরেরামের খুনের ব্যাপারটা?

হাবু বলল, সেই পরামশ্য তো করতে গেল বড় দারোগাবাবু জমিদারের কাছে। তারপর সে মহিমের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, এইটুকু তাড়াতাড়ি কাম সারো মণ্ডলের পো, নইলে দারোগা এসে পড়লে ফ্যাসাদ লাগবে।

মহিমের হাতের যাদুতে তখন মৃত হরেরামের বীভৎস মুখ প্লাস্টারের দলাটাতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

॥ ২০ ॥

কয়েকদিন পর।

হরেরামের মৃতদেহ পুলিশ সদরে নিয়ে গেল, আবার ফিরিয়ে দিল। রায় দিল, হরেরাম আত্মহত্যা করেছে।

মরা ছেলে বিয়োল হরেরামের বউ। আর মানুষ দেখলে কেবলি চোখ বড় বড় করে বলে, চিনি চিনি। মনে করি আগে, তা'পরে বলব সবারে। বলে আর হাসে, কাঁদে।

অস্পষ্ট স্মৃতির জ্বালায় বউ আজ বাউরী হয়েছে হরেরামের। বাউরী বউয়ের শোক নিয়ে নয়নপুরের বাতাস হয়েছে বাউরী। শুধু নয়নপুরের নয়, কটা মহকুমা জুড়ে। অসময়ের ধর্মঘটের পূজো দিল চাষীরা। পণ রাখল মরণের, কাস্তে কুড়ুল হাতুড়ি বাটালি সব ছাড়ল চাষী কামাররা। বছরের সুদিন এলে বৈশাখে আবার দেবে তারা ধর্মঘটের পূজো। কিন্তু যে যমের দ্বারে হরেরামকে গলা টিপে ঠেলে দিয়ে এল শত্রুরা, তাদের সঙ্গে রফা নেই।

দিন যায়। ধান ঝরে মাঠে, পায়রার ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেন পালা পড়ছে তাদের। দেশ অরাজক, শস্য বুঝি মূল্যহীন। কারুর কারুর মনে খটকা লাগল, এ তো ঠিক হচ্ছে না। নিজের ভাগেরটা কেন ছাড়ি? লাগ্ লাগ্ করে আবার বৈঠক হয়। সবাই মিলে সাব্যস্ত করে: হাঁ, নিজের পাওনা ঘরে তোল।

এমন সময় রফার কথা হল জমিদারের। বেগার নজরানা ছুটোই খুশির ব্যাপার। না দিলে কথা নেই, দিলে ছেলের মধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে। জবরদস্তি রইল না। খাটুনির দাম দেওয়া হবে। পড়তি খাজনা মকুব করা গেল। এ ঘোষণায় সবাই নিরস্ত হল বটে, কিন্তু বুঝল শত্রু তাদের সবার বড় সর্বনাশ সমাধা করেছে হরেরামকে মেরে। আজ হোক, কাল হোক, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। আবার জ্বলবে আগুন।

আগুন জ্বালা রইল মহিমের ঘরে। সবাই আসে হরেরামের সেই মুখ দেখতে। সত্য, এ তো মুখ নয়, শত্তুরের পৈশাচিক কীর্তি। এ মুখ কেউ ভুলল না।

॥ ২১ ॥

অনেকগুলি মাস কেটে গেছে।

এতদিনে মহিম অনেক গড়েছে। যা তার ইচ্ছে হয়েছে তাই গড়েছে। কখনো দিগন্তে পাড়ি জমানো ডানা মেলে দেওয়া পাখী, শাবক হারানো উৎকণ্ঠিত দিশেহারা গাভী। গাঁয়ে ঘরের সবাইকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে তার সূক্ষ্ম কাজ সোনার বরণ ধানের গোছা উপহার দিয়েছে সে তার বাল্যসখী বনলতাকে। আর কাজ করতে করতে হরেরামের বউয়ের কান্না আড়ষ্ট করে দিয়েছে তার হাত, প্রাণ থম্‌কে থেকেছে। তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে নিরালায় ছুটে গেছে সে। এ কান্না তার সয় না। কিন্তু গতবছরের কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকে তার জীবনে যা ঘটে গেছে তার ছায়া যে আজও তার মুখে এক বিচিত্র ছাপ রেখে গেছে।

আগের চেয়ে অহল্যার কাছ থেকে সে দূরে গেছে কিছুটা। কিন্তু উভয়ের কি যে বিচিত্র বন্ধন, যখনই মহিমের মনে হয় অকারণে প্রাণটা বড় বেশি ভারী হয়ে উঠেছে,অযথাই কেন যেন বুকের মধ্যে কান্না গুমরে ওঠে তখনই সে, ছুটে আসে অহল্যার কাছে। অহল্যা সেজন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। দুজনে পাশাপাশি বসে অনেক কথা অনেকক্ষণ ধরে বলতে থাকে। নয়নপুরের কথা, তার মানুষের কথা, গোবিন্দবনলতার কথা, হরেরাম, তার পাগল বউয়ের কথা, সর্বোপরি নিজের মনের বিচিত্র শিল্পী স্বপ্নের কথা।

বলে না শুধু নিজেদের দুজনের কথা, উমার কথা। তবু মহিম মাঝে মাঝে অহল্যাকে ধরে বসে শৈশবের গল্প বলার জন্য। খেলা, ঠাকুর গড়া আর অহল্যার সঙ্গে খুনসুটি করার গল্প। তার বাবা দশরথ মণ্ডলের কথাও জিজ্ঞেস করে সে।

অহল্যা সব কথাই বলে। বলে আর আড়ালে কিছুতেই কান্না সে রোধ করতে পারে না। এ জীবনে বুঝি এ লুকানো কান্নার শেষ নেই।

গোবিন্দের কাছে মহিম আজকাল খুব কমই যায়। আজকাল তার বন্ধু হয়েছে নরহরি বৈরাগী। নরহরি আজকাল অবসর সময়ে খালের মোহনার ধারে বসে থাকে। মহিমও যায়। একজন গান গায়, আর একজন শোনে। দমকা হাওয়ার মত কখনো কখনো কুঁজো কানাইও আসে।

ইতিপূর্বে আমলা দীনেশ সান্যাল কয়েকদিন এসে গেছে মহিমের কাছে জমিদারের চাকরির প্রস্তাব নিয়ে। মহিম একদিন গিয়েছিল এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এসেছে এ প্রস্তাব তার পক্ষে মেনে নেওরা সম্ভব নয়। জমিদার হেমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কটু কথা বলেছেন, এমন কি ছদ্মকণ্ঠে শাসিয়েছেন। কিন্তু মহিম অটল। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, এতখানি সম্মানের লোভ সে কেমন করে ছেড়ে দিল?

জমিদার জননেতা বলে গান্ধীজীর একখানি আবক্ষ প্রতিমূর্তি চেয়েছিলেন, কিন্তু মহিম তাতেও নারাজ হয়েছে। তিনি হরেরামের মূর্তিটা চেয়েছিলেন মহিম তাতেও অস্বীকৃত হয়েছে।

এর পরে মহিম ও উমা আদেখার মধ্যে থাকলেও বুঝেছিল, একজনের ডাকা, আর একজনের যাওয়ার সেই পালা খেলাও শেষ হয়েছে। সেদিনও এল। বলল, সাধে কি আর তোদের গাল দিই। হরেরাম চাষার মুণ্ডু আর অ'খলের মোষ গড়ে ফষ্টি নষ্টি করছিস্, সাধা। লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছিস্। এখুনি তু বলে ডাক দিলে গণ্ডা কয়েক আর্টিস্ট কলকাতা থেকে ছুটে আস্‌বে। আঁটি বাঁধা ছেড়েছিস্ যখন লেগে পড়্।

মহিম সেই একই কথার জবাব দিল, জমিদারে ঠাঁই মুই যাব না।

দীনেশ, সান্যাল হেসে চোখ কুঁচকে বলল, তবে বুঝি বৌঠাকুরানীর কাছে কলকাতায় যাবি?

হঠাৎ এতদিন বাদে সান্যালের মুখে একথা শুনে চমকে উঠল মহিম। সান্যাল বলল, কুৎসিত মুখভঙ্গি করে তুই ব্যাটা বেশ খেলোয়াড় আছিস। এ্যাকেবারে বউ-শ্বশুরে ঝগড়া লাগিয়েছিস। সেই জন্যই তো কর্তার অত জেদ তাকে নেবার জন্য।

কথাটা বলে ফেলে সান্যাল অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল। ভাবল,

বোধ হয় আনাড়ির মত কথাটা বলে ফেলেছে সে। পরমুহূর্তেই মহিমের কাছে এগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তা বেশ তো, ওই দুজনার কাছ থেকেই দেঁড়েমুষে কিছু কমিয়ে নে না।

কিন্তু আচমকা অন্ধকারে সাপের ফোঁস করে ওঠার মত রান্নাঘরের দরজায় এসে অহল্যা বলে উঠল, মোর কাউকে দেঁড়েমুষে কমাতেও চাই না আর কত্তারে বলে দিও বাবু, তাদের বউ শ্বশুরের টানাপোড়েনের মধ্যে মোরা যাব না।

সান্যাল এক মুহূর্ত চুপ করে বলল, কে, ভরতের বউ না ? তা বেশ বলেছ, মণ্ডল-বউ। ওসব হেফাজতের দরকার কি গরীব মানুষের। ওরে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করাটা—

অহল্যা বলল বিবাদ চাই না, সুবাদও চাই না। যেমন আছি তেমন থাকব।

সামান্য চোখ কুঁচকে চিবিয়ে বলল, তা কি থাকতে পারবে। মামলায় যে ভরত কাত মারতে বসেছে। তার মধ্যে তোমার দেওর আবার আর্টিস্ট হয়েছে। বলে হো-হো করে হেসে উঠল যেতে যেতে ফিরে আবার মহিমের কাছে বসে বলল, তা তোকে একটা কথা বলি। আমার ছেলেটাকে তোর কারিগরি একটু শিখিয়ে দে না, ওকেই না হয় লাগিয়ে দিই ? জবাবের প্রত্যাশায় আগ্রহে সান্যালের কপালের রেখাগুলো সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠল।

একমুহূর্ত নীরব থেকে মহিম বলল, ছেলে আপনার শেষটায় আমের আঁটির ভেঁপু ফুঁকে বেড়াচ্ছে, দরকার কি সানেল মশাই ?

সান্যাল খোঁচা খাওয়া জানোয়ারের মত দু পা পেছিয়ে এসে একটা তীব্র ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করে লাঠি ঠুকে বেরিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর সন্ধ্যাবেলা ভরত এল সদর থেকে অসহ্য মাথা ধরা আর তীব্র জ্বর নিয়ে। দু হাতে অহল্যার কাঁধে ভর দিয়ে বলল, তিন মাসের মেয়াদ দিয়েছে রে বড়বউ, দেনা শেষ না হলে ভিটেমাটি সবই যাবে। কিন্তু ভাবি অধম্মের একি যাদু যে, মুই হইলাম দেনাদার জমিদারের কাছে!

এতবড় শোক সামলাতে না পেরে ভরত বিছানা নিল। অহল্যা স্বামীর বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল দিনের পর দিন। ভরতের বুকে মাথা রেখে বুকের কান্না চাপে সে। যত অবস্থা খারাপ হয় ভরতের ততই চাপা কান্না বাড়ে অহল্যার। এক বিচিত্র অনুশোচনা বাসা বেঁধেছে তার মনে যে, এ মানুষটিকে সে তার সব পাওনা বুঝি মেটায়নি। বুক তার তীব্র দহনে জ্বলে গেল। হায়, ভরত কেন তার সবটুকু আদায় করে নিল না। কিন্তু নিতে চাইলেই কি ভরতের তা মিলত? তেমন করে তো অহল্যার কোনদিন মনেও পড়েনি। গর্তে বসে যাওয়ার চোখে যেন সব আশা নির্বাপিত হতে বসেছে তার। যে আশায় বুক বেঁধে মাদুলি জলপড়া ঝাড়ফুঁক সবই করেছে, যে আশায় নিরালায় বিবস্ত্রা হয়ে মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখেছে, সে ক্ষীণ আশা আজ নিঃশেষ হতে বসেছে বুঝি। আর কেবলি মনে হয়, ভরতকে সবটুকু দিলে তার সে আশা পূর্ণ হত বা।

কিন্তু এর চেয়ে প্রচণ্ড বিপর্যয় বৈচিত্র্য ও লুকিয়েছিল তার মনের মধ্যে। তার প্রকাশ পেল, যখন সে দেখল উঠোনে গত বছরের মত পরানকে এসে দাঁড়াতে উমার ডাক নিয়ে। অবার বৌঠাকুরানী! চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল অহল্যার। সব ভুলে নিমেষে ভরতের বুক ছেড়ে উঠে এল সে। রোগা মুখ তার জ্বরো তাপে যেন তম্‌তমে, তীব্র নিষ্ঠুর হাসিতে ঠোঁট বেঁকে উঠেছে।

পরান সে মুখ দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

মহিম বলল, আজ মুই যেতে পারব না পরানদা।

তীব্র গলায় অহল্যা বলল, কোন দিনই যেতে পারবে না।

জবাব নিয়ে পরান চলে গেল। তেমনি ব্যঙ্গ নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে অহল্যা সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

মহিম তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলল, কি হইছে তোমার বউদি?

কিছু না।

তুমি কি মোরে অবিশ্বাস কর?

অবিশ্বাস? চমকে উঠল অহল্যা, শান্ত হয়ে এল তার মুখ, আগুন

নিভল চোখের। গলা বন্ধ হয়ে এল কান্নায়। কান্নার তুফান বুঝি। কেবল বার বার মাথা নাড়ল, না না না···। ছুটে গেল সে ভরতের কাছে, ভরতের বুকে।

ভরত একটু বোধ হয় ভাল ছিল। বলল, কাঁদবার ঢের সময় পাবি বড়-বউ, এখন থাক। তোকে একটা কথা বলব আজ।

কথা! ভয় হল অহল্যার। কি কথা বলবে ভরত! ভরত বলল, মরেও মোর শান্তি নেই তোর জন্য। তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না।···ছাখ, সদরের ডাক্তার একবার বলেছিল, বাঁজা শুধু মেয়েমানুষ হয় না, পুরুষেও হয়। বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে ভরত, একটু চুপ থাকে। অহল্যার বুক কাঁপে। তার হাত একটা নিজের হাতে নিয়ে বলল ভরত, মুইও বাঁজা হতে পারি। মুই মরলে তুই আবার বিয়া করিস্। বুকে তোর ছাওয়াল আসতেও বা পারে।

আহল্যার মুখটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেল। ভরতের বুকের কাছে মুখ গুঁজে বার বার বলতে লাগল সে, একি বলছ তুমি, একি বলছ! গো!

ভরত বলল, জানতাম বললে তুই কাঁদবি। ভেবে দেখিস্। তারপর বলল, মহী কুনঠাঁই।

মহিম এসব শুনে বেড়ায় মুখ চেপে কান্না রোধ করছিল। তাড়াতাড়ি এল ভরতের কাছে। ভরত বলল, তুই মোরে শনি বলেছিলি, মুই তোরে মার দিছিলাম না রে?

মহিম তাড়াতাড়ি উদ্গত কান্না চেপে বলল, এসব কি বলছ দাদা?

ভরতের মৃত্যুন্মুখ স্বচ্ছ মুখ উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। বলল, কিন্তুক্ কুনঠাঁই মাথা গুঁজবি তোরা? বাঁচবি কেমন করে?

এই ভরতের শেষ কথা। সেই রাত্রেই মারা গেল সে।

॥ ২২ ॥

ভরতের মৃত্যু মহিমকে নির্বাক করে দিয়ে গেল।

ভরতের মৃত্যুর পর অহল্যা এত দূরে সরে গেল যে মহিম প্রায়

অষ্টপ্রহরেই নরহরির সঙ্গে খালের মোহনার ধারে গিয়ে বসে থাকত, আগে মহিম ঠাঁই নিয়েছিল এখানে অনেক তুঃখে। শুধু ঘর নয়, নয়নপুরের মধ্যে কোথাও শান্তির লেশ পেত না সে। হরেরামের বাউরী বউ যেদিন থেকে পথে পথে হেসে কেঁদে বেড়াতে শুরু করল, সেদিন থেকে সে প্রকৃতপক্ষে গাঁয়ের পথ চলাই বন্ধ করে দিয়েছিল। গোবিন্দ জীবনের নিশানা পেয়েছে, প্রাণখুলে সে কথা সে বন্ধু মহিমকে বলেছে। বলেছে ভাদ্রবউয়ের কথা, তার সর্বনাশের কথা, আচায্যির কথা। আগেও বলেছে। বলেছে, তবে মোর জীবনে গুরুদেব রইল অক্ষয় হইয়ে, সে গুরু মোর পাগলা ঠাকুর। তার মন্তরই মোর মন্তর। সে হইল, পাপ কুচাল থেকে এই দেশোদ্ধার।···আর বনলতা তার রহস্যময়ী হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছে বিচিত্র হেসে তার বাল্যসখার কাছে, মাতাল চোখে নিজেকে দেখিয়ে বলেছে, নতুন মানুষ আসছে তার মধ্যে, গোবিন্দর আর বনলতার জীবন-সৃষ্টি। তাদের নতুন ঘর। মহিমকে ঠাট্টা করে বলেছে, বউ-বিবাদীর দাবিদার তুমি একজন, নিত্যপ্রহর ঝগড়া বাধাবার নিমন্ত্রণ রইল তোমার।

খুশিতে প্রাণ ভরে উঠেছে মহিমের কিন্তু হাহাকারের চাপা ধ্বনিও কেন যেন উঠেছে বুকের একপাশ থেকে। তবু সব মিলিয়ে সে যখন সুর বাঁধবার চেষ্টা করেছে তখনই কুঁজো কানাইয়ের অপঘাত-মৃত্যু প্রাণটাকে টুণ্ডা করে দিল তার। গত কয়েকদিন যে ঝড়বৃষ্টি গিয়েছে, সেই ঝড়বৃষ্টিতেই কালুমালার মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর ঘরের পেছনে গাছ-চাপা পড়ে মরেছে কুঁজো কানাই। সবাই বলল, ওর তো স্থানকালের বিচার ছিল না, নইলে ঝড়ের রাত্রে কেবা বন জঙ্গল ঢুড়ে মরতে যায়! সত্য কথা। কিন্তু মহিম বুঝল, ঝড়ের রাত্রে কুঁজো কানাইয়ের প্রাণে ডাহুকের অসহ্য বিরহ বাঁসা বেঁধেছিল। কালুমালার সোন্দরী মেইয়েকে ছিটেবেড়ার ফাঁক দিয়ে একবার দেখার আকাঙ্ক্ষায় আতুর করে তুলেছিল ওই ঝড়ের রাত্রিই।

জীবন্তে হল না, মরণের পর মহিম তার শিল্পসাধনার শরিক কুঁজো কানাইয়ের মুর্তি গড়া শুরু করল। কানাই মহিমের হাতে গড়া মুর্তি

দেখে বলত, আচ্ছা, কোনরকমে যদি পরানের ধুকধুকিটা ঠেসে দেওয়া যেত মূর্তির বুকটাতে, তবে তুমি হইতে বেহ্ম।...আজ মহিমের মনে হল, কোথায় পাওয়া যাবে সেই প্রাণের ধুকধুকি, যা দিয়ে কানাইদাকে জীবন্ত করে তোলা যায়।...ধুকধুকি নয়, কানাইয়ের প্রতিটি অঙ্গকে জীবন্ত করে তোলার সাধনাতেই আত্মনিয়োগ করল সে। আর বার বার মনে পড়ল কুঁজো কানাইয়ের সেই কথা, কুরচিতলায় পা ছড়িয়ে বসে কাঁদে কালুমালার সোন্দরী মেইয়ে, সে মূর্তি কি গড়া যায় না?

কিন্তু প্রাণে তার থমকে রইল কান্না। অহল্যা তো এল না তার মূর্তি গড়া দেখতে। জিজ্ঞেস করল না কোন কথা দূর থেকেও একবার চোখ তুলে দেখল না। চকিত হাসির সেই অভিনন্দন, মাথায় হাত দিয়ে কাছে টেনে সেই স্নেহ আদর কোথায়?

এমন সময় একদিন পরানকে সঙ্গে নিয়ে উমা এসে দাঁড়াল মহিমদের উঠোনে। এসে চমকে উঠল উমা। বাড়িটা যেন পোড়া বাড়ির মত নিস্তব্ধ খাঁ খাঁ করছে। মনে হয়, কেউ নেই। মণ্ডলবউ অহল্যার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। ঘরগুলির দরজা খোলা পড়ে রয়েছে। কাকপক্ষী অবাধে ঘরে বাইরে ঠোঁট ঠুকে বেড়াচ্ছে।

নিঃসাড়ে মহিম বেরিয়ে এল। বিস্ময় নেই, দুঃখ নেই, আনন্দও নেই এমন একটি মুখ নিয়ে এসে দাঁড়াল সে। উমা দেখল, শিল্পী তার রোগা হয়ে গেছে, মাথার চুল বড় বেশি ঝুলে পড়েছে ঘাড়ের দিকে, চোখের কোল বসা। তবু সেই স্বপ্নময় চোখ হাতে পায়ে মাটিমাখা, মুখে চুলেও মাটি।

উমা দ্রুত দাওয়ায় উঠে এল মহিমের কাছে। উৎকণ্ঠা মুখে। বলল, কি হয়েছে তোমার?

মহিম হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিছু হয় নাই তো। ঘরে আসেন।

উমা ঘরে এসে দেখল অর্ধসমাপ্ত এক কুঁজো মানুষের মূর্তি। প্রাণ চমকাল তার সেই মূর্তির চোখ দুটো দেখে। সে যেদিকে ফেরে

সেদিকেই যেন কুঁজোর ঠেলে ওঠা বিহ্বল মুগ্ধ চোখ দুটো ওকে অনুসরণ করছে। কি দেখছে কুঁজো মূর্তি ? কি রকম যন্ত্রণা হতে লাগল উমার বুকে সেই আকুল মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে। কিন্তু সে যেদিকে ফেরে সেদিকেইএ ঘরের মূর্তিগুলো আজ যেন বিচিত্র কটাক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল। একি হল তার। সে তাড়াতাড়ি ফিরল মহিমের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য ! তার শিল্পী যেন আজ এ ঘরের মূর্তিগুলোর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিশে গেছে। সে দ্রুত কাছে এসে মহিমের হাত ধরে বলল, কি দেখছ তুমি।

উমা দেখল, মহিম যেন কেমন হয়ে গেছে। তার জীবনে যেন কোন বোঝা চেপে বসেছে যার ভারে মরতে বসেছে তার শিল্পী। সে বলল, বল, এখনও কি তুমি যেতে চাও না। লাঞ্ছনা কি আরও পেতে চাও ?

মহিম যেন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল উমার দিকে। উমা বলল তোমাদের ভিটে-বাড়ীর কথা সব শুনেছি পরানের মুখে। আমি টাকা দেব, আদালতে জমা দিয়ে তুমি সব মুক্ত কর। মণ্ডল-বউকে সব দিয়ে তুমি চল কলকাতায়। তোমার যে অনেক বড় জীবন পড়ে রয়েছে সেখানে। এ মুহূর্তের জন্য মনে হল, উমার গলায় প্রকৃত সরলতা ও আবেগ ফুটে উঠেছে।

মহিম নির্বাক। তার মনের মধ্যে আলোড়িত হয়ে উঠল জীবনের সব বিপর্যয়। হঠাৎ তার মনে হল, সবই যেন শেষ হয়ে গেছে, নয়নপুর যেন ছেড়ে দিয়েছে তাকে। গোবিন্দ-বনলতা নতুন জীবনে ফিরে গেল। হরেরাম, ভরত কুঁজো কানাই মরে গেল। পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে দিনেকের তার দেখা হবে না, কিন্তু তার দেশত্যাগ যেন মহিমের বুকটাও খালি করে দিয়েছে। হরেরামের বাউরী বউ পথে পথে ঘোরে, নয়নপুরের বাতাসও বাউরী হয়েছে। নরহরির গানে শুধু কান্না। সর্বোপরি, অহল্যা আর সে অহল্যা নেই। সেও যেন ছেড়ে দিয়েছে মহিমকে, বন্ধন যেন কেটে গেছে। আর সব সইলেও এ সইল না তার নিজের কথাই চিন্তা করে। মহিমও তাই। একবারও ভেবে দেখল

না, কেন সে তার কাছে আসেনি, এ দুর্জয় অভিমানেই অহল্যার উপর মনটা বিরূপ হয়ে উঠতে লাগল তার। একবারও মনে হল না, অহল্যা জীবনের কোন্ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, কী হারিয়ে কি নিয়ে বসে আছে।

উমা বলল, কি দেখছ মহিম ?

মহিম তাকাল উমার দিকে। হ্যাঁ, আকুল আহ্বান রয়েছে ওই চোখে, মিষ্টি ডাক রয়েছে, ওই সুন্দর ঠোঁটে, উষ্ণ আলিঙ্গণের জন্যে অপেক্ষা করে আছে ওই সুগঠিত আধখোলা বুক।

সে বলল, যাব আপনার সাথে।

আচমকা উল্লাসে মহিমকে দু-হাতে বেষ্টন করে উমা মহিমের চোখে বুলিয়ে দিল তার ঠোঁট।

সমস্ত শরীর ঝিম ধরে রইল মহিমের। মদের নেশার মত চোখের পাতা বড় ভারী হয়ে গেল, জ্বলতে লাগল। মনে হল সমস্ত জগৎ যেন টলছে।

উমা বলল, আমাদের বাড়িতে যার হাসির কথা জিজ্ঞেস করেছিলে, তার কথা শুনবে না ?

যেন জ্বরের ঘোরে মহিম বললে, বলেন।

উমা বলল, মহিলাটি আমার খুড়ি-শাশুড়ী। বয়স কম। ওঁর স্বামী যখন মারা যায় তখন একটি ছেলে ওঁর বছর চারেকের। হঠাৎ ক-দিনের রোগে ছেলেও মারা যায়। কিন্তু ওর ধারণা সম্পত্তির ওয়ারিশকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য আমার শ্বশুরই নাকি মেরে ফেলেছেন ওঁর ছেলেকে। সেই থেকে একরকম হয়ে গেছেন। ব্যাপারটা বাইরের লোকে অবশ্য জানে না। একটু হেসে বলল, তবে এসবই আমার বিয়ের আগে। তোমার বড় ভয় ওই হাসিতে না ?

একদিন একথা শোনার খুবই আগ্রহ ছিল মহিমের। আজ সে-কথা কানে তার গিয়েও গেল না ! বিন্দুমাত্র কৌতূহল হল না।

উমার হাসি-মুখের দিকে তাকিয়ে মহিম বলল, ভয় ছিল, আর নাই।

উমা বলল, আমি এখন যাই। পরানকে ডাকতে পাঠাব, তুমি যেও। বলে মহিমের হাতে একটু চাপ দিয়ে উমা আজ বেরিয়ে এল ছায়ামুক্ত মুখে। একবার দেখল বাড়িটার চারদিক, তারপর পরানের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল সে।

মহিম বেরিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে খালের মোহনার পথ ধরে ছুটল। উদার শূন্য আকাশের তল ছাড়া আর কিছু চায় না সে।

॥ ২৩ ॥

দু-দিন কাটল এমনি। তৃতীয় দিন খালের মোহনার ধারে হঠাৎ মহিমের নজরে পড়ল, খালে ঢুকছে একটি শিশুর মৃতদেহ। শ্যামবর্ণ নিটোল নবজাত শিশু উবু হয়ে জলে ভাসছে। নরহরির সাহায্যে শিশুটিকে ডাঙায় তুলে খাল ধারে পুতে দিল মহিম।

তারপর কি বিচিত্র খেয়ালে বাড়ি এসে সেই শিশুর মূর্তি গড়তে শুরু করল সে। এমন কি, কুঁজো কানাইয়ের মূর্তি শেষ করার আগেই সেই মূর্তি গড়তে লাগল।

আজ আর মহিমকে দেখে কেউ সুস্থ বলতে পারবে না। আজকের তার নাওয়া খাওয়া ভোলার চেহারা অন্যরকম। যেন জ্বরের বিকারের ঘোরে কাজ করছে সে। কাজ থামিয়ে চেয়ে থাকে তো চেয়েই থাকে ঘণ্টা কেটে যায়। তার মাথায় অদ্ভুত সব চিন্তার উদয় হতে লাগল। তার গড়া শিশুকে সে একবার ভাবল এ বুঝি হরেরামের বউয়ের বিয়ানো মরা ছেলে। আবার ভাবল, এ হয়তো বনলতার অনাগত সন্তান। তারপর হঠাৎ তার মনে হল, এই শিশু কেন অহল্যার গর্ভেও আসে না! মানুষ কোথা থেকে, কেন এল ?···এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে হাজার চিন্তায় মাথায় যেন রক্ত উঠে আসে তার। ঘরটার মধ্যে প্রেতের মত পায়চারী করে। আচমকা ঠাণ্ডা মাটিতে বুক চেপে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মাঝে মাঝে।

অহল্যা পাষাণ। সবই দেখছে, সবই শুনছে কিন্তু আড়াল ছেড়ে

কখনোই বাইরে আসে না। ভরতের শেষ কথাগুলো কেবলি থেকে থেকে তার মনে পড়ে। চমকে চমকে নিজের গা-হাত-পা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মহিমকে দেখলেই চোখ নামিয়ে চকিতে আড়ালে সরে যায়। চোখ ভরা ত্রাস তার। গোপনে কান্নার বদলে গোপন ভয় বুঝি বাসা বেঁধেছে তার বুকে। ভাত বেড়ে দিয়ে বসা দূরের কথা, দাঁড়ায় না পর্যন্ত। একি হল তার! ভরত বলেছিল, কাঁদবার ঢের সময় পাবি। কোথায় সেই কান্না! সে দেখল বৌঠাকুরানীকে আসতে, শুনল মহিমের চলে যাওয়ার বাসনার কথা। দেখছে মহিমকে আলিঙ্গনাবদ্ধ বৌঠাকুরানীর বুকে। পাষাণের বুক অহল্যার, তবু কেন প্রাণের ধিকি ধিকি শব্দ শোনা যায়। নিশীথ রাত্রে বাড়ির পেছনে ডোবার নিস্তরঙ্গ জল ডাক দিয়ে গেল, হাতছানি দিয়ে গেল নয়নপুরের তীব্র স্রোত। খালের মোহনায় মধুমতী কোল ডাক দিল তাকে। কিন্তু ভেতরে তুটো মনের কোলাহলে নিঃসাড় রইল সে। ঘরের অন্ধ কোণে অশ্রুহীন চোখে হাত দিয়ে বসে রইল সে।··· জীবনের এ তুর্বোধ্য বিপর্যয় কিসের?

শিশুর মূর্তি গড়ার তুদিন বাদে সন্ধ্যার খানিক পরে মহিম ফিরে এল মোহনার ধার থেকে। তেমনি জ্বর বিকারের ঘোর লেগে রয়েছে তার মুখে, চোখ লাল, দৃষ্টি বিভ্রান্ত। চোয়াল শক্ত, ঠোঁট টেপা। সে সোজা এসে উঠল অহল্যার ঘরের দরজায়। ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মহিম ডাকল বউদি!

অহল্যা বসেছিল চুপচাপ ঘরের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, কি?

তোমারে একটা কথা বলতে আসছি।

অহল্যা নীরব। মহিমও খানিকক্ষণ চুপ থেকে যেন নিজেকে তৈরি করে নিয়ে বলল, মুই চলে যাব এখান থে।

বলতে তার গলায় যেন কি ঠেলে এল ভিতর থেকে। তাকে জোর করে রোধ করে বলল আবার, মুই কাঁটা হইছি তোমার, সরে যাওয়া মোর ভাল। মুই কাছে থাকলে তোমার যন্ত্রণা লাগে, তার শেষ হউক।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে অহল্যা বলল, কে কাঁটা হইছে ভগবান জানে তা। যেতে চাইলে আটকাবে কে তোমারে ?

বিভ্রান্ত চোখ মহিমের হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল, কেউ আটকাবে না। মোর ঘরে একটু আসবে।

কেন ?

কাম ছিল।

একটু চুপ করে থেকে অহল্যা বলল, চল, যাচ্ছি।

মহিম চলে গেল নিজের ঘরে। অহল্যা প্রদীপ নিয়ে মহিমের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মহিম ডাকল, ভিতরে আস।

অহল্যা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিমকে দেখে ভিতরে এল।

মহিম শান্তভাবে বলল, বস না কেন ?

কি করবে মহিম, কি চায় ? অহল্যা চমকায়। প্রদীপ রেখে বসল সে।

মহিম সেই শিশুর মূর্তি অহল্যার কোলে রেখে দিয়ে বলল, তোমারে কভু কিছু দেই নাই, এটা দিলাম। মোরে ঠেলা দিলা, মোর হাতে গড়া একে কি ঠেলতে পারবে ?

অহল্যা ফ্যাকাসে মুখে আর্তনাদ করে উঠল। দু-হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল সে, একি করলা, একি করলা তুমি ? এত নির্দয়, এত বড় শত্তুর হইলা তুমি মোর ?

শত্তুর! কেন ?

নয় ? অহল্যা ডুকরে উঠল। বলল, মোর যে কোন আশা নাই, সব যে শেষ হইয়া গেছে। হায়, তোমার দাদাও যে আর নাই।

কথা শুনে বুকটা পুড়ে গেল মহিমের। সে তো এসব কথা ভাবে নাই। সে যে রক্তক্ষয়ী অভিমানবশে তার শেষ দান ওই শিশুটি অহল্যার নিয়তি কামনার মূর্তি স্থান পাবে ভেবেছিল।···সে দু-হাতে মুখ ঢেকে অপরাধীর মত ছুটে পালিয়ে গেল।

অহল্যার বুক ফাটল, চোখ ফেটে জল এল। বার বার একই কথা

বলতে লাগল, একি করলা, একি করলা। তারপর মুখ তুলে দেখল মহিম নেই। বাতি জ্বলছে। তার চোখ পড়ল শিশুর দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তার। একি দেখছে সে! কোলে তার নধর শ্যাম শিশু, অপলক মধুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নরম ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, কচি মাড়ি দেখা যাচ্ছে তার ভিতরে। সুগোল কচি কচি হাত বাড়ানো অহল্যার দিকে। বুঝি ডাক শুনতে পেল শিশুর। আচমকা সন্তানহীনা অহল্যার স্তনযুগলের শিরা-উপশিরা বড় ভারী হয়ে টনটন করে উঠল, স্ফীত হয়ে উঠল স্তনের বোঁটা।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ করে বুকের কাপড় খুলে মাটির ঠাণ্ডা শিশুকে আগুনের মত উষ্ণ বুকে চেপে ধরল সে। যেন প্রাণসঞ্চার করবে মাটির শিশুর মধ্যে।···থাকতে থাকতে নিজেকে দেখার বাসনা তার উদগ্র হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র করে মুগ্ধ চোখে নিজেকে দেখতে লাগল সে।···নিটোল পা, বিশাল উরত, প্রশস্ত নিতম্ব, জননীর জটর, বলিষ্ঠ বুক, সুডৌল হাত। বিস্মিত মুগ্ধ চোখে দু-হাতে স্তন তুলে দেখল সে। তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিরাম নেই সে কান্নার।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে একসময় সে থামল। মাটির শিশু মাটিতে রাখল, মহিমের মুখ মনে পড়ল তার। সে মুখ মনে করে উৎকণ্ঠায় বুক ভরে উঠল তার, হাহাকার করে উঠল প্রাণ। সেই অসহায় দিশেহারা যন্ত্রণাকাতর মুখ মনে করে অপরাধে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। মহিমকে মেরে ফেলতে বসেছে সে। তার শৈশবের বন্ধু, অহল্যা-বউয়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল মহিম। তাকে সে বিদেশে বৌঠাকুরানীর অচেনা বুকের আগুনে ছুঁতে দিতে চাইছে দগ্ধে মরবার জন্য! কেন সে বুঝল না, মহিমের সারা প্রাণ ছড়ানো নয়নপুর, তার প্রিয়তম বন্ধুদের তিরোভাব, বীভৎস হত্যা, ভিটের শোক, ভাইয়ের মৃত্যু সব যখন তাকে দিশেহারা করে দিয়েছে সেই সময় অহল্যার সরে যাওয়া তার মাথায় মৃত্যু-আঘাত করেছে। সে তো জানত, এ জীবন নিজের কথা ভেবে কোন লাভ নেই। তবু নিজেকে নিয়েই সে

কেন পড়েছিল ?

ত্রস্তে কাপড় সামলে বাতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা খুলল। ডাকল, ঠাকুরপো!

নিস্তব্ধ অন্ধকার উঠোন থেকে মানুষ দেখে শেয়াল পালিয়ে গেল। সেখানে কেউ নেই। ভয়ে কান্না পেল অহল্যার। ডাকল, মহী, মহী।

সাড়া নেই। সব নিস্তব্ধ। গাছের আঁধার কোল থেকে রাতজাগা পাখী ডাকে। অহল্যা ছুটে নিজের ঘরে গেল। ঘর খালি। রান্নাঘর ঢেঁকিঘর সব শূন্য। হঠাৎ নজরে পড়ল বাড়ির পিছনে পিপুলতলায় মাটিতে বুক চেপে মহিম শুয়ে আছে। বুকটা পুড়ে গেল অহল্যার। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দু-হাতে মহিমের মাথাটা তুলে ধরে ডাকল, মহী, মহী, ওঠ!

মহী, মহী, ওঠ।

মহিম মাথা তুলে চোখ মেলে তাকাল। রক্তবর্ণ চোখ, বিভ্রান্ত দৃষ্টি। বলল, আজ নয়, কাল চলে যাব।

কান্না চেপে অসম্ভব শক্তিতে অহল্যা মহিমকে টেনে তুলল। বলল, কোথায় যাবে এখান ছেড়ে? কোথাও যেতে পারবে না। ওঠো শীগ্‌গির মাটি ছেড়ে!

স্থির চোখে মহিম তাকাল অহল্যার দিকে, চোখের ঘোর যেন কাটতে লাগল।

মহিমের মুখভাব দেখে কান্না ঠেলে এল অহল্যার। বলল, মোর বুঝি খিদে তেষ্টা নাই। ওঠো খাবে চল।

এবার মহিম অহল্যার কোলে মুখ রেখে সেই শিশুর মত ফুলে ফুলে উঠল কান্নায়। সে কান্নায় অহল্যার কান্না এল।

॥ ২৪ ॥

পরদিন ভোরবেলা দীনেশ সান্যালের খ্যাকারিতে মহিমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কই রে মণ্ডলের পো, আছিস্ টাছিস্, না, ভাগলি?

নিশ্চিন্ত ঘুমে মহিমের মুখ আজ বেশ প্রফুল্ল। এক রাত্রে যেন তার অনেকদিনের সমস্ত ক্লেদ কেটে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বললে, নমস্কার সানেল মশাই।

সান্যাল বলল, কি রে, আদালতে কিছু জমা টমা তো দিলিনে? ভেবে দেখলি কিছু?

মহিম বলল, ভাববার তো কোন উপাই নাই সানেল মশাই।

হুঁ। সান্যাল একমূহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, উপায় আছে বই কি। কত্তার কথাটা ভেবে গ্যাখ্ তাতে সবই বজায় থাকবে।

মহিম বলল, জমিদারের ঘরে চাকরি মুই নিব না। নিজের মন ছাড়া মুই গড়তে পারব না কিছু।

সান্যাল হেসে বলল, তুই ব্যাটাদের মনও তো সে রকম। অ'খলে চাষার মোষ, ভাগচাষার মরা মুখ। এ ছাড়া কি দুনিয়ায় কিছু নাই?

সকালবেলাই মহিম আর বাকবিতণ্ডা বাড়াতে চাইল না। বলল, সে আপনি বোঝবেন না সানেল মশাই। আপনি এখন যান, মোর কাজ আছে।

সান্যাল বক্র ঠোঁটে চোখ কুঁচকে বলল, এখনও কাজ? জেদ এখনও? ভাল, ভাল। কর্তা পাঠিয়েছিল, তাই বললাম। তবে এক কাজ কর। আমের আঁটির ভেঁপু কিছু তুলে রাখ্। বলে হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। অহল্যা গোবর জলের বালতি হাতে সবই শুনল। বাপ-ভাইয়ের কথাই মনে পড়ল তার। এরমধ্যে কয়েকদিন তার বাবা পীতম্বর আর দাদা ভজন এসে ঘুরে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে কোন গতি আছে কিনা, কিছু বিক্রি বাটা করে ভিটে বজায় রাখবার। অহল্যা তাকে সবই বলেছে যে, কিছুই নেই। পীতাম্বর মেয়েকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, অহল্যা কিছু বলতে পারেনি। বাপ জিজ্ঞেস করেছে, তোর দেওরের জন্য ভাবছিস্? সে কথার জবাবও অহল্যা দিতে পারেনি। পীতাম্বর দেখেছে মেয়ে তার রাসভারী। তবু একটু চুপ করে থেকে বললে, চাষ করে খাই সত্যি, মোরা কাউকে দয়া ধম্মো দেখাতে পারি নি! কিন্তক্ তোর দেওরের

মত কীর্তিমান ছেলে যদি মোর ঘরে দু-দিন থাকে তবে বর্তে যাই। ভিটে তো আর আটকে থাকবে না। ভজন বলেছে, ওর ভিটা নাই কিন্তুক নয়নপুরের অনেক ভিটার দোর ওর জন্য খোলা রইছে। আর শুধু নয়নপুরই বা বলি কেন। এ তল্লাটে কোথায় নাই? ব্যাপারটা এমনই যেন, অহল্যাকে রাজী করানোটাই বাপ-ভাইয়ের কাছে সবচেয়ে বড়। তাই পীতাম্বর বলেছে, মোরা গতর খাটাই, মহিম গতরও খাটায়, চিন্তাও করে। এ দুটো ছাড়া মানুষের আর কি কাজ থাকতে পারে মুই জানি না।

অহল্যা অরাজী হয়নি, কিছু বলতেও পারেনি। বুকে তখন তার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে। সান্যালের ঘুরে যাওয়ার পর ভবিষ্যৎ চিন্তাতে ডুবে গেল সে।

মহিম তখন নতুন উদ্যমে শুরু করেছে আধশেষ কুঁজো কানাইয়ের মুর্তি।

দুপুরে এল পরান। পরান আজকাল খুবই বিমর্ষ, নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। এসে ডাকল মহিমকে।

মহিম বেরিয়ে এসে বলল, পরানদা বৌঠাকুরানীরে ব'লো, নয়নপুর ছেড়ে মুই যাব না।

সেদিনের ক্রুদ্ধ বাঘিনী অহল্যা আজ শান্তভাবে এসে বলল, বৌঠকুরানীরে ব'লো পরানদা, তানারা হলেন রাজরাজড়া লোক, দরিদ্দ মহিমের পরানটুকু নিয়ে তার পরান কতটুকু ভরবে? ওই পথ ও-ই দেখে নেবে।

পরানের বিস্মিত মুখে মিট মিট করে উঠল হাসি। দু-পা এগিয়ে এসে অহল্যাকে বলল, তাই তো ভাবছিলাম যে, তেলজলে এমন মিশ খায় কেমন করে। আচ্ছা, তাই বলব।

বলে পরান, বেরিয়ে গেল। কিন্তু যেমন বিমর্ষভাবে এসেছিল তার চেয়ে অনেকটা খুশি নিয়ে যেন ফিরল সে।

॥ ২৫ ॥

পরদিন বেলা প্রায় একটা।

অহল্যা ডোবায় গেছে বাসন মাজতে। মহিম নানান্ রকমের গাছের আঠা ও চূর্ণ সংমিশ্রণে মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ার নতুন মশলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

এমন সময় জমিদারের কয়েকজন পাইক, আদালতের নাজির, পেয়াদা এসে হাজির হল। পেছনে সান্যাল বোধ হয়, দখলদারের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে।

পেয়াদা হাঁকল, মহিম মণ্ডল, ঈশ্বর ভরত মণ্ডলের বউ অহল্যা মণ্ডল বাড়িতে আছে?

মহিম উঠোনে নেমে এল। বলল, কি বলছেন?

নাজির বলল, তুমি ভরত মণ্ডলের ভাই মহিম মণ্ডল?

হ্যাঁ।

নোটিশ পেয়েছিলে তুমি গতকাল রাত্রের মধ্যে ভিটে ঘর সব খালাস করে দেওয়ার?

না তো!

পেয়াদা খিঁচিয়ে উঠল, কোথায় ছিলা বাবা। বড় ভাই জীবনভর মামলা করে ম'ল, এ-খবরটা রাখ না?

নাজির গম্ভীর গলায় বলল, দশ মিনিট সময় দেওয়া গেল। যা পার, খালাস কর।

ডোবার ধার থেকে অহল্যা ছুটে এসে ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, ঘরের মানুষ বলছিল, তিন মাস সময় আছে। সে সময় তো হয় নাই?

সান্যাল তাকাল নাজিরের দিকে, নাজির তাকাল পেয়াদার দিকে। পেয়াদা হেসে উঠল হাতের কাগজগুলো অহল্যাকে দেখিয়ে। তোমার মানুষ মরবার সময় কি বলছিল তা জানি না, আর আদালতের কাগজ তোমার বাওড়াঘাটের মেয়েমানুষের ঘোঁট পাঁচালীও নয়। দুই মাস বাইশ দিন গত কাল পূর্ণ হয়ে গেছে। এই হল আদালতের রায়।

সান্যাল বলল, যা করতে হয় করেন নাজির মশাই। বলে সে পেয়াদাকে প্রথম দেখাল মহিমের ঘর।

পেয়াদা পাইকদের নিয়ে মহিমের ঘরের দাওয়ায় উঠে বলল, খালাস কর এ ঘর।

যেমনি বলা, তেমনি পাইকদের সঙ্গে পেয়াদা ওঘর থেকে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলতে শুরু করল।

মহিমের প্রাণ, মহিমের রক্ত দিয়ে গড়া সব মূর্তি উঠোনে এসে পড়তে লাগল। চূর্ণ বিচূর্ণ হতে লাগল সব।

প্রথমটা মহিম হতভম্ব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। যেন চক্ষের নিমেষে কি ঘটে গেল। পরমুহূর্তেই আকাশ ফাটানো চীৎকার করে সে ছুটে গেল ঘরের দিকে। কিন্তু অহল্যা ছুটে এসে মহিমকে দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। বলল, ঠাণ্ডা হও মহী। ওরা এখন শোধ তুলছে, ওরা যে হার মানছে তোমার কাছে। জিততে পারে নাই।

কুঁজো কানাইয়ের অর্ধসমাপ্ত মূর্তির গলা ভেঙ্গে গেছে, হরেরামের মুখ চূর্ণবিচূর্ণ, পাগলাঠাকুরের মূর্তি, শিব-সতী-বুদ্ধদেব, কিছুই ভাঙ্গতে বাদ গেল না। পুরনো দিনের সব কাজ, ভাঙাচোরা অবস্থায় উঠোনে স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। অহল্যার মাটির শিশু টুকরো টুকরো হল। ভূমিকম্পে উৎক্ষিপ্ত বিশাল মাটির চাঙ্গড়ের মত অখিল আর তার মোষের মূর্তি আছড়ে পড়ে খান খান হয়ে গেল।

যারা দেখতে এসে ভিড় করছে তারা ডুকরে উঠল। অহল্যা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল। তার হাতে ধরা মহিম চোয়াল শক্ত করে প্রতিটি মূর্তিকে ধ্বংস হতে দেখল, রুদ্ধশ্বাস, অপলক কঠিন দৃষ্টি, যেন পাথর হয়েছে।

হরেরামের বাউরী বউয়ের কান্না শোনা গেল। সে কান্নায় নয়নপুরের বাতাস হল বাউরী। আকাশে মেঘে ভেসে গেল হরেরামের বীভৎস মুখের আকৃতি নিয়ে। বাঁশঝাড়ের বাউরী হাওয়া তেপান্তর দিয়ে খাল বেয়ে নদী ভেঙে ছুটে গেল দিগদিগন্তে।

ধ্বংসের স্তূপ মাঝে ঝাপসা হয়ে গেল মহিমের চোখ। তার চোখে ভেসে উঠল কুঁজো কানাইয়ের মুখ। কালুমালার 'সোন্দরী মেইয়ের' মুখ দেখতে গিয়ে যে অপঘাতে মরেছে। তার চোখে ভাসল অখিলের সেই কান্নার কথা, মৃত মোষের নিষ্পলক চোখ, না-দেখা ভাদ্রবউয়ের অনুরাগভরা মুখ, হরেরামের ভ্রূকুটি, বউয়ের বিয়োনো মরা ছেলে। তার চোখে ফুটে উঠল গোবিন্দের মন্ত্রগুরু, তার প্রাণবন্ধু পাগলা-ঠাকুরের উদ্দীপ্ত মুখ, দেশে-বিদেশে, আবাদে জঙ্গলে যাকে খেয়ে না খেয়ে শত্রুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। সে দেখল, নয়নপুরের খালের শ্যাম শিশু হাসতে হাসতে নয়নপুরের তেপান্তর ভেঙে ছুটে আসছে। হরেরামের বউয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে, অহল্যার কোল জুড়ে এসে বসেছে। আহা, সংসারে যেন হাসি ফোটাবার মানুষ আসছে। চোখের জল সে কিছুতেই রোধ করতে পারল না।

পীতাম্বর আর ভজন এসে অহল্যা মহিমকে ধরে ডাকল, চল, বেলা যায়।

সারা নয়নপুরের মানুষ এসেছে এ ধ্বংসলীলা দেখতে। গোবিন্দ এসে দাঁড়িয়েছে মহিমের হাত ধরে। বনলতা এসেছে পাশে।

মহিমের শিল্প-সাধনার অতীত দিন আর ভরতের প্রাণভরা ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার রিক্ত সংসারের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে তারা সকলে বেরিয়ে এল।

হরেরামের বাউরী বউয়ের কান্না বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়ছে সারা নয়নপুরে। সারবন্দী মেঘের দল ছুটে চলেছে উত্তর দিকে। হেলে পড়া সূর্যের আলো পড়ে সেই মেঘের ধারে ধারে যেন আদিম কালের পাথরের কিম্ভূৎকিমাকার অস্ত্রের মত দেখাচ্ছে।

অহল্যা পেছিয়ে পড়েছে। ভজন-পীতাম্বরের সঙ্গে চলেছে মহিম। তাদের পেছনে চলেছে অনেক মানুষ, যেন ক্রোধে বেদনায় আত্মহারা মূক মিছিল একটা।

সকলের অলক্ষ্যে জমিদারবাড়ির দোতালার একটি ছোট জানালা খুলে গেল। দেখা গেল উমার মুখ। তার মুখে হাসি নেই, বেদনা

নেই রাগ নেই, যেন ত্রাস রয়েছে। কেন, তা সে-ই জানে। পাগলীর সেই হাসি অন্তঃপুরের অলিন্দে খিলানে খিলানেপ্রাচীরে ঘা খেয়ে আবার হারিয়ে যাচ্ছে ইমারতের অন্ধ গুহায়, তলিয়ে যাচ্ছে সন্তান-সন্ধানে।

খানিকদূর চলে ভজন আর পীতাম্বর হঠাৎ দাঁড়ালো। বলল, অহল্যা যে পেছিয়ে পড়ল। মহিম দেখল পথের মাঝে ভিটের দিকে ফিরে অহল্যা দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, মুই নিয়া আসি।

মহিম এসে দেখল, পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে অহল্যা দাঁড়িয়ে আছে ছেড়ে আসা ভিটা, উঠানের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে, বিশাল বলিষ্ঠ বুক সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মত ফুলে উঠেছে। চোখ ধ্বক্ ধ্বক্ করে জলছে। আগুন ভরা চোখ। ঘোমটা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে অবিন্যস্ত চুলের গোছা এসে পড়েছে মুখে। ঠোঁট কঠিন রেখায় বঙ্কিম।

তারপরই আচমকা মনে পড়ল ভরতকে। জীবন্তে, মরণেও যার জন্য হৃদয়ে তার এতখানি অনুশোচনা বুঝি হয়নি, এখন হল যেন তার সব চিহ্ন আজ ছেড়ে যাবার বেলায়।

মহিমের চোখে আলো ভরে উঠল। আবেগকম্পিত গলায় বলল, বউদি, তোমার মূর্তিখানি মুই গড়ব, এই মুখ এই চোখ মুই গড়ব। নতুন প্রস্থে সেই হইবে মোর প্রথম কাজ। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অহল্যা মহিমের দিকে তাকাল। ভাবে আবেগে গভীর চোখ মহিমের। অহল্যার বুক ঠেলে হঠাৎ কান্না এল। ফিস ফিস করে বলল, চেরকাল মুই পাথরের অহল্যা হয়ে থাকব ?

মহিম বলল, না, তাতে মুই পরান পিতিষ্ঠা করব।

চকিতে মুখ ফিরিয়ে অহল্যা বলল, নেও, সে হইবে অখন। বলে ঘোমটা টেনে দিল। যেন ভয় পেয়েছে। পীতাম্বর হাঁক দিল একটা। মহিম এগিয়ে চলল। কিন্তু অহল্যা কান্না কিছুতেই রোধ করতে পারল না। মুখে আঁচল চেপে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। এ গোপন কান্নার বুঝি শেষ নেই। আহা, বাঁধা বীণার তারে সে সুর কি গভীর!

মিছিমিছি

বাস্তবই সম্ভবতঃ সব থেকে অপ্রাকৃত। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের চোখে যা উদ্ভট, অদ্ভুত, বিচিত্র অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর বলে মনে হয়, তা হয়তো এতই বাস্তব, বাস্তব সমস্যা থেকে উদ্ভূত, সে কথাটা মানুষ ভুলে যায়। মানুষ তার নিজের কতকগুলো গতানুগতিক চিন্তার মধ্যেই সব কিছুর যুক্তি খুঁজে পেতে চায়। মানুষ তার নিজের অভিজ্ঞতাগুলো সম্পর্কেই এত অচেতন যে, সেগুলোকে সে খুঁটিয়ে দেখে, কোন কিছু বিচার করতে চায় না, বা সে অবকাশও তার থাকে না। ফলে, বাস্তব যে অতি তীব্র রকমের অপ্রাকৃত হতে পারে এটা তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না।

কোন বিশেষ ঘটনার কথা সে যখন, ঘটনার স্থান কাল পাত্র-পাত্রীদের কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে শোনে, তখন হয়তো সেটা তার কাছে এত অপ্রাকৃত মনে হয় যে, সে তার মধ্যে কোন বাস্তবতা খুঁজে পায় না। অথচ উদ্ভট বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা অনেক ঘটে চলেছে, মানুষ স্বয়ং তার স্রষ্টা, এ কথাটা তার মনে থাকে না। সে সব সময়েই তার প্রচলিত চিন্তা আর মতামতগুলোই জাহির করতে থাকে। যেন তার পকেটে একরাশ চাবির গোছা রয়েছে। এক-একটা তালার এক-একটা চাবি। ঘুরিয়ে দিলেই কুলুপ ফাঁস, সব ধরা পড়ে যাবে।

আর সম্ভবতঃ এই কারণেই মানুষ নিজের কাছেও অনাবিষ্কৃত বিস্ময়কর রয়ে গিয়েছে। নিজের কাছেই সে সব থেকে বেশী অপরিচিত।

যেমন ধরা যাক, অমুক মেয়েটি খুব ভাল। বল কী হে, প্রেমনাথের সঙ্গে পালিয়েছে এবং আবার প্রেমনাথকে খুন করে এখন ধরা পড়েছে? মুখের শোনা ঘটনায় বা সংবাদপত্রে পাঠ করলে, তবু একরকম। এমন আশ্চর্য ঘটনা মেনে নিতে লোকে হয়তো নিমরাজী। ছিন্ন দ্বিখণ্ডিত সাপের মাথা উঠোনের এপাশ থেকে ছিটকে গিয়ে ওপাশের একজনের মা কামড়ে ধরেছে এবং সেই ছিন্নমুণ্ড সাপের দংশনে সেই একজন মারা গিয়েছে—এ যুগের সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয় এবং এ অলৌকিকতায় লোকে বিশ্বাসও করে। অলৌকিক বলেই বিশ্বাস করে। কারণ এর সঙ্গে একটা ধর্মবোধ জড়িয়ে আছে। সাপ মানেই মনসা। এবং এরকম আশ্চর্য মৃত্যুতে লোকের পাপ চিন্তার একটা অন্ধকারে শিহরণ, তার ভিতরটাকে কাঁপায়।

এ ধরনের অলৌকিকতার কথা বলা হচ্ছে না। বাস্তবের মধ্যে যা

অপ্রাকৃত, এমন কি অলৌকিক, শুধু তার কথাই বলা হচ্ছে! যেমন একটা লোক, স্ত্রীকে নিজের হাতে হত্যা করে প্রতি রাত্রে সেই স্ত্রীকে দেখতে পায়, তার সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলে। ম্যাকবেথ-এর ডাইনীদের দৈববাণী শোনার মতন। হ্যামলেট-এর নিহত পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের মতন। কিংবা, ধরা যাক, ভাওয়ালের মধ্যমকুমার মৃত্যুর বারো বছর পরে আবার প্রত্যাবর্তন করেন—এমন ঘটনা।

এসব ঘটনা হয়তো অনেক বড় অনেক বেশী গভীরাশ্রয়ী অথচ চমকপ্রদ। কিন্তু আমাদের বাস্তব পরিবেশের মধ্যে অহর্নিশ কত অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে চলেছে, তা আমরা অনেক সময়েই খেয়াল করি না। করলেও, যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করতে পারি না। সে সব যদি আবার গল্পে, উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়, তখন বলি, ওসব নাটক নভেলের বিষয়। জীবনের পক্ষে সম্ভব নয়। তার মানেই, প্রচলিত ধারণার বাইরে যাবার যোগ্যতা ইচ্ছা বা চিন্তা নেই। অথচ এই বিপুল বিশ্বের এত বিস্ময়কর ঘটনা, বাস্তব জীবন থেকেই উদ্ভূত।

আসলে, ঘটনার বাস্তবতা যে আমাদের মনের মধ্যেই, অবচেতন রয়ে গিয়েছে, মস্তিষ্কের সীমার মধ্যেই চক্র দিচ্ছে, এ কথাটা কেউ মনে রাখে না। রাখে না বলেই, একজন রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই কেন তার মৃত পিতার কণ্ঠস্বরই শুধু শুনতে পায়, এটা ভেবে উঠতে পারে না! সচ্চরিত্র প্রৌঢ় পরাশরবাবু হঠাৎ মদ ধরেছেন এবং রাস্তার দেওয়াল ধরে ধরে আজকাল বাড়ি ফিরছেন, বেশ্যালয়ে গমন করছেন, এ বিস্ময় আর ঘোচে না। মৃত পিতার কণ্ঠস্বর, সেই ব্যক্তিবিশেষেরই মস্তিষ্কের সীমায় আবর্তিত হয়, আর কারুর নয়। এই ব্যক্তির জীবন বা মস্তিষ্ক, কোনটাই অপরের নয়। পরাশরবাবুকে যারা এ যাবৎ সচ্চরিত্র বলে এসেছে, তারা জানতই না, পরাশরবাবু তাদের কাছে থেকেও কত দূরের মানুষ। পরিচয়ের মধ্যেও কত অপরিচয়।

এই প্রাত্যহিকতা নিয়ে বাঁচার মধ্যে মানুষ নিজে আত্মবিস্মৃত, এবং অন্যের বিষয়েও, তার নিজের মধ্যে একটা মৌমাছির প্রবণতা রয়েছে। যেন সবাই হবে এরকম দেখতে, সবায়েরই হবে এরকম ভাবনা। এমন কি প্রেমটাও একরকমের হলেই ভাল হয়। এরকম একটা নির্দিষ্ট চিন্তা তাকে শেষ পর্যন্ত একটি মক্ষীরানীর দাস করে তোলে, একথা সে ভুলে যায়। শত পুষ্প ফুটবে, জীবনের এরকম একটা উজ্জ্বল ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ

যদি বলে, সেই শত পুষ্প কেবলই ক্রিসান্‌থিমাম্‌ বা জুঁই বা বেল, তাহলে সেটাও অনেকটা মৌমাছিতন্ত্রের মতই মনে হয়। শত পুষ্প, শত বিভিন্নতা, এরকমটাই ঠিক। তাতে পুষ্পের যা অবদান, তা-ই থাকে, কিন্তু বাগিচাটা হয়ে উঠে আরো উজ্বল, সুন্দর এবং অর্থপূর্ণও বটে।

যাই হোক, বাস্তবই সব থেকে অপ্রাকৃত, এটাই আমার বিশ্বাস। নয়তো, সদ্য মৃত শিশুর কথা মনে করে মায়ের চোখেই শুধু জল গড়াতো না, স্তনের অমৃতধারাও অজস্র ধারায় ফেটে বেরোয়। এটা, আমরা যাদের গাড়ল বলি, তারাও জানে। যুবতীর জরায়ুর মধ্যে একটি ডিম্বাণু প্রায় তিন দিন ধরে একটি পুরুষ বীর্যের জীবাণুর প্রত্যাশায় কাতর থাকে, এই বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে, যুবতীর দেহে সহসা ঈষৎ তাপের সঞ্চারণ, তার প্রাণের দখিন দরওয়াজার খিল হঠাৎ খুলে যায়, চোখের তারায় কিসের আবেশ, হাসিতে এক বিচিত্র লাস্যের আবেগ, চলার তালের ছন্দ যায় বদলে এবং কোনদিনের তরেই গান না-গাওয়া কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে, ওহে, ওহে সুন্দর মরি মরি, এই অপ্রাকৃত বিষয়টা আরসিক বাঁদরদের বোঝানো যায় না। সহসা এই পরিবর্তনের অবাস্তবতা তাদের চোখে জাগায় কেবল সতর্ক সন্দেহ।

বাস্তবের মধ্যে অপ্রাকৃত শুধু এই রকম তা নয়। দেস্‌দেমোনিয়াকে হত্যা করে ওথেলোর আত্মহত্যা একটা অপ্রাকৃত ঘটনা। বাস্তবই একমাত্র মানুষের কল্পনাকে কাঁচকলা দেখায়। বাস্তবের মধ্যে যা অসংলগ্নতা আছে, তা মানুষের কল্পনার থেকেও অনেক বেশী জটিল আর সুদূরপ্রসারী। বাস্তব মানুষের শাসন মানে না, তারা তৈরী কোন রীতিনীতিও ধার ধারে না। সেইজন্যই, বাস্তব অপ্রাকৃত, দৈব তার সঙ্গী।

স্থান কাল পাত্র ভেদে, বাস্তবের মধ্যে যে অপ্রাকৃতের বিভিন্নতা, তার প্রভেদ দেখা যায়। এক্ষেত্রে, মানুষের কথাই বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। তার মনের বাস্তব বোধের সঙ্গে যে-সব অসংলগ্নতা থাকে, তারই পরিণতি, অপ্রাকৃত। খুনী, খুন করার পরেই নিখুঁত টপ্পায় গান করে, তবলার বোলে ভুল হলে শুধরে দেয়, একজন শান্ত সৌম্যদর্শন মানুষ, মনে মনে যাকে খুন করেছে, তাকেই হয়তো তখন চিঠি লিখছে, 'অথচ তুমি জান না, কী ভীষণ ভালবাসি তোমাকে··· অথবা সে হয়তো কখনো জানে না, সে তাকে খুন করতেও চায়। অথচ এসব কোন কিছুই অবাস্তব নয়।

অবাস্তব নয়, অপ্রাকৃতভাবে প্রতীয়মান হয়। অবাস্তব বলে মনে হয়। হাস্যকর ভাবে বলা যায়, ভিক্ষুক রাজা হতে চায়, এটা বাস্তব, কিন্তু most

unnatural তেমনি, রাজা ভিক্ষুক হতে চায়, এটা বাস্তব বলে মেনে নিতে পারি না। লতিকা দেড়হাজার মাইল ট্রেনে স্বামী-সন্দর্শন আকাঙ্খায় ডবল ভাড়া দিয়ে সিঙল্‌ কূপে-তে আসছিল। কিন্তু স্বামী সন্দর্শনের আগেই, স্বামীর থেকে সব বিষয়েই প্রায় নিরেস একটি ছেলের কাছে, নির্জন কূপে-তে নিবিড়ভাবে নিজেকে দান করলো। হাওড়া স্টেশনে যখন স্বামীর সঙ্গে দেখা হল, দেখল স্বামীর উজ্জ্বল মুখে চোখে প্রেমাবেগের তরঙ্গ বইছে। স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে সে তার দেহ মনের তাপ যেন লতিকার মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইল। কিন্তু লতিকার সকল উত্তাপ তখন অন্যখানে। স্বামীর সামনে সেই পরিমাণ শীতল। ব্যবহারে মনে হল, স্বামী লোকটি তার কাছে তেমন পরিচিত নয়। স্বামীর মধ্যে সেটা আরো বেশী। সে দেখল, যে-লতিকাকে সে দেখবে ভেবেছিল, এ যেন সে নয়। এর পরে, জীবন-যাপনের বাস্তবতার মধ্যে, কত বিবিধ অপ্রাকৃতের আবির্ভাব ঘটবে, কে বলতে পারে।

কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীতই বোধহয় গাওয়া হল এতক্ষণ। এত কথা বলবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কথাগুলো ভাবছিল, একজন বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা। সে তখন একেবারে একলা, যেটা ভাবাই যায় না, একেবারেই অসম্ভব, তাও দূর জেলাগামী একটা ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়ল, একেবারে ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরের মত একটা স্টেশনে···

কিন্তু আসল লোকের কথাটাই আগে বলা দরকার।

একে আসল লোক বলা যাবে কী না জানি না, কিন্তু এ লোকটি চালক। গাড়ির, মোটর গাড়ির চালক এবং মালিক। নাম ফকিরচাঁদ, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এখন তার পরনে আছে একটা ময়লা ধুতিকে দু'ভাঁজ করে লুঙ্গির মত পড়া। গায়ে একটা বুকখোলা জামা, তার কয়েক জায়গায় ছেঁড়া। ময়লা তো বটেই। বোতাম খোলা, বুকে একটা বেশ মোটা ময়লা পৈতা দেখা যাচ্ছে। মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা, এখনো ভেজা-ভেজা। কিন্তু লক্ষ্য, করলে চাঁদিতে খানিকটা তেল দেখা যাবে। গন্ধেও মালুম দেয়, সরষের তেলই মেখে চান করেছিল। কোনরকমে মোছার সময় হয়েছিল, আঁচড়াবার সময় হয় নি।

চেহারার মধ্যে এমনি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, চোখ মুখ মন্দ নয়। চোখ দুটি কালো এবং ডাগর,

নাকটাও চোখা। বেশ কয়েকদিন গোঁফদাড়ি কাটা না হলেও, মুখখানি যে খারাপ নয়, তা বোঝা যায় কিন্তু মুখের ভাবভঙ্গি, চাউনিটা এমনই যে তাকালেই মনে হয়, লোকটা কাঠগোঁয়ার। যেভাবে বিড়িটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে, এক পাশের দাঁত বের করে বিকৃত করে রেখেছে, যেন সে ওই দাঁত দিয়ে সবকিছুই কামড়ে চিবিয়ে দিতে পারে। মুখের রঙটা এক সময়ে বোধহয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণই ছিল। এখন জলে রোদে ভিজে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা বেশ তীক্ষ্ণ আর গভীর রেখা পড়েছে। শরীরের গঠনটা খারাপ নয়। তথাপি একটু যেন বেশী লম্বাই মনে হয়। গায়ে গতরে একটু মাংস লাগলে বেশ ভালই দেখাবে। বয়স হবে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দেখায় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মত।

এর নাম ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিবাস বর্ধমান কাটোয়া সাব-ডিভিশনের এক গ্রামে। কর্মস্থল হিসাবে সে বেছে নিয়েছে এই ফুলেরি ইষ্টিশন। এখানে যে-দুটি মোটরগাড়ি যাত্রী নিয়ে চলাচল করে, তার মধ্যে একটির মালিক এবং চালক সে নিজে। একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণচাঁপাগাছের ছায়ায় তার মোটর এখন বিশ্রাম করছে। হাল আমলের কোনো গাড়ি নয়, সম্ভবতঃ ফকিরচাঁদের জন্মের আগে এই গাড়ির জন্ম হয়েছিল। গাড়ির দুপাশের পাদানি, যা নিচে বাঁশ দিয়ে, গাড়ির মাথায় দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, তাতেই প্রমাণ করে গাড়িটার আমল বলে কিছু নেই আর এখন। গাড়ির দু পাশের দরজাই একেবারে আলাদা করে খোলা। গাছের গায়ে ঠেকনো দিয়ে রাখা হয়েছে। আগেকার দরজা নেই, দরজা বসাবার আলাদা লোহার ঘর কব্জা করা হয়েছে। আটকাবার জন্যে লোহার ছিটকিনি আছে। বনেট খোলা একটা বাঁশের খুঁটি দিয়ে সেটা ঠেকা দিয়ে রেখেছে। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়িতে যে রকম গদি দেখা যায়, গাড়ির গদি সেই রকম। সামনের গদিতে একটি ছেলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ফকিরচাঁদ দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরে গাড়িটা দেখছে। এখনো বিড়িটা ধরানো হয় নি। হাতে দেশলাই, ধরবার অবকাশ হয় নি এখনো।

খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখার পরে, ষ্টিয়ারিং হুইলটা একবার নাড়াচাড়া করে দেখল। তারপরে হঠাৎই যেন তার নজরে পড়ল, ছেলেটার মুখে মাথায় রোদ লাগছে। যেন ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে, ভুরু কুঁচকে, চোখ পাকিয়েই পশ্চিমদিকে তাকিয়ে দেখল। সূর্যটা সত্যিই এতখানি নেমে পড়েছে কি না, সেটাই তার জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা। তারপরে গাড়ির পিছন থেকে তেলকালি মাথার

ওপরে যতটা সম্ভব পরিষ্কার থাকা একরকম একটা ন্যাকড়ার টুকরো নিয়ে ছেলেটির মুখ মাথা ঢেকে দিল। দাঁতে কামড়ানো বিড়িটা হাতে নিয়ে বারকয়েক টিপল, ঘোরালো, কানের কাছে নিয়ে তামাকের শুদ্ধতার শব্দ নিল। তারপর ধরালো। ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে উলটো পিঠ দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে ঢেঁকুর তুলল।

ঢেঁকুর তুলেই তার মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। কারুর উদ্দেশে একটা শ্রুতিকটু খিস্তি দিয়ে বলল,–শালা রোজ এই ইঁদুর পচা তেল নিয়ে রেঁধে খাওয়াচ্ছে। পেটটাকে ইস্‌পয়েল করে দিল বানচত্‌।'

বলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে যেদিকে তাকাল, সেদিকেই ফুলেরির দোকানপাট, হাটবাজার। ফুলেরিকে প্রায় একটা গঞ্জবিশেষ বলা যায়। একটা বড় হাট আছে সপ্তাহে দুদিন বসে। বেচাকেনার জায়গা হিসাবে মন্দ নয়। তবে এখন আর হাটের অপেক্ষা নেই। আজকাল রোজই বাজার বসে। ফুলেরি এখন আর সে ফুলেরি নেই। রেল লাইনের এপারে ওপারে অনেক দোকান বেড়েছে। লাইনের ওপারে অদূরেই জি. টি. রোড। ফুলেরিতে ইস্কুল পোস্ট-অফিস ছাড়াও বড় বড় কয়েকটি ধানকল আছে। নতুন দুটো ঠাণ্ডা গুদাম হয়েছে, যার নাম কোল্ড স্টোরেজ। আশেপাশে আরো আছে।

ধানচালের কারবারটা এখানে ভাল। আলু পেঁয়াজ কুমড়োও মন্দ নয়। এখন বার মাস নিত্যদিন ব্যবসা। এখন রোজ বাজার বসবে বৈকি! লরির চলাচল বেড়েছে, জি. টি. রোড থেকে ফুলেরির মধ্যেও তাদের যাতায়াত। অতএব, মোটর লরি মেরামতি কারখানা হয়েছে। সাইকেল রিকশাও প্রায় খান পনর-কুড়িটার মত হবে। তাই খাবারের দোকান, ভাতের হোটেল সবই বেড়েছে।

ফকিরচাঁদের যেটা বড় সুবিধে, ফুলেরি থেকে অনেক দিকে অনেক রাস্তা গিয়েছে। সোজাসুজি ফুলেরি থেকে না, জি. টি. রোডে পড়লেই, যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাওয়া যাবে। আজকাল ভিতর দিকেও অনেক রাস্তা হয়েছে। তবে, পীচের রাস্তায় আর কদিন চলেছে ফকিরচাঁদের গাড়ি। গ্রামের রাস্তা, নয়তো ধানকাটা মাঠের ওপরেই যাতায়াত বেশী। ফুলেরি ইষ্টিশনে যারা নামে, তারা কেউ শহরের যাত্রী নয়। সবাই দূর গাঁয়ের যাত্রী।

যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হাঁটা পথের যাত্রী। দূরের গ্রামের লোকেরা পরিবার পরিজন নিয়ে ফুলেরিতে আসবার আগে দেশে চিঠি পাঠিয়ে দিনক্ষণ

জানিয়ে দেয়। গরুর গাড়ি এসে অপেক্ষা করে। নেহাত না হলে, সাইকেল রিকশায় সম্ভব হলে, তাতেই যায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি, মেঠো পথে রিকশা চলে না। আর মোটরগাড়ি নেহাত বিয়ে-থা অসুখ-বিসুখ এসব ব্যাপারেই লোকে খোঁজে। তাও পারতপক্ষে নয়। আর যারা নেহাত গ্রামের মানুষ নয়, গরুর গাড়ি চড়তে অভ্যস্ত নয়, তারাই বা একটু-আধটু খোঁজ করে।

আগেকার দিনে যাও-বা নসীবপুর বা পুণ্যার হাটে রোজ কয়েকটা ক্ষেপ মারা যেত আজকাল তাও উঠে গিয়েছে। আজকাল বাস এসে পড়েছে। লোকে আর শেয়ারে এই ছোট গাড়িতে উঠতে চায় না।

তবে হ্যাঁ, হাওয়া বইছে অন্যরকম। লোকে আজকাল গাড়ি চড়তে চায়। পকেট একটু রেস্ত থাকলে আর বলা নেই, অমনি গাড়ি। তাই বসে থাকতে হয় না প্রায় কোনদিনই। বরং রেট বাড়িয়ে দিতে হয়েছে। নতুন জামাই মেয়ে দেখলে তো কথাই নেই। যা কিছু চেয়ে বস। যাবে তো ওঠ, তা নইলে যাও। তিন চাকা কতদূর নিয়ে যাবে, তাতে না হলে মারো হন্‌টন্‌।

'শালা বেশী রমজানি!' এ কথাও মনে মনে বলে ফকিরচাঁদ কথায় কথায় মোটরগাড়ি চড়তে চায়, তাদের ওপর কেমন একটা বিদ্বেষ আছে তার। অসুখ-বিসুখ বিপদ-আপদ হয় সেটা বুঝি। তোমার বাপ-ঠাকুর্দা, চিরদিন গরুরগাড়িতে যাতায়াত করে এল, তুমি কোন খবর না দিয়ে, মোটর-গাড়ি ভাড়া করবে। এ তো শুধু পয়সার জলুনি না, ফুটানি, বাবু গাড়ি নিয়ে গাঁয়ে এলেন।

তবে, কার ঝাড়ে কে বাঁশ কাটে। গাড়ি নিয়ে বসে আছে, ফ্যাল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? যে যত বেশী দেবে, সে-ই গাড়িতে উঠবে। এখন যখন তোমাদের বাতিক ধরেছে, তখন আক্কেল সেলামী দাও।

দোকানপাটের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফকির তার গাড়ির দিকে তাকাল। এখনো যা আছে, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। হতে পারে দেশে অনেক গাড়ি হয়েছে, পাড়াগাঁয়ে এখানে সেখানে আজকাল হুট্ বলতে হাল ফ্যাশানের চকচকে ঝকঝকে গাড়ি যাতায়াত করছে। তা সে যতই গাড়ি বাড়ুক, যতই যাতায়াত করুক, ফুলেরিতে কেউ প্রাইভেট গাড়ির ব্যবসা করতে আসছে না। ফুলেরির প্রাইভেট গাড়ির রাজত্ব দুই রাজ্যে ভাগাভাগি। দুই রাজ্যের দুজন রাজা। ফকিরচাঁদ চট্টোপাধ্যায় আর কালী ঘোষাল।

নামটা মনে পড়তেই প্যাচ করে এক গাদা থুথু ফেলল ফকিরচাঁদ। দূরেরু

দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, 'শালার সঙ্গে একদিন আমার হয়ে যাবে। বড্ড বাড়িয়েছে আজকাল।'

কথাটা নানান কারণেই ফকিরের মুখ দিয়ে বেরোতে পারে। মানুষের অনেকের অনেক রকম দোষ থাকতে পারে। নেশা-ভাঙ করতে পার তুমি। তোমার পয়সায় তুমি বিষ কিনে খাও গিয়ে, তাও আজকালকার দিনে কেউ দেখতে যাবে না। কিন্তু নেশা ভাঙ্ করে লোকের ওপর হামলা করবে, এর তার ঘরের কথা নিয়ে, চরিত্রের কথা নিয়ে হাঁকডাক চেঁচামেচি করবে, তা চলবে না। কালী ঘোষালের এই দোষটি ষোলআনা।

'তোমার কেচ্ছা কে গায় তার নেই ঠিক, তুমি যাও পরের ছেঁদা খুঁজতে, শালা'...

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ফেলে, আর একবার থুথু ফেলল সে। নিচু হয়ে মার্ডগার্ডের তলা দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখল। তার মুখ দেখে মনে হল, গাড়ির কোন গোলমাল নেই।

আর মেয়েমানুষ নিয়ে র‍্যালা কর, তাতেও কারুর মাথাব্যথা নেই। রেস্তই বল আর রঙই বল, মাগী পোট খেলে লেগে যাবে, কার কী। তা বলে অন্যের মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি করবে কেন? শালার সঙ্গে একদিন রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে।

প্রায় বিড়বিড় করে কথাগুলো উচ্চারণ করল ফকির। কালী ঘোষাল, তার যে প্রতিদ্বন্দ্বী এ সব বিষয়গুলো লোকটার ব্যাপারে সত্যি। মদ খেলেই সে দিগ্বিজয়ী রাজা। ফুলেরির হাটে গঞ্জে সবাই জানতে পারে, কালী মদ খেয়েছে। মেয়েমানুষের ব্যাপারেও তার নীতি প্রায় বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যদিও ফুলেরি এমন একটা জায়গা, এখানে কোন বেশ্যালয় নেই। শহরে যেমন পাকাপোক্ত পাড়া থাকে, ফুলেরি সেরকম শহর নয় যে বরাবরের মত চালু কোন মেয়েমানুষদের ব্যবসা করার পাড়া থাকবে।

তবে হাটগঞ্জের ব্যাপার, এখানে সবরকম মানুষেরই আনাগোনা। দায়ে পড়ে খারাপ আর স্বভাবের দোষে খারাপ, এরকম মেয়ে যারা আশে-পাশে আছে, তারা ফুলেরির কারবারে আছে। যেমন গদাধরের বউ। গদাধরের কারবার হচ্ছে, বে-আইনী চোলাই মদের। স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই কারবার। দু'জনে মিলে চোলাই করে, দু'জনেই বিক্রী করে। এই করতে করতেই গদাধরের কালোচুলো আটো-খাটো বউটি নিজেকেও বিক্রী করে দিয়েছে। এখন সবাই জানে, গদাধরের বউ ফুলেরির রাঁড়। কিন্তু ফকির

কোনদিন গদাধরের বউয়ের কাছে যায় নি। গদাধর বাউরি, তার বউও বাউরি, সেজন্য নয়। তার ভালই লাগে না। তবে হ্যাঁ, বউটার হাতের গুণ আছে, বস্তুটি ভালই বানায়। সেটা আনতে যেতে হয়। আর কালী ঘোষালকে গিয়ে দেখ সে থাকলে গদার বউয়ের কাছে কারুর এগুবার উপায় নেই। গদার বউ যদি বলে, 'তুমি ডেরাইভার এমন করে কেন বল তো। কই, ফকিরবাবু তো কথনো তোমার মত করে না।'

তার জবাবে কালী ঘোষাল বলে, 'আরে কালী ঘোষাল যেথানে আছে সেথানে ফক্‌রে চাটুয্যের মুরোদে কুলোবে না এগোতে।'

সব কথাতে ফক্‌রে চাটুয্যে। মনে মনে বলে, 'দেব একদিন এমন বাঁশ, ফক্‌রের পেছনে লাগা বেরিয়ে যাবে।'

গদার বউ ছাড়াও হাটে-বাজারে বেচা-কেনা করতে আসে, এমন অনেক মেয়ে আছে। শনিবারের দিনটাই সব থেকে জম-জমাট। সেদিন অনেক রাত অবধি বেচাকেনা চলে। সব রকমের বেচাকেনাই চলে। বাজারের পেছনে, কোঙারদের দীঘির চারপাশেই, অন্ধকার বৃন্দাবনলীলা হয়। যত তাড়ি মদের শ্রাদ্ধ, তেমনি ছুঁড়ি বুড়িরও শ্রাদ্ধ।

আশেপাশে ধানকল আছে কয়েকটা। সেখানকার কামিনগুলো আছে। চাষ-আবাদের কাজের জন্য সাঁওতাল মুণ্ডা মেয়েরা আছে। নন্দ পোদের ইঁট পোড়াবার কলেও মেয়ে কম নেই। সন্ধ্যার সময় তাড়ির দোকানটা এদের দখলেই থাকে বলতে গেলে। তবে হ্যাঁ, এদের কাছে একটা জিনিস, বেবুশ্যেবৃত্তি পাবে না। এরা সোজাসুজি মানুষ। তোমার সঙ্গে রঙ ধরল ভিড়ে পড়ল। গতরে খাটি, নিজের রোজগারে খাই। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। চল একটু আশনাই করি। পকেটের টাকা ঝনঝনিয়ে লোভ দেখাবে, সেটি হচ্ছে না। সে সব হল গদার বউয়ের মত মেয়ে। গদার বউয়ের সঙ্গে যে সব মেয়েদের ভাব ভালবাসা আছে, আশেপাশের গ্রাম থেকে যারা যারা আসে, তারাও এ সব করে। ভাল চরিত্রের মেয়ে তারা। তাদের কারুর অভাব, কারুর স্বভাব। ফুলেরিতে যদি কোনদিন নিয়মিত মেয়েপাড়া হয়, তবে তা গদাধরের বাড়িটাকে ঘিরেই হবে।

ফকির একটা ন্যাকড়া নিয়ে গাছতলায় খুলে রাখা গাড়ির দরজাগুলোর ধুলো ঝাড়তে লাগল উটকো হয়ে বসে। সে নিজে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। দোষ-ত্রুটি মানুষ মাত্রেরই আছে। তারপরে এ যা লাইন, কথন কোথায় যাচ্ছে, থাকছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ কী রকম আয় হবে,

কাল পেটের ভাত জুটবে কি না, এই ধান্দায় ধান্দায় দিন কাটে। তাই জীবনটা আর মনটাও বেঠিক মত হয়ে গিয়েছে। চোখে মাঝে মধ্যে নেশা ধরে যায় বৈকি! রক্তে দপ্‌ দপ্‌ করে। তখন কিছু একটা ঘটে যায় হয়তো।

কিন্তু কালী ঘোষাল জানলেই পেছনে লাগবে। হাসি টিটকারি হল্লা করে সবাইকে জানাবে। এটা কি লোক জানাবার মত বিষয়? কালীর মত ফকির অত বুক বাজিয়ে কিছু করতে চায় না। এতে বাহাদুরির কী আছে। কালী তা করবেই। শুধু তাই নাকি? ফকির যদি কোন মেয়ের সঙ্গে মেশে, কালী তার পেছনে ঘুর ঘুর করবে। একে তো, সকলের সামনেই বলে, 'চাটুয্যে ধানকলের সেই ছুঁড়িটাকে বেশ জুটিয়েছিলে।'

ফকির দু-এক কথা বলে কোনরকমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। দাঁতে দাঁত পিষে কাছ থেকে চলে যায়। তারপরে সে যখন লোকজনকে বলে, 'জবাগাঁয়ের মুকুজ্জেদের জামাই ফকরে চাটুয্যে ধানকলের মেয়ে নিয়ে খুব উড়ছে।'

কেন, এসব শ্বশুর জামাই কথা বলবার দরকার কী। ফকির কোন গ্রামের, কাদের বাড়ির জামাই, এসব কথা বলবার কী অধিকার কালীর! এ সব পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করবার ফিকির নয়? আসলে খোঁচাটা যে কোথায় দিতে চায় সেটা ফকির ভালই জানে। এ জন্যেই কালী ঘোষালের সঙ্গে তার একদিন একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

যেন কালী ঘোষালেরই গায়ে মারছে, এমনি ভাবে গাড়ির খোলা দরজাটাতে সে ন্যাকড়া দিয়ে জোরে জোরে ঝাপটা মারে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে, 'শালা'।

এমন সময় তার নজর পড়ে গেল গাড়িটার ওপর। ছেলেটা মুখ থেকে তেল মোছা ন্যাকড়াটা সরিয়ে দিয়েছে। আবার রোদ পড়ছে তার মুখের ওপর। ফকির আবার একবার পশ্চিমের আকাশে তাকাল। সূর্যের এত তেজ যেন তার ভাল লাগছে না। সে এবার আর ন্যাকড়া ঢাকা দেবার চেষ্টা না করে দরজা তুলে নিয়েই কব্জায় বসিয়ে আটকে দিল। ছেলেটার মুখে এবার ছায়া পড়ল। ফকির, ছেলেটির গলার কাছ থেকে ন্যাকড়াটা নিয়ে গাড়ির পিছনের গদীতে ছুঁড়ে দিল।

ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যাবার মুখে আবার সে ছেলেটার দিকে তাকাল। বুক খোলা জামার ফাঁকে ময়লা পৈতাগাছাটি দেখা যাচ্ছে, গত বছরই কোন-রকমে উপনয়নটা সারা গিয়েছে। মনে হতেই, ঠোঁট দুটো একবার বেঁকে

উঠল ফকিরের। উপনয়ন! দ্বিজত্ব! নেহাৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে, তাই একটা নিয়ম-কর্ম রক্ষা। এ ছেলে পুরোহিতবৃত্তিও করবে না, পণ্ডিতও হবে না। এর এখন একমাত্র পরিচয়, ক্লিনার। ফকিরের গাড়ির সে ক্লিনার। তবে বলতে নেই, এই রোগা রোগা হাত-পা নিয়ে গাড়ি চালাতেও শিখেছে।

বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলে। ইস্কুলেই পড়েছিল গ্রামের বাড়িতে। বুড়ি ঠাকুমাটি মরল, তারপরে ফকিরকেই সঙ্গে নিয়ে আসতে হল। দেখবার শোনবার কেউ নেই। দেশের বাড়িতে খাবার সংস্থান এমনিতেই ছিল না। ফকিরের আয়ের ওপরেই সব। প্রকাণ্ড একটা বসত বাড়ি আছে। বিঘে পাঁচ ছয়েকের মত ধান জমি। দেখাশোনা করবার লোকও নেই। তাই ফুলেরিতেই নিয়ে এসেছিল।

নিজের ছেলে, রেখে আসবেই বা কার ভরসায়। এককালে চাটুয্যেদের নাম ডাক ছিল। সেই নাম ডাকের ইঞ্জিনের যত গর্জন, তার বেবাক তেল বাবা পিতামহরাই শেষ করে গিয়েছে। ফকিরদের জন্য কিছু নেই। নিজের কৈশোরে তার একটু রোশনাই দেখেছিল। সেটা হল, দপ্ করে নিভে যাবার পূর্বাবস্থা। যৌবনে পা দিল, তারপরেই সব ফুত্। নেহাত সাতকড়ি চাটুয্যের ছেলে বলে জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের মেয়ের আগমন ঘটেছিল। তাও যদি, মুকুজ্জেরা চাটুয্যেদের ভিতরের অবস্থা জানতো, তাহলে কখনোই সে বিয়ে হত না। আর এই একটিমাত্র কারণে নিজের বাপের বিরুদ্ধে ফকির নালিশ না করে পারল না। নেহাত বাপ, আর মানুষটাও মারাও গিয়েছে, তা না হলে এখন এক-এক সময় অকথ্য গালাগালি দিতে ইচ্ছে করে।

ভাবতেই ফকিরের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল। কেউ দেখলে ভাবত, সে বুঝি ক্রুদ্ধ মুখে, জ্বলন্ত চোখে, ছেলেটার ঘুমন্ত মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। আসলে, তার নিজের বিয়ের কথাটাই মনে পড়ছে। কে বলেছিল বাবাকে, জবাগ্রামে মুকুজ্জেদের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে? এখন যে কাঁচ-কলাটি দেখাচ্ছে সেটি দেখবে কে?

তবে হ্যাঁ, ফকির চাটুয্যেও চাটুয্যের বাচ্ছা। জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের মুখে সে ইয়ে করে দেয়। এত বড় সাহস তার শ্বশুরের, বলে কি না, লেখাপড়া শেখ নি। তোমাদের অবস্থা যে এত খারাপ, তাও তোমার বাপ গোপন করেছিল। তা নইলে অমন বাড়িতে কেউ মেয়ে দেয়? গোটা বাড়িতে হিসেব করলে, দু লাখ নোনা ইঁট ছাড়া তো কিছু নেই। তাও খদ্দের জুটবে না। তা যাই হোক, মেয়ে যখন একবার সম্প্রদান হয়ে গেছে তখন তো

আর চারা নেই। তুমি বরং আমাদের বাড়িতে এসেই থাক। মেয়েটাও যাহোক খেয়ে পরে বাঁচবে। তোমারও আমার ওখানেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

নেহাত শ্বশুরের নিজের বাড়ীতে বসে কথা হয়েছিল, নইলে লোকটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিত। তবু ফকির বলেছিল, 'সংসারে কি গরীব নেই?'

শ্বশুর বলেছিল, 'তা থাকবে না কেন। গরীবেরা গরীবের মত থাকে। তোমার জন্যে তো ভাবনা নেই, মেয়ের জন্যেই ভাবনা। সে তোমাদের ওই পোড়ো বাড়িটায় উপোস দিয়ে থাকবে কেমন করে বল তো।'

সত্যি বলতে কি, অভাবের জন্য এমন অপমানিত ফকির সেই দিনের আগে আর তেমন করে হয়নি। বলেছিল, তা হলে অমন বাড়িতে মেয়ের বিয়ে না দিলেই পারতেন?'

শ্বশুর বলেছিল, 'গুরুজনের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়, তাও বুঝি জান না। তোমার বাপ যদি কথা না বলত, তা হলে কি ও বাড়িতে মেয়ে দিই?

'কেন আমার বাবা কি আপনাকে বলেছিল নাকি, আমাদের লাখ লাখ টাকা আছে?

'তা বলে নি। তবে এ কথা বলেছিল, তালপুকুরে এখনো নাকি ঘটি ডোবে।'

তখন ফকির বলেছিল, 'দেখুন ওসব বাপ খুড়ো কী বলছে জানি না। আমি আমিই। আমি আপনার বাড়িতে বরাবর থাকব, এ কোনদিন হবে না। আপনার মেয়ে থাকুক, তাও আমি চাই না। তারপরে যদি আপনার মেয়ে না যেতে চায়, সেটা তার ইচ্ছে।'

এ-সব বিষয়ে কথা হয়েছিল এই ছেলের জন্মের পরে। বিয়ের কয়েক মাস পরেই এ ছেলে মায়ের পেটে এসেছিল। ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ফকিরের মুখটি শুধু নরম হয়ে উঠল না, অসহায় পিতা করুণ চোখে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কী করবে ফকির, ছেলেটার ভাগ্য। নিজে লেখাপড়া শিখতে পারে নি। বাপ-ঠাকুর্দারও সেই ঢিলে-ঢালা সেকালের এক ধরনের আয়েসি চরিত্র ছিল। লেখাপড়া শিখতেই হবে, এমন একটা প্রবণতা তাদের পরিবারে কোনদিনই ছিল না। নিজেরাও শেখেনি, খেয়ে-পরে দিন চলে গিয়েছে। ভেবেছিল

ফকিরদেরও চলে যাবে। যা দিয়ে যাবে, তা তো নিজেরাই বেচারাম হয়ে বেচে দিয়ে গিয়েছে। ছ বিঘে জমিতে কখনো চলে। বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত জমি বিক্রী করেই করতে হয়েছে। ফকিরের বিয়েতেও জমি বিক্রী করা হয়েছিল। নেহাত এই জেলায় জমির দাম সব থেকে বেশী। এই জেলার জমির তুল্য জমি রাঢ়ে নেই বললেই চলে। অন্য জেলায় হলে এক হাত জমিও থাকত না।

বিয়ের পরে যখন ছেলে হয়েছিল, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনি ফকির। কাটোয়ায় মহাদেব ঘোষ এই গাড়িটা চালাত। তার সঙ্গে গিয়ে গাড়ি চালানো শিখেছিল সে। চালানো, কিছু মেরামত সবই শিখেছিল। ওদিকে মহাদেবের বয়সও হয়ে আসছিল। তার বদলে ফকিরই গাড়ি ট্রিপ দিত এখানে সেখানে। তারপরে একদিন মহাদেব বলেছিল, সে আর গাড়ি চালাতে পারবে না। শরীরে কুলোচ্ছে না। ফকির যদি ইচ্ছে করে, সে-ই গাড়িটা কিনে নিক। সদরে গিয়ে নিজের নামে একটা লাইসেন্স করিয়ে নিলেই হবে।

সেই থেকে পুরোপুরি ড্রাইভার। মহাদেব মতলব দিয়ে গিয়েছিল, এ গাড়ি নিয়ে কাটোয়ায় বেশী দিন চালানো যাবে না। তার চেয়ে ফকির যেন ফুলেরির মত জায়গায় চলে যায়। সেখানে গাড়ির কারবার ভাল চলবে। উঠতি জায়গা, চট করে ওখানে কেউ যাবে না।

কথাটা মিথ্যে বলেনি মহাদেব ঘোষ। পুরনো লোক, অনেক জায়গা দেখাশোনা ছিল। এসব গাড়ি কোথায় চলবে, দুটো পয়সা রোজগার হবে, ভাল বুঝত। ফুলেরিতে যখন প্রথম এসেছিল ফকির তখন কালী ঘোষাল এসে গাড়ির রাজ্যে ভাগ বসায় নি, ফুলেরিতে মোটরগাড়ির অধিপতি তখন একলা ফকির। কিন্তু এসব রাজ্যের কোন লেখাপড়া তো নেই। ছ'মাস না যেতেই কালী ঘোষাল এসেছিল। আর দু চারটে যদি আসে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিন্তু তাতেই কি দিন চলছিল। ছ বিঘে জমি, ভাগে চাষ। আধাআধি বখরা। তিরিশ, বড় জোর চল্লিশ মন ধান পাওয়া যায়। ভাঙানোর খরচ খরচা আছে। তার থেকে কিছু বিক্রী বাটাও আছে। তা নইলে চলে না। এদিকে তার নিজের গাড়ির আয়। গাড়িটা পাঁচশো টাকায় মহাদেব দিয়েছিল। আর শ তিনেক খরচ করে, এক রকম দাঁড় করিয়ে নেওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তেল মবিল আছে। টায়ার টিউব আছে। নেহাত

সেকালের গাড়ি, তা-ই এঞ্জিনটা এখনো চলে। আর তো সবই বেঁধে-ছেদে চলে। আজ এটা ভাঙে, কাল ওটা খুলে কোথায় পড়ে যায়। বর্ধমান শহরের সুধীন মিস্তিরির কাছে তো দেনার অন্ত নেই। গাড়ির রোগ ধরলে তার ঘরেই সারানো হয়। পার্টসের দরকার হলে সে-ই দেয়।

তবু গাড়ি চালানোর টাকাই বাড়িতে পাঠাত। যখন যা পারত, তাই পাঠাত। রাতে, সব মিলিয়ে কোন রকমে ক্ষুন্নিবৃত্তি, দিন গুজরানো চলছিল। অভাব চূড়ান্ত। গাইগরু ছিল না। ছেলেটার দুধের জন্যও টাকা দরকার ছিল।

ছেলের যখন পাঁচ বছর, সে সময়েই একবার শেষ গিয়েছিল ফকির জবাগ্রামে। সেইবারেই শ্বশুরের সঙ্গে তার বিবাদ হয়েছিল। জবাগ্রামের মুকুজ্জেদের ঘরেও যে সরস্বতীর দয়া ছিল, তা নয়। তবে লক্ষ্মীর কৃপা ছিল। জমিজমা ভালই আছে। বাড়ি ঘরদোরও পাকা। শ্বশুরের তেজারতি বন্ধকি কারবার বেশ তেজী। টাকার জোরেই ভদ্রলোক।

তার কথা শুনে শ্বশুর বলেছিল, 'একখানা ছ্যাকরা গাড়ি চালিয়ে তো খাও। তাও সে গাড়ি দেখলে লজ্জা করে; ড্রাইভারকে দেখলে আরো লজ্জা করে। তোমার অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তো ভাল নয় বাপু।'

কথাগুলো শ্বশুর বেশ ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা ভাবেই বলেছিল। এ সব লোক মোক্ষম কথা বলে কিন্তু সহজে মাথা গরম করে না, গলা চড়ায় না। কিন্তু ফকির চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল 'বাড়িতে বসে অপমান করেছেন?'

কেন বাইরে গেলে শোধ নেবে? শ্বশুর হেসে বলেছিল, 'যা সত্যি তা বললে কি অপমান হয়?'

ফকিরের তখন যাচাই বিচারের মেজাজ ছিল না। বলেছিল গাড়ি আর ড্রাইভার দেখলে আপনার লজ্জা করতে পারে, আপনাকে তো কোনদিন পায়ে ধরে সেধে সে গাড়িতে উঠতে বলি নি। আপনার লজ্জা নিয়ে আপনি থাকুন আমাকে বলবেন না।

'তবে কাকে বলব বাছা? গাড়ি তোমার, চালাও তুমি। তুমি পায়ে ধরে সাধলেই কি আমিও গাড়িতে উঠব? আমি ম'লেও গাড়িতে চেপে ত্রিবেণীতেও যাব না।'

অর্থাৎ শ্বশুর মারা গেলে ত্রিবেণীর চিতায় তার দাহ হবে। বোধ হয় সেটাই তার ইচ্ছা। ফকির বলেছিল, আপনাকে ত্রিবেণী নিয়ে যাবার জন্য

আমার গাড়ির দায় কেঁদে গেছে।'

টাকাওয়ালা লোকদের মেজাজে কতকগুলো বৈচিত্র আছে। ওরা পরের দুঃখ নিয়ে বেশ মোলায়েম করে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে পারে। দু-চারটে কড়া কথা শুনেও তাদের তেলতেলে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে! দুঃখী দরিদ্রের কটু কড়া কথার মধ্যে তারা একটা আনন্দদায়ক কৌতুক অনুভব করে। কিন্তু এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা আর তেলতেলে গায়ে লাগে না। একেবারে ভিতরে গিয়ে বেঁধে। তখন সেটাকে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

ফকিরের শ্বশুরও পারে নি। শেষের কথাটি বেশ জোরেই বিঁধেছিল। তাই হঠাৎ একেবারে চিৎকার করে উঠেছিল, 'থায় হে ছোকরা, তোমার মত অমন বাটপাড়ের ছেলে, পচা ড্রাইভার অনেক দেখেছি। বড় বড় কথা! শ্বশুরের সামনে কী ভাবে কথা বলতে হয় জান না? না জান তো হাঁটা দাও।'

পরিস্কার তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু ফকিরেরও তখন মাথার ঠিক ছিল না। সেও গলা তুলে বলেছিল, 'বাড়িতে পেয়ে অনেকেই অমন অপমান করতে পারে। আমার বাবাকে যে বাটপাড় বলে তাকে আমি বলি চোর।'

খবরদার! মুখ সামলে কথা বল।'

শ্বশুরের চিৎকারে তখন বাড়ির লোকজন বাইরের ঘরের দরজায় এসে পড়েছিল। কাজে কর্মে রত কিষাণরা, বাড়ির মেয়েরা।

ফকিরও তেমনি চিৎকার করে বলেছিল 'কিসের মুখ সামলে মশায়? চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি যে বাড়িতে অপমান করছেন। আপনার বাড়িতে ফকির চাটুয্যে কোনদিন পেচ্ছাপ করতেও আসবে না।'

'তবে রে ছোটলেক ইতর। বিশে, আমার বন্দুকটা নিয়ে আয় তো, এ ব্যাটার খুলি উড়িয়ে ছাড়ব আজ।'

শ্বশুর লাফিয়ে উঠেছিল কোমরের চাবি গুঁজতে গুঁজতে। ইতিমধ্যে ফকিরের এক শালা এসে পড়েছিল। শাশুড়ি তার বউ, সবাই। সকলেই শ্বশুরকে ঘিরে ধরেছিল। ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেছিল।

ফকিরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তার বউ। ভয়ে তখন তার চোখে জল এসে পড়েছিল। বলেছিল, 'তুমি চুপ কর, পায়ে পড়ি। বাবা যদি দুটো কথা বলেই, তাতে কী হয়েছে?'

ফকিরের তখন উগ্রচণ্ডী মূর্তি। বলেছিল দুটো কথা! একে দুটো কথা বলে? আমার বাবা বাটপাড় আমি পচা ড্রাইভার ছোটলোক,

ইতর ? আবার বন্দুক দেখাচ্ছেন। আমাকে বলে ঘরজামাই থাকতে। বলে, হাঁটা দায়।'

শ্বশুরের সমান চিৎকার, 'ঘরজামাই না, বাড়ির কিষেন করে রাখব। আমার মেয়ের বিয়ে হয়নি বলে জানব, তবু সে আর তোমার বাড়ি যাবে না।'

ফকির বলেছিলেন, 'এখন আর যাব না বললে তো আর একটা বড়লোক জামাই করা যাবে না।'

ফকিরের বউ সুষমা কাকে যে সামলাবে ঠিক করতে পারছিল না। তবু সে স্বামীকেই সামলাবার চেষ্টা করেছিল। ফকিরের পাঁচ বছরের ছেলেটি মায়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে বাবার আর দাদুর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখছিল, আর ভয় পাচ্ছিল। দাদুকেই তার বেশি ভয় করছিল। বাবাকে তার বিশেষ ভয় ছিল না। বাবাকে সে চিনত বেশী।

সুষমার ভাই বলেছিল, 'জামাইবাবু, তুমি চুপ কর একটু। বাবা তুমি ভেতরে চলো।'

ফকির বলেছিল, আমার চুপ করার কি আছে। ওবেলা এসেছি, এবেলায় যাব। বলতে এসেছিলাম, ছেলে বউকে বাড়ি নিয়ে যাব। সেই থেকে তো আরম্ভ হল যত কুচ্ছো। যাকগে, এসব কথায় আমি আর থাকতে চাই না। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?'

সে সুষমাকে জিজ্ঞেসা করেছিল। তার জবাব দিয়েছিল শ্বশুর, 'না, যাবে না ও। এই তো মেয়ের হাল করেছ, না খেয়ে মরতে যাবে ?'

ফকির আর শ্বশুরের দিকে তাকায় নি। সুষমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিল।

সুষমা বলেছিল, 'এ অবস্থায় কি যাওয়া যায় বল ? কয়েকটা দিন পরে তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে এস, তখন যাব।'

ফকিরের মাথায় তখন রক্ত ফুটছে। বলেছিল, 'না, আমি আর

এ বাড়িতে কোনদিন আসব না। যাবে তো আজই চল।'

শ্বশুরকে ধরে তখন বা'ড়ির ভিতরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকেই চিৎকার করে উঠেছিল, 'না যাবে না। আর তুমি এ বাড়িতে না এলেও মেয়ের দিন যাবে।'

ফকির বলেছিল, 'তবে তাই হোক।'

ফকির ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করেছিল। সুষমা ডেকেছিল, 'শোন, একবারটি শোন।' ফকির ফিরে দাঁড়িয়েছিল। ঘরে তখন সুষমা আর ছেলে ছাড়া বাড়ির আর কেউ ছিল না। সুষমা বলেছিল 'কবে আসবে বললে না?'

ফকির বলেছিল, 'কেন, আমার গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই, আবার আসব? তোমার বাপ বলেছে, সে জানবে তোমার বিয়ে হয় নি। এখন তুমিও যদি সেটা ভাব, তা হলেই সব ল্যাটা চুকে যায়।'

সুষমা সেই সময়েও হাসবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'ওসব তোমাদের রাগের কথা, আমাকে টেন না।'

ফকির বলেছিল, 'তোমাকেও বলি, আমার এই অপমানের পরে তুমি যদি এক দণ্ড এখানে থাক, তবে আর আমার বাড়িতে এস না!'

সুষমার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'এক কথায় এত বড় কথাটা তুমি আমাকে বললে?'

'ছোট বড় জানি না, যা বুঝেছি তাই বলেছি।'

'কিন্তু ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ-বিষুধ খেয়ে, অসুখ সারিয়ে যাব তাই কথা ছিল। আমার শরীর যে একটুও সারে নি।'

ওসব বড়লোকের মেয়েদের গায়ে গতরে অসুখ বারো মাস লেগেই থাকে।

'কেন, আমার অসুখের কথা কি মিছে?'

'তা জানি না। যেখানে আমার এত বড় অপমান, সেখানে তুমি থাকতে পারবে না।'

সুষমার মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তুমিও তো বাবাকে কম অপমানটা করনি। কেবল কি তোমাকেই অপমান করা হয়েছে?'

মুহূর্তের মধ্যে, আর একবার ফকিরের মাথায় দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। বলেছিল, 'বটে! জানি, মুখুজ্জের মেয়েরা বাপের কুল নিয়ে বরাবরই কুলকুনুটি হয়। তবে বাপসোহাগি হয়েই থাক, আর স্বামীর ঘরে যেতে হবে না। আর বাপ যা বলেছে, তাই কর, আবার একটা বিয়ে কর।'

সুষমা রেগে বলেছিল, 'অসভ্যের মত কথা বলো না।'

'অসভ্য!'

'হ্যাঁ অসভ্যই তো, আমার মুখ খুব খারাপ! যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে আর কথা বাড়াতেই চাই না। তুমি মাকে গিয়ে সব কথা বলো? আমি এখন যাব না, কিছুদিন পরে যাব।'

আর একবার নতুন করে অপমানিত বোধ করেছিল ফকির। এক-এক সময়, যে-সব কথাকে সামান্য মনে করে, মিটমাট করে নেওয়া যায়, সময়ে সেই কথা অসামান্য হয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। ফকিরকে সুষমা জীবনে কতবারই 'অসভ্য' বলেছে! ফকির হেসেছে ছাড়া আর কিছু করেনি! কিন্তু সে সময়ে, সেই কথাই একটা প্রকাণ্ড গালাগাল বলে বোধ হয়েছিল! সে বলেছিল, 'বুঝেছি, তুমি বাপ কা বেটি। আমার মাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই চলে যাচ্ছি, তুমি স্বামীপুত্রের মাথা খাও, আর যদি আমার বাড়ি যাও।

সুষমা একটা আর্তনাদ করে উঠেছিল, 'চুপ চুপ, ওগো পায়ে পড়ি চুপ কর, এমন কথা বলো না।'

'বলব। হাজারবার বলব। স্বামীপুত্রের মাথা খাও, যদি যাও। স্বামীর সাতপুরুষ, বাপের সাতপুরুষের মাথা খাও, যদি যাও।'

সুষমা মুখে আঁচল চেপে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। ছেলেটা

দুজনের মাঝখানে অসহায় ভাবে তাকিয়েছিল। বাবা মাকে সে এমনভাবে কোনদিন কথা বলতে দেখেনি আগে। বাবাকে তার এতখানি ভয় ছিল না যে, মাকে জড়িয়ে ধরবে। তবে বাবার ওপরে তার রাগ হয়েছিল মাকে অমনি করে কাঁদাবার জন্যে।

ফকিরের মাথায় তখন এত রক্ত উঠে গিয়েছিল, শুধু মাথার দিব্বি দিয়ে চলে আসতে পারছিল না। তারপরেই সে বলেছিল, 'বাপের ঘরে টাকা থাকলে অমন অসুখের অছিলা অনেক করা যায়। বুঝিচি, গরীব ভাতারের ঘর আর ভাল লাগছে না, এবার বাপের ধরে দেওয়া নাগরে মন উঠবে।'

সেই মুহূর্তে সুষমা, চোখের জল নিয়েই, দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল। তীব্রগলায় বলে উঠেছিল, 'তুমি সত্যি ছোটলোক, সত্যি ইতর। এতবড় কথা বলছ তুমি আমাকে?'

সুষমার সেই দপদপে রাঙা মুখ, টানা টানা বড় রাঙা চোখ দুটির কথা একবারও ভুলতে পারে না। কেন যে সে সুষমাকে সেই সময় ওভাবে অপমানকর কথাগুলো বলছিল, নিজেও তা জানত না। সুষমাকে কোনদিনই সে এত ছোট বা মন্দ ভাবে নি। তার সম্পর্কে ও ধরনের চিন্তা কখনো তার মাথায় ছিল না। অথচ সে নিজেকে দমন করেও রাখতে পারছিল না। শুকনো খড়ের গাদায় আগুন লাগলে তা যেমন সহজে নেভানো যায় না, তেমনি করেই তখন ফকিরের মস্তিষ্কের মধ্যে জ্বলছিল সে আরো নোংরা, আরো নিষ্ঠুর কথা বলেছিল, 'তা বটে আমি তো ইতর ছোটলোকই, ফুলেরিতে গাড়ি চালিয়ে খাই। তোমাকে এতবড় কথা বলা ভুল, যার অমন বাপ ভাই আছে, তার কত বুকের পাটা। তা অমন বাপ ভাই থাকতে আর বাইরের নাগর তোমার দরকার হবে না। চিরকাল সিঁদুর পরে, মাছ খেয়ে এখানেই থেকো।'

সুষমা তৎক্ষণাৎ বাইরের দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দপদপে চোখে ঘৃণা উৎক্ষিপ্ত স্বরে বলেছিল, 'বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

তুমি মহাপাপী, তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার দিব্বিই আমি মেনে নিলাম তুমি না নিতে এলে আর তোমার ঘরে কোনদিন যাব না। আয় তো ফড়িং, চলে আয়।'

ছেলের হাত ধরে সুষমা বাড়ির ভিতর চলে গিয়েছিল। ফকিরও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাড়ির বাইরে, বাঁশঝাড়ের পাশে, রাস্তার ওপরে তার গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। বউ ছেলে নিয়ে যাবার জন্য গাড়িটা নিয়ে গিয়েছিল ; তখনো গাড়িটার এত দুর্দশা হয় নি।

বাইরে গিয়ে লাট্টু-গিয়ার টেনে দিয়ে, গাড়ির হ্যাণ্ডেল মেরে স্টার্ট করেছিল। তারপরে, একটা প্রচণ্ড আর্তনাদের মত শব্দ করে, জবাগ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মাইল কাঁচা রাস্তা যাবার পরে বৈদ্যপুর কালনার পাকা রাস্তায় পড়েছিল।

অতদূরে যেতে যেতে, সাপের যেমন দংশনের পর নিজের একটা বিষক্রিয়া হয়, তেমনি হয়েছিল ফকিরের। বিষেরও বিষক্রিয়া আছে। সাপ যেমন ছোবল দিয়ে বেশী দূরে যেতে পারে না, বিষ ছেড়ে দিয়ে অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে, ফকিরও তেমনি গিয়েছিল। পীচের রাস্তায় পড়ে সে গাড়িটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। মনটা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। অনুশোচনা হয়েছিল। ও কথাগুলো তার সুষমাকে বলা উচিত হয় নি। শত হলেও ফড়িং-এর মা। নিজের সর্বস্ব দিয়ে, ফকিরের সংসার করেছে। ফকির ফুলেরি থেকে বাড়ি গেলে, তাকে অনেক যত্ন করেছে। নিজের হাতে ফকিরের গা পর্যন্ত পরিষ্কার করে দিয়েছে। বলেছে, "রাজ্যের রাস্তার ধুলোবালির মধ্যে ঘোর, তা নিজেকে একটু সাবান জলে পরিষ্কার রাখতে পার না ?'

নিজের জন্যে সোনার একটি অলংকারও রাখেনি। ফড়িং-এর অন্নপ্রাশন থেকেই বউয়ের অলংকার বিক্রি শুরু হয়েছিল। তাকে অমন অপমানকর কথাগুলো বলা ঠিক হয় নি।

মনের মধ্যে একটা যুক্তিও মাথা চাড়া দিয়েছিল, সুষমা তো চলে এলেই পারত। স্বামীর এমন অপমানটা সে দাঁড়িয়ে দেখেও বাপের বাড়িতে থাকতে চাইল কেমন করে। আবার নিজেই মনে মনে জবাব দিয়েছিল, সে কথা পরেও বোঝাপড়া করা যেত। গালাগাল গুলো দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রাস্তার মাঝখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে, মাঠের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ ধরে সুষমার স্ফুরিত ক্রুদ্ধ মুখখানির কথা ভেবেছিল। তারপরে কাটোয়া হয়ে, বাড়ি গিয়ে মোটামুটি সব ঘটনাই তার মাকে বলেছিল। মাও তাঁকে ভাল বলেনি। শ্বশুরের ওপর রাগ করে তার নামে গালাগাল দিয়েছিল বটে, বউকে কটু কথা বলার জন্য মা তাকেই বকেছিল। কিন্তু মা আসলে সারারাত ঘুমোতে পারে নি ফড়িং-এর জন্য। নাতিটি যেমন ঠাকুমার চোখের মণি, নাতিটির কাছেও তেমনি ঠাকুমা ছাড়া কথা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে, সেবার ফড়িং-এর জন্যই সুষমাকে আনতে গিয়েছিল সে। এদিকে যখন ঠাকুমা হেঁদিয়ে পড়ছিল নাতীর অবস্থাও খারাপ। নাতীর দিনরাত্রিই ঠাকুমা ঠাকুমা। ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ঠাকুমার শোকে। সুষমা নিজেই তার শাশুড়িকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, ফড়িং খেতে বসতে শুতে যেরকম ঠাকুমার কথা বলছে, ঠাকুমার কাছে যাবার জন্যে কান্না বায়না করছে, তাতে তাকে আর জবাগ্রামে রাখা যাচ্ছে না। এমন কি সে ঘুমন্ত অবস্থায় ঠাকুমার নাম করে ডেকে ওঠে। ছেলের শরীর খারাপ হয়ে যাবার অবস্থা। অথচ সুষমার যে কারণে পিত্রালয়ে যাওয়া, সেই চিকিৎসা চললেও, শরীর মোটেই ভাল হয় নি। কিন্তু ছেলেকে আর জবাগ্রামে রাখা ঠিক হবে না, তাকে ঠাকুমার কাছে পাঠাতেই হবে। তাতে যদি, সুষমাকেও যেতে হয়, অগত্যা তা যেতে হবে। ফড়িং-এর বাবা যেন আসে।

সেই চিঠির ভিত্তিতেই ফকির গিয়েছিল। ফকিরের বাবা জীবিত

থাকতেই তার শ্বশুর আর চিঠি লিখত না ফকিরকে কোনদিনই লেখেনি। যাওয়া আসার কথাবার্তা যা কিছু বউয়ের চিঠিতেই হত। কিন্তু শ্বশুরের অপমানকর কথাবার্তার পরিণতি ঘটেছিল অন্যরকম। অথচ, আসলে যার জন্যে যাওয়া, সেই ছেলেকে রেখেই চলে এসেছিল ফকির।

মাসখানেক পরে আবার সুষমার চিঠি এসেছিল শাশুড়ির কাছে। ছেলেকে ঠাক্‌মার কাছে না নিয়ে গেলে একটা বিপরীত কিছু ঘটে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। ছেলে আর একটুও থাকতে পারছে না। চিঠি পড়ে. মা নিজেই যেতে চেয়েছিল। ফকির সেটা পারে নি। সঙ্গে এক জ্ঞাতিভাইকে নিয়ে সে নিজেই গিয়েছিল। নিজে গ ড়ি নিয়ে জবাগ্রামের বাইরে. হেল্‌থ্‌ সেণ্টারের হঁসপাতালের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে পাঠিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। ফকিরের মনে কেমন একটা আশা হয়েছিল, সুষমাও চলে আসতে পারে ছেলের সঙ্গে।

জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে শুধু ছেলেই এসেছিল। ফকির ছেলেকে নিজের পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোর মা এল না ?

ছেলে বলেছিল. 'ন, মা কোনদিন আর আসবে না বলেছে। তুমি মাকে বকেছিলে কেন ?'

বুকের কাছে কেমন করে উঠেছিল ফকিরের। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'সে তো ঝগড়ার কথা রে, তা বলে মা বাড়িতে আসবে না ? তুই আসতে বললি নে ?'

'বলেছিলুম।'

'তা কী বললে ?'

'কিছু বললে না। আমাকে ধরে খালি কাঁদতে লাগল। আর বললে, মাঝে মাঝে এসে মাকে দেখে যাস ফড়িং।'

ফকিরের বুকের কাছে কথা আটকেই ছিল। আর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে নি। বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেকে। সে একটা

দৃশ্য বটে নাতী ঠাক্‌মার মিলন। কথায় নাকি বলে, মায়ের থেকে বেশী যে, তাকে বলে ডান, অর্থাৎ ডাইনী। কিন্তু নিজের ছেলে আর মেয়ের বেলায় ফকির এ কথার বিপরীত দেখেছিল। ফড়িং তার মাকে ছাড়া থাকতে পারতো, ঠাক্‌মাকে ছাড়া নয়! আর এই কারণেই, ছেলেটা কোনদিন মামাদের বা দাহু দিদার প্রিয়পাত্র হতে পারে নি। একরকম ভালই হয়েছিল। তবু অন্ততঃ তার ছেলে জবাগ্রামের মুখুজ্জ্যেদের ন্যাওটা হয় নি।

কিন্তু সুষমার না আসায়, প্রথমদিকে অভিমান হলেও, তার দিক থেকে যখন কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি, তখন ফকিরের মনও আবার আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে উঠেছিল। সুষমার এত যদি জেদ, তবে সে চিরদিন বাপের বাড়িতেই থাকুক। এমন কি, ফড়িং এর খবর জিজ্ঞেস করে, মাকে সে যে চিঠি লিখত, তাতেও ফকিরের প্রসঙ্গে একটি কথাও থাকত না। যেন ফকির নামে কোন মানুষের অস্তিত্বই নেই তার কাছে। এত তেজ! বেশ, ফকিরও কোনদিন জিজ্ঞেস করবে না। এমন কি, এতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে ফকির, ছেলেকেও পারতপক্ষে জবাগ্রামে যেতে দিতে চাইত না। নেহাত মায়ের অনুরোধে পড়ে, কারুর সঙ্গে পাঠাত। হু একদিন বাদেই আবার ছেলে চলে আসত।

তারপরে মা মারা যাবার পর দেশের বাড়িতে একলা ছেলেকে রাখা গেল না। নিয়ে আসতে হল নিজের কাছে। ফকিরের তো গাড়ি না চালাতে পারলে চলবে না। তাই ফুলেরিতেই হরেকৃষ্ণ দের বড় কাপড়ের দোকানের পাশে একটি ঘর ভাড়া করে ছেলেকে নিয়ে এসেছিল।

ফুলেরির ফাঁকা লাইনের ওপর দিয়ে গুম্‌গুম্ করে একটা মালগাড়ি চলে গেল। ফকির মুখ তুলে দেখল। যাত্রীর ভিড় দেখে সে বুঝল, হাওড়ার গাড়ি আসছে। কে জানে, যাত্রী জুটবে কি না। যদি জোটে, তখন দরজাগুলো লাগালেই হবে। তখন ফড়িংকে ডাকলেই হবে।

কিন্তু আজ একটু উথলা হয়ে উঠল ফকিরের মন। অনেকদিন এসব কথাবার্তা মনে হয় নি। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ফড়িং এর মুখের দিকে তাকিয়ে আরো বেশী করে মনে পড়ে গেল। ছেলেটা ফকিরের প্রায় কিছুই পায় নি। রঙে, চোখে মুখে, সব কিছুতে একেবারে মা বসানো। সুষমাকে তো দেখতে খারাপ নয়। বরং সুন্দরীই বলতে হবে। টকটকে না হোক, ফরসা রঙ, টানা কালো চোখ। প্রতিমা ভাবের দেখতে।

ছেলেটার মুখ চোখ অবিকল মায়ের মতই হয়েছে। কিন্তু ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে, লেখাপড়া শিখল না, এই একটা দুঃখ। ফকিরের একটা তো মস্ত দোষ, সে গরীব। তা বলে গরীবের ছেলের কি লেখাপড়া হয় না? তাও হয়, সেরকম একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল। ফকির রইল পড়ে গাড়ি নিয়ে ফুলেরিতে। ছেলে ঠাক্‌মার আদরে আদরে আর ঠাক্‌মাকে মানতে চাইত না। লেখাপড়া ফেলে মাঠে বাদাড়েই ঘুরেছে। তারপরে মা মারা যাবার পর, এখানে এনে পড়াবে ভেবেছিল। তাও হল না। কথায় বলে বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে খারাপ। ফকির বেরিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে, ফিরে এসে শোনে, ছেলে স্কুলে যায় নি। ফুলেরিতে তো ছেলেকে ভরতি করে দিয়েছিল ফকির।

বকা-ঝকা মার-ধোর, সবরকমই হয়েছে। এমন ইল্লুতে ছেলে, কালী ঘোষালের সঙ্গে তার গাড়ি মেরামতের কাজ করে। সে কথা আবার ফকিরকে শুনতে হয় অন্যের মুখ থেকে। বলে কী না, তার ছেলে গাড়ি চালানো শিখবে কালীর কাছ থেকে।

তার ছেলে গাড়ি চালানো শিখবে কালী ঘোষালের কাছে। ওরে ব্যাটা নিকুচি করেছে তোর লেখাপড়ার। চল্ কত গাড়ি চালানো শিখবি। প্রথমে রাগ করে, তারপরে যত্ন করেই কাজটা শেখাবার চেষ্টা করেছে ফকির। যাকগে, সকলেরই তো আর লেখাপড়া হয় না। একটা কাজ শেখাও তো খারাপ নয়।

এখন দেখ, এই রোগা নড়বড়ে হাত পা ছেলের এই গাড়ি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যায়। বয়স তো এই তের। যে গাড়িতে স্টার্ট দিলে গাড়ির শরীর থরথরিয়ে কাঁপে, যে কাঁপুনিতে মনে হয়, ছেলের হাতের ডানা শুদ্ধ খুলে পড়ে যাবে, সেই গাড়ি নিয়ে অনায়াসে মেঠো পথে ট্রিপ মেরে আসে। এখন এ গাড়ির কোথায় কী গোলমাল সে কথা ফড়িং যত জানে, ফকিরও জানে না। গাড়ি স্টার্ট দিলে, এমন ভেজালের শব্দ হতে থাকে, তার মধ্যে কোথায় কতটুকু গোলমালের আওয়াজ আছে, ফকির টের পায় না। ফড়িং ঠিক কান খাড়া করে শোনে, টের পায়।

ফকিরকে কিছু বলতে হয় না, নিজেই গাড়ি পরিষ্কার করে, রোজ ধোয়া। তলায় শুয়ে সারায়। বাপের গাড়িটা এখন প্রায় ওর হয়ে গিয়েছে। তবে যাত্রীরা ভয় পায়। তারা যখন দেখে, রোগা ডিগডিগে, ফর্সা, বড় বড় চোখ একটা ছেলে গিয়ে চালকের আসনে বসছে, তখন বলে ওঠে, ও বাবা এর হাতে গাড়ি চললে যেতে ভরসা পাব না বাবা।'

তারপরে চালানো দেখলে একটু ভরসা পায়। তবু পুরোপুরি নয়। সে ভরসা কি ফকিরেরই আছে? সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও আড়চোখে ছেলের হাত পায়ের দিকে সব সময়ে নজর রাখে জি, টি, রোডকেই ভয়টা বেশী। তার ওপরে ফড়িং যখন আবার অন্য গাড়ির সঙ্গে রেস্ দিতে যায় বা লরি বাসকে পাশ দিতে না চায় তখনই বড় ভয়ের কথা। ওদের কি বিশ্বাস আছে? ওদের বিশ্বাস নেই। একটু ঠেকিয়ে দিলেই হল। আর দিলেই সোনা।

অবিশ্যি এ গাড়ির জান অনেক শক্ত। জীপের মত চলতে পারে, আজকালকার গাড়ি থেকে অনেক উঁচুও বটে। ইদানিং সাইলেন্সগিয়ারটা ভেঙে গিয়ে একটু আওয়াজ দিচ্ছে বেশী। তা হলেও, আজকালকার টিনের গাড়ি নয়। সত্যিকারের লোহার গাড়ি। তবে হ্যাঁ, একটা বড় গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা সইবে কেমন করে।

তাই এখনো ফড়িং এর পাশে বসে ফকিরকে বলতে হয়. হর্ন দে।' 'আস্তে যা, বাঁয়ে ঘ্যাষ, হাত দেখিয়ে পাশ দে।' সামনে গরুর গাড়ি, হর্ন মার, ডাইনে কাটা।'

কোন কোন সময় ফড়িংএর জেদ চাপে। হয়তো পাশ দিতে চায় না। পাপের কথাও তার কানে যায় না। তখন থেকে বলছি করে ধমকে ওঠে, 'মারব এক থাপ্পড় হারামজাদা, তখন থেকে বলছি পাশ দে, পাশ দে।'

তবে. এ ব্যাপারে যতই বকো ঝকো মার, ছেলের মুখে রা-টি নেই। কিন্তু রা যখন দেয় তখন এ ছেলের চেহারা আলাদা। সেও ফকির জানে। বাপের মদ খাওয়াটি ছেলের একেবারে চক্ষুশূল।

মদ খেতে বসতে দেখলেই ছেলের মুখ গম্ভীর। মুখের ওপর চোপা করে বলে, নাও, এবার গিলতে বস, টাকার ছেরাদ্দ কর'

ফকিরের মেজাজ ভাল থাকল তো ভাল। খারাপ থাকলে সে ফুঁসে ওঠে, 'এ্যাই হারামজাদা, খবর্দার বলছি, তুই আমাকে শাসন করতে আসিস না।'

সে সময়ে ফড়িংও দুর্মুখ, দুর্বিনীত। বলে, 'শাসন আবার কী, গিলতে বসলে তো তোমার আর খেয়াল থাকে না। খাবার পয়সা পর্যন্ত রাখতে ভুলে যাও।'

এমন যে হয়নি এক-আধবার তা নয়। কোথাও ওকে ফেরবার পথ, ঝোঁকের মাথায় হয়তো এত খেয়ে ফেলল যে, খাবারের পয়সা পর্যন্ত থাকে না কিন্তু সে সময়ে মন মানে না। ভাবে, তা বলে মুখের সামনে এত বড় কথা। ফকির হুংকার দিয়ে বলে, 'দেখবি, মুণ্ডুটা ছিঁড়ব?'

'অ্যাঃ ছিঁড়লেই হল আর কি। উনি মদ খেয়ে পয়সা উড়িয়ে দেবেন, সে কথা বলা যাবে না।'

তখন সত্যি সত্যি ফকির হুমকে উঠে ফড়িংকে তাড়া করে যায়। ফড়িংও সেই রকম ছেলে। ভোঁ ভোঁ দৌড়। এ ব্যাপারে মার

খেতে সে মোটেই রাজী নয়। ফকিরের জান এখন আর একটা নেই যে, এই হালকা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে দৌড়ে পারবে। তাই খানিকটা ছুটেই দাঁড়িয়ে পড়ে। ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে হাঁপায়। ফড়িংও দূরে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে চেয়ে থাকে।

ফকির শাসায়, কোথায় যাবি, তোকে আসতে হবে না?'

ফড়িংও সামনে জবাব দিয়ে যায়, 'তোমার খেয়ারি কাটুক, তারপরে আসব। তখন তো বাবা ফড়িং বাবা ফড়িং করবে।'

ফকিরের চোখ দুটো তখন এমন জ্বলতে থাকে, রাগে গা-হাত-পা কাঁপতে থাকে মনে হয় সত্যি ছেলেকে কাছে পেলে মুণ্ডুটা ছিঁড়েই ফেলত। এতে তার মদ খাওয়া বেশী হয়ে যায়। যতক্ষণ নেশা থাকে, ততক্ষণই ফড়িংকে গালাগাল দিতে থাকে। আর ফড়িংকে গালাগাল করতে গেলেই জবাগ্রামের কথা এসে পড়ে। সুষমার কথা এসে পড়ে। যেন গালাগালগুলো আসলে ছেলেকে দেয় না দেয় বউকে, আর বউয়ের বাপ ভাইকে।

ছেলের সঙ্গে রাগারাগি না হলেও, মদ খেলেই ফকিরের স্ত্রীর ওপর যত রাগ আক্রোশ, শ্বশুরের ওপর যত বিক্ষোভ, সব ফেটে পড়ে! মদ খেলেই, একটু পড়ে আরম্ভ হবে, 'বুঝলি ফড়িং, জবাগ্রামে কোনদিন পেচ্ছাব করতেও যাবি না। ব্যাটা আমার শ্বশুর! শালার শ্বশুরের নিকুচি করেছে। আর এই বাপসোহাগী মেয়ে……।'

এসব কথা ফড়িং বেশীক্ষণ শোনে না। বাপের কাচ থেকে সরে যায়। মাকে গালাগাল দিলে তার শুনতে ভাল লাগে না। আর ফড়িং-এর সঙ্গে যেদিন রাগারাগি হয়, সেদিন প্রথম কথাই ফকিরের 'জবাগ্রামে মুখুজ্জেদের দৌহিত্রির তো, তোর দোষ তো থাকবেই রে হারামজাদা। ওই মায়েরই পেটে তো জন্মেছিস, রক্তের দোষ একেবারে যাবে কী করে। বাপের মুখের সামনে এতবড় কথা?'

নিরাপদ দূরত্ব বাঁচিয়ে ফড়িংও সমানে বাপের মুখের ওপর কথা বলে

যেতে থাকে। এখনো ওর গলায় বয়সা ধরে নি। স্বরটা শোনায় প্রায় ওর মায়ের মতই সরু আর তেজী। বরং সুষমার গলা এখন ছেলের থেকেও যেন একটু মোটা। নিরাপদ দূরত্বের কারণ, ফকির অনেক সময় মদের গেলাস বোতলও ছুঁড়ে মারে। ফড়িং বাপের কথার জবাব দেয়, 'আর তুমি হলে ভদ্দরলোক। মদ খেয়ে পয়সা ওড়াচ্ছ, বলতে গেলেই আমার দোষ। তুমি তো মাতাল।'

'খবরদার বলছি ফড়িং আমার সামনে থেকে যা।'

'যাব না। তোমার থেকে মুখুজ্জেরা অনেক ভাল।'

'কী বললি ?'

শুনেই ফকির তেড়িয়ান হয়ে ওঠে। আরো জোরে চিৎকার করে ওঠে, 'ঘরশত্তুর বিভীষণ তুই, তবে যা, জবাগ্রামেই যা, তোকে আমার কাছে থাকতে বলেছে কে ?'

ফড়িং বলে, তাই যাব ! ভেব না, তুমি মদ গিলবে, আর না খেয়ে তোমার কাছে থাকব, কাল রাত পোহালেই চলে যাব।'

'যাস, যাসতে হারামজাদা।'

রাত পোহালে রাত্রের কথা আর ফকিরের বিশেষ মনে থাকে না। কিন্তু ফড়িং-এর শুকনো গোঁমড়া মুখ দেখেই ফকিরের বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তখন আর না মনে পড়ে থাকে না, ছেলের রাত্রে খাওয়া হয় নি। তখন ফকিরের ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। পকেটে পয়সা কড়ি না থাকুক, ধার করেই প্রচুর খাবার নিয়ে আসে। যতক্ষণ ছেলের মান না ভাঙে, রাগ না যায়, ততক্ষণ ধরে তোষামোদ।

ব্যাপারটা তো আর হ্যাখ্‌তাই ব্যাপার নয়। তখন ফকিরের বুকের মধ্যে টনটন করতে থাকে ! নিজেরই গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে করে। কপাল চাপড়ে বলে, 'এমন নেশার দাস হয়েছি। আমার কেন মরণ হয় না।'

শেষ পর্যন্ত ফড়িং-এর রাগ যায়। চোখের জল মোছে। খাবার

খায়। ফকিরের মনে হয়, ওর মা থাকলেও বোধহয় এই রকমই হত। ছেলেটার কথাবার্তা রাগের ধরন-ধারণ ওর মায়ের মতই। কয়েকবার ফকিরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে পালিয়েও গিয়েছে। দূরে কোথাও নয়, কাছে পিঠেই কোথাও লুকিয়ে থেকেছে। ফকিরের তখন উদ্বেগে ছোটাছুটি।

ছেলের রাগের ছুটি কারণ একটি ফকিরের মদ খাওয়া। আর একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে মেলামেশা। ধান কলের দিকে তো যাবার উপায় নেই। হাটের দিন তাড়ির দোকানে গেলেই ফড়িং-এর টনক নড়ে। কারণ বলা যায় না, গোটা রাত ফকিরের কোথায় কী ভাবে কেটে যায়। ফকির নিজেও সে কথা বলতে পারে না। ফকিরকে তাই কিছু ছলনার আশ্রয় নিতেই হয়। নানান কাজের অছিলা বা কারুর সঙ্গে দেখা করবার নাম করে হয়তো একটু আড্ডা দিতে গেল।

কিন্তু ছেলে তার থেকে অনেক ধড়িবাজ। ফড়িং চাটুজ্জে ফকির চাটুজ্জের সবই বোঝে। ওকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ঘরপোড়া গোরু তো। নিজেই বাপকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

তবে মেয়েমানুষের ব্যাপারে মদের মত কোন নেশা নেই তার। এমন নয় যে, যেমন করেই হোক কারুর কাছে বা ঘরে যেতে হবে। চলতে ফিরতে জুটে গেল, আচ্ছা একটু ফষ্টি-নষ্টি করা যাক। তেমন সুযোগ সুবিধে যদি মিলে যায় আর মনের রঙ রক্তে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে হয়তো কিছু ঘটে। তাও ন-মাসে ছ-মাসে। তা আর কী করা যাবে। মানুষ তো বটে। চুল পেকে, দাঁত পড়ে হদ্দ বুড়ো তো হয়ে যায় নি। ঘরের বউ গিয়ে বসে রইল বাপের বাড়ি। এরকম দু-একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া বিচিত্র কী।

নিজের বিষয়ে ফকিরের এটা হল যুক্তি। তা বলে, কালী ঘোষালের মত মেয়েমানুষ নিয়ে ঢ্যালা করবার পাত্র নয় সে। আর সে সব কাহিনী, ইষ্টিশনের গাছতলায় বসে যার তার কাছে গলাবাজী

করে বাহাদুরি করবারও লোক নয় সে। এমন কিছু মহৎ কর্ম তো নয় সেটা। সেটা ফকির বোঝে, তবে সব সময়ে পারে না। তা এই ছেলের জন্য কোনদিকে যাবার যো আছে।

মদের ব্যাপারে ঝগড়া বিবাদ করবে। কিন্তু একবার যদি দেখে ধানকল বা ইঁটের কলের মেয়েদের সঙ্গে হেসে ঢঙে কথা বলছে, তা হলে ছেলে কথাটি কইবে না, কাছ থেকেও নড়বে না। বাপকে চেনে তো। জানে, সারা রাত হয়তো তাকে একটা ঘরে থাকতে হবে।

ফকিরকে একবার জবর শিক্ষা দিয়েছিল ফড়িং। চুঁচুড়া থেকে ফেরবার পথে পাণ্ডুয়া পার হয়ে এক জায়গায় বসে গিয়েছিল তাড়ি খাবার জন্যে। বলেছিল, 'রাগ করিস নি বাবা, এক পাত্তর খেয়ে আসি, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

ফড়িং-এর মাথাটা ঠাণ্ডাই ছিল। কিন্তু তাড়ির আড্ডায় কিছু আদিবাসী মেয়েও ছিল। মেয়েগুলো বেবাক প্রায় মাতাল হয়ে উঠেছিল। ফকিরের সঙ্গে একটা মেয়ের একটু রঙ হয়ে গিয়েছিল। নিজেরও তখন ঝোঁক এসেছে। মেয়েটাকে কিনে খাইয়েছিল। মেয়েটা আবার নিজের হাতে তাকে গেলাসে ঢেলে খাওয়াচ্ছিল। সেরকম একটা অবস্থাতেই ফড়িং এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বলে নি, খালি দেখছিল বাপের কীর্তিটা।

ওরকম সময়ে আবার ফকিরের মেজাজ আলাদা। সে খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'এখানে এসেছিস কী করতে? যা গাড়িতে বস গে যা।

রাস্তার পাশেই, একধারে তালপাতার ঝুপড়িতে তাড়ির দোকান। আর একধারে একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ফড়িং বাপের কাছ থেকে চলে এসেছিল ঠিকই। গাড়িতে উঠে, এঞ্জিন চালু করে দিয়েছিল। ফকিরের প্রথমটা খেয়াল হয় নি। তখনো সে আদিবাসী মাতাল মেয়েটির ঘোরেই ছিল। কিন্তু এঞ্জিনের শব্দটা কেমন যেন জোরে জোরে বেজে উঠেছিল। এ তো অন্য গাড়ি না, তার নিজের গাড়ির শব্দ। সে ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল দেখেছিল,

ফড়িং ততক্ষণে গাড়ি ষ্টার্ট দিয়েছে। সে চিৎকার করে বলেছিল, কী করছিস ? কোথায় যাচ্ছিস।'

কোন জবাব আসে নি! গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছিল। ফকির ছুটতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমে রাগ, 'ফড়িং ভাল হবে না বলছি, গাড়ি থামা, নইলে তোর হাড় মাস আজ আলাদা করব।'

সে সব তো পরের কথা, গাড়ি তখন জি, টি, রোড ধরে বেশ জোরেই চলতে আরম্ভ করেছিল। তখন ফকিরের চৈতন্যের উদয় হয়েছিল। চিৎকার করে বলেছিল, 'বাবা ফড়িং, নক্‌কী ছেলে বাবা, থাম্। চল একসঙ্গেই যাচ্ছি, ওখানে আর বসব না।'

তাতেও ফড়িংএর থামবার কোন লক্ষণ ছিল না। গাড়ির গতি আরো বেড়েছিল। ফকির প্রথমে রাগে বিস্ময়ে কাঁপতে কাঁপতে দেখেছিল, গাড়িটা সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই একটা ভীষণ ভয়ে তার হাত পা কয়েক মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে গিয়েছিল সর্বনাশ, জি. টি রোড বলে কথা। যে কোন মুহূর্তেই একটা রাক্ষুসে ট্রাক এসে, ওকে ছিটকে ফেলে দিয়ে যেতে পারে। তারপরে যে রকম ছেলে, ওই গাড়ি নিয়ে হয়তো কারুর সঙ্গে রেস লাগিয়ে দেবে। গাড়িটা হয়তো যাবে। তার সঙ্গে—

না, আর ভাবতে পারেনি ফকির ওখান থেকেই সোজা দৌড়ে গিয়েছিল রেল ইষ্টিশনে। যতক্ষণ ট্রেন আসছিল না, ততক্ষণ যেন তার নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছিল না। ট্রেন যতক্ষণ ফুলেরিতে পৌঁছায়নি ততক্ষণও সেই একই অবস্থা তার। ফুলেরিতে গিয়ে, আস্ত ছেলে আর গাড়ি দেখতে পাবে তো ?

কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পায় নি। ছেলে না, গাড়িও না। কালী ঘোষালের গাড়িটা একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলে। লোকটা তো ঘুঘু তাই সন্দেহের চোখে, দূর থেকে ফকিরের দিকে তাকিয়েছিল। তাকে ওরকম একলা ট্রেন থেকে নেমে আসতে দেখে ধরেই নিয়েছিল, একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই ঘটেছে।

ফকির শুধু দু-একজন রিক্সাওয়ালা আর দোকানদারকে জিজ্ঞেস করেছিল, তারা কেউ ফড়িংকে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখেছে কী না। কেউই দেখে নি। ফকিরের মনে হচ্ছিল, তার হাত পা ভেঙ্গে আসছে। একটা তীব্র উৎকণ্ঠা, দুঃসহ উদ্বেগে তার মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যাবার মত হচ্ছিল। ভেবে পাচ্ছিল না, কী করবে, কোথায় যাবে, কোথায় সংবাদ পাবে।

সে আগেই ছুটে গিয়েছিল জি. টি. রোডে। সেখান থেকে বাসে উঠে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত গিয়েছিল আবার, যদি রাস্তায় কোথাও ফড়িং গাড়ি নিয়ে বসে থাকে বা একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে থাকে। কিন্তু কোথাও বা গাড়ির চিহ্নই ছিল না। অতএব কোথায় যেতে পারে ফড়িং।

জীবনে সেই রাত্রিটার কথা কোনদিন ভুলবে না ফকির। এই ছেলে, দেখ এখন কেমন ঘুমিয়ে আছে। এক রাত্রের মধ্যে ফকিরের বাবার নাম ভুলিয়ে দিয়েছিল, যদি সেখানে ফড়িং তার খোঁজে গিয়ে তাড়ির ঝুপড়িতে গিয়েছিল, যদি সেখানে ফড়িং তার খোঁজে গিয়ে থাকে। সেখানে তখন্ রীতিমত নাচ গান শুরু হয়ে গিয়েছিল। সময়টাও সেই রকম! মাঘ মাস। মাঠের কাজকর্ম শেষ। আদিবাসীদের হাতে পয়সা টান কিছু থাকে সে সময়ে। আর খুব সহজেই ওরা একটা জায়গায় উৎসব জমিয়ে তুলতে পারে।

না, সেখানে ফড়িং যায় নি। তখন একটা সম্ভাবনা তার মনে হয়েছিল। বৈচি দিয়ে, বৈদ্যপুর হয়ে, কালনার রাস্তায় কাটোয়ায় চলে যায় নি তো ফড়িং। কিন্তু তা যাবে কেমন করে। গাড়িতে এত তেল কোথায়? বড় জোর ফুলেরি পর্যন্ত পৌঁছে, আর দু-চার মাইল চলবার মত আছে। খুই বেশী গেলে, সে পথে কালনা পর্যন্ত যেতে পারে। তবু সে একবার বৈচি গিয়েছিল। বাজারের কাছে রাস্তার ধারে দোকানপাট অনেকেই তার চেনা। তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কেউ তার গাড়ি আর ছেলেকে দেখেছে কি না।

না, কারুর চোখে পড়ে নি। তবে কি ছেলেটা হাওয়া হয়ে গেল

নাকি। আবার সে ফুলেরিতেই ফিরে গিয়েছিল। তখন, উদ্বেগে, আশঙ্কায়, দুশ্চিন্তায়, মনের মধ্যে একটি মাত্র আশা, ফড়িং রাগ করে যেখানেই যাক, হয়তো ফুলেরিতেই ফিরে আসবে। আর কোথায় যাবে ফড়িং তাকে ছেড়ে।

একথা ভাবতে ভাবতে ফকিরের চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল। তখন রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। কালী ঘোষালের মত গলা শোনা যাচ্ছিল, 'আজ বাওয়া একটা কিছু কাণ্ড হয়ে গেছে জবাগ্রামে মুকুজ্জেদের জামাইয়ের। গাড়ি নিয়ে ব্যাটা কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে।'

কালী ফকিরকে দেখতে পায় নি অন্ধকারে। ইস্টিশনের কাছে একটা পাক দিয়ে ফকির ঝাপসা চোখে, জি. টি. রোডের দিকে চলে গিয়েছিল। কালী ঘোষালের কথায় তখন তার কিছুই মনে হয় নি। ফড়িংএর চিন্তায় সে ডুবেছিল। ভেবেছিল খুব শাস্তি তাকে ফড়িং দিল। ফিরে এলে, আর কোনদিন ফকির এমন কাজ করবে না।

সে পেট্রলপাম্পের কাছে গিয়েছিল। কোন আশা নেই, তবু গিয়েছিল। পাম্পের দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল কাছেই। তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'দারোয়ান আমার ছেলেকে দেখেছ নাকি?'

দারোয়ান বলেছিল, 'হাঁ, দেখা, বিকাল মে তো দেখা।

প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল ফকির। জিজ্ঞেস করেছিল, 'গাড়ি ছিল সঙ্গে?'

'হাঁ ছিল উ তো তেল লিয়ে গেল।'

তেল নিয়ে গেল? ইস্, এ কথাটা কেন আগে মনে আসে নি ফকিরের। পয়সা না থাকলেও ফড়িং যে এখান থেকে ধারে তেল নিতে পারে, এ কথাটা একবারও তার মনে হয় নি। তা হলে আর সে পাণ্ডুয়া ছুটে যেত না। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কত তেল নিয়েছিল?'

দারোয়ান সেটা জানত না। ফকির ছুটে ঘরের দিকে গিয়ে পাম্পের ভবতোষ বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফড়িং কত তেল নিয়ে গিয়েছে ?'

ভবতোষ বাবু হিসাব দেখে বলেছিলেন, 'দু গ্যালন নিয়ে গেছে।'

'কোন দিকে গেছে বলতে পারেন ?'

'না তো। কেন, না বলে চলে গেছে ?'

'হ্যাঁ, একটু বকেছিলাম, তাই।'

'তুমি নিজেই তো ছেলেটাকে খারাপ করেছ। একে তো হাটবাজার জায়গা তার ওপর ছেলেকে এর মধ্যেই শেখালে গাড়ি চালানো।'

'নিজে শেখাই নি ভবতোষবাবু, ও নিজেই শিখেছে।'

'তা না হয় বুঝলাম। তার ওপরে নিজে মদ ভাং খেয়ে র‍্যালা কর। ছেলের সামনে এ সব করলে তার বিগড়োতে আর কতক্ষণ। ছাখ গে সেও হয়তো কোথায় গিয়ে বাপের মত বোতল নিয়ে বসেছে।'

ফকিরের সে কথা বিশ্বাস হয় নি। ফড়িং-এর যা মন, আর যা বয়স, তাতে ও সব সে করবে না। কিন্তু কোথায় গেল সে তেল নিয়ে ? দারোয়ানটাও বলতে পারে নি কোন্ দিকে গিয়েছে। ইস্টিশন জি, টি, রোড থেকে একটু দূরে, আড়ালে পড়ে গিয়েছে। তাই কারুর চোখে পড়ে নি ফকিরের মনে আবার প্রশ্ন জেগেছিল, কাটোয়ায় গেছে কী ? সেখানে তো কেউ নেই। আর একটা কথা অস্পষ্টভাবে মনে এসেছিল, জবাগ্রামে যায় নি তো ?

এখন তো ফড়িং-এর কাছেই ওর মায়ের চিঠিপত্র দু-একটা আসে। ন'মাসে ছ'মাসে ফড়িং গিয়ে মাকে দেখেও আসে। তার সঙ্গে নাকি মামারা ভাল করে কথা বলে না। কর্তাটি মারা গিয়েছেন। একমাত্র সুষমাই ফড়িংকে জড়িয়ে ধরে নাকি কাঁদে। ফড়িং যে শেষ পর্যন্ত বাপের সঙ্গে গাড়িতে গাড়িতে ঘুরবে, এ কথা সুষমা কোনদিন ভাবে

নি। সে ছেলেকে বলেছিল, 'তোর বাপ কি আমার ওপর শোধ নিতে তোর এমন সর্বনাশ করল।'

তার জবাবে ফড়িং তার মাকে বলেছিল, 'তা কেন, আমিই তো গাড়ি চালানো শিখেছি। লেখাপড়া করতে আমার ইচ্ছে হয় নি।'

ওর মা বলেছিল. 'তোর বাপ যদি নিজে লেখাপড়া শিখত, তাহলে তোকে কখনো এ কাজে টেনে নিত না। যাক্, তোর বাপ যা হয়েছে, তুইও তাই হচ্ছিস।'

সুষমার শোকটা ফকির যে একেবারে বুঝতে পারে নি, তা নয়। কিন্তু তাতে ফকির মনে কোন কষ্টবোধ করেনি। সুষমা যে বাপের বাড়ি থেকে আসার নাম করে না, এ কথা ফকিরের মন পর্যন্ত একেবারে বিঁধে আছে। সুষমা নাকি কথায় কথায় দু'একবার ফড়িংকে জিজ্ঞেস করেছে, 'তোর বাবা কি তাহলে জীবনটা এমনি ফুলেরির হাটে ঘর ভাড়া করেই কাটিয়ে দেবে? এখনো তো গিয়ে, নিজেদের বাড়ি ঘর দোর ঠিক করে নিয়ে থাকতে পারে। তোরা তো বাপ ব্যাটা দুজন। দু'বিঘে জমি তো আছে! নিজে দাঁড়িয়ে দেখাশোনা করলে গোটা বছরের ধানটা পাওয়া যায়। আর যা হোক কোনরকমে এদিক-ওদিক করে চলে যেতে পারে।'

ফড়িং নিজের বুদ্ধিতেই বলেছে, 'কেন গাড়ি চালিয়ে তো মন্দ চলছে না। ধান বেচে তো বাবা টাকা নিয়ে আসে।'

সুষমা ছেলেকে বলেছে, 'বাপের মতই কথা শিখেছিস। এভাবে গাড়ি চালিয়ে, ঘর দোর-ছেড়ে চিরদিন কি চলবে? একদিন তো ফিরতেই হবে। তখন হয়তো কিছুই থাকবে না।

ফড়িং মাকে বলেছে, 'টাকা জমিয়ে একটা নতুন গাড়ি কেনা হবে।'

সুষমা বলেছে, 'গাড়ি গাড়ি গাড়ি। তোর বাপ যেমন ছুটে চলেছে, তুইও তেমনি ছুটতে শিখেছিস্। তার চেয়ে তোর বাবাকে

বলিস, আর একটা বিয়ে-থা করে, ভাল করে সংসার করতে। নতুন মাকে বলবি, তোকে যেন ইস্কুলে ভরতি করে দেয়।'

ফড়িং ফকিরকে বলেছে, এ কথা বলবার সময়ে মায়ের চোখে, জল এসে পড়েছিল। নতুন মায়ের কথা বলায়, মায়ের ওপরে তার একটু রাগ হয়েছিল। কিন্তু মার চোখে জল দেখে সে আর কিছু বলতে পারে নি।

ফকির জানে না, সুষমার এ কথা শুনে, সেই সময়ে তার মনটাও উদাস হয়ে উঠেছিল। আবার কয়েক মুহূর্ত পরেই তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। একটা বিড়ি কামড়ে ধরে বলেছিল, 'বিয়ে! শালা ন্যাড়া আবার বেলতলায় যাবে।

ফড়িং নাকি তার মাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি আমার কাছে চল না মা, আমরা সবাই ফুলেরিতে থাকব।'

সুষমা বলেছে, 'তা কেন, আমার শ্বশুরের অত বড় ভিটে থাকতে ফুলেরির হাটে ভাড়া করা ঘরে থাকতে যাব কেন!'

ফড়িং জিজ্ঞেস করেছে, 'নিজেদের বাড়িতে গেলে তুমি যাবে?'

সুষমা একটু চুপ করে থেকে বলেছে, 'তা যেতে পারি, তোর বাবা যদি এসে নিজে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়, তবে যেতে পারি।'

'কেন, বাবা না ডেকে নিয়ে গেলে যাবে না?'

'না, কোনদিনই না। তোর বাবা আমাকে যে কথা বলে গেছে, তারপরে আর আমি যেচে কোনদিন যেতে পারব না।—পারতাম—'

এই পর্যন্ত বলে সুষমার গলাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে আবার বলেছিল, 'তবু যেতে পারতাম, যদি তোর ঠাকমাও একবার আমাকে নিতে আসত।'

সুষমা একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করেছিল। ফকিরের মনটা মুহূর্তেই জন্য নরম হলেও, মুখটা আবার শক্ত হয়ে উঠেছিল। কেন, এত তেজ কিসের? স্বামী কি স্ত্রীকে দুটো চারটে আজে-বাজে কথা বলতে পারে না? রাগের মাথায় কথা বলেছে, তার কী মূল্য

আছে। সেও তো ফকিরকে ছোটলোক ইতর কত কী বলেছিল। আর স্বামী যদি দুটো কথা বলেই থাকে, স্বামীর ঘরে আর যাব না, এই বা কেমন কথা। স্ত্রীর কাছে তো স্বামীর ঘরই সব থেকে বড়।

তা নয়, সুষমা আসলে বাপের বাড়ির আয়েসে আরামে থাকতেই ভালবাসে। তবে অবিশ্যি সুষমা নাকি ফড়িংকে বলেছে, 'তোর বাপের ঘর থেকে এ ঘর আমার বেশী আপন নয়। কিন্তু তোর বাবা যে কথা আমাকে বলেছে, সে কথা আমাকে কালব্যাধির মত আঁকড়ে আছে। স্বামীর সব গালাগাল মানতে পারি, কিন্তু বাপ ভাই নিয়ে খারাপ বলবে, সে সইতে পারি না। তাই, তোর বাবা এসে নিয়ে গেলে তবু মনে একটা শান্তি পাব। জানব, সত্যি সে আমাকে নিয়ে সংসার করতে চায়, তার মনে অনুতাপ দুঃখ হয়েছে। তা নইলে আর কি হবে, এ জন্মটা এ ভাবেই কেটে যাবে।'···

কথাগুলো শুনে ফকিরের মনটা আবার বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু একটা নিঃশ্বাসে মনের সবই উড়িয়ে নিয়েছিল। প্রায় আট বছর হতে চলল, এত দিন যখন যায় নি, তারও এ জন্মটা এ ভাবেই কেটে যাক। এখন সুষমার মুখটা ফকিরের ভাল মনে পড়ে না। একমাত্র ফড়িংএর দিকে চেয়ে একটা ঝাপসা অস্পষ্ট মুখ ভেসে ওঠে। ফর্সা, একটু গোল ধাঁচের একটি মুখ। ডাগর চোখ, টিকলো নাক। মুখখানি শান্ত। ঘোমটার পিছনে খোঁপাটা ফুলে আছে।

কিন্তু, যন্ত্র অব্যবহারে যেমন মরচে পড়ে যায়, ফকিরের মনের অবস্থাটা অনেকটা সেই রকমের। আট বছর ধরে যা চোখের বাইরে, তা যেন অনেকখানি মনের বাইরেও চলে গিয়েছে। তার নিজের একটা অন্য জীবনও গড়ে উঠেছে। সে জীবনটা এমনই ছুটন্ত, চলন্ত, নিয়ত বহির্মুখী এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস ভাবনাগুলোও এমনভাবে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কোথাও যেন সুষমাকে মেলানো যায় না, খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই কোন উৎসাহও সে বোধ করে না।

তবে, ফড়িং যতবারই ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছে, ততবারই বলেছে, সুষমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফকির ভাবে, কেন। বড়লোক বাপের বাড়িতে থেকেও, সুষমার শরীর খারাপ হচ্ছে কেন।

ফকিরকে কে বোঝাবে, পুরুষের ক্ষেত্রে, বা মেয়েদের ক্ষেত্রে, তাদের স্ব স্ব বিষয়ে, তারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক এবং যুক্তিতেও যত্নবান, আত্ম-সম্মান বোধ বা জীবনের নানান ছকে বাঁধাধরার মধ্যে সীমিত। কিন্তু পুরুষ কখনো কখনো এত অন্ধ যে, মেয়েদের খুব সহজ বিষয়টুকুও তার চোখে পড়ে না। তা না হলে সে সুষমার শরীরের বিষয়ে এমন একটা বাঁকা বিদ্রূপের চিন্তা করতে পারত না। তার বুকের মধ্যে, তার মস্তিষ্কের সীমার মধ্যে একটা অপমানের গ্লানি গভীর ভাবে আশ্রয় করে আছে সত্যি। কিন্তু সুষমার দিনে দিনে বর্ধিত অসুখের বিষয়ে, এ ভাবনাতেই ফকিরের দায়িত্ব শেষ হয় না।

কিন্তু এ কথা ফকিরকে কে বলবে।

সেই রাত্রে ফকিরের মনে তখন এই কথা উদয় হয়েছিল জবাগ্রামে ওর মায়ের কাছে যায় নি তো ফড়িং। মাসখানেক আগেই তো গিয়েছিল। আবার যাবে কি ? বিশেষ যে বাড়িতে গেলে, মায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকা ছাড়া কারুর সঙ্গে ফড়িং কথাও বলতে পারে না। মামারা তার সঙ্গে কথা বলে না। ড্রাইভারের ছেলে, ড্রাইভারি শিখেছে, মাত্র সাত-আট মাইল দূরে ফুলেরিতে ভগ্নিপতি ভাগনে গাড়ি চালাচ্ছে, এতে তাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই, ফড়িং-এর উপরেও তাদের মন বিষ হয়ে গিয়েছে। তাই ফকির ভেবেছিল, কথা নেই, বার্তা নেই গাড়ি নিয়ে জবাগ্রামে যাবে ছেলেটা ?

মন থেকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। অথচ, অন্য আর

কিছু মাথায়ও আসছিল না। কটোয়ার মত দূর জায়গায়, একলা, সেই বিশাল পোড়া বাড়িটায় নিশ্চয় যায় নি। এইরকম নানান কথা ভাবতে ভাবতে, পেট্রলপাম্পে ঢোকবার মুখে, সাঁকোটার ওপরে চুপ করে বসেছিল ফকির। একটা বিড়ি ধরিয়েছিল আনমনে।

রাত্রের জি, টি রোড সব থেকে মুখর। ভারতবর্ষের সুদূর অঞ্চলের মালবাহী ভারী লরী ট্রাক যাতায়াত করছিল। রাস্তাটা যেন একটা মূহূর্ত ফাঁকা নয়। নিরন্তর চলতে চলতে কখন যে কোন ড্রাইভারের চোখে ঘুম নেমে আসে, কেউ বলতে পারে না। তারপরে দেখা যায়, গাড়ি উল্টে পড়ে আছে রাস্তার ধারে।

ফকির ভাবছিল, কারুর কাছ থেকে একটা সাইকেল চেয়ে নিয়ে জবাগ্রামে চলে যাবে কী না। জবাগ্রামে যেতে তার খুবই বিরাগ, একেবারেই অনিচ্ছা, বিশেষ সেই মুখুজ্জেবাড়ির সামনেই গিয়ে দাঁড়ানো ফকিরের কাছে একটা ক্ষুব্ধ কষ্টের বিষয়। কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতেও পারছিল না যেন। ভয় হচ্ছিল, সেখানে গিয়েও যদি শোনে, যায়নি, তা হলে ফকির কী করবে?

সাঁকোটার ওপরে বসে, কিছু স্থির করতে না পেরে, ফকির চুপচাপ বসেই ছিল। ইস্টিশনের দিকে বা ঘরে যেতে পারছিল না। সেখানে বসেই তার যেন ঝিমুনি ধরে আসছিল।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে ফকির চমকে উঠেছিল। কেমন একটা চেনা শব্দ যেন, তার একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। সে চমকে তাকিয়ে দেখেছিল, একটা গাড়ি ইষ্টিশনের পথে মোড় বেঁকছে। চিনতে দেরী হয় নি গাড়িটা। ফকির লাফ দিয়ে ছুটে চিৎকার করে উঠেছিল, 'ফড়িং ফড়িং দাঁড়া।'

গাড়িটা ক্যাঁচ করে একটা শব্দ করে ঝাঁকানি দিয়ে থেমে গিয়েছিল। ফকির ছুটে গাড়িটার কাছে গিয়েছিল। রাস্তার আলোয় দেখেছিল, ষ্টিয়ারিং ধরে ফড়িং বসে আছে। কিন্তু যে ফড়িং গাড়ি নিয়ে রাগ করে চলে গিয়েছিল, তখন আর সে ফড়িং ছিল না। বিব্রত

ভয়ের ছায়া তার চোখে মুখে। ফকিরের দিকে একবার তাকিয়ে ও মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মুহূর্তের মধ্যে ফকিরের হাত মুঠি পাকিয়ে এসেছিল। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল। গলার কাছে একটা গর্জন ফেটে পড়ার অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার তার হাতের মুঠি শিথিল হয়ে পড়েছিল। মুখ নরম হয়ে উঠেছিল। ফড়িংএর চুপচাপ, ঘাড় গুঁজে নিচু মুখ করে থাকা দেখে ফকিরের মনটা হঠাৎ কেমন টনটনিয়ে উঠেছিল। কোথায় ছিল ফড়িং, সেই বিকাল থেকে এই রাত্রি বারোটা অবধি।

কথাটা জিজ্ঞেস না করে, ঘুরে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাঁ পাশে বসেছিল। বলেছিল, 'চালা।'

ফড়িং গাড়ি চালিয়ে বাসার কাছে এসেছিল। তাদের ঘরের কাছেই, দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা সরু জায়গায় গাড়িটাকে তুলে দিয়েছিল ফড়িং। গাড়িটা রাত্রে এখানেই থাকে। দুজনেই নেমে এসেছিল। পকেট থেকে ঘরের তালার চাবি বের করতে করতে ফকির জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় গেছিলি?'

কোল বসা বড় বড় চোখ দুটো তুলে ফকিরকে একবার দেখে ফড়িং বলেছিল, 'মায়ের কাছে।'

'জবাগ্রাম' বলে নি ফড়িং। মায়ের কাছে গিয়েছিল। তাড়ির ঝুপড়িতে বাবাকে আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখে ছেলে মায়ের কাছে গিয়েছিল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে ফকির হ্যারিকেন জ্বালিয়েছিল। পিছনে আর একটা দরজা। সেটা খুললে আর একটা ছোট ঘর, রান্না হয় সেখানে। তার পাশেই একটু বাঁধানো জায়গা, সেখানে হাত মুখ ধোবার বা স্নানের জায়গা। সকালবেলাই বালতিতে জল ভরে রাখা ছিল।

শীতটা যাবার মুখে তবু শেষ মাসেও একটু শীত ছিল রাত্রের

দিকে। জামাটা না খুলেই, পিছনে দরজা খুলতে খুলতে ফকির আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'খেয়ে এসেছিস ?'

'হ্যাঁ।'

ফকির পিছনে গিয়ে জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেছিল। ততক্ষণে ফড়িং মাদুর তোষক পেতে বিছানা করতে আরম্ভ করেছিল বিছানা পেতে ও নিজেও হাত মুখ ধুয়ে এসেছিল। ফকির ততক্ষণে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিল। ফড়িং বাবার দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মত জিজ্ঞেস করেছিল. 'তোমার খাওয়া হয়েছে ?'

ফকির একটা বিড়ি ধরিয়ে বলেছিল, 'খাব না।'

ফড়িং শুতে যাচ্ছিল না। বাবার দিকেই তাকিয়েছিল ফকির তার দিকে তাকাচ্ছিল না। সে বুঝতে পেরেছিল, ফড়িং অন্যায় বোধে কথা বলতে পারছে না। তবু বলেছিল, 'এখনো তো কিষেণজীর দোকান খোলা আছে, রুটি তরকারি নিয়ে আসব ?'

লরীওয়ালাদের জন্য কিষেণজীর দোকান প্রায় সারা রাত্রিই খোলা থাকে। ফকির গম্ভীর ভাবে বলেছিল, 'না। তুই শুয়ে পড় '

ফড়িং আর কথা বলতে সাহস পায়নি। এক পাশে শুয়ে গায়ে কাঁথা টেনে দিয়েছিল। বাতিটা তেমনি জ্বলছিল, ফকির বিড়ি টেনে যাচ্ছিল। তারপরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি বললি সেখানে ?'

সেইটাই ফকিরের তখন চিন্তা। কে জানে, ছেলেটা কী বলে এসেছিল আবার ওর মাকে। আদিবাসী মেয়েটার কথা যদি বলে এসে থাকে, তা হলে আর লজ্জার সীমা থাকবে না। আট বছর যার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত নেই, যার কোন কথাতেই ফকিরের আর বোধহয় কিছুই যায় আসে না, তার কানে তাড়িখানার ঝুপড়ির খবর গেলে ফকিরের এক লজ্জার কারণ কী সে নিজেই তা জানত না।

ফড়িং বলেছি, 'মাকে বলেছি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছি।'

ফকির প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী জন্যে ঝগড়া ?

'তাড়ি খাচ্ছিলে বলে।'

ফকির ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। প্রায় ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাজে বাজে কথা কিছু বলিস নি তো?'

'না।'

ফকিরের বিশ্বাস হয়েছিল। ফড়িং মিথ্যে কথা বলে না। তবু ফকির ছেলের মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে বলেছিল, 'অবিশ্যি বললেই বা আর কী হত!'

ফড়িং বলেছিল. 'মার কষ্ট হত, রাগও হত।'

আশ্চর্য, ফড়িং এত বোঝে? তের বছরের ছেলের এত বুদ্ধি হয়েছে যে মায়ের কোন কথায় লাগবে, রাগ হবে।

সেটাই মানুষের বিড়ম্বনা, বড়দের বিড়ম্বনা ছোটদের শরীরের মত, সবকিছুই তারা, তাদের ছোট মনে করে। তারপরে দুজনেই চুপ করেছিল।

ফড়িং আবার বলেছিল, 'মা আমাকে খুব বকেছে।'

'কেন?'

'তোমাকে না বলে গাড়ি নিয়ে চলে গেছি বলে।'

'সে কথা না বললেই পারতিস?

'মাকে মিছে কথা বলব?'

ফকির কোন জবাব দিতে পারে নি। ফড়িং বলেছিল, 'তাই মা আমাকে রাত্তিরে থাকতে দিলে না। তুমি সারা রাত্তির ভাববে, তাই পাঠিয়ে দিল। আমারও চলে আসতে ইচ্ছে হয়েছিল।'

ফকিরের চোখের সামনে সুষমার ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠেছিল। কথাটা তো সুষমা মিথ্যে বলে নি। ভাবতে পেরেছিল কেমন করে?

আবার চুপচাপ। ফড়িং ডেকেছিল, 'বাবা।'

'হুম্।'

'না খেলে তোমার শরীর খারাপ হবে।'

ফকির বলেছিল, 'না, তুই ঘুমো।'

ঘুম আসছিল ফড়িং-এর। তবু সে বলেছিল, 'মার শরীরটা আরো খারাপ হয়ে গেছে।'

ফকির সে কথার কোন জবাব দেয় নি। কিন্তু কথাটা তার কানে গিয়েছিল। সে কোন রকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে পারে নি মনে মনে। কেবল ভেবেছিল, সে দোষ কি আমার? কিছুক্ষণ পরে ফকির পাশ ফিরে দেখেছিল, ফড়িং ঘুমিয়ে পড়েছে। ফকির আস্তে আস্তে উঠেছিল। হ্যারিকেনটা হাতের কাছে এনে, নেভাবার আগে, একবার ফড়িং-এর মুখের সামনে নিয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে। কেন যে বুকটার মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারে নি। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে রেখে, একটা হাত সে ফড়িং-এর বুকের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছিল, সেও ভাগ্য!'···

হাওড়ার গাড়িটা এসে দাঁড়াল ইস্টিশনে। সেই শব্দেই ফড়িং-এর ঘুম ভেঙে গেল।

ফকির বলল, 'উঠে পড়েছিস্? যা মুখে চোখে জল দিয়ে আয়, দেখি সেরকম প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায় কি না।'

কালী ঘোষালের গাড়ি সকাল থেকেই বেরিয়ে গিয়েছে, ফেরে নি। ফড়িং উঠে, হাফ প্যাণ্টটা টেনে টুনে, আগেই প্রকৃতিকে বেগ সামলাতে চলে যায়। ফকির ইস্টিশনের দিকে তাকায়? এ গাড়িকে খুব বিশ্বাস নেই। একে স্টিম-এঞ্জিনের গাড়ি, তায় যাবে বীরভূমের দিকে। এদিককার প্যাসেঞ্জার এ-গাড়িতে কমই আসে।

সে যখন এসব ভাবছে, তখনই একটা রিকশা এসে দাঁড়াল তার সামনেই। যাত্রী যুবক দম্পতী। দেখে মনে হল, কাছে পিঠের কোন গ্রাম থেকেই এসেছে। বউটির চেহারায় রুগ্নতার ছাপ, চোখের কোল বসা, সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না। পেটটা যে রকম বড় দেখাচ্ছে, গর্ভবতী বলেই মনে হল।

যুবক এসে ফকিরকে বলল, 'ভাড়া যাবেন তো?'

কোথায় যাবেন?'

'জবাগ্রাম হাসপাতালে।'

'মাপ করবেন, জবাগ্রাম যেতে পারব না।'

এক কথায় নাকচ করে দিয়ে, মুখ ফিরিয়ে বিড়ি ধরাল ফকির। জবাগ্রামের যাত্রী সে বহন করে না, করবেও না।

যুবক অসহায় ভাবে বলল, 'দেখুন, আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ, যাবেন না কেন? ভাড়ার জন্যে ভাবছেন? আগাম দিয়ে দিচ্ছি!'

'না না, আগাম-টাগাম দরকার নেই মশাই, আমার গাড়ি জবাগ্রাম যাবে না।'

'কেন বলুন তো?'

যুবকটি আবার অসহায় উদ্বেগে ভেঙে পড়ে। ফকিরকেই জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করি বলুন তো। ওকে এখুনি হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারলে একটা বিপদ-আপদ ঘটে যেতে পারে।'

ফকির বিড়ি খেতে খেতেই জবাব দিল, 'কী বলব বলুন। আর একটা গাড়িও তো ইষ্টিশনে আছে, ভাড়া নিয়ে গেছে। দেখুন যদি এসে পড়ে।'

ঠিক সে সময়েই, ফকিরের পাশ থেকে, বেশ ভরাট আর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন এল, 'কিন্তু আপনি যাবেন না কেন? এটা কি ভাড়া খাটবার গাড়ি নয়?'

ফকির বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকাল। দেখল, নতুন মানুষ। বয়সে যুবক, তিরিশ-বত্রিশ হতে পারে! বড় বড় চোখ, চোখা নাক, মুখখানি বেশ মিষ্টি। ডান দিকে টেরি কেটে চুল আঁচড়ানো বটে, তবে ট্রেনের প্যাসেঞ্জার বলেই একটু উসকো খুসকো হয়ে উঠেছে। ছিপছিপে নয়, দোহারাও নয়, এমনি গড়ন, লম্বায় ফকিরকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। যতই উসকো খুসকো দেখাক, গায়ের জামাটা দামী গরম পাঞ্জাবী বলেই মনে হচ্ছে। হাতা গুটানো। বাঁ-হাতের

কব্জিতে ঝকঝকে ঘড়ি। পরনের ধুতিটা ফরাসডাঙার কাচির ধুতি, অথচ পরেছে যেন আনাড়ি হাতে, ফেত্তা মেরে। পায়ের স্যাণ্ডেল দেখে মনে হল, ঠিক এ জিনিস ফকির আগে আর কখনো দেখেনি। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো। সেটা চামড়ার না আর কিছুর, বোঝা যায় না, কিন্তু ভারী সুন্দর! হাতেও একখানি ব্যাগ, সেটিও বেশ দামী আর সুন্দর।

তা হোক, ফকির মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলল, 'কোথাকার মাল ইনি, ফকির চাটুজ্জ্যেকে কৈফিয়ৎ তলব করে?' সে মুখ খুলে জবাব দিল, 'ভাড়ার গাড়ি বলে তো আর সকলের হুকুমবরদার নয়। যাব না বলে দিয়েছি, যাব না, যা করতে পারেন করুন গে।'

নতুন যুবকটি বলিল, 'সে তো বনগাঁয় আপনারাই রাজা। আইন-কানুন সব আপনাদের হাতেই।'

ফকির খেঁকিয়ে উঠল, 'তার মানে, শেয়াল রাজা বলছেন আমাকে?'

যুবকের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল। ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে দু-একজন রিকশাওয়ালাও এসে ভিড় করেছে মজা দেখবার জন্যে। তারা নতুন যুবকটির দিকে বারে বারে তাকিয়ে দেখছিল।

যুবক বলল, 'আহা, আপনাকে শেয়াল রাজা বলব কেন, একটা কথার কথা বললাম আর কী! একে অরাজকতা বলে, বুঝলেন? দেখছেন ভদ্রলোক বউকে নিয়ে ছুটে আসছেন, স্ত্রী কষ্ট পাচ্ছেন এ সময়ে কি আপনার না বলা চলে? যে কারণেই থাকুক, মানুষের একটা মায়া দয়া বলেও তো কথা আছে।'

যুবকের কথার সুরে ও যুক্তিতে এমন একটা কি ছিল, ফকির হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। একটু পরে সে সরে গিয়ে বলল, তা কী করব মশাই, আমি যাব না।'

যুবক বলল, 'ভাবুন তো, আপনার স্ত্রীরই যদি আজ এমনটি হত?'

ফকির বলল, 'হবে না।'

যুবক বলল, 'ও, সেই জন্যেই আপনার মনে লাগছে না ? আপনার বোনেরও তো হতে পারত ?

ফকির কোন জবাব না দিয়ে চাঁপাগাছতলার দিকে সরে গেল। ফড়িং কিন্তু এই না যাওয়ার জেদে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। সে এমনভাবে বাবার দিকে তাকাল, যেন বাবা রাজী হলে ভাল হয় তারা তো জবাগ্রামে হেলথ্ সেণ্টারে যাবে। মুখুজ্জেদের বাড়িতে তো নয়।

যুবক আবার জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া কত ?'

ফকির বলল, 'ভাড়া তো মশাই আট টাকা। তাতে কী হয়েছে, বলে দিয়েছি যাবো না।'

যুবকটির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে দম্পতীর দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'টাকাতে অনেক সময় গোলমাল কেটে যায় কি না, তাই বলছি।'

ফকিরের ঠোঁট বেঁকে উঠল। বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে, দাদার মেলাই টাকা। একশো টাকা চাইলে, একশো টাকাই দিয়ে দেবেন।

যুবকটি কোন চিন্তা না করেই বলল, 'তাতেও যদি আপনি যেতে রাজী থাকেন আমি একশো টাকাই দিচ্ছি।'

ফকিরের কাছে কথাটা গালে থাপ্পড়ের মত লাগল। আট টাকার জায়গায় একশো টাকা দিতে চায়, এ কী রকম লোক। চোর বাটপাড় ছাড়া আর কিছু হতে পারি কি ? তাই সে অবাক হয়ে বলল, 'একশো টাকাই দেবেন ?

যুবক বলল, 'নিশ্চয়ই দেব, আপনি যদি যান।'

ফকিরের অবিশ্বাসী মন জেদ ধরে বসল। বলল, 'দিন তাহলে, আগাম টাকাটা দিন, আমি দেখি।'

যুবক হাতের ব্যাগটা খুলতে উদ্যত হয়েও, পকেটে হাত

ঢোকালো। কাগজের খর খর শব্দের মধ্যে, একটা নতুন একশো টাকার নোট বের করে ফকিরের দিকে এগিয়ে দিল। ফকির হাত বাড়িয়ে নোটটা নিল। কিন্তু চোখে তার সন্দেহ আরো তীব্র হল। একশো টাকার নোট এ ফুলেরিতে এখনকার দিনে দুষ্প্রাপ্য নয়। বড় বড় দোকানে, আড়তে, ধানকলে, ইস্টিশনে সব সময়েই দেখা যায়। তথাপি, আট টাকা ভাড়ার জায়গায় একটা অচেনা লোক একশো টাকা দিতে চায়। আর এক কথায় পকেট থেকে একশো টাকার নোট বের করে দেয়, দেখলে সন্দেহ না করে পারা যায় না। ফকির পরিষ্কার বলল, 'ঘরে ছাপানো নোট নয় তো মশাই? চলবে তো?'

যুবকের মুখে হাসিটা লেগেই ছিল। বলল, দেখুন না, কোন দোকানে-টোকানে ভাঙানো যায় কী না। তাহলে ভাঙিয়ে দেখেই নিন।'

ফকির বলল, 'হ্যাঁ বাবা, যা দিনকাল, বিশ্বাস নেই। কত দেখলাম ওরকম।'

যুবক এবার একটু ধমকের সুরে বলল, 'বেশী কথা না বলে টাকাটা ভাঙিয়ে আনুন আগে। যে জন্যে আপনাকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

ফকিরের সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে ক্রোধ ফুটলেও সে কিছু বলতে পারল না। রাস্তার ওপরেই বড় কাপড়ের দোকানে সে নোটটা নিয়ে গেল। মিনিটের মধ্যেই দশটা দশ টাকার নোট নিয়ে ফিরে এল। এসেই হাঁক দিল, 'ফড়িং দরজাগুলো লাগা। কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন বললেন না তো?

'আমিও জবাগ্রামেই যাব।'

যে যুবক তার অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল, সে সমস্ত ঘটনাটাকে প্রায় আষাঢ়ে গল্পের ঘটনার মত দেখছিল। এবার বলল, 'সত্যি আপনি লোকটাকে একশোটা টাকাই দিলেন?'

'দিলাম মশাই, কী আর করা যাবে। নিন, আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে উঠে পড়ুন, আর দেরী করবেন না।'

'আপনার নামটা কী জানা হল না।'

'আমার নাম ? আমার নাম—'

তার থিতিয়ে যাওয়া দেখে ফকির দরজা জুড়তে জুড়তে সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'নিজের নামটাই ভুলে গেলেন যে মশাই।

যুবক, হেসে তৎক্ষণাৎ বলল, 'আর যা আমাদের সব ব্যাপার দেখছি, জন্মদাতার নামই ভুলে যাবার যোগাড়, তার আবার নিজের নাম।'

বলে, অন্য যুবকের দিকে ফিরে বলল, 'আমার নাম মনীষ চট্টোপাধ্যায়।'

ফকির বলে উঠল, 'চাটুয্যে ?'

মনীশ বলল, 'কেন, আপত্তি আছে ?'

'না ; আমার আবার আপত্তি কিসের। বামুনের পৈতে আছে তো ?'

আসলে মনীশকে নিয়ে ফকিরের সন্দেহ কিছুতেই ঘুচছে না। মনীশ বলল, 'না, ওটা আর রাখিনি। পদবীতেই পরিচয়, পৈতে রেখে কী করব।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

ঠোঁট বেঁকিয়ে, ঠেস দিয়ে কথাটা বলল ফকির। যুবকের দিকে ফিরে বলল, 'নিন মশাই উঠে পড়ুন।'

যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে উঠে পড়ল পিছনে। তার স্ত্রীটি আসলে আসন্ন প্রসবা। কিংবা হয়তো, কয়েক দিন দেরী আছে। দেখে মনে হয়, অন্য কিছু অসুখ বিসুখও আছে।

ফকির ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসল। মনীশও সামনের দরজা খুলে, সামনেই বসল। ফকির চোখ টেরে একবার তাকে দেখল। লোকটাকে সে কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। অথচ,

কথাবার্তা চালচলনের যথেষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। সত্যি সত্যি একশোটা টাকা তো দিল। ডাকাত বা ফেরেববাজ বলেও চেহারায় মালুম দিচ্ছে না। লোকটা এল কোথা থেকে? হাওড়ার গাড়িতে যখন এসেছে, কলকাতা থেকে এসেছে নিশ্চয়। তবে বেশী ভেবেই বা কী হবে। টাকাটা পাওয়া নিয়ে কথা। কোন রকমে হাসপাতালের কাছে নামিয়ে দিয়ে চলে আসা। কী আর হবে, না হয় বড় জোর মুখুজ্যে বাড়িতে খবর যাবে, ফকির জবাগ্রামে এসেছিল। যাক না, জবাগ্রাম তো কারুর কেনা জায়গা না। ফকির কোনদিন যাবে না বলেছিল, কিন্তু সেটা জবাগ্রামের কথা বলেনি, শ্বশুরবাড়ির কথা বলেছিল। তবে, জবাগ্রামে তার যেতে ইচ্ছে করে না! এতগুলো টাকা হাতছাড়া হবে—তাই যাচ্ছে। সে মনীশের দিকে ফিরে বলল, 'দেখবেন মশাই আগেই বলে দিচ্ছি জবাগ্রামের ভেতরে কিন্তু যেতে পারব না। হাসপাতাল অবধিই যাব।'

মনীশ বলল, 'বায়নাক্কা আপনার অনেক। নিন, এখন চলুন দেখি।'

ফকির চোখ পাকিয়ে একবার তাকাল। তারপরে বলল, 'ফড়িং হ্যাণ্ডেল মার্।'

কিন্তু ফড়িং-এর বাসনা, সে-ই গাড়ি চালাবে। বলল, 'তুমি চালাবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন, আমাকে দাও না।'

'যা বলছি কর। কাজের সময় ভ্যানতাড়া আমার ভাল লাগে না।'

মনীশ অবাক হয়ে ফড়িং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ আবার গাড়ি চালাতেও পারে নাকি?'

ফকির বলল, 'তা পারবে না কেন?'

মনীশ হেসে বলল, 'আঁতুড়ঘরেই চালাতে শিখেছে বুঝি।'

ফকির প্রায় ধমকে উঠল, 'তার মানে ? কী বলতে চান ? আঁতুড়ঘরে আবার কেউ গাড়ী চালাতে শেখে নাকি ?'

মনীশ একটুও বিচলিত না হয়ে হেসে বলল, 'না, খুবই ছেলেমানুষ তো, তাই বলছি ! শুনে আমার খুব ভাল লাগছে।'

ফকির সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল একবার। ফড়িং হ্যাণ্ডেল ঘোরাল। গুটিকয় পটকা ফাটার মত শব্দ করে গাড়িটা লাফিয়ে গর্জন করে উঠল। মনীশ বলল, 'আহ্, চমৎকার !'

ফকির আবার ভুরু কুঁচকে একবার মনীশকে দেখল। ফড়িং হ্যাণ্ডেলটা গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে মনীশের পাশে পাদানীতে উঠে দাঁড়াল। মনীশ বলল, 'খোকা, ভেতরে আসবে না ?

'না।'

গাড়িটা জান্তব চিৎকার করে, একটা লাফ দিয়ে, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দিয়ে এগিয়ে গেল। পিছনের যুবক বলে উঠল, 'কাঁচা রাস্তাটা একটু আস্তে যান। বড্ড ঝাঁকুনি লাগছে।'

মনীশ বলল,'পাকা রাস্তায় এ গাড়িতে ঝাঁকুনি লাগবে না বলছেন ?'

সে পিছন ফিরে যুবকের দিকে তাকাল। যুবক একটু হাসল। ফকিরের মেজাজ তাতে আরো চড়ল। যাও বা আস্তে-চালাতো, এদের হাসি দেখে সে ইচ্ছে করেই জোরে চালাতে লাগল। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে খানিকটা এসেই জি. টি. রোড।

যন্ত্রের গর্জন তো নয়, যেন শুয়োরের চিৎকার। কত রকমের শব্দ যে বাজছে।

স্টেশন এলাকায় ইতিমধ্যে একটা গুঞ্জন উঠে গিয়েছিল মনীশকে নিয়ে। লোকটা কে ? মুখটা যেন চেনা লাগছিল, অথচ ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। এক কথায় একশো টাকা দেবার মত লোক, সেটাও বিস্ময়।

পিছনের সীট থেকে যুবকটি বলল, 'আচ্ছা মনীশবাবু, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো, মুখটা খুব চেনা চেনা লাগছে।'

মনীশ মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'তা বলতে পারছি না। এদিকে তো আগে আসি নি। হয়তো অন্য কোথায় দেখে থাকবেন।'

এ সময়েই যুবকের স্ত্রী যেন তার স্বামীকে কী একটা বলল। যুবক সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছ, ওঁর চেহারাটা যেন অবিকল সুজনের মত। আমার মনে আসছিল, মুখে আসছিল না।'

মনীশ ফিরেও তাকাল না। যেন তার কানেই যায় নি। যুবক ডেকে বলল, 'বুঝলেন দাদা, আপনার চেহারাটা ঠিক সুজন কুমারের মত।'

মনীশ যে অনিচ্ছায় বলল, 'কে সুজনকুমার?'

'সে কি, সুজনকুমারের নাম শোনেন নি, বিখ্যাত নায়ক, রোমান্টিক হিরো।'

মনীশ বলল, 'তা হবে, ওসব জানি-টানিনে। তবে অনেকে আমাকে একথা বলেছে!'

ফকির একবার মনীষকে দেখে নিয়ে বলল 'আমারও মনে হচ্ছিল ছবি ছাপাতে এ রকম মুখ একটা দেখেছি। তা সে মাল কি আর কুলেরিতে এভাবে আসবে?'

মনীশ বলল, 'মাল?'

'নয়? শালা কত ছোঁড়া-ছুঁড়িকে বখাচ্ছে, আর মাথা খাচ্ছে মশাই, ওই আপনাদের সুজনকুমার না কুজনকুমার। আমি ওসব দেখিও না, চিনিও না!'

মনীশ হেসে বলল, 'ভাগ্যিস্ আপনার মাথাটা খেতে পারে নি।'

ফকির বলল, 'ফকির চাটুয্যের মাথা খেতে হলে সুজনকুমারকে আর একবার জন্মাতে হবে, এ জন্মে হবে না।'

মনীশ বলল, 'বাব্বা।'

গাড়িটা এতক্ষণ চলছিল জি. টি. রোড ধরে উত্তরে। এবার বাঁদিকে বেঁকে একটা চওড়া কাঁচা রাস্তায় পড়ল।

মনীশের বুকটা দুরু দুরু করছিল, অর্থাৎ সুজনকুমারের। বাঙলা

দেশের বিখ্যাত নায়কের নামটা তাই। কিন্তু পিতৃদত্ত নামটা মনীশই বটে। সে মনে মনে ভাবল, যাক, আপাততঃ ফাঁড়াটা কেটেছে। সে তার দু-চোখ মেলে দিল ধান কাটা মাঠের দিকে মাঝে মাঝে গাছপালা রাস্তার ধারে। ভালো করে তাকিয়ে দেখবার উপায় নেই। নাকেও রুমাল চাপতে হয়েছে। ধুলো তো ঢুকছে না, যেন ফোয়ারার মত জল ঢুকছে। মাঘ মাস প্রায় শেষ। কাঁচা রাস্তায় পায়ের পাতা ডোবা ধুলো। গাড়ি আগাবার আগেই ধুলো উড়ে আসছে।

বর্ষায় জল যাবার জন্যে রাস্তার মাঝে মাঝে ছোট সাঁকো। গোরুর গাড়ি চলে চলে মাঝখানটা এত উঁচু হয়ে গিয়েছে, গাড়ি ঠেকে যাবার অবস্থা। তাই একটা চাকা সব সময়েই গোরুর গাড়ির চাকার দাগে দাগে, নিচে আর একটা ওপরে। ফলে, পাল খাটানো নৌকো যেমন একদিকে কাত হয়ে চলে, গাড়িও তেমনি চলেছে। তার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলানি তো আছেই।

তবু ভাল লাগছে মনীশের। সামনের রাস্তায় প্রায়ই দেখা যাচ্ছে শালিকের ধূলা স্নান। একসঙ্গে অনেক চড়ুইয়ের ঝাঁক বেঁধে ওড়া। মাঠে এখনো মরা ধানের সন্ধানে চড়ুইয়ের সঙ্গে গ্রাম বিবাগী পায়রারাও আছে। সূর্য চলে গিয়েছে, রোদটা বেশ মিষ্টি লাগছে। আশেপাশে গ্রামে, গাছের পাতায় পাতায় রোদের ঝিলিমিলি। মনীশের চোখে যেন স্বপ্ন নেমে আসছে। এই ধুলো, রোদ, আকাশ গাছপালা, সমস্ত কিছুর মধ্যে সে যেন নতুন জীবনের নিবিড়তায় ডুবে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা অভাবিত, বিস্ময়কর। সুজনকুমার এরকম ভাবে চলেছে। কিন্তু মনীশের কাছে এটা অভাবিত বা বিস্ময়কর নয়। সে যেন নতুন করে বাঁচছে। এতক্ষণে নিশ্চয় তার খোঁজ-খবর পড়ে গিয়েছে। চারদিকে ছোটাছুটি, টেলিফোন ডাকাডাকি চলছে। যদিও সে তার সেক্রেটারির জন্য একটি চিঠি রেখে এসেছে, 'আমাকে খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন নেই। আমি একলা একটু বাইরে যাচ্ছি।

হাণ্ডব্যাগের সমস্ত টাকাই আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমি যাদের সঙ্গে অভিনয়ে চুক্তিবদ্ধ, তাঁরা হয়তো ক্ষতিগ্রস্থ হবেন, আমি নিরুপায়। যেখানেই থাকি, সময় মত তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এই চিঠিটা যেন খবরের কাগজে না যায়। তোমাকে যে যে কথাই জিজ্ঞেস করুক, তুমি শুধু একটি জবাবই দেবে, "তিনি বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন, কিছু বলেন নি। কবে ফিরবেন, তাও আমাকে বলেন নি। সম্ভবতঃ তিনি দমদম এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে কোথাও গেছেন।" এর বেশী না, এর কমও না। তুমি কোন রকম দুশ্চিন্তা করবে না।—ইতি।'

এই লিখে সে চলে এসেছে। নিজের দুটো গাড়ি আছে। বের করেনি। চাকরকে ট্যাক্সি ডাকতে বলেছে। কেবল মাত্র ব্যাকব্রাশ চুলটা ডান দিকে সিঁথি কেটে, সামনের দিকে টেনে দিয়েছি। ধুতিটাকে ফেত্তা দিয়ে পরে গরম পাঞ্জাবী চাপিয়েছে। চোখে সানগ্লাস দিয়েছে। তাতেই চেহারা অনেকখানি বদলে গিয়েছে। মনীশ জানে, এই চেহারার সে যদি খুব সচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, শিল্পীজনোচিত মনোভাব নিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কোনরকম ভঙ্গি বা আচরণ না করে হাওড়া ছাড়িয়ে চলে যেতে পারবে। তারপরে কোথাও নেমে পরলেই হবে। দাঁত বের করে হাসা চলবে না। এই ভাবে সে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে চলে যেতে চায়।

যেখানে তার ধ্যানভক্ত মোসাহেব ব্যবসায়ী, অভিনয়, নাটক, শহর, নাচ, গান, হোটেল, ক্যাবারে, ক্লাব, মেয়েরা না থাকবে, এমন কোন যায়গায় যাবার জন্য সে বেরিয়েছে। জীবনটা কেবল অভিনয় করা হতে পারে না। অভিনয়! অভিনয়!! অভিনয়!!! একটা ভারবাহী মেষের মত, আমার ঘাড়ে সারা দেশ অভিনয়ের জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছে। বিয়ে করি নি তাই রক্ষে; তাহলে স্ত্রীও অভিনয় চাপিয়ে দিত আমার ওপর। অভিনয় অভিনয়, পেশার পরেও, আমার আশে-পাশে, সকলের সঙ্গে কেবল অভিনয়।

পেশার অভিনয় শেষ হলেই টাকার অভিনয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। রোমান্টিক জনপ্রিয় শিল্পীর অভিনয় ভক্তদের সঙ্গে, যে লোকগুলো আমার চারপাশে ঘোরে, তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্বের অভিনয়। মেয়েদের সঙ্গে অভিনয়। ভ্রমণে নাচে শয্যায়। প্রতিটি রাত্রের বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে যৌনতার খেলাতেও। মদ খাবার অভিনয়, মাতলামির অভিনয়। সুখী এবং অর্থবান এবং ভদ্র অমায়িকতার অভিনয়। আমি শুধু নট, জনপ্রিয় নায়ক, তাই সকল উপচার আমার কাছে সবকিছুর মধ্যে আমি অতি ভয়ংকর দুঃসহ মূর্তিমান অভিনয়ে মোড়া একজন অভিনেতা মাত্র।

আমি জানি, আমার চারপাশে মানুষের যে সমাজ, আমি সেই সমাজের একজন সামাজিক নই। ভিতরে বাইরে আমি কোথাও সামাজিক নই। কিন্তু আমি যে সমাজবোধসম্পন্ন মানুষ, সে কথাটাও আমাকে দাঁত বের করে বলতে হয়। সমাজ নিজেই আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে! আমার জীবন-যাপন ভাবনা-চিন্তা কোন কিছুর সঙ্গেই এই সমাজের কোন যোগাযোগ নেই।

তথাপি এই সমাজ, প্রেক্ষাগৃহে আমাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা মেতে থাকে। তার বাইরেও, আমাকে নিয়ে কথা বলে। কাছে আসতে পারলে, আচরণের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ছেলেরা গায়ের জামা পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারে। মেয়েরা প্রেম করে, যে কোন নিরালায় দেহ দান করতে পারে। গৃহস্থ কন্যা বধূ বারোবাসরের মেয়ে সবাই। কিন্তু আমি জানি, তাদের জীবনের শোকে দুঃখে সংগ্রামের আনন্দে আমি কোথাও নেই। আমার জন্যে কোন বধূ সারাদিনের পর ভাত নিয়ে বসে থাকে না, অথচ অনেক মহিলাই আমার জন্য বসে থাকে, আমার একটু সান্নিধ্য, একটু স্পর্শ, একটু হাসির জন্য। কিন্তু তারা স্ত্রী নয়। তারা শুধু সুজন নামে একজন নায়কের পাশে মনে মনে নায়িকা! কাছে পেলে নায়িকার সবটুকু দিয়ে তার বিদায়। কিন্তু তারপরে সে যেখানে যাবে, সেটাই তার

আসল জায়গা। এটা একটা গোপন মানসিকতা, আমাকে সে জয় করে নিয়েছে সুজনকে সে জয় করেছে। হাসি পায়, দুঃখ হয়, লজ্জা করে; কিন্তু এতই এসব নিয়ে মত্ত হয়ে থাকি, দুঃখ বা লজ্জা পাবার অবকাশই বা আমার কোথায়?

কিন্তু পাই, হয়তো স্কচ হুইস্কির খোয়ারি কাটাবার মুহূর্তে, স্বপ্নে, অথবা নিতান্তই বাথরুমে, পুরনো স্মৃতিচারণের সময়। আয়নার সামনে নিজেকেই নগ্ন হয়ে দেখতে আমার মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে, একটি মুখ স্মরণ করে। একটি দেহের ব্যাকুল ভঙ্গিগুলোর কথা মনে করে।

কিন্তু ওরা কি কেউ আমাকে ভালবাসে? কেউ না। বুর্জোয়া, পাতি বুর্জোয়া এমন কি সামান্য বস্তিবাসিনী মেয়ে আর বেশ্যা, সবরকমই আমি দেখেছি। এরা কেউ আমাকে ভালবাসে না। একজন নামকরা সুন্দরী যুবতীর কাছে যেমন সবাই সোনা টাকা জড়োয়া আর বাসনা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, যুবতীর যৌবন, আর বিগতযৌবনেরা একটা বিকারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমার চারপাশে ঘোরে। একটা তাৎক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেওয়া, সেটাই তাদের কাছে জয়।

আর আমার কাছে? চাই, কাউকে না কাউকে তো চাই, আস-যাও। নগদ বিদায় যদি কিছু চাও, শৃঙ্গার মিলনের অধিক, তাও নিয়ে যেতে পার। কিন্তু ভালবাসা? কোথায় অ ছে আমার? 'যদি জানতেম, আমার কিসের ব্যথা, তবে তোমায় জানাতাম।'··· এরকম গান গেয়ে বলতে ইচ্ছে করে। সত্যি, ভালবাস বলে কি আমার কিছু জানতে নেই? অথচ জনমনে আমি কেষ্ট ঠাকুরটি হয়ে বসে আছি।

কিন্তু আমাকে দেখে কি কেউ কোনদিন ভাবতে পারে, আমিও এসব ভাবি। আমার মনে এসব চিন্তা পাক খেয়ে মরে। আর আমার সুন্দর হাসিটির পিছনে থাকে একটা ঠোঁট-বাঁকানো বক্রতা।

না, আমাকে এরা কেউ ভালোবাসে না। মেয়েরা না, ছেলেরাও না। মেয়েরা ভাবে, উঃ লোকটার মেয়ের কোন অভাব নেই। এ ভাবনাটাই তাদের আরো কাছে আনে। আর ছেলেরা ভাবে, 'শালা মেয়েদের চালিয়ে যাচ্ছে বটে।' ছেলেরা, যারা আমাকে অনুকরণ করে, আমার মত চলে ফেরে, আমার অভিনয়ের ভঙ্গী করে কথা বলে, তারা হঠাৎ আমাকে রাস্তায় দেখতে পেলে চেঁচিয়ে বলে, 'ওরে শালা সুজনকুমার যাচ্ছে মাইরি।' আরো দেখবার জন্যে হয়তো ছুটতেই আরম্ভ করে। একদিন যেমন একটা ছেলে, একটা ফ্লাইং কিস্ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, 'সুজনের গালে! মাইরি ও গালে কত মেয়ে গাল ঘষেছে, ঠোঁট ঘষেছে।'···মেয়েদের উন্মাদনাও দেখেছি, 'যেন উল্লাসে বিলাসে, নিবীবন্ধ পড়ে খসি।'···

এর নাম কি ভালবাসা? আমাকে নিয়ে যারা ব্যবসা করে, তারা কি আমাকে ভালবাসে? আমার সঙ্গে যে সব নায়িকারা অভিনয় করে, আমাকে ভালবাসে? কেউ না, আমি জানি।

আমি যতক্ষণ দীপশিখা হয়ে জ্বলছিল, ততক্ষণ, ব্যবসায়ী মোসাহেব ইয়ার বন্ধু এমন কি সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা সকলেই সেই আলোকে ঝলকাচ্ছে। যখন আমি আর দীপশিখা হয়ে জ্বলব না, তখন সেই অন্ধকারে, শূন্য হাঁড়িটাকে একটা নেড়িকুত্তাও এসে চাটবে না।

বাস্তবতার মধ্যে এ নিষ্ঠুরতা অবশ্যম্ভাবী কী না জানি না, কিন্তু এ নিষ্ঠুরতা আছে, আমি জানি সেই জন্যেই বাস্তবের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাকৃত অলৌকিকতা আছে বলে আমি মনে করি। এবং সত্যি বলতে কি, আমার এভাবে চলে আসাটাও তো তাই। বাস্তবই যে অপ্রাকৃত, এটা তারই প্রমাণ হচ্ছে।

কিন্তু আমি আর এভাবে থাকতে পারছিলাম না। তাই বেরিয়ে পড়েছি। আমি যে এর আগেও, অবকাশ যাপনের জন্য বেরোই নি, তা নয়। কিন্তু সে তো প্রায় লাটসাহেবের সফর। তাতে অবকাশে

যাপন হত না। প্রতিদিনের রুটিনের কাজের বাইরে, বাইরে কোথাও গিয়ে, আরো বেশী মদ্যপান, আরো বেশী হুল্লোড়, নাচ গান ফুর্তি সম্ভোগ হত। আর সেই খোয়ারি নিয়ে যখন কলকাতায় ফিরতে হত, তখন গা ম্যাজম্যাজ, শরীর ঝিম্‌ঝিম। তাজা হয়ে আসার বদলে আরো শিথিল শ্লথ। ডাক্তার প্রেসার দেখে বলত, উর্ধ্বচাপের লক্ষণ। নিয়মিত জীবন যাপন, পরিমিত পান এবং ইত্যাদি চালাতে হবে। সেইসব অবকাশ যাপনের পরিণতি ছিল এই রকম।

তাই আমি এভাবে চলে এসেছি! এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমি কাউকে চমকে দিতে বা চমক সৃষ্টি করবার জন্যে বেরুইনি। আমি বেরিয়েছি অ মার নিজের দায়ে। এতে হয়তো আমার অনেক ক্ষতি হবে। কিংবা হবে না। কিন্তু আমার নিজেকে একটা ভারবাহী পশু ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছিল না। অভিনয়ের আর জনপ্রিয় অভিনেতার জীবনের যে-সব ভার, তার জোয়ালটা নামিয়ে আমি স্বাধীনভাবে চরতে বেরিয়েছি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখন বড় বড় কথাও ভাবছি না, জীবনের সন্ধানে বেরিয়েছি। বা, জীবনটা শুকিয়ে যাচ্ছে একটু ভালবাসার অভাবে অতএব ভালবাসার সন্ধানে বেরিয়েছি। সে সব কিছুই না। এ ভাবে জীবনকে সন্ধান করা যায় না এভাবে কেউ ভালবাসার সন্ধানেও বেরোয় না।

আসলে এই যে রোমান্টিক নায়ক বলে পরিচিত হয়েছি, তার আগেও আমার একটা জীবন ছিল, যে-জীবনটা কলকাতার নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের পরিবেশের। সেখানেও আর আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। মা বাবা মারা গিয়েছেন অনেকদিন। দাদারা আছেন। কিছুটা আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া, আমি আর কিছুই করি না। তাঁদের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগও নেই। কিন্তু কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবেশ ছাড়াও বাঙলা দেশে আরো

অনেক পরিবেশ আছে। এই যেখানে আজ আমি এসেছি, বা আরো অন্য কোনখানে। যেখানে ফকির চাটুয্যের কত লোকেরা আছে। বলে, ওসব সুজনকুমার-টুমার নিয়ে তার কোনদিন মাথাব্যথা হয় না। বলে, ছেলেদের মাথা খাচ্ছে সুজনকুমার এইসব লোকদের মাঝখানে আমার ঘুরতে ইচ্ছা করছে। কিছুদিন এদের কাছে, এমনি বিশাল আকাশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, গাছপালা পাখি, এইরকম একটি উদ্বাস্তু স্বামী, এরকম একটি গর্ভবতী ভীরু বউ, মত তার নাম সুজনকুমার। আর ফড়িং-এর মত ছেলে, আমার বুকের অথচ তার মধ্যেই স্বামীকে বরণ করিয়ে দেয়, আমার চেহারাটা যার বোতাম খোলা, পৈত টা দেখা যায়, সেকালের গাড়ির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে চলছে, কপালের ওপর চুল ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এদের সঙ্গে এমন পরিবেশে আমায় আসতে ইচ্ছা করছিল।

একটু মুক্তি, আর কিছুই না। কোন ভূমিকার কথা আমাকে মনে রাখতে হবে না, প্রতিটি রাত্রের বিষয়ে নেশাসক্তের মত, সন্ধ্যা থেকেই রক্তে বিষক্রিয়া শুরু হবে না। আসলে, লোকে যে রকম আমাকে সুখী মনে করে, এবং হয়তো ভাবেও, আমার মত মানুষের আবার দায়দায়িত্ব কিসের, অথচ আমার এই যে জীবনটা, তার নিজস্ব দায়িত্ব যে অনেক, তা বোঝানো যাবে না, আমি এসবের বাইরে আসতে চেয়েছি। আমি আর অভিনেতা-জীবনের দায়িত্ব এবং নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকতে পারছিলাম না। যে জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতাও যেন একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেই পড়ে।'

ঘ্যাচ্ এবং ঘটাং একটা শব্দ হল। গাড়িটি দাঁড়িয়ে গেল। মনীশের ভাবনাটা ভেঙে গেল। দেখল, দু'দিকে মাঠ। গাড়িটির সামনের দিকটা উঠে আছে একটা ঢিবির মত উঁচু জায়গায়, পিছন দিকটা ঢালুতে। ফকির চেঁচিয়ে বলল, 'ফড়িং হ্যাণ্ডেলটা মার।'

ফড়িং হ্যাণ্ডেল মারতে গেল, আর ফকির মুখটা বিকৃত করে বলল,

'শালা গ্রাম-পঞ্চায়েত হয়েছে। মস্‌টে মস্‌টে টাকা মারবে, রাস্তায় মাটি ফেলবার নাম নেই।'

ফড়িং হ্যাণ্ডেল মারল, আবার গাড়ি গর্জন করল। ফকির আড়চোখে বারে বারেই মনীশকে দেখছিল জবাগ্রামে লোকটা কাদের বাড়ি যাবে। কোনদিন তো লোকটাকে দেখেনি সে। নতুন জামাই নাকি কোন বাড়ির। পদবীতে চাটুয্যে, হবে হয়তো বাঁড়ুজ্যেদের বা মুখুজ্যেদের কোন বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। সব মিলিয়ে বাঁড়ুজ্যে-মুখুজ্যে সাত-আট ঘর আছে জবাগ্রামে।

মনীশও সেটা লক্ষ্য করছিল। ভয় পাচ্ছিল, লোকটা চিনে ফেলল কী না। এবং সেও, পিছনের ভাবনা ছেড়ে, আশু ভাবনা করছে। জবাগ্রামে গিয়ে কোথায় উঠবে সে। অচেনা লোককে গ্রামের মানুষ থাকতেই বা দেবে কেন।

গাড়িটা একটা পাশ দিয়ে উঁচু টিবিটা পার হল। ফকির পিছন ফিরে যুবককে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি হাসপাতাল থেকে আবার ফিরবেন এখন?'

যুবক বলল, 'না, আমার আত্মীয়বাড়ি আছে। কয়েকটা দিন সেখানেই থাকব।'

ফকির বলল, 'না বলছি, ফিরে গেলে ফুলেরিতে নিয়ে যেতাম।'

মনীশ ঠোঁটের কোণে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'তার জন্যে রিটার্ন চার্জ কত দিতে হবে?'

ফকির প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'মানে? কী বলতে চান আপনি?'

'বলছি ফিরে যাবার কোন ভাড়া লাগবে না?'

'টাকাটা দিয়ে খুব মাথা কিনেছেন, না? আট টাকা কেটে, বিরানব্বই টাকা দিয়ে দোব আপনাকে। ফকির চাটুজ্যেকে আপনি টাকা দেখাবেন না।'

'আহা টাকা দেখাব কেন? কী যে বলেন। বিরানব্বই টাকা আপনার কাছে ফেরত চাইছে কে?'

ফকির কোন জবাব দিল না। গাড়িটা তখন একটা বড় বাঁকে বাঁ-দিকে ঘুরছে। সামনেই একটা গ্রাম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গাছগাছালির পাতা, শাদা রঙের একটা লম্বা একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

মনীশের মনে মনে হাসি, ফকিরকে তার ভাল লাগছে। তার মনে হচ্ছে, লোকটা মূলে সৎ। জবাগ্রামে না আসতে চাওয়ার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। বলেছিল, গ্রামের মধ্যে ঢুকবে না রাস্তার জন্য না কি কোন রকম গোলমাল আছে, কে জানে।

রাস্তাটা গ্রামের কাছাকাছি এসে, বেশ চৌরস, এবড়োখেবড়ো নয়। ফকির গাড়িটা নিয়ে সোজা হাসপাতালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ফড়িং দরজা খুলে দিল পিছনের। যুবক নামবার আগে বলল, 'মনীশবাবু, আপনি কাদের বাড়ি যাবেন?'

মনীশের বুকটা একবার ধ্বক্ করে উঠল। সে খুব অস্পষ্টভাবে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'এই যাব একজনের কাছে, আবার ফিরব এখুনি।'

'কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব—।'

'তার কোন দরকার নেই, আপনি স্ত্রীকে নিয়ে আগে ডাক্তারের কাছে যান।'

মনীশের সঙ্গে একবার বউটির দৃষ্টি বিনিময় হল। রুগ্ন বড় বড় চোখ দুটিতে তার কৃতজ্ঞতা। একটু যেন কৌতূহলও রয়েছে। যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে নেমে গেল।

ফকির দেখল, মনীশের নামবার কোন লক্ষণ নেই। সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ফড়িং ডাকল, 'বাবা।'

'বল্।'

'একবারটি যাব?'

ফড়িং মায়ের কাছে যেতে চাইছে। ফকির এটা আগেই অনুমান করেছিল। গ্রামের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে মুখুজ্যেদের বাড়ি। যেতে আসতে কথা বলতে, প্রায় আধঘন্টা কেটে যাবে? তবে

জবাগ্রামে এসে, মাকে না দেখেই বা ফড়িং যায় কী করে। সে বলল
'সে তো জানিই যেতে চাইবি।'

'যদি না যাই, আর মা জানতে পারে জবাগ্রামে এসেছিলাম, তা হলে মায়ের খুব কষ্ট হবে।'

ফকির বলল, 'যা কিন্তু দেরী করিস্ নে। গাড়িটা নিয়ে আমি বটতলায় অপেক্ষা করব।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফড়িং এক দৌড়। মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'ও ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল মানে, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে তো!'

এ রকম অনধিকার চর্চায় ফকির একটু বিরক্ত হল। শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

'আপনি যাবেন না?'

'না।'

'সে কি মশাই, মানে ব্যাপারটা—'

'কিন্তু আপনি কোথায় যাবেন? আপনি তো নামছেন না।'

মনীশ একটু দ্বিধায় পড়ে গেলেও সামলে নিয়ে বলল, আচ্ছা' এ গ্রামে কোন ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে?'

এবার ফকিরের ভুরু কুঁচকে উঠল। বিড়ি ধরাতে গিয়ে সে অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে? জবাগ্রামে আপনি ঘর ভাড়া নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এই আর কি, যদি পাওয়া যেত, তবে থাকতাম।'

ফকির কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। কী বলতে চায় লোকটা? ঠাট্টা করছ, নাকি ফেরেব্বাজী করছে? যেভাবে এল তাতে মনে হয়েছিল, এরও নিশ্চয় কোন জরুরি প্রয়োজন আছে জবাগ্রামে। জিজ্ঞেস করল, 'জবাগ্রামে আপনার কেউ নেই?

মনীশ এবার আনকটা নির্বিকার ভাবে বলল, 'না তো।'

'তবে এলেন কেন?'

'এমনি। ভাবলাম, ওই ভদ্রলোকের হাসপাতালে আসা দরকার।

আমারও একটু ঘোরা হবে। চলুন না, কোন বটতলায় যাবেন বলেছিলেন, সেখানেই যাই।'

ফকিরের তখন নানারকম সন্দেহে বুদ্ধি ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে আসছেন আপনি?'

'কলকাতা।'

'কী জন্য?'

'এমনি বেরিয়ে পড়লাম।'

তার মানে কী! লোকটার মাথা খারাপ নয় তো? মনীশ ফকিরের অবস্থাটা বুঝতে পারছিল। সে মনে মনে স্থির করে নিল, এ লোকটাকে সব কথা বলতে পারলে ভাল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরিচয় পেয়ে পাগলামি না করলেই হল। সে খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল, 'ফকিরবাবু। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে।'

ফকির সন্দিগ্ধ গলায় বলল, কী কথা?'

হাসপাতালের সামনে খোলা জায়গায় কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে। একটি নার্সকে সামনে বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করতে দেখা গেল কয়েকবার। ঝাড়ুদার বা অন্যান্য কর্মচারি নিজেদের কাজে ব্যস্ত। গাড়িটার দিকে কারুর লক্ষ্য নেই।

মনীশ বলল, 'আমার আর একটা নাম আছে।,

'কী?'

'সুজনকুমার!'

'অ্যাঁ?'

মনীশ সংক্ষেপে কয়েক মিনিটের মধ্যে সব কথা ফকিরকে বলে ফেলল।

আর ফকিরের মুখটা কখনো গোল হল, লম্বা হল। তারপরে শুধু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মনীশ বলল, তবে আপনার মাথা আমি খাব না। সত্যি বলছি।'

ফকির একবার ভুরু কোঁচকালো, তারপরে খ্যাঁক করে হেসে বলল 'ওটা তো ঠিক মনে আছে? আমার মাথা খাওয়া তোমার—মানে, আপনার কম্মো নয়।'

মনীশ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক আছে, আপনি আমাকে 'তুমি'ই বলুন।'

'তাই কী হয়? অতবড় একটা লোক।'

'কিন্তু আপনি নিজেই বলেছেন, সুজনকুমার খারাপ, ছেয়েদের মাথা খায়, তাকে আপনি বড় ভাববেন না। আর সত্যি আমি সে হিসেবে বড়ও নই।'

'না বাবা, তার ওপরে বড়লোক মানুষ, এমনি কদে তুমি বলা যায় না।'

মনীশ বলল, 'অনুরোধ রাখুন না ফকিরদা।'

ফকিরদা?'

'বলব না?'

ফকির মনীশের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বেশ তাই বলবে। তাহলে আমিও তুমিই বলব। কিন্তু সত্যি করে বল তো কেন এভাবে বেরিরে পড়েছ? তোমাদের কথা কিছু বলল যায় না বাপু। কিছু গোলমাল কেলেংকারি করে পালিয়ে আসনি তো?'

মনীশ মনে মনে হাসল, বলল, 'বিশ্বাস করুন, গেলমাল কিছুই নেই। আমার আর ভাল লাগছিল না, যে কথা আপনাকে বললাম।'

ফকির বলল, 'তা বেশ করেছ। কিন্তু বাবা, তোমার এই টাকা নিয়ে নাও। তুমি খুব ঘুঘু ছেলে। এত যার নামডাক, সে কিনা এভাবে বেরিয়ে পড়ে?

মনীশ বলল, 'আচ্ছা একিরদা, সত্যি বলুন তো, আমার নামডাকে আপনার কিছু যায় আসে?'

'আহা, আমার আবার কী যাবে আসবে। পৃথিবীতে কত

ব্যাপার ঘটছে, কত মানুষ আছে, তার জন্যে আমার কী যাবে আসবে। গরীব মানুষ, ওই গাড়িটা চালিয়ে কোনরকমে চলে। আর ঘরবাড়ি আছে, ভাঙাচোরা। তবে তোমার কে না জানে বল। সিনেমা-থিয়েটার দেখি না বটে, তোমার নামটা ঠিক জানি, ছবিও অনেক দেখেছি। তা সে বইপত্তরেই বল আর দেয়ালেই বল। কিন্তু আজ তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে। কিন্তু টাকাটা—।'

মনীশ বলল, 'কেন টাকার জন্যে এরকম করছেন। যদি দিতেই হয়, দেবার সময় অনেক পাবেন। আপনি বরং আমার এ ব্যাগটা রাখুন।'

বলে সে হাতের ব্যাগটা ফকিরের দিকে এগিয়ে দিল। ফকির জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে এতে?'

'দেখুন না খুলে।'

হাতব্যাগ হিসেবে বেশ বড়ই, সুদৃশ্য কালো রঙের ব্যাগ। ব্যাগটা খুলেই ফকির ঝপ করে বন্ধ করে ফেলল। যেন দেখেছে এমনিভাবে ব্যাগটা মনীশের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'না বাবা, এ আমি রাখতে পারব না। বাবা রে, এত টাকা! কত টাকা আছে ওখানে?'

মনীশ বলল, 'ষাট সত্তর হাজার টাকা আছে।'

'তব্‌বে? উরে বাবা, তোমার মাথা খারাপ, সারা জীবনে এক সঙ্গে অত টাকা দেখি নি।'

মনীশ জানে ফকিরের কথার মধ্যে কোন মিথ্যে নেই। এতগুলো টাকা আছে, এ কথাটা হঠাৎ জানানোর ব্যাপারে তার মনে যে কোন দ্বিধা নেই, তাও সত্যি নয়। কিন্তু ফকিরকে মানুষ হিসেবে তার ভালই লাগছে। বলল, 'সেইজন্যেই তো ব্যাগটা আপনার কাছে থাকা ভাল ফকিরদা। কেউ ভাবতেই পারবে না, আপনার কাছে এত টাকা আছে।'

ফকির বলল, 'না না বাপু, তোমার তা বলে এত টাকা নিয়ে বেরুনো ঠিক হয় নি। ষাট হাজার বা সত্তর হাজার, সেটাও তুমি জান না ; মাঝখানে দশ হাজার টাকাটা কিছুই নয়? তোমরা লোক সুবিধের নও বাপু।'

মনীশ বলল, 'ঠিক বলেছেন দাদা, লোক সুবিধের নই। কিন্তু এ টাকা আপনারই আমাদের দিয়েছেন। আপনি ব্যাগটা রাখুন।'

'অ.চ্ছা আমি রাখব পরে। এখন তুমি রাখ। তুমি বাপু আমাকে একটা ভয় ধরিয়ে দিলে। কিন্তু তুমি থাকবে কোথায়?'

'কেন আপনাদের এখানেই। আপত্তি আছে?'

'আমাদের এখানে মানে?'

'এই গ্রামে, মানে এই জবাগ্রামে?'

'এটা কি আমার গ্রাম। এটা তো আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ।'

'ও, তাই বুঝি ফড়িং বৌদির সঙ্গে দেখা করতে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কেন গেলেন না তাহলে?'

'ওই মুখুজ্জেবাড়িতে আমি যাই না। জবাগ্রামে তো আমি সেই জন্যেই আসতে চাই নি।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল মনীশ, কেন ফকির আসতে রাজী হচ্ছিল না। ফকির আবার বলল, 'তুমি কি ভাবছিলে আমি এমনি চশমখোর, ওরকম অবস্থায় একটা মেয়েছেলেকে দেখেও আসতে চাইছিলাম না? মনে মনে ইচ্ছে করছিল ঠিকই। তারপরে তুমি এসে হাজির হলে, একশো টাকার নোট দেখিয়ে বেশ খেলা দেখালে। আমি আর পেছুতে পারলাম না।'

'চমৎকার!'

মনীশ হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু দাদা শ্বশুরবাড়ি যান না কেন? ঝগড়া?

'ঝগড়া?'

বলে ফকির চাটুজ্জ্যে এক লহমায় সব ফিরিস্তি দিয়ে ফেলল। তবে মনীশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল 'দাদা আমরা লোক ভাল নই সত্যি, কিন্তু আপনি বৌদির প্রতি খুব অন্যায় করেছেন। বাঙলা দেশে এখনো এমন মহিলা আছেন, জানতুম না।'

ফকির গম্ভীর হয়ে বলল, 'কি রকম?'

'স্বামীর অপমানের পর যে বলতে পারে,'তুমি না নিয়ে গেলে যাব না।'

'আরে রাখ, ওসব বড়লোকি মেজাজ আমি জানি।'

'আপনি তো বড়লোক নন, আপনার কিসের মেজাজ?'

'আমি অপমানিত হয়েছি।'

'বৌদিকেও আপনি করেছেন।'

'অ্যাঁ?'

'অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। বৌদি কী দুঃখে আছেন, সেটা ভাবতে পারেন?'

'অ্যাঁ? শুনেছি বটে, শরীরটা ক্রমেই খারাপ হয়ে গেছে···।'

'খুব অন্যায় দাদা, এটা ঠিক করেন নি।'

ফকির সন্দিগ্ধ চোখে মনীশের দিকে তাকিয়ে বলল, হুঁ, এই তো বাবা তুমি আমার মাথা খাচ্ছ?'

মনীশ হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'সত্যি? এমন মাথা খেতে পারলে ভাল!'

ফকির মুখখানা গম্ভীর করে বলল, 'বটে? যাকগে, এখন বল দিকিনি বাছা, তুমি কোথায় যাবে? কা তোমার মতলব?'

'বলেছি তো দাদা যেখান থেকে এলাম ঠিক তার উল্‌টো দিকে। এরকম একটা পাড়াগাঁয়ে। যেখানে লোকে নিজের মনে—।'

ফকির তিক্ত হেসে বলল, 'নিজের মনে, পরের পেছনে কাটি দেয়, এ তার কুচ্ছো করে, খিদেয় মরে, মরাইয়ে ধান নেই, তার ওপরে তারি গিলে পড়ে থাকে, খাবার-দাবার বলতে সেখানে কিছু নেই, দুটো কাঁচকলা পেতে হলেও গ্রাম তোলপাড় সব শহরে গিয়ে বিকিয়ে বসে আছে···।'

মনীশ অবাক হয়ে শুনল। বলল, 'এরকম অবস্থা?'

'তবে কি রামরাজত্ব ভেবেছ নাকি? সে তো বাবা তোমাদের কলকেতাটিকেই করে রেখেছে। যত টাকা সেখানে, শালা বাঘের দুধও সেখানেই পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, একেবারে উল্‌টো জায়গায় এসে পড়েছ, সন্দেহ নেই। যত খুশি মাঠ ঘাট, বন বাদাড় চষে বেড়াও, এঁদোপুকুর জোড়াপুকুর যত খুশি দেখতে পার। খেতে চেও না। খেতে পাবে, অই তোমার বেড়াল ডিঙোতে পারবে না, এতে ভাত, ডাল আলু কুমড়ো··· ।'

শুনতে শুনতে মনীশের নিজের খাদ্য তালিকা চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। অথচ এমন গ্রামীণ নায়কের ভূমিকায়ও সে নাকি সার্থক অভিনয় করেছে। এমন না হলে আর নাটক অভিনয়-অভিনেতা নাট্যকার কাকে বলে। সে বলল, 'তা হলে এই নিয়েই কাটাই কিছুদিন।'

'কোথায় কাটাবে?'

'যেখানে বলবেন, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।'

'আমি? আমাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে।'

'গাড়িটা তো এখন আমিই ভাড়া নিয়েছি।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, সারা দিনরাত্রির জন্যে ভাড়া। আগাম যদি কিছু চান—।'

'থামো হে ছোকরা।'

ধমক দিয়েই ফকির থেমে বলল, 'দেখো বাবা, রাগটাগ করো না। তোমরা হলে অনেক— ।'

'বড় মানুষ, বলুন না। তা হলে আর দাদা ভাই থাকছি কেমন করে?'

'তাও তো বটে।'

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে এল ফড়িং। বলল, 'বাবা তুমি বটতলায় যাও নি গাড়ি নিয়ে? আমি সেখান থেকে ঘুরে এলাম।'

ফকির বলল, 'যাব কি বাবা, এখানে যে সঙের খেলা লেগেছে। তুই দেখা করে এসেছিস ?'

'এসেছি।'

কিন্তু এতক্ষণে ফকিরের লক্ষ্য পড়ে, ফড়িংএর মুখটা এর মধ্যেই শুকিয়ে উঠেছে। চোখে যেন জলের আভাস। কেন, মামারা কিছু বলেছে নিশ্চয়। এমন চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে আছে ফড়িং। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে ফড়িং ?'

ফড়িং-এর গলাটা নিচু শোনাল, করুণ সুরে বলল. 'মা তোমাকে একবারটি ডাকছে।'

ফকির অবাক হয়ে বলল, 'তোর মা আমাকে ডাকছে ?'

'হ্যাঁ। মার রোজই এখন জ্বর হচ্ছে। শরীরটা ভাল না। আমাকে বললে, 'তোর বাবা যখন এতদিন বাদে জবাগ্রামে এসেছে তখন একবারটি আসতে বল্। তার ইচ্ছে না হয় এ বাড়িতে আসতে বলব না। বাড়ির পশ্চিমের পোড়ো মন্দিরের কাছে তো গাড়ি আসে, সেখানেই একটু আসতে বলিস। একবারটি চোখে দেখে রাখব ! আবার কবে আসবে ! আর হয় তো দেখা হবে না কোনদিন···।'

মায়ের জবানী শেষ করতে পারল না ফড়িং। ওর গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। চোখে জল এসে পড়ল। বলল, 'তুমি একবারটি যাবে বাবা ?'

ফকিরের মুখে একটা অপ্রস্তুত ভাবের সঙ্গে বিরক্তি। ভুরু কুঁচকে মনীশের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখ তো কী ঝামেলায় পড়লাম। তোমার জন্যেই আজ আমার—।'

মনীশ বলল, 'কোন কথা না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিন দাদা।'

ফড়িং একটু অবাক হল ফকির আর মনীশের কথার ধরনে। ফকির প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'স্টার্ট দেব মানে ?'

'পশ্চিমের পোড়ো মন্দিরের কাছে বউদি অপেক্ষা করছেন,

সেখানে যেতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করার এমন সুযোগ আর পাবেন না ফকিরদা।'

ফকির চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'ফকির চাটুজ্যে কোন পাপ করে না।'

'কিন্তু এ অবস্থায় আপনি ফিরে যাবেন ফকিরদা? বউদিকে কি আপনি একটুও ভালবাসেন না?'

ফকির ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। মনীষ আবার বলল, বউদির কথাটা ভাবুন, আপনাকে একবার দেখতে চান খালি। না হয় মিছিমিছিই চলুন!'

ফড়িংএর খুব ভাল লাগল মনীশকে। সে আবার বলল, 'বাবা, একবারটি চল।'

ফকির প্রায় নিরুপায় বোধ করল। তা ছাড়া আসলে তার মনটাও কেমন করছিল। তথাপি সে মুখটা ভয়ংকর করে বলল, 'শালা জবাগ্রামে আসাটাই আজ ভুল হয়েছে। নে ফড়িং হ্যাণ্ডেল মার।'

মনীশ দরজা খুলে নামবার উদ্যোগ করল। ফকির খেঁকিয়ে উঠল, 'আবার নামছ কোথায়!'

'আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে এ সময়ে?'

'আর ন্যাকামো করতে হবে না, চুপ করে বসো।'

মনীশের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। বলল, 'তা হলে দাদা বউদির কাছে আমার পরিচয়টা আপনার ভাই বলেই দেবেন। মানে, আমার ব্যাপারটা মিছিমিছিই।'

ফকির বলল, 'অই মিছিমিছির কারবারই তো বরাবর করে এলে।'

মনীশ বলল, 'যা বলেছেন দাদা। শোন ফড়িং, আমি এখন তোমার কাকা।' ফড়িং কপালের চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বলল, 'মিছিমিছি তো?'

মনীষ অবাক হয়ে হাসল, বলল, 'না, তোমার সঙ্গে মিছিমিছি নয়।'

জবাগ্রামের এক অংশকে সচকিত করে দিয়ে, গাছপালা ঘেরা দু'তিনটে বড় বড় ঢিবি ঢেউয়ের মত পেরিয়ে, মন্দিরের গোড়ায় এসে যখন ফকিরের গাড়ি দাঁড়াল, তখন পশ্চিমের আকাশে রোদ ঢল খাওয়া, গাছপালার মগডালে রক্তিম রোদের ঝিলিমিলি গাড়িটা থেমে যেতে সব যেন নিঝুম মনে হল। থেকে থেকে পাখির ডাক শোনা যায়।

শিব মন্দিরটা জীর্ণ, তলায় ক্ষয় ধরেছে। এখানে-সেখানে গা থেকে ইট খসেছে। শ্যাওলা ধরেছে গোটা গায়ে। অশত্থের চারা মাথা তুলেছে কয়েকটা। পিছনে গাছপালার ফাঁকে দেখা যায় একটা দোতলা লাল রঙের বাড়ি।

গাড়িটা গোড়ায় দাঁড়াতেই ফড়িং নেমে দৌড়ে গেল মন্দিরের পিছনে। ফকির নেমে দাঁড়াল গাড়ি থেকে। মনীশ দেখল, মন্দিরের পিছন দিক থেকে প্রায় বছর তিরিশের এক স্ত্রীলোক ফড়িং-এর পাশে পাশে বেরিয়ে এল। ফরসা রঙে কিছু কালিমার আভাস, শীর্ণ, মাথার মাঝামাঝি ঘোমটা টানা। কিন্তু মুখখানি সত্যি সুন্দর, বড় চোখ টিকলো নাক। শরীরের গড়ন দেখলে বোঝা যায়, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চেহারাটি অপরূপ দেখাত।

ফকির কয়েক পা এগিয়ে গেল। সুষমার গাড়ির দিকে লক্ষ্য পড়ল না। সে ফকিরের দিকে একবার তাকিয়ে নিচু হয়ে তাকে প্রণাম করল। ফকিরের মনটা কেমন দুলে উঠল, মোচড় খেল। বলল, 'থাক না এ সব। কেমন আছ?'

সুষমা ফকিরের দিকে তাকাল। ফকির সেই চোখে যেন চোখ রাখতে পারছে না। সুষমা বলল, 'ভাল আছি। তুমি ভাল তো?'

এ সময়ে মনীশ নেমে এল। তাকে দেখেই সুষমা মস্ত বড় একটা ঘোমটা টেনে দিল। ফকির বলল, 'আমার ভাই সুজ-ম-ম-মনীশ চাটুজ্জে।'

মনীশ একেবারে নিচু হয়ে সুষমার পায়ের কাছে হাত দিয়ে বলল, 'কেমন আছেন বৌদি?'

সুষমা দুর্বল শরীরে কোনরকমে একটা হাত বাড়িয়ে একটু সরে গেল। কোন কথা বলল না। কয়েক মুহূর্ত সকলেই চুপচাপ। ফকির তার নিজস্ব গলা খুলল, 'ভাল যা আছ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাপের ভিটেয় পড়ে থেকে মরেও তোমার সুখ।'

মনীশ বলল, 'আহ্ ফকিরদা এ সব কথা—।'

তার আগেই সুষমার গলা শোনা গেল, 'তুমি তো তাই চেয়েছো।'

'আমি চেয়েছি?'

'চাও নি? তা নইলে, একবারও তো এলে না আমাকে নিতে?'

'ও সব জেদবাজী আমাকে দেখিও না।' ফকির চিৎকার লাগাল, 'নিজে ইচ্ছে করে বাপের বাড়িতে রইলে, বাপ-ভায়ের আদর-সোহাগ নিয়ে—'

তার কথা শেষ হল না, সুষমা কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেল! এ সময়েই, আঠারো উনিশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবতী ফরসা মেয়ে মন্দিরের পিছন থেকে এদিকে এল। সুষমার দিকে দেখে বলে উঠল, 'বড়দির কী হল?'

ফড়িং বলল, 'দেখ না মাসী, মা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।'

মনীশ প্রায় ধমকের সুরে বলল, 'দাঁড়িয়ে দেখছেন কি ফকিরদা, বউদি অজ্ঞান হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি তুলুন।'

ফকির ভয়ে ও বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

'তুলুন তাড়াতাড়ি। তুলে বাড়িতে নিয়ে চলুন।'

ফকির আর কিছু ভাবতে পারল না। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে সুষমাকে বুকের কাছে তুলে নিল। সুষমার কোন চৈতন্য নেই। ফকির ডাকল, 'শুনছ?'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ফকির আবার বলল, 'ইস্ জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। নীলিমা, চল্ তোর দিদিকে বাড়িতে দিয়ে আসি।'

নীলিমা সেই মেয়েটি, যাকে ফড়িং মাসী বলছিল, তার চোখে-মুখে বিস্ময়। অনেকটা সুষমার মতই দেখতে। বয়সটা অনেক কম এবং স্বাস্থ্যটা ভাল বলে মনে হচ্ছিল, একটি রৌদ্র কিরণের ছটা-লাগা টলটলানো ঝর্ণার মত। সে ব্যাপারটা কিছুই ধরতে পারছিল না, হঠাৎ শিব-মন্দিরের পোড়োয় এরকম সমাবেশ হল কী করে সে কেবল বলল, 'নিয়ে এস, বাড়িতে খবর দিচ্ছি।'

যাবার আগে সে মনীশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে গেল। অপরিচয়েব কৌতূহলেত অনুসন্ধিৎসা।

সুষমাকে পাঁজকোলা করে নিয়ে বাড়িতে ঢোকবার আগেই, দরজায় শাশুড়ি দেখা দিলেন। তাঁর চোখেমুখে শঙ্কিত উৎকণ্ঠা। জিজ্ঞেস করলেন, 'পুষি বেরুল কখন বাড়ি থেকে? ওর তো জ্বর।'

ফকির, সতীবুকে শিবের মত বলল, 'মন্দিরে আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছল।'

সবাই ঢুকে গেল বাড়িতে। মনীশ দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। সেটা লক্ষ্য পড়ল নীলিমার। সে ফড়িংকে বলল, 'ফড়িং ওঁকে ডাক!'

ফড়িং ফিরে বলল, 'কাকা এস।'

মনীশ বাড়িতে ঢুকল। সুষমার দাদারাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। যে-ঘরে সুষমকে নিয়ে যাওয়া হল, সবাই সেই ঘরে এল। সুষমার দাদারা বারেবারেই মনীশের দিকে দেখছিল। তাদের ভগ্নিপতি ফকির চাটুজ্যের সঙ্গে বোধহয় মনীশকে ঠিক মেলাতে পারছিল না। মনীশ আশা করেছিল, সুষমার দাদারা নিজেরাই ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে, কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু নিরীহ গ্রামীণ ভদ্রলোকেরা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে রইল। অথচ সুষমার অবস্থা দেখে মনীশ আর চুপ করে থাকতে পারছে না। সুষমার দাদাদের দিকে ফিরে মনীশ বলল, 'আপনারা বোধহয় বউদির দাদা?'

বড় দাদা শিবনাথ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার ডাকতে পারেন? গ্রামে ভাল ডাক্তার আছে?'

'ভাল মানে, হরিপদ ডাক্তার আছে। পাশ-টাশ নয়—তবে সে-ই দেখছিল।'

মনীশের এখন কোন সংকোচ নেই। বলল, 'দেখে তো এই হাল করেছে। আর ভাল ডাক্তার কেউ নেই?'

'আছে, হাসপাতালে ভাল ডাক্তার আছে, আসতে চায় না।'

'আসতে চায় না? বেশ, আমি দেখছি! ফড়িং তুমি আমার সঙ্গে এস।'

ফড়িংকে নিয়ে সে মন্দিরের পোড়ো থেকে গাড়িটা নিজেই চালিয়ে চলল।

ফড়িং অবাক হয়ে বলল, তুমি গাড়ি চালাতে পার?'

মনীশ মুচকি হেসে বলল. 'একটু একটু।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হল। ডক্টরস্ রুমের কাছে গিয়ে দেখল তালা বন্ধ। মনীশ দেখল সামনে একটা ওয়ার্ড। পুরুষ সেখানে কেউ নেই, সবাই মেয়ে। সমস্ত ওয়ার্ডের চেহারাটা এমন হতভাগা যেন এরা রুগী নয় সব ভিখিরি। একটু আগে যে-বউটির জন্য, ফুলেরি থেকে এখানে আসতে হল. সে আর তার স্বামীই-বা গেল কোথায়! বউটির অবস্থা তো তেমন ভাল নয়, তাকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের দেখা দরকার।

সামনে বারান্দা ঘুরে গিয়ে পিছনে যাবার পথে দেখা গেল একটি মেয়ে আসছে শাদা এ্যাপ্রন পরে। তাহলে নার্স আছে। সেটাও ভাগ্য এ গ্রামের পক্ষে। নার্সটিকে দেখেও গ্রামের মেয়ে বলেই মনে হয়। সে মনীশকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখে তার বিস্মিত কৌতূহল। মনীশ মনে মনে হাসলেও, সাবধান হল। সে-ই আগে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এখানকার নার্স?'

নার্স ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

'আপনাদের ডাক্তারবাবু কোথায়?'

'রুগী দেখছেন।'

'কোথায়?'

'যেখানে রুগীদের দেখা হয়। আপনি যাবেন সেখানে?'

'যেতে চাই।'

'আসুন।'

মেয়েটি যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরল। কিন্তু তার চোখে কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা আরো তীব্র হয়েছে। কয়েক পা গিয়েই নার্স হঠাৎ ফিরল, বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

মনীশ প্রমাদ গণল, তবু বলল, 'নিশ্চয়ই।'

'আপনার নাম কী?'

'মনীশ।'

'মনীশ? ঠিক বলেছেন?'

মনীশ হাসল, রীতিমত অভিনয় করে বলল, 'নিজের নাম আবার কেউ মিথ্যে বলে নাকি?'

মেয়েটি লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, তা নয়, কিন্তু ভারী আশ্চর্য তো!'

মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

মেয়েটি আবার লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি আর কেউ।'

মনীশ নির্বিকার ভাব করে বলল, 'ও। আপনার চেনাশোনা কেউ?'

'শুধু আমার চেনা কেন, সারা দেশের লোকই তাকে চেনে, তার নাম সুজনকুমার।'

আসল সুজনকুমারের চোখে দেখা দিল স্মৃতি হাতড়ানো ভ্রূকুটি। তারপরে চোখ বড় করে বলল, 'ও আপনি অভিনেতা সুজনকুমারের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার চেহারাটা ঠিক যেন তার মত।'

মনীশ একটু হাসল। মনে মনে সে ঠিক খুশি হতে পারছে না, দূর পাড়াগাঁয়ের হাসপাতালের একটি সেবিকাকে এভাবে ঠকিয়ে। কিন্তু সে নিরুপায়। বলল, 'তা হবে হয় তো।'

নার্সটি বলল, 'এমন কি, আপনার গলার স্বর পর্যন্ত।'

'সত্যি?'

এর বেশী উৎসাহ দেখালে আর সাহস পেল না মনীশ? নার্স একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে দেখা গেল সেই যুবক স্বামীটিকে। ঘরের সামনে একটি পর্দা ঝুলছে দেখে মনে হল, পুরনো বালিশের খোল ঝুলছে। যুবক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কি, আপনি এখানে?'

মনীশ বলল, 'ডাক্তারবাবুকে ডাকতে এসেছি।'

'আপনার কিছু হয়েছে নাকি?'

'না, আমার বউদির।'

যুবকটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। বলল, 'আপনার বউদি? আপনার বউদি কি এই গ্রামে থাকেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

যুবক কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে হঠাৎ একটু হাসল। বলল, 'আসলে মোটরওয়ালাকে আপনি কিছু বলতে চাইছিলেন না, তাই তো?'

মনীশ ফড়িং-এর মুখের দিকে একবার দেখে বলল, 'মানে ফকির-দার কথা বলছেন তো? উনি আমার সম্পর্কে দাদা।'

'আপনার সম্পর্কে দাদা?'

'হ্যাঁ। কখনো দেখাশোনা হয় নি তো। এখন দাদার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কথা বলতে বলতে, পরিচয় বেরিয়ে গেল।'

যুবক অবাক খুশিতে বলল, 'বাঃ, ভারী মজা তো!'

মনীশ গম্ভীর হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্ত্রীকে

দেখেছেন ডাক্তারবাবু ?'

যুবক ক্ষুব্ধ গাম্ভীর্যে বলল, 'সে আর বলবেন না দাদা। ডাক্তারবাবু তাঁর কোয়ার্টারে ঘুমোচ্ছিলেন, ঘুম ভেঙে তো আমাকে যাচ্ছেতাই বকতে লাগলেন। প্রায় হাতে-পায়ে ধরে ঘর থেকে বের করা গেছে, এখন রুগীকে দেখছেন।'

নার্সটি তখনো মনীশকেই দেখছিল। এখনো যেন তার মন থেকে সন্দেহ ঘোচে নি। এদের কথাবার্তা শুনে, সে বলে উঠল, 'তবু তো দেখছেন। হয়ত কোন চাষী মজুর, এক হাঁকড়ানি দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতেন। বিকেল পাঁচটার আগে উনি হাসপাতালেই আসেন না।' নার্স কথাগুলো বলল প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে।

মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'কোন এমারজেন্সি কেস এলে ?'

নার্স বলল, 'একই ব্যাপার। আপনি এমারজেন্সি বললে তো হবে না। উনি যদি মনে করেন কেস্‌টা এমারজেন্সি তা হলেই এমারজিন্সি।'

মনীশ বলল, অর্থাৎ রুগীর বাঁচা-মরা, সবই ওঁর ইচ্ছা। ডাক্তার কেমন ?'

নার্স এবার গম্ভীর মুখে, চোখ বড় করে বলল, 'ডাক্তার খুব ভাল। তবে বয়স হয়ে গেছে তো।'

মনীশ বলল, 'সেই জন্যই।'

'সেই জন্যই মানে ?'

'মানে, বুড়ো বয়সে আর পেরে উঠছেন না।'

'তবে—।'

বলতে গিয়ে নার্স থেমে গেল। মনীশ চোখ তুলে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। নার্স আঙুল নেড়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বলল, 'এই হলে সবই পারেন।'

মনীশ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তবু আশা আছে। অন্ততঃ একটা মন্ত্রে ঠাকুর গলেন, নিরেট পাথর নন।'

তার বলার ভঙ্গিতে নার্স খিলখিল করে হেসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জিভ কেটে চুপ করল। তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

হাসপাতালের সীমায় সবুজ ঘাস গজানো অনেকখানি জায়গা। সেখানে চারটে শালিক নিজেদের সঙ্গে কী সব কথা কাটাকাটি করছে। তারপরে গুটিকয় বাবলাগাছ। সীমানা পেরিয়ে ধানকাটা মাঠ। মাঠের ধুলায় চড়ুইয়েরা ধুলা-স্নান করছে। অনেক দূরে গুটিকয় গাছ, তার নিচে গোরুর পাল চরছে।

মনীশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সুষমার মুখটা আবার তার সামনে ভেসে উঠতেই সে ঘরের পর্দার দিকে তাকাল। পর্দা সরিয়ে সে সময়েই ডাক্তারবাবু দেখা দিলেন। নার্সের উদ্দেশে তখনো বলছেন, 'সাত নম্বর বেডে দিয়ে দাও, এখনো দু-একদিন দেরী আছে।'

মনীশ দেখল, চেক-কাটা লুঙ্গি-পরা ডাক্তারবাবু, গায়ে একটি মোটা চাদর, পায়ে খড়ম। বয়স ষাটের কম নয়। মাথায় বেশ বড় একখানি টাক। রঙটি ফর্সা, চোখ মুখ একদা বেশ ভালই ছিল, এখন বার্ধক্যে চামড়ায় শৈথিল্য ও রেখার আধিক্য। যুবক স্বামীটি তাড়াতাড়ি দু-পা এগিয়ে, ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু।'

ভারীমুখে, গম্ভীরগলায় বললেন, 'যেমন দেখবার, তেমনি দেখলাম আপনাকে বললে আপনি কিছু বুঝবেন!'

যুবক থতমত খেয়ে বলল, 'না, তা না, মানে ভাল তো?'

যুবক আর কিছু বলতে সাহস পেল না। নার্স ঠোঁট টিপে হেসে বউটিকে নিয়ে চলে গেল। মনীশকে যেন ডাক্তারবাবু দেখতেই পান নি এভাবেই চলে যাচ্ছিলেন। মনীশ ডাকল, 'ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু ফিরে তাকালেন। মনীশকে একবার দেখে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?'

'একটি রুগী দেখতে যেতে হবে।'

'কোথায় ?'

'এই গ্রামেই।'

'এখন যেতে পারব না।'

'একটু গেলে ভাল হত ডাক্তারবাবু, রুগী বড় কষ্ট পাচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমি গেলেই রুগীর কষ্ট থেমে যাবে ?'

মনীষ প্রায় আবেগ মিশিয়ে করুণ স্বরে বলল,'তাই তো যায় ডাক্তারবাবু, আপনাদের দেখলেও রুগী ভরসা পায়, অর্ধেক রোগ সেরে যায়।'

ডাক্তারবাবু এবার ভাল করে মনীশকে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কাদের বাড়ি থেকে আসা হচ্ছে ?'

মনীশ ফড়িং এর দিকে তাকাল। ফড়িং বলল, 'শিবনাথ মুখুজ্জে।'

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল, ডাক্তারবাবু একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'ও বাড়িতে আমি যাব না। আমি হলাম হাতুড়ে ডাক্তার, মুখুজ্জেদের বাড়িতে তো ফুলেরি থেকে ডাক্তার আনানো হয়। আবার এখানে কেন ?'

মনীশ তার উপরে যায়, বলল, 'ও সব ফুলেরি-টুলেরি জানি না ডাক্তারবাবু, আপনি গাঁয়ের ডাক্তার, আমি আপনাকেই নিয়ে যাব। আমি এসেছি আমার বউদির জন্য,আমি তো মুখুজ্জেদের জন্য আসিনি। দয়া করে চলুন ডাক্তারবাবু, বউদি এখনো অজ্ঞান হয়ে আছেন।'

মনে হল ডাক্তারবাবু সন্তুষ্ট হলেন। মনীষকে আবার দেখলেন জিজ্ঞেস করলেন, 'বউদি মানে, শিবনাথের বোন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু একটু ভাবলেন, বললেন, 'তোমার কথায় যাচ্ছি বাপু, কিন্তু চার টাকা ভিজিট দিতে হবে।'

মনীশ তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে বলল,'এ্যাডভান্স দিতে হবে ?

ডাক্তারবাবুর ভ্রূকুটি চোখে একটু সন্দেহ দেখা দিল। বললেন, এ্যাডভান্স কেন, রুগী দেখেই নেব।'

মনীশ দেখল বেঁচে যেতে পারে। হাত জোর করে বলল, 'যা আপনার অভিরুচি।'

ডাক্তারবাবু প্রীত হলেন। বললেন, 'তোমার কথাবার্তা শুনেই যাচ্ছি, না হলে যেতাম না। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, আমি জামা-কাপড় পরে আসছি।'

তিনি কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। কোয়ার্টার দেখেই বোঝা যায়, বেশ সযত্নে লাউয়ের মাচা তুলেছেন, তার সঙ্গে সিম। কয়েকটি পেঁপেগাছে বেশ ডাগর ডাগর পেপের গুচ্ছ ঝুলছে। কঞ্চি বাঁশের বেড়া ঘিরে, অনেকখানি জায়গা দখল করে, তরকারির বাগান ছাড়াও, গাঁদা আর অতসী ফুল ফুটিয়েছেন বিস্তর। কৃষ্ণকলির ঘন ঝাড়, কিন্তু তলা বেশ সাফ সুরত নিকানো।

ভাগ্য ভাল, ডাক্তারবাবু বেশী দেরী করলেন না। ধুতির নিচে সার্ট গুঁজে, কোট চাপিয়ে, শামলা মাথায় দিয়ে সাইকেল নিয়ে এলেন। পিছনের কেরিয়ারে ব্যাগ। মনীশ বলল, 'ডাক্তারবাবু সাইকেলটা রেখে যান, আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে।'

ডাক্তারবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না বাপু, যত কু রাস্তাই হোক গোরুর গাড়িতে আমি যেতে পারব না।'

ফড়িং বলে উঠল, 'গোরুর গাড়ি হবে কেন মোটরগাড়ি।'

'মোটরগাড়ি!'

বোঝা গেল, ডাক্তারবাবু এতটা আশা করেন নি। মনীশ বলল, 'মানে, আমার দাদা ফুলেরিতে গাড়ি চালায় তো, সেই গাড়ি।'

'অ। ফকিরের গাড়ি?'

ডাক্তারবাবুর মুখে যেন একটু অচ্ছেদ্দার ভাব ফুটলো। কিন্তু আবার মনীশের আপাদমস্তক দেখে বলল, 'তুমি ফকিরের ভাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় থাক?'

'কলকাতায়।'

সেই জন্যই।'

বলেই হাঁক দিলেন, 'ওরে অ গোবরা।'

কালো কুচকুচে, বেঁটে, হলদে চোখ, খাকী সার্ট-প্যান্ট পরা একজন মাঝবয়সী লোক কোথা থেকে আবির্ভূত হল। ডাক্তারবাবু তাকে বললেন, 'সাইকেলটা তুলে রাখ, বাক্সোটা খুলে দে।'

মনীশ নিজেই কেরিয়ার থেকে ওষুধের বাক্সটা হাতে নিয়ে নিল।

হাসপাতালের ডাক্তার আসতেই বাড়ির আবহাওয়াটা হয়ে উঠল থমথমে। বিষয়ের গুরুত্ব যেন বেড়ে উঠল। ডাক্তার নাড়ি দেখে ব্যাগ খুলে আগে একটা ইনজেক্সন দিলেন, তারপরে সুষমার অসুখের বিস্তারিত খবর নিলেন। তাতে অনুমতি হল, সুষমার অসুখটা সকলেই টি. বি. বলে ধরে নিয়েছে। ডাক্তার জানতে চাইলেন, বুকের কোন প্লেট আছে কী না। বর্ধমান টাউন থেকে একটা প্লেট করানো হয়েছিল। সেটা এনে ডাক্তারকে দেখানো হল। ডাক্তার দেখে বললেন, 'বুকে সেরকম কিছু তো চোখে পড়ছে না।'

কিছুক্ষণ বাদেই সুষমার জ্ঞান হল। ডাক্তার সুষমার মাকে আরো কিছু প্রশ্ন করলেন। সুষমার পেটের ডান দিকে একটু চাপ দিতেই, সুষমা আর্তনাদ করে উঠল। ডাক্তারের মুখ ভীষণ গম্ভীর হল। তাড়াতাড়ি প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে বললেন, 'এখুনি ওষুধ আনতে হবে। তবে এ ওষুধ হাসপাতালে নেই। ফুলেরিতেও পাওয়া যাবে না। বর্ধমান টাউন ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

কে যাবে ওষুধ আনতে? মনীশ বলল, 'আমিই যাব।'

ফকির বলল, 'না, তুমি যাবে না, আমি যাব।'

'না তুমি থাক. আমি যাচ্ছি, আমি গাড়ি চালাতে পারি।'

ফকির অবাক হল ফড়িং বলে উঠল, 'হ্যাঁ গো বাবা, কাকা খুব ভাল গাড়ি চালাতে পারে। হাসপাতাল থেকে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এল যে!' তথাপি সে নিজেই যেতে চাইল। মনীশ তাড়াতাড়ি অনেকগুলো টাকা বের করে বলল, 'এগুলো নিয়ে নাও।'

ফকির বলল, 'দরকার নেই, আমার কাছে একশো টাকার বেশী আছে।'

এদের ব্যাপার দেখে বাড়ির সকলেই অবাক হল। মনীশের প্রতি তো বটেই, ফকিরের প্রতিও যেন এ বাড়ির নতুন করে একটা কৌতূহল মিশ্রিত ঔৎসুক্য বেড়ে উঠল। ফকির যাবার আগে মনীশ তার কানে কানে বলল, 'দেখবেন দাদা ; এটা যেন মিছিমিছি ভাববেন না।' ফকির মুখটা বিকৃত করে বলল, 'তুমি আমার মাথাটা খাবে দেখছি।'

কিন্তু ফকিরের চোখে একটা ব্যাকুল উৎকণ্ঠা ফুটে আছে। সে তাড়াতাড়ি প্রেসক্রুপশান নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার সুষমাকে চিনি মিশিয়ে একটু ছানার জল দিতে বলল। দুধ ঘি ইত্যাদি একদম বারণ করল। বলল, 'ছানার জলটা খেয়ে এখন একটু ঘুমোবে। তবে, একটু সাবধান। ওষুধটা তাড়াতাড়ি পড়া দরকার।'

ডাক্তার চলে যাবার সময়ে মনীশ আলাদা করে জিজ্ঞেস করল, 'অসুখটা কী?'

ডাক্তার বললেন, 'আমার ঘোর সন্দেহ, লিভার অ্যাবসেস্ হয়েছে।'

'লিভার অ্যাবসেস্?'

'হ্যাঁ! অসময়ে খেয়ে, আর মাসে চৌদ্দটা উপোস স্বামী-পুত্রের কল্যাণে, তার পরিণতি এসব। দেখছি তো এসব অঞ্চলে। যাই হোক, সেরকম বুঝলে খবর দেবে, আমি কোয়ার্টারে থাকব।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সুষমা ঘুমোচ্ছে।

ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। মনীশ বুঝতে পারছে, তাকে নিয়ে সকলের কৌতূহল চরমে উঠেছে। সুষমা এবং ভাইয়েদের সামনে মনীশ পরিষ্কার জানিয়ে দিল, সে ফকিরের মাসতুতো ভাই। আপন নয়, একটু দূর সম্পর্কের। কলকাতায় তাদের বাড়ি, বেড়াতে এসেছে। নেহাত কোন যোগাযোগ নেই, তাই আসা হত না। তারপরে ফকিরদার সঙ্গে এখানে এসে জানা গেল, বউদির শরীর খারাপ, দাদার

সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। সে জোর করে দাদাকে মন্দিরের গোড়ায় ধরে নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু ফড়িংকে আলাদা ডেকে, নীলিমা সংবাদ পেল অন্যরকম। ওর কাছে ব্যাপারটা তাই রহস্যময় মনে হল। কিন্তু মনীশের দিকে তাকাতে গিয়ে বারেবারেই ওর মুখে লেগে গেল একটা রঙের ছটা চোখে ঝিলিক। তারপরেই লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

মনীশ দেখল, এ মুখ তার কলকাতার পরিবেশের মুখ নয়। তার জগতে যারা নক্ষত্রের মত বিচরণ করে, এ সে মেয়ে নয়। কিন্তু শুক্রস্থানে রাহুর যে মণ্ডলে তার বাস, সেখানে নিষ্পাপের কৌমার্য বিসর্জন যায় নি, তা নয়। অতএব সাবধান। নীলিমা, তুমি দূরে থাকো। তাকে দেখে, মনীশের চোখের তারায় নিমেষ হারায়! প্রাণে এইটা মুগ্ধতার আবেশ। কিন্তু দূরতর চাঁদের মত কিরণময়া নীলিমা থাক আকাশে, দূরান্তের মত মনীশ থাক এক কোটাল লাগা নদীর মত। একজন কিরণ নিক, আর একজন জ্যোৎস্নায় ঝিকিমিকি করুক।

তথাপি, ফড়িং মুড়ির পাত্র হাতে নিয়ে বলল, 'মাসী কাকাকে জলখাবার দেবে না ?

মনীশের জলখাবারের দায়িত্ব দুই বউদি এবং মা নীলিমাকেই দিয়েছে। ওর দাদারা কিছুক্ষণ মনীশের সঙ্গে একটু আলাপ করেছে। দাদারা খুবই আড়ষ্ট, কথার শেষে মুখে সমীহ। আশেপাশের বাড়ির লোকজনেরাও কেউ কেউ এসেছিল। সকলেরই মনীশকে নিয়ে কৌতূহল। মুখুজ্জেদের বড় জামাইয়ের এমন এক ভাই আছে, কেউ জানত না। কিন্তু মনীশ লক্ষ্য করল, নীলিমার দাদাদের একেবারেই ইচ্ছে নয়, বাইরের লোকেরা বাড়িতে ভিড় করুক।

নীলিমার হাতে জলখাবারের বহর দেখে মনীশ বলল, 'এক কাপ চা ছাড়া কিছু না।'

নীলিমা শুনতে চায় না। বলল, 'কলকাতা থেকে সেই কখন বেরিয়েছেন, খিদে পায়নি ?'

'না তো।'

'মিছে কথা! একটু খান।'

মনীশ নীলিমার হাতের পাত্র থেকে একটি ছাপা সন্দেশ তুলে নিয়ে খেল। সেই খাওয়া দেখে নীলিমার হাসি পেল। লজ্জা লাগল তার চেয়ে বেশী। মনীশ জল খেয়ে নিল। নীলিমা চা এনে দিল। মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাঁধের ব্যাগটা এনে দেবেন!'

'দিচ্ছি।'

দরজার কাছে গিয়ে নিলিমা মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমাকে আপনি করে বলতে হবে না।'

একটু পরে সে বড় ব্যাগটা এনে দিল। তার ভিতর থেকে সিগারেট বের করে ধরাল মনীশ। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় একটু ঘুরে আসা যায়? মানে বেড়িয়ে।'

নীলিমা অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় যাবেন এই অচেনা গাঁয়ে, অন্ধকারে? বাইরের বাড়িতে দাদারা আছেন সেখানে যাবেন?'

মনীশ বলল, 'একলা থাকতে ইচ্ছে করছে।'

নীলিমা বলল, 'তা হলে ছাদে যান।'

'পথটা দেখিয়ে দাও।'

'আসুন।'

নীলিমা নিজেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছাদের দরজা খুলে দিল। মনীশ ছাদে এসে চারদিকে অবারিত অন্ধকার ও আকাশের দিকে চেয়ে বলল, 'বাঃ সুন্দর।'

নীলিমা ফিবে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার বলল, 'সত্যি আপনি ফকিরদার ভাই?'

'নিশ্চয়ই।'

'তবে ফুলেরিতে এসে একশো টাকা দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কেন? সব শুনেছি আমি।'

মনীশ পেছুবার লোক নয়। বলল, 'তখন তো পরিচয়টা জানাজানি হয় নি। হাসপাতালে এসে হল।'

নীলিমা একটু চুপ করে রইল। অন্ধকারে ঠিক দেখা যায় না মনীশের মুখ। মনীশ ভাল দেখতে পাচ্ছে না নীলিমাকে। নীলিমা বলল, 'ভারী আশ্চর্য তো।'

মনীশ বলল, 'পৃথিবীতে কত আশ্চর্য আছে!'

'তা বলে এতটা?'

বলে নীলিমা অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল! মনীশ দেখতে পেল না। ও ব্যাগটা কাঁধে করেই এসেছিল। তার ভিতর থেকে বের করল ছোট্ট একটা বিদেশী শক্তিশালী ট্রানজিস্টার অন্ করে কলকাতায় দিল। বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত গায়িকার গান ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে কাছ থেকেই কথা শোনা গেল, 'কী ওটা?'

নীলিমা কাছেই কোথায় ছিল অন্ধকারে মনীশ চমকে উঠেছিল। বলল, 'ট্রানজিস্টার।'

'বাহ্।'

এক মুহূর্তের জন্য সে মনীশের কাছাকাছি হল, আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। গানটা শেষ হল। মনীশ বন্ধ করল। সে চারদিকে তাকিয়ে ডাকল 'নীলিমা।'

কোন সাড়া নেই। আবার ডাকল। কোন সাড়া নেই। শুধু নীলিমার মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে রইল! এমন দৃশ্য কবে দেখেছে মনীশ? গ্রামের মানুষের দু-একটা সাড়া শব্দ কোথায় শোনা যাচ্ছে। চারদিকে, গ্রামের বাইরে মাঠ। সেখানে মাঝে-মধ্যে হঠাৎ এক-আধটা আলোর বিন্দু জেগে উঠে হারিয়ে যাচ্ছে। আশে পাশে গাছপালা বাঁশ-ঝাড়। আকাশে তারার ঝিকিমিকি। শীতটা যেন একটু বেশী লাগছে।

একটু পরে আবার শোনা গেল, 'একটা মাদুর আর আলো দিয়ে যাব?'

'নীলিমা।' মনীশ বলল, 'না, অন্ধকারই ভাল। তুমি কোথায়?'

'এই তো।'

'তুমি যেন রহস্যময়ী হয়ে গেলে।'

'কেন ?'

'কেন ? কী হবে ?'

'একটু কথা বলি।'

'আমাকে যখন সবাই খুঁজবে ?'

নীলিমা তা হলে লুকিয়ে আসছে বারে বারে! মনীশ বলল, 'তাতে কী ? চলে যাবে।'

'সবাই বুঝবে, আমি ঘুরে ফিরে খালি ছাদে আসছি।'

'এলেই বা, তাতে কি অন্যায় হবে ?'

'বৌদিরা ঠাট্টা করবে।'

'কী বলবে ?'

'তা কী জানি।'

মনীশ বুঝতে পারল, নীলিমার আসতে ইচ্ছা করছে, বৌদিদের ঠাট্টার ভয়ে আসতে পারছে না। ভয়টা আসলে লজ্জা।

এবার নিলীমা খুব কাছে এল। বলল, 'ওটা বাজাচ্ছেন না' ?

'না, চুপচাপই ভাল লাগছে।'

'আপনার মুখটা খুব চেনা চেনা লাগে, কেন বলুন তো ?'

'তা তো জানি না। এ রকম তো কতই আছে।'

'মিছে কথা।'

'কেন ?'

'এমন মুখ কতই আছে বুঝি ?'

'কেন থাকবে না। বরং তোমার মত মুখ কম আছে।'

'ছাই। আপনি ভারী মিথ্যুক।'

মনীশ নিজেকে বলল, 'থাক, আর বেশী দূরে নয়। এখানেই থাক।' এমন সময়ে ফড়িং এসে ডাকল, 'মাসী, মা তোমাকে ডাকছে।'

মনীশ বলল, 'বৌদি জেগেছে ?'

'হ্যাঁ।'

মনীশও নেমে এল। সুষমা তাকে দেখে ঘোমটা টেনে উঠে বসবার চেষ্টা করল। মনীশ বাধা দিয়ে বলল, 'উঠবেন না বৌদি, এ শরীরে উঠবেন না।'

সুষমা আর উঠতে পারল না। মনীশ জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছেন?'

'একটু ভাল। পেটে ব্যথাটা কম।'

নীলিমা ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মনীশকে নিরীক্ষণ করছে। তার সরল মুখে একটি মুগ্ধতার ছাপ পরিস্ফুট। ঘরের বাইরে, বাড়ির বউয়েরা যে রয়েছে, সেটাও অনুমান করা যায়।

খানিকক্ষণ পরে সুষমা আবার বলল, 'আশ্চর্য, আপনার কথা কখনো ওঁর মুখে শুনি নি।'

মনীশ বলল, 'কী করে শুনবেন, কোন যোগাযোগ তো ছিল না।'

একটু পরে মনীশ বলল, 'সব কথা শুনছিলাম ফকিরদার মুখে। আপনার মনের জোর আছে সত্যি।'

সুষমা বলল, 'মনের জোর আর কী? তবে আপনার দাদাকেও তেমন দোষ দিই না। ওকে ও বাড়িতে সত্যি বড় অপমানিত হতে হয়েছে।'

মনীশ বলল, 'এবার আর ওসব শুনছি না। দাদা আপনাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।'

সুষমার চোখে জল এসে পড়ল। মনীশ শুনল, নীলিমা বলছে, 'লক্ষ্মণ দেবর এসেছে তো সঙ্গে, তাই।'

মনীশের মুখে এসে পড়েছিল, 'উর্মিলাকেও ছাড়ছি নে।' কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে চুপ করে গেল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ফকির ওষুধ নিয়ে ফিরল। সুষমাকে ওষুধ দেওয়া হল। ফকির আড়ালে মনীশকে বলল, 'কী কাণ্ড যে

করলে, আমার আবার একটু মাল খাবার নেশা আছে। এখন কোথায় পাব মাল?'

মনীশের মনে পড়ে গেল, তার ব্যাগে একটা স্কচ বোতলে অর্ধেকের ওপরে হুইস্কি আছে। সে বলল, 'খাবেন?'

'আছে?'

'ব্যাগে আছে।'

'কী, বিলিতি?'

'হ্যাঁ।'

'তোফা, বলতে হয়, দাও বোতলটা দাও, কোথায় লুকিয়ে একটু মেরে আসি।'

'নীট্?'

'সে আবার কি?'

'মানে জল ছাড়াই?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাল যত কাঁচা হয়, ততই ভাল।'

মনীশ তাকে বোতল দিয়ে দিল। ফকির কোথা থেকে গিয়ে খেয়ে এল। এসে আবার মনীশকে বলল 'একটু খাবে না?'

মনীশের খুব ইচ্ছে করছিল। এ তো তার প্রতিদিনের জিনিস। কিন্তু আজ তো সেই প্রতিদিন নয়—অতএব থাক। বলল, 'না'।

দশ দিন হয়ে গেল। সুষমার অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না, বরং খারাপের দিকেই। ফকির এর মধ্যে কয়েকবারই ফুলেরিতে যেতে চেয়েছে গাড়ি চালাবার জন্য। যেতে পারেনি। ফড়িংও তার মায়ের কাছে থাকতে পেরেই আশ্বস্ত। ফকির গাড়ি চালাতে যেতে চেয়েছে বটে, সুষমার কাছ থেকে নড়তে চায় নি বিশেষ। কেবল মাঝে মাঝে মনীশকে আড়ালে বলেছে, 'কী খেলা যে দেখাচ্ছ, জানি নে। মাথাটা তুমিই খাবে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, মনীশ দেখল, দূরতর চাঁদের জ্যোৎস্নায়

মর্ত্যের নদীর তরঙ্গে যে ঢেউয়ের দোলা লাগল, মানব মানবী সম্পর্কে তার রূপটা আলাদা। মনীশ জীবনে মেয়ে দেখেছে অনেক। প্রেম, তাও বটে। কিন্তু প্রেমিকের নাম ছিল বিখ্যাত নায়ক সুজনকুমার। তার প্রেমিকারা সুজনকুমারের প্রেমিকা। নীলিমা বাতাস-কাঁপা পাপড়ি যখন কাঁপে, তখন সে ফকির চাটুয্যে নামে ফুলেরির এক গাড়ির ড্রাইভারের ছোট ভাই। তাদের দেখা হয়, গ্রামের প্রান্তে, নাম না-জানা এক ছোট নদীর ধারে। নাম-না-জানা, কারণ গ্রামের লোকেরাও তাকে শুধু নদীই বলে। কখনো বনের প্রান্তে, গোটা বাড়িটার যত নিরালা কোণে কোণে। মনীশ, ফড়িং আর নীলিমার দাদার দুই ছেলেকে সহ নীলিমাকে নিয়ে ফকিরের গাড়ি করে বেড়াতেও বেরিয়েছে। নিজে একদিন বর্ধমান টাউনেও গিয়েছে ওষুধ আনতে।

এ কদিনেই, নীলিমার হাসতে গেলে চোখে জল আসে এ সেই বুদ্ধিজীবীদের সুচিন্তিত প্রেমের প্রবন্ধের প্রেম নয়, বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। নীলিমা মরেছে। বাঁচেনি মনীশও। কিন্তু অন্তরের জগত ছেড়ে, নীলিমার সংসারের জগতে বেঁচে থাকাটা এখনো অনেক বড়। অতএব দূরে দূরে থাক মনীশ। তার নিঃশ্বাসে বাতাসে এখন অন্য একটা গন্ধ। দৃষ্টিতে উজ্জ্বলতা তা আর যাই হোক, সেই নাম-করা রোমান্টিক নায়কের বা তার জীবনের চারপাশের সঙ্গে কোথাও মিল নেই।

একদিন ঘোর দুপুরে ছাদে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে মনীশের চোখ পড়ল নদী যেখানে বাঁকের মুখে, বাঁশঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে হঠাৎ ওর মনে হল, ওখানে যেন কেমন একটা হাতছানির ডাক। ওদিকটায় কোনদিন ওর যাওয়া হয় নি। প্রায় কোন সময়েই একলা যাওয়া ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। ইচ্ছা হল, এই শীতের দুপুরের নির্জনে একলা একলা ঘুরে আসবে।

কথাটা মনে হতেই ওর বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা দোলা লেগে গেল। যে দোলা লাগাটা জীবনে কোন এক সময়ে অন্য রকমের ছিল। যে-দোলা লাগাটা বুকের রক্তে বহুকাল চলকে ওঠে নি। এ দোলা লাগাটা যে কিসের, তাও মনীশের ঠিক জানা নেই। ছোট এক নাম-না-জানা নদীর বাঁক, অনেক গাছপালা আর বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে যাওয়া সীমায়, বিশ্বের এমন কিছু অনাবিষ্কৃত রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে না যার জন্য মানুষের বুকে দোলা লেগে যেতে পারে। তথাপি লাগে, মানুষের মন এমন করেই কেন যেন দুলে ওঠে এবং বাঙলাদেশের মেয়ে-পুরুষের প্রাণের নায়ক সুজনকুমারেরও উঠল। কলকাতার কথা ওর যেন তেমন করে আর মনে পড়ে না, ভাবায় না। এখানে এসে এক অবগাহন স্নানের আবেশে ডুবে আছে। অথচ, এখানে এই প্রকৃতির মন, পাখি বা পতঙ্গের মতো এই গ্রামের লোকেরা চোখ আর কান ভরে তুলছে না। নীচতা দীনতা হীনতা অনেক। নীলিমার কাছ থেকেই মনীশ খবর পায়, কত লোকে কত কী বলছে। বলছে মনীশকে কেন্দ্র করে, কটু কথা আর দুর্নাম রটছে মুখুজ্জে পরিবার সম্পর্কে। এত হীন কথা, ভাবা যায় না। গ্রামে রীতিমত ঘোঁট, কুৎসিত আলোচনা। নীলিমার দাদাদের সঙ্গে কখন যে গ্রামের লোকের হাতাহাতি হয়ে যায় বলা যায় না। আলোচনা পুকুরঘাট থেকে টিউবওয়েলের চত্বরে বিস্তৃত। অথচ, ভরপেট খাবার বোধহয় অধিকাংশ লোকেরই ভাগ্যে ঘটে না। মনীশের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা, গ্রামে দুধ নেই, মাছ নেই, একটু ভাল তরিতরকারিও নেই। ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে লরি ভরতি হয়ে শহরের ফড়েদের মাথার ঝাঁকায় সব কিছু চলে যায়। একদিক থেকে ভাবতে গেলে, সব যেন কেমন নির্জীব, রিক্ত আর হতভাগা বলে মনে হয়।

তবু, এই সবকিছু ছাপিয়ে আরো কিছু আছে, যা মনীশের কাছে অবগাহন স্নানের মত। সেসব সম্ভবতঃ, এই গাছপালা, মাঠ-নদী, মন্দির পাখি-পতঙ্গ, এবং কিছু মানুষ। এমন মানুষও হয় তো অনেক

আছে আপাতঃ দৃষ্টিতে যাদের চেনা যায় না। তারাও হয় তো ফকিরের মত, বাইরে থেকে দেখে যাকে প্রথমে মনে হয়েছিল লোভী স্বার্থপর রাগী অশিক্ষিত নীরেট একটা পাড়াগেঁয়ে ঝরঝরে গাড়ির ড্রাইভার মাত্র। অথচ সেই মানুষটার পশ্চাদ্‌পট আর ভিতর দেখলে আর এক মানুষকে দেখা যায়। অনেকটা যেন সেই বাউল গানটার মত, 'এই মানুষে সেই মানুষ আছে, ক্ষ্যাপা যারে খুঁজে মরছে।' সেই জন্ম গ্রামের লোকেরা কী বলছে, সেটা বড় কথা নয়। এমন একটা ঘটনা ঘটলে ছুটো কথা না বললেই বা চলে কেমন করে। শহরে হলে একরকম, গ্রামে আর-এক রকম। তা ছাড়া সমালোচক যারা তারা মুখুজ্জেদের সমকক্ষ, অনেকটা সমগোত্রের মানুষ, ঈর্ষা স্বাভাবিক। শহরে ঈর্ষা কম না, সম্ভবতঃ তার চেহারা আরো অনেক বেশী জটিল, অনেক শক্ত নির্ভাজ মুখোস পরা, অনেক তীব্র ও ভয়ংকর। কেবল গ্রামে খাদ্য নেই—এটাই সব থেকে নতুন অভিজ্ঞতা।

কিন্তু মনীশের তাতে দুঃখ নেই। গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবারের যে-টুকু শাক, মাছ, ভাত, সেটুকু তার কাছে অমৃতের মতই মনে হয়। লাঞ্চ, ডিনার, ড্রিংক ক্যাবারে, গ্যাম্বলিং, কোন কিছুই মনে আসে না। সম্ভবতঃ একেবারে নতুন পরিবেশের জন্যও এটা হতে পারে। ফকির, মনীশ, নীলিমার দাদারা যখন এক সঙ্গে খেতে বসে বাড়ির গৃহিণী পরিবেশন করেন। দুই বউ শাশুড়িকে সব এগিয়ে দেয়, মুখের কিছুটা তাদের ঘোমটায় ঢাকা। গাছ-কোমর বাঁধা শাড়িপরা নীলিমা তখন এক কোণে দাঁড়িয়ে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে মনীষকে দেখতে থাকে। চোখাচোখি হলে লজ্জা পায়। বৌদিদের দিকে তাকায়। সেখানেও যেন চোখে চোখে কী কথা হয়। নীলিমা হঠাৎ বৌদিদের কারুকে কী কারণে যেন জিভ ভেংচে দিয়ে, মুখ লাল করে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। মনীশের তখন মোচার ঘণ্টর স্বাদের সঙ্গে আর-এক অনাস্বাদিত স্বাদের তরঙ্গ লেগে যায়।

চুপ করে খানিকক্ষণ সেই নদীর বাঁকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে

এক সময়ে সিঁড়ি দিয়ে সে নিচে নেমে গেল। নিঝুম বাড়ি, হয় তো সবাই ঘুমোচ্ছে। ফকির সুষমার ঘরে। সুষমার কাছে নিশ্চয় কেউ আছে। কিন্তু খুদেরা কি এত সহজে ঘুমোয়। ফড়িংই-বা কোথায়?

যেখানেই থাকুক, মনীশ সান গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে উঠোনে নেমে এল। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে, বাড়ির পিছন দিকের খিড়কি পুকুরের পাশ দিয়ে নদীর রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ছাদ থেকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, নিচের পথে তেমন নয়। নিচে বাগান বাবলা বন ডোবা পুকুরের আশপাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে যেতে হয়।

মনীশ নদীর ধারে এসে ডান দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেল। নদীর ধারে এপারে-ওপারে চাষ আছে। বাগানও আছে। বাগানের মধ্যে কলাবাগানই বেশী। চাষের মধ্যে রবিশস্য কলাই, মুগ, মটর, আলু। দু-একটা পানের বরজ। এমন ঘোর দুপুরে নদীতে মাঠে কেউ নেই। মনীশ এগিয়ে গেল। বাঁশঝাড়ের কাছে এসে নদীটা সত্যি এমন করে মোড় নিয়েছে ডানদিকে কিছুই দেখা যায় না। বাঁশঝাড় নিচু হয়ে ছপ ছপ করে জল লাগছে।

মনীশ চোখ তুলে দেখল বাঁশঝাড়ের উঁচু জমিতে পায়ে হাঁটা রাস্তা উঠে গিয়েছে, দুপাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সেই পথ দিয়ে উঠে বিস্তৃত বাশঝাড় পেরিয়ে হঠাৎ দেখল একটা বাঁশের সাঁকো। নদীর ওপারে গাছপালা নিবিড়। তার মধ্যে এক মন্দিরের চূড়া।

মনীশের মনটা নেচে উঠল। কিসের মন্দির, কেমন মন্দির, দেখবার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে সাঁকোর ওপর উঠল। উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল সাঁকোটা মড়মড়িয়ে ডাইনে-বাঁয়ে দুলে গেল। এখুনি ভেঙে পড়বে যেন। অথচ হাত বাড়িয়ে ধরার কিছু নেই। রীতিমত সার্কাসের রজ্জু খেলা। যদিও সাঁকোটা তত সরু নয়। প্রায় দেড় হাত চওড়া ফালি ফালি বাঁশের ওপরে। ঘিঞ্জি করে মোটা কঞ্চি পাতা। তলায় কাঠের খুঁটি।

হয় তো একদা সাঁকো পোক্ত ছিল, এখন নড়বড়িয়ে ঝরঝরিয়ে

গিয়েছে। বাঁশে ঘুণ, কঞ্চিতে পোকা, খুঁটিতে ক্ষয়, মনে হয় পরিত্যক্ত। কিন্তু সাঁকোর মাঝখানে মানুষের পায়ে পায়ে যে দাগ পড়েছে তা পুরনো নয়।

মনীশ প্রথম দোলানিটা সামলে আবার আস্তে আস্তে পা বাড়াল। পড়লে জলে! তাতে বিশেষ অসুবিধা নেই, সাঁকোটা ঘাড়ের ওপর না পড়লেই বাঁচোয়া। দেখা গেল আস্তে গেলে দোলানি কম। টিপে টিপে পা ফেললে মড়মড় শব্দটা তেমন ভীতিজনক ভাবে বাজে না। মনীশ তেমনি করেই সাঁকোটা পার হয়ে গেল। এক পথ গিয়েছে সোজা, আর এক পথ ডাইনে নিবিড় গাছপালার মধ্যে। মন্দিরটা সেদিকেই। মনীশ সেই পথেই গেল।

কিছুটা যাবার পরে, দেখতে পেল, বাঙলা দেশের শীতের ফুল আর লাউ সিম মাচায় তোলা, ঘেরা বাগান। দুটি বেড়ার ঘর, মাথায় খড়ের চাল। তার পাশে এক প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের উঠোনটার সামনে কেউ ঝাঁটা দিয়ে, শুকনো পাতার ডাঁই আশেপাশে সরিয়ে রেখেছে। চার পাশে বড় বড় গাছ। লোকজন কেউ কোথাও নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ।

মনীশ পায়ে পায়ে মন্দিরের সামনে গেল। মন্দিরের গায়ে পোড়া ইটের কাজ। বিচিত্র নারী পুরুষের মূর্তির ছাপ তার গায়ে। এই সব মূর্তির কী পরিচয়, মনীশ জানে না। কিন্তু তাদের শরীরের পোশাক, অলঙ্কার ও ভঙ্গি সুন্দর লাগে। অনেক জায়গাতেই ভেঙে পড়েছে। ইটে নোনা ধরেছে। এখানে যেন বড় বেশী ঠাণ্ডা।

মনীশ মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিতেই উঠোনের দিকে শুকনো পাতায়, কার যেন পায়ে হাঁটার শব্দ পাওয়া গেল। মনীশ থমকে গেল। পিছন ফিরে তাকাল, কাউকে দেখতে পেল না। আবার সিঁড়িতে পা দিতে গেল, আবার শব্দ হল। যেন দু-পা দৌড়ে গেল কেউ। পিছন ফিরে দেখল কেউ নেই সুজনকুমারের একটু যেন অস্বস্তি হল। একটু গা ছমছমানিও। এমন নির্জনে এরকম একলা

সহসা যেন নিজেকে একটু অসহায় বোধ হল। ভৌতিক কিছু না হোক, কোন জন্তু-জানোয়ার হতে পারে। দুষ্ট লোকেরই বা অভাব কী?

মনীশ মন্দিরের চত্বরে সরে এল, চারপাশে তাকাল। একটানা ঝিঁ ঝিঁ আর থেকে থেকে পাখির পিক্ পিক্ ছাড়া কোন শব্দ নেই এখন। আবার হঠাৎ মনীশের পিছন দিকে শুকনো পাতার শব্দ হল। ও তাড়াতাড়ি পিছন ফিরল। কেউ নেই। এ বড় অস্বস্তি। ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

মনীশ ঘুরে চলতে আরম্ভ করবার আগেই আবার শুকনো পাতার শব্দ এবং এবার শব্দ লক্ষ্য করে ফিরতে গিয়েই একটা যেন কী দেখতে পেল। রঙিন কিছু। কিন্তু মস্ত চওড়া একটা গাছের আড়ালে চকিতে তা সরে গেল। মনীশ বলে উঠল, 'কে ওখানে?'

কোন সাড়া-শব্দ নেই। একটা ভয় মেশানো দ্বিধা থাকলেও মনীশ পায়ে পায়ে সেই গাছের দিকে এগিয়ে গেল। ওর সন্দেহ, কোন মানুষ আছে ওখানে। তবু গাছটার কাছে গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। ওপাশে কে আছে, কী আছে সঠিক জানে না। আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কে?'

হঠাৎ একটু হাসির শব্দ শোনা গেল যেন। চকিতে একটা সন্দেহের ঝিলিক হেনে গেল মনীষের মনে। গাছের ওপাশে গেল। দেখল এক রাশ খোলা রুক্ষু চুল, খয়েরি রঙের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকা। হাসির চমকে শরীর কাঁপছে। নীলিমা, কোন সন্দেহ নেই।

মনীশ মুখে চেপে রাখা আঁচল ধরে টান দিতেই নীলিমার মুখ দেখা গেল। হাসিতে আর লজ্জায় সেই মুখ লাল। নীলিমা আজ মাথা ঘষেছে, তাই খোলা চুল ফাঁপানো, ছড়ানো কালো চুলের মাঝখানে তার লাল হয়ে ওঠা মুখ। চকিতে একবার মনীশের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

মনীশ তখনো নীলিমার আঁচল ছাড়ে নি। বরং আঁচল টেনে,

নীলিমাকে টেনে নিল একেবারে বুকের কাছে। চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরল। বলল, 'ভীষণ ভয় দেখিয়েছ তুমি। আমি পালাচ্ছিলাম।'

নীলিমা আবার হেসে উঠল। মুখ নামিয়ে নিল। মনীশ আঁচল ছেড়ে নীলিমার কাঁধে হাত রেখে আবার চিবুকে হাত দিয়ে ওর মুখ তুলে ধরল। নীলিমা রক্তিম মুখে মনীশের দিকে দেখল, আর মুহূর্তে ওর চোখ দুটি বুজে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভয় দেখানো কৌতুকের লজ্জা মেশানো হাসিটা যেন অন্য রূপ নিল। মনীশ দেখল সেই দূরতর চাঁদ কোটাল লাগা নদীর বুকে দোলে। একটি সুন্দর মুখ, বুকের কাছে, সুজনকুমারের পক্ষে খুব আয়াসসাধ্য কখনো না। কিন্তু এক দূর গ্রামের নিবিড় গাছপালা ছাওয়া মন্দিরের নির্জন চত্বরে, নীলিমার মুখ মনীশের কাছে আর এক মায়া। একটি কাছের মুখ মুখের ওপরে নিশ্বাস ফেলে কোনদিন যেন বুকের মধ্যে এমন দুরু দুরু করে ওঠে নি। দূরে রাখতে চেয়েও নীলিমাকে আরো কাছে টেনে মনীশ নীলিমার ঠোঁটে চুমো খেল।

তথাপি নীলিমা চোখ খুলতে পারল না, ওর শরীরে যেন একটা অচিন চেতন একবার কাঁপিয়ে দিল। মনীশ হাত দিয়ে রুক্ষু চুলের গোছা সরিয়ে দিল নীলিমার মুখ থেকে, আবার চুমো খেল, আগ্রাসী আবেগে গভীর আলিঙ্গনে। প্রত্যাশা করল নীলিমা গ্রহণের সংকেত গ্রহণ করে দেবে। কিন্তু বোঝা গেল নীলিমা তা জানে না। ও শুধু জানে দান। তারপর মনীশের কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য দিকে মুখ, মুখ যেন ভার। আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে মনীশের দিকে তাকাল।

মনীশ বুঝতে পারল না, নীলিমা দুঃখিত হয়েছে, না বিরক্ত হয়েছে, না রাগ করেছে। জিজ্ঞেস করল, 'রাগ করলে?'

নীলিমা ঘাড় নেড়ে সায় দিল, তারপরে চোখে ঝিলিক হানল। ফিক করে হাসল। রক্তিম জিভ বের করে ভেংচে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে ছুটে গেল অন্য দিকে। মনীশের মনে হল ওর বুকের মধ্যে

কেমন একটা তরঙ্গ টলটল করছে। ঝড় তোলপাড় নয়। ও নীলিমাকে অনুসরণ করল।

নীলিমা যেদিকটায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে নদী সেই দিকে। বাঁয়ের বাঁকে কিছু গাছপালা ছড়িয়ে, ধান কাটা মাঠ ধূ ধূ করছে। মনীশ ডাকল 'নীলিমা।'

নীলিমা মুখ ফিরিয়ে হাসল। লজ্জার ছায়া ওর মুখ থেকে যায়নি, তবু সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'পালিয়ে এসেছিলেন কেন?'

'পালাব কেন। ছাদে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হল, নদীর ধারের এদিকটা একটু দেখে আসি। ভাবলাম তোমরা সবাই ঘুমোচ্ছ।'

নীলিমা বলল, 'দিনের বেলা আমি ঘুমোই না।'

মনীশ বলল, 'জানলে পরে ডেকে নিয়ে আসতাম।'

নীলিমার চোখে ভয়মেশানো বিস্ময় ফুটে উঠল। বলল, 'শুধু আমাকে?'

'কেন, তাতে কী?'

'ছি, ছি, সবাই তা হলে কী ভাবত। একলা কখনো আসা যায় বুঝি। ছোটর দল সঙ্গে আসে, তাই আসতে পারি।'

'তবে যে তুমি এখন একলা এলে?'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মুখ নামিয়ে নিল নীলিমা। মনীশ আরো কাছে গেল। বলল, 'পালিয়ে এসেছ বুঝি?'

নীলিমা বলল, 'দেখতে এসেছিলাম, কোথায় যাচ্ছেন। কে জানত এত দূরে আসবেন।'

বলতে বলতেই নীলিমা মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠল। মনীশ বলল, 'হাসছ যে?'

নীলিমা বলল, 'সাঁকোয় উঠে কী রকম ভয় পেয়েছিলেন?'

'সেটাও তুমি দেখেছ?'

'আমি তো তখন বাঁশঝাড়ের আড়ালে।'

'পিছু নিয়েছিল বুঝি ?'

নীলিমা হাসল। মনীশ বলল, সাঁকোটা তো ভয় পাবার মতই।'

নীলিমা বলল, 'আমরা তো ওটার ওপর দিয়ে দৌড়ে পার হই।'

মিথ্যে বলবার মেয়ে নয় নীলিমা। খোলা চুল, এলো আঁচল, স্বাস্থ্যবতী নিলীমা। ওর ফর্সা মুখে ডাগর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে মনীশ কথা হারাল। তৃষ্ণার্ত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল। নিলীমার ভুরু লতিয়ে উঠল, চোখে যেন ভর্ৎসনা। তারপরেই মুখে যেন গভীর ছায়া নেমে এল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী দেখছেন!'

'তোমাকে।'

'আমাকে দেখার কী আছে।'

'ভাল লাগছে।'

'মিছামিছি।'

কথাটা শুনে মনীশের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। ও হাত বাড়িয়ে নীলিমার হাত ধরল। বলল, 'মিথ্যে নয় নীলিমা।'

নীলিমার ছায়া মুখে আলোর ছটা লাগল একটু, তবু ছায়ার ভাব বেশী। একবার মনীশের দিকে তাকাল, তারপরে নদীর জলের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কবে চলে যাবেন ?'

মনীশ বুঝতে পারছে, নীলিমার মনে অনেক জিজ্ঞাসা। কথাটার জবাব দিতে একটু যেন দেরি হল। বলল, 'এখনো ঠিক নেই। বৌদি সেরে উঠুন।'

'বৌদি সেরে উঠলে ?'

'দাদার বাড়িতে ?'

'সেখান থেকে ? নিজেদের বাড়িতে।

মনীশ যেন অনেকটা অসহায় হয়ে বলল, 'আর কোথায় যাব নীলিমা ?'

নীলিমা আবার তাকাল মনীশের দিকে। বলল, 'তাই তো। সেখানে সবাই আছে।'

মনীশ বলল, 'হ্যাঁ চাকর-বাকর আছে।'

নীলিমা অবাক চোখে তাকাল।

মনীশ বলল, 'আর তো কেউ নেই।'

'কেন?'

মনীশ হেসে বলল, 'কেন আবার, নেই, তাই।'

নীলিমা যেন বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝে উঠতে পারছে না বলল, 'আপনার সবই আশ্চর্য।'

মনীশ নীলিমার গলায় হাত দিয়ে কাছে টানল। নীলিমা ভয়ের স্বরে বলল, 'কেউ দেখবে।'

মনীশ ততক্ষণে নীলিমার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট নামিয়ে দিয়েছে। সে মুখ তুলতে নীলিমা একটু সরে গেল। এদিক-ওদিক তাকাল। বলল, 'আমি যাই। আমি আগে সাঁকোটা পেরিয়ে যাই, আপনি আরো পরে আসবেন। আর কোথাও নয়, বাড়িতে আসবেন?'

বলেই ও ছুট দিল। খানিকটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রাগ হয়নিতো।'

মনীশ ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে জানাল, না। নীলিমা মন্দিরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'মন্দিরের পিছনে একটা বেলগাছ আছে। গাছের ডালে কিছু মানত করে ঢিল বেঁধে দিলে মনোস্কামনা পোরে। বলেই তেমনি ছুটে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল।

আর মনীশ যেন সাপের মত দংশনে বিষ ত্যাগ করে কেমন একটা ব্যথায় নির্জীবের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এটা ওর অভিনয় নয়, এইটাই ব্যথা। নিশ্বাস ফেলে মন্দিরের পিছনে সেই বেলগাছের সন্ধানে গেল ও।

মন্দিরের পিছনে বেশ ঝাড়ালো বেলগাছ। তাতে অজস্র ঢিল ঝুলছে। হাত বাড়ালেই ডাল পাওয়া যায়। এমন বেলগাছ যেন অশেষ কৃপা। কষ্ট করে কাউকে পাতা পাড়তে হয় না।

ও দেখল, অনেক ছোটখাটো ঢিল পড়ে নেই শুধু, অনেক

পাড়ের দড়ি এখানে-সেখানে ছড়ানো। মনীশ একটা ঢিল তুলে, দড়িতে বাঁধল। তারপর ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বারে বারেই ভাবতে লাগল, 'আমার কী মনোস্কামনা, কী-কী-কী।'

বাঁধা শেষ হয়ে গেল, তবু কোন প্রার্থনা ফুটে উঠল না ওর মনে কেবল একটা কষ্টের অনুভূতি আর নীলিমার মুখটা বারে বারে মনে পড়তে লাগল।

দশ দিন পরে, হাসপাতালের ডাক্তার বলল, অপারেশন ছাড়া বোধহয় উপায় নেই। বাঁচানো কঠিন। তবে অন্য একজন ডাক্তার দেখাতে পারলে ভালো হয়, আর কোন বড় ডাক্তার। মনীশ সিদ্ধান্ত নিল মনে মনে। কলকাতায় তার নিজস্ব ফিজিসিয়ানকে সে তার লেটার-প্যাডে চিঠি লিখল। 'পত্রবাহককে কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। সঙ্গে চলে আসবেন, ঠিকানা নিচে লিখে দিলাম। কলকাতা থেকে দূরত্ব সত্তর-আশী মাইলের বেশী নয়। শুধু একটি অনুরোধ, কাউকে এ কথা বলবেন না। আপনার গাড়ি নিয়ে আসাই ভাল। জি. টি. রোড থেকে আট মাইল কাঁচা রাস্তা যদিও তা হলেও অসুবিধে হবে না। আপনি বলেই আমি কোন টাকা পাঠালাম না।'

ফকির নিজে গেল সেই চিঠি নিয়ে। ডাক্তার চিঠি পড়ে অবাক হয়ে ফকিরকে দেখলেন। যাবার পথঘাট ঠিকানা আরো ভাল করে জেনে নিলেন। তারপরে ভিতরে গিয়ে আধঘণ্টা বাদে বেরিয়ে এলেন পোশাক পরে। তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে চললেন।

ফকির ভাবল, কী যে করছে এই মনীশ ছোকরা! কেন যে আবার সুষমাকে দেখালাম!···

কিন্তু মনীশের ডাক্তার যখন জবাগ্রামে এসে পৌছুলেন, তখন সুষমার অবস্থা একেবারেই খারাপ। তিনি তো মনীশকে দেখে যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না, সে এখানে! যাই হোক, রুগী দেখে

তিনি বললেন, 'আমার বিশ্বাস হয় না, এখন আর কলকাতায় নিয়ে গিয়ে এ রুগীকে লিভার অপারেশন করা যাবে

কথাটা মিথ্যে নয় আধঘণ্টার মধ্যেই, ফকিরের কোলের ওপরে সুষমা, ঘর ভরতি লোকের সামনে মারা গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সে-ই তার শেষ অচৈতন্য অবস্থা। আর জ্ঞান ফিরে আসে নি ফকিরকে তখন দেখাচ্ছিল এক মুখ দাড়ি, চোখমুখ বসে যাওয়া নিতান্ত অসহায় একটা লোক। প্রথম মৃত্যু ঘোষণার পরে সে কেবল বলল, 'নিজের মানুষকে দূরে ফেলে রাখলে এরকমই হয়।'

তারপরে মনীশের দিকে ফিরে বলল, 'কেন এসেছিলে জবাগ্রামে! এও কি মিছিমিছি?'···

অভিনয় করে তো চোখে জল অনেক এনেছে মনীশ, কিন্তু এমন বুক টনটনিয়ে ওঠা কষ্ট কোথায়ও আগে অনুভব করে নি।

প্রায় শেষরাত্রে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে সুষমাকে দাহ করা হল। ইতিমধ্যে ডাক্তারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা মনীশের হয়েছে। ডাক্তারকে সে জানিয়েছে, ফকির তার দাদা, এখানে না জানিয়ে এসেছিল, যাতে তার-জগতের লোকেরা এখানে কেউ না আসে।

সকালবেলা, বেলা প্রায় দশটা নাগাদ, ডাক্তার যখন কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করছে তখন জবাগ্রামে এসে পৌঁছুল আরো তিনটে গাড়ি। তারা সারি সারি এসে দাঁড়াল মুখুজ্জ্যেবাড়ির সামনে। খবর পেয়েই মনীশ ডাক্তারের দিকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল। ডাক্তার বলল, 'কী করব বল, যে ভাবে তোমাকে খোঁজাখুঁজি চলছে, তোমার সেক্রেটারিকে একটা টেলিফোন না করে আমি পারি নি।'

তিনটি গাড়ির মধ্যে সুজনকুমারের বিখ্যাত বিদেশী বিশাল গাড়িটা দেখার জন্যই গ্রামটা ভেঙে পড়ল। তার সঙ্গে কলকাতার

অভিনয়-জগতের নারী-পুরুষ। বিশেষ ভাবে, একজন খ্যাতানাম্নী নায়িকা পর্যন্ত জবাগ্রামে এসে পড়েছে।

মৃত্যুর শোকে তখনো বাড়িটা থম্ থম্ করছে। তথাপি একটা কৌতূহল সকলেরই। কেবল মনীশ দেখতে পেল না নীলিমাকে। ফকির বলল, 'ভালই হয়েছে, আমিও আমার ছেলেকে নিয়ে এখুনি জবাগ্রাম থেকে কাটব।'

মনীশ, খুঁজতে খুঁজতে নীলিমাকে এসে পেল দোতলার এক ঘরে। একটা খাটে সে পাষাণ প্রতিমার মত বসেছিল। মনীশ আসতেই উঠে দাঁড়াল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। নীলিমা ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'তুমি সেই নায়ক?'

মনীশ বলল, 'আমি মনীশ'।

নীলিমা মাথা নাড়ল, 'তুমি নায়ক। এখুনি চলে যাচ্ছ?'

মনীশ নীলিমার এমন নির্বিকার প্রাণহীন কথায় অবাক হল। বলল, যাওয়াই তো ভাল।'

নীলিমা বলল, 'আচ্ছা।'

মনীশ হয়তো তার জগতের সীমা ছাড়িয়ে এ কথা বুঝতে পারল না, নারীর জীবনে বহু বিচিত্র আঘাতের প্রথম আঘাতে নীলিমা বিশ্ব-সংসারের বিচিত্র রূপ দেখে এই প্রথম থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। রাত্রে দিদি মারা গিয়েছে, সকালে মনীশ চলে যাচ্ছে। এই বাস্তবের অপ্রাকৃত রূপ। এ স্তব্ধতা না কাটলে নীলিমা নিজেও জানতে পারছে না তার কোথায় কী ঘটেছে। তথাপি মনীশ ঘর ছাড়বার আগেই নীলিমার চোখে জল এসে পড়ল।

জবাগ্রামের বুকের ওপর দিয়ে সারি সারি পাঁচটা মোটর গাড়ি চলল। যেন একটা মিছিল, বিচিত্র যাত্রী নারী-পুরুষ। সকলের শেষ গাড়িটা ফকিরের, যেমন তার শব্দ, তত তার লাফানো। সেই

গাড়িতে ফকির ফড়িং এবং মনীশও। মনীশ সকলের কাছে যথাবিহিত বিদায় নিয়েছে। নীলিমাকে আর দেখতে পায় নি।

গাড়ি ছেড়ে দেবার সময় সে অনেক চেষ্টা করেছে, বাড়ির দিকে তাকিয়ে যদি নীলিমাকে দেখা যায়। দেখা যায় নি।

নীলিমা ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়ে, মাঠের রাস্তার ওধার দিয়ে সেই গাড়ির সারি দেখছিল। কে জানে কোন্ গাড়িতে মনীশ আছে। কিন্তু তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল!

মনীশের মনে হল মাঠের ধুলোয় তার চোখ ঝাপসা। চোখের সামনে নীলিমার মুখটা ভাসছে। মনে মনে বলল, এ ত আর একটা নাটকই হয়তো হল আসলে আমি যা আবার সেখানেই চলেছি। কিন্তু এখানেও কি অভিনয় করে গেলাম?

জবাগ্রামের মাঠে ধুলো উড়ছে। ফকিরের চোখের সামনেও শুধু সুষমার মুখখানি ভাসছে। ফড়িং-এর চোখে ভাসছে তার মায়ের মুখ।

যাত্রিক

জীবনের পিছনের কোন অংশই আর ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করে না। পিছন দিকটা, যে-দিন-মাস-বছরগুলো কেটে গিয়েছে, সেই দিকে ফিরে তাকাবার মতো, দেখবার মতো পুরন্দরের কাছে কিছু নেই। কোন সুখ, আনন্দ, ভালো-লাগা, কিছুই না। এমন কি একটি মানুষের পরিচিত হিসাবে, পুরন্দর নামটাও ফেলে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তার কোন উপায় নেই। এই বিশাল সংসারে পুরন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা কিছু না। নাম বা পরিচয়ের প্রয়োজনটা অন্য কারণে। নিতান্ত একটা মানুষের নিজের বেঁচে থাকার, নানান সমস্যাগুলোর জন্য, একটা নাম বা পরিচয়ের দরকার। শুধু নিজের নাম বা বাবার নামটা পর্যন্ত এই কারণেই প্রয়োজন হয়। ইস্কুল, কলেজে, চাকরিতে, যে-কোন ব্যাপারেই, একজন মানুষ সব সময়েই, সন্ অব্ অমুক হওয়ার দরকার। অন্যথায়, পরিচয়হীন অজ্ঞাতকুলশীল সে। জন্মসূত্রে পিতৃত্বের পরিচয়, বিশেষ একটি নামের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে সে জারজ। যেন পিতারা হান্ড্রেড পার্সেণ্ট জেনে বসে আছেন, যে ছেলেটি তার পিতৃত্বের পরিচয় বহন করছে তিনি তারই জন্মদাতা। মা ছাড়া, কে জানে তার সন্তানের পিতার পরিচয়। কর্ণের পরিচয় ত কুন্তীই জানতেন। আর নারী মাত্রেই একনিষ্ঠ নয় এবং নারীই যখন জননী, তখন সন্তানের পরিচয় দেবার অধিকারটা তো তারই থাকে! একদা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সন্তানদের পরিচয় মায়ের নামেই ছিল। তার পরে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতা দখল। তাও পুরুষত্বের জোরে না, সম্পত্তির দাপটে। পুরন্দরের ভাবতে খুব অদ্ভুত লাগে। সমস্ত ব্যাপারটাই খুব অদ্ভুত। এখানকার মানুষেরা হয়তো ভাবতেই পারে না, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহও ছিল না। না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ সন্তান জননীর। জনক বলে কেউ

নেই, জনক-সন্তান সকলেই তো জননীর অধীন। তার নিজস্ব কোন শক্তি বা এক্তিয়ারই ছিল না। অতএব, যে-কোন পুরুষের সঙ্গে মিলবেই, সন্তান আসুক, তার পরিচয় মায়ের নামে। প্রায় উলটি গঙ্গার মতো। পুরুষ-শাসিত সমাজ যেমন যুক্তি আবিষ্কার করেছে, স্ত্রী দুষ্কুলাদপি। স্ত্রী যে-কোন জাতেরই হোক শাসক পুরুষের আশ্রিতা সব নারীর সন্তানেরই পরিচয় তার বাবার নামে। কেবল, পুরুষ তার সন্তানের পরিচয়ের আসল চাবিকাঠিটা রেখে দিয়েছে, মেয়েদের কাছে রেখে দেয়নি, প্রাকৃতিক কারণেই তা রয়ে গিয়েছে। আর পুরুষেরা সব কিছুর অধিকার মেয়েদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে নিতান্ত তাদের একটা বেকায়দায় ফেলে। সে হিসাবে, পুরুষ সামাজিকভাবে কুটনীতিক, পুরন্দরের বলতে ইচ্ছা করে, পুরুষ জাতটাই খচ্চর। আর মেয়েদের যত কুটনীতি তার সবটাই শরীরকে ঘিরে। তাদের আদি ও অন্তে শরীর, কেননা তারা জননী, এ কাজ পুরুষ কখনো পারে না এবং সেটাই বোধ হয় মেয়েদের সব থেকে বড় অহংকার এবং একই সঙ্গে, সব থেকে বড় যাতনাও বটে। এই একটা কারণেই, বস্তু আর সামগ্রী আর খাদ্যের উৎপাদনের ক্ষমতাটা পুরুষ ক্রমাগত নিজের হাতে পেয়েছে। যত পেয়েছে ততই তার শক্তি বেড়েছে, উৎপাদিত বস্তুকে সে দু'হাতে আড়ালে নিজের কুক্ষিগত করেছে, বলেছে, এ সব আমার সম্পত্তি। বোধহয় এই কারণেই, আদিম সাম্যবাদী সমাজেই, মেয়েদের অধিকার সমান সমান ছিল। উৎপাদন ব্যাপারটা তখনো দু'জনের ভাগে সমান সমান ছিল। তারপরে, যতই সেই শক্তি গিয়ে পুরুষের হাতে জমল, ততই তার ধনসম্পত্তি বাড়তে লাগল। মেয়েরা দেখল, ফ্যাসাদ। তার গর্ভজাত সন্তানকে কেউ পোঁছে না, একটি কানাকড়িও দিতে চায় না। চাইতে গেলে পুরুষ বলে, কাকে দেব? আমি কি তোমার সন্তানের জন্মদাতা?'

মেয়েরা গালে হাত দিয়ে ভাবল, তাও তো বটে। তার গর্ভজাত

সন্তান কার, সে নিজেও তো জানে না। জানবেই বা কেমন করে? জানবার তো সেরকম ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী নারী পুরুষ, সকলেই সকলের। বিশেষ একজনের সঙ্গে একজনের নেই। অতএব উপায়? উপায় আছে, সেই উপায় হল একটি চুক্তি। অমুক নামে নারী, তুমি শুধু আমার, আমারই। আমি ছাড়া তোমার পুরুষ নেই। আমার চার দেওয়ালেই তোমার উদয়াস্ত, জীবনযাপন, বলতে পারো, এই তোমার জীবিকা। তাতে শুধু তোমার সন্তান নয়, তুমিও আমার সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। কিন্তু আর কোন পুরুষকে তুমি গ্রহণ করতে পারবে না, ভোগ করতে পারবে না। তাহলেই বিতাড়ন। এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হোক বিবাহ। নারীর গর্ভজ উৎপাদনের যন্ত্রকে পুরুষ অধিকার করল এই নিয়মে। তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হল সতীত্ব নামে এক বিচিত্র মালা। কেবল বহুদূরের দিকে তাকিয়ে, ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে, নারী হাসল মুখ টিপে। বেশ, তথাস্তু। কিন্তু পুরুষ, তোমাদেরও তো চিনি। বীজ নেব আমি, ফসলও আমিই ফলাব। তার জন্যে যত খুশি নিয়ম কানুন তৈরি কর, আপত্তি নেই। আজ থেকে আমি সেই নারী, যে হবে, চিররহস্যময়ী, যার মন হবে হাজার বছরের সাধনার ধন।...

পুরুন্দর হেসে ফেলল। ভাগ্যিস্ ওর মুখটা ফেরানো ছিল চলন্ত ট্রেনের জানালার দিকে। না হলে, আশেপাশের যাত্রীরা ওকে পাগল ভাবত! মানুষের মন কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। মায়ের মুখটা ওর মনে পড়ল। না, আপাতত মায়ের চরিত্র নিয়ে পুরন্দরের কোন ভাবনা বা সংশয় নেই। যদিও পঞ্চাশ উত্তীর্ণ মাকে দেখে অষ্টাদশী মায়ের রূপ বা চরিত্রের চিন্তা ও করতে পারে না। অষ্টাদশীর মনের কথা কেউ-ই বলতে পারে না। ও ধরেই নিচ্ছে, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ভদ্রলোকই ওর বাবা এবং জন্মের পর অন্নপ্রাশনের সময়, বাবার গুরুদেব যেহেতু বলেছিলেন, প্রথম

অক্ষর ও দিয়ে যেন ছেলের নাম রাখা হয়, আর তার সঙ্গে একটা হ্রস্বউকার থাকলে খুবই ভাল হবে; তা-ই জগৎসংসারে পরিচিতির জন্য, এই পুরন্দর নাম। পুরন্দর! কেন, আর কি পু দিয়ে কোন নাম ছিল না, একেবারে পুরন্দর! পুলিন, পুলক, পূর্ণেন্দু, পুণ্য, এমন কত নামই তো পুরন্দর শুনেছে। একেবারে পুরন্দরই বা কেন। তা হলে, পুরুষরা কী দোষ করেছে, কিংবা পুরূ। তবু উর্বশী পাবার একটা সম্ভাবনা ছিল বা একজন যোদ্ধা রাজার নামের সঙ্গে মিল থাকত। আর পুরন্দ নাম রেখে যে না ঘরকা, না ঘাটকা, ধোপার গাধা হয়ে থাকতে হল।

জানালার দিকে ফেরানো মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল পুরন্দরের মুখ থেকে। একটা ক্ষোভ আর হতাশা জেগে উঠল ওর মুখে। না, জীবনের পিছন দিকের কোন অংশেই, ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করে না। এ চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত, পিছনের প্রায় সব কিছুতেই ওর বিরাগ বিরক্তি, ক্ষোভ, অপমান আর হতাশা। এখন আর পুরন্দরের মনে কোন সন্দেহ নেই, পৃথিবীতে ওকে কেউ আমন্ত্রণ করে ডেকে আনেনি। পৃথিবীতে আসাটা একটা আকস্মিক ব্যাপার, তারপরে কতগুলো নিয়ম-নীতি পালন, কারণ এসেই যখন পড়েছে তখন কি আর করা যাবে। অনেকটা যেন জনসমাবেশের মতো, এসে পড়েছে, বসে পড়। যা বলা হচ্ছে, তা শোন, যা করতে বলা হচ্ছে, তা-ই কর।

নিজেকে পুরন্দরের এত অসহায় মনে হয়, এ ছাড়া অন্যরকম কিছুই ওর মাথায় আসে না। এই অসহায়তা থেকেই পিছন দিকটা ভাবতে কেবল খারাপ লাগে না, ভয়ও লাগে। বাবার মুখটা মনে পড়ে, মায়ের মুখটা মনে পড়ে। তারাও কম অসহায় না, পুরন্দর তা জানে, তথাপি তাদের আস্ফালনটা দেখলে মনে হয়, পৃথিবী সম্পর্কে সব তারা জেনে বসে আছে। কলকাতা থেকে দেড়শো মাইল দূরে, এক মুন্সেফের আদালতের কেরাণী ছিল ওর বাবা।

বছর ষাটেক বয়স। একটাও দাঁত নেই, চুলগুলো সব পাকা, সমস্ত মুখটা ভাঙাচোরা রেখায় ভরতি, বিরক্ত রাগ আর হতাশা, সমস্ত চোখেমুখে যেন সৌরসিপাট্টা করে বসে আছে। পুরন্দরের মনে হয়, বাবার কোনকালে যৌবন ছিল না। যেন আজন্ম এইরকম ক্রুদ্ধ-বিরক্ত এক বৃদ্ধ। মনে পড়ে না, বাবাকে ও কখনো হাসতে দেখেছে কী না। হয়তো, ভদ্রলোকের—হ্যাঁ, এভাবেই বলতে ইচ্ছা করে পুরন্দরের, একজন বিরক্ত হতাশ বুড়ো ভদ্রলোক ওর বাবা। প্রকৃত ভদ্রলোক কাকে বলে কে জানে! মুন্সেফের রিটায়ার্ড কেরাণীকে ভদ্রলোকই বলতে হবে। ভদ্রলোকের চোখের দিকে ভালো করে তাকালে, মনে হয়, ঘষা ভেজা ভেজা তারায় যেন একটা কান্না ফেটে পড়তে চাইছে। বাবা বোধহয় মনে মনে সব সময় কাঁদে, তাই চোখের গভীরে কান্নার আভাস ফুটে থাকে। কিন্তু কথাবার্তায়, হাবে-ভাবে, কান্নার কোন আভাস পাওয়া যায় না। বরং সব সময়ে যেন খিঁচিয়েই আছে।

পুরন্দরের কোন কিছুতেই ওর বাবা খুশি নয়। ছেলে হিসেবে, পুরন্দর কোনদিনই খুব একটা প্রতিভাবান নয়, তবে মোটামুটি আর দশটা ছেলের মতোই লেখাপড়া করেছে, কখনো ফেল করেনি। মফঃস্বল কলেজে. বি. এস-সি. একটানা পাশ করে গিয়েছে। কিন্তু এতে ওর বাবা কোনদিনই খুশি ছিল না। বরং বিরক্ত আর হতাশ হয়ে বলেছে. 'অমন গণ্ডায় গণ্ডায় পাশ করছে। হ্যাঁ, দেখতাম, স্কলারশিপ পেয়েছে, তা হলে বুঝতাম, একটা কিছু হবে। এ পাশ করার আবার মুরোদের কী আছে।' হয়তো কথাটা সত্যি। আর একটি তথাকথিত বি. এস-সি. সাধারণ বেকারের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া পুরন্দর আর কী-ই বা করেছে। কিন্তু পুরন্দর নিজের সাধ্যমত যত পেরেছে, করেছে। পড়া ছেড়ে দিয়ে কোন কাজে ঢুকে পড়লে মনে মনে হয়তো ওর বাবা খুশি হত। নিতান্ত ভদ্রলোকিতে বেধেছে। কখনো খুশি মনে ইস্কুল কলেজের মাইনে দেয়নি।

দেবার সময়ে, দশ কথা না শুনিয়ে দেয়নি। অভাবই হচ্ছে এর প্রধান কারণ। কিন্তু বাবার কথা শুনলে মনে হত, অভাব নয়, পুরন্দরকে পড়ানোটা একটা নীতি-বিহিগত কাজ হচ্ছে। এ কথা ভাবলেই পুরন্দরকে শুধু রাগ হত না, ভিতরে ভিতরে একটা ঘৃণাও যেন উথলে উঠত। ভদ্রলোকদের এ ধরনের ভণ্ডামি বড় অসহ্য।

পাশ করার পরে, এতদিন পর্যন্ত, যে বছরগুলো কেটেছে, নরকবাসও তার থেকে ভালো ছিল। পাশ করার পরদিন থেকেই, চাকরির চেষ্টা শুরু হয়েছে। অনার্স ছিল না, অতএব এম. এ, পড়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। থাকলেও অর্থের প্রশ্ন অনেক বড় হয়ে দেখা দিত সুতরাং চাকরি চাকরি চাকরি। মফঃস্বল শহরে চাকরি কোথায়? বাবাকে দেখে মুন্সেফের অফিসে ঢোকবার ইচ্ছা দূরের কথা, একটা বিদ্বেষ এবং ঘৃণাই ছিল। যদিও সে চাকরিও কোনদিনই পুরন্দর পায়নি। আদালত, ব্যাংকের মফঃস্বল ব্রাঞ্চ অফিস, স্টেট গভর্ণমেন্টের ছোটখাটো দু'একটা অফিস, কুটিরশিল্প অথবা ট্রান্সপোর্ট, এ সবের মধ্যেই চাকরি সীমাবদ্ধ। পুরন্দরের কপালে কোনদিনই তা জোটেনি। বেকার পুরন্দরের দিকে ওর বাবা তাকাত যেন একটা বিশ্রী কিছু চোখে পড়েছে। সোজাসুজি তাকাবার লোক নয়, চোখের কোণ দিয়ে এমন ভাবে তাকাত যেন পুরন্দরের ছ' ফিট শরীরটা একটা কুৎসিত কিছু। শরীর, চুল, হাঁটা চলা সমস্ত কিছু নিয়েই সমালোচনা। বালিশের খোলের কাপড়ের থেকে বিশেষ ভালো কাপড়ের ট্রাউজার বা জামা কোনদিন পায়নি। কিন্তু তার সমালোচনার ঠেলাতেও অস্থির। কাপড় যেমনই হোক ফ্যাশানের একটা যুগের দাবী পুরন্দরের মনেও ছিল। আটসাট সরু নলের ট্রাউজার বা একটু বিশেষ কাট-এর জামা পরবার শখ ওরও ছিল। এসবের প্রতি সব সময়েই শ্লেষ বিদ্রূপ ঘৃণা প্রকাশ করেছে ওর বাবা। পুরন্দর মুখে কিছু বলত না, মনে মনে রেগে বলত, 'না' তোমার মতো হাঁটুর কাছ বরাবর মোটা ধুতি পরে লজঝড় মার্কা হয়ে ঘুরে বেড়াব।'

মনে মনে আরো একটু গালাগালও দিত। কিন্তু অপমানটা সব থেকে বেশী বাজত, চাকরির ব্যাপারে, টাকার হিসাবে। ইস্কুলে মাস্টারি করা ছাড়া আর কিছুই জোটে নি। বি, টি, পড়া নেই, মাস্টার হিসাবেও সব থেকে কম বেতনের কাজ তাকে করতে হয়েছে। বাড়িতে টাকা দেবার বেলায় হিসেবের প্রশ্ন উঠেছে। পুরন্দর যে অনেক কম টাকা দিত, এ অনড় নিশ্চল বিশ্বাস থেকে ওর বাবাকে কেউ টলাতে পারে নি। তার থেকেও খারাপ, ইস্কুলের মাস্টারি কাজটাকে কোনদিনই মন থেকে পুরন্দর নিতে পারে নি। নিতান্ত দায়ে পড়ে, অনিচ্ছায় প্রতিদিনের ছলনা। যাদের ও পড়াত, তাদের কোন কিছুই ওপরেই ওর কোন আগ্রহ বা কৌতূহল ছিল না। ভালবাসা তো অনেক দূরের কথা।

এই মাস্টারির জন্যও ওর বাবার শ্লেষ বিদ্রূপ কম ছিল না। মুখোমুখি কোনদিন উত্তেজিত চিৎকার চেঁচামেচি না হলেও বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি অনেকবার হয়েছে। যদিও পুরন্দর এ ব্যাপারে বুদ্ধিমান, বাবার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের ওর কোন উৎসাহ ছিল না। সেটা এই কারণে নয় যে, বাবাকে ও শ্রদ্ধা করে বলে। আসলে বাবাকে ও মনে মনে করুণাই করেছে। ভেবেছে ভদ্দরলোককে অকারণ বাজে কথা বলতে না দেওয়াই উচিত। ছেলেবেলা থেকে পুরন্দর ওর মাকে দেখেছে, রোগা ক্লান্ত, যেন আজন্ম উপবাসীর মতো চেহারা, অকাল বৃদ্ধা। সব সময়েই ধুঁকছে, অথচ সব সময়েই সংসারের কাজ করছে। ধোকারও শেষ নেই, কাজেরও শেষ নেই, সন্তান উৎপাদনেরও কামাই নেই। কিন্তু বিরক্তি, রাগ বিদ্বেষ চিৎকার, সেসব কিছুই নেই। যেন সংসারের কাছে মায়ের আর কিছুই চাইবার নেই, কোনরকমে শেষদিনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া। কোন নালিশ নেই, এমন কি জীবন ও সংসার সম্পর্কে কোন উদ্বেগও নেই। পুরন্দর একলা একলা অবাক হয়ে মাঝে মাঝে মায়ের কথা ভেবেছে। পারে কি করে? একটা মানুষ এমন

শান্ত নির্লিপ্ত ভাবে, এ অবস্থায় থাকতে পারে কি করে? অথচ মায়ের মনে, স্নেহের অভাব নেই, এবং আরো একটা বিষয়, বাবার সঙ্গে প্রেম—তাছাড়া আর কি-ই বা বলা যায় প্রেম বা বাবার সঙ্গ পাওয়ার প্রতি অপরিসীম আসক্তি মায়ের কখনো কম দেখা যায় না। প্রথম সন্তান হিসাবে বাবা-মায়ের দাম্পত্যজীবনের সব ব্যাপারটাই পুরন্দরের জানা। এখনো, সব থেকে ছোট ভাইটির বয়স মাত্র চার। বছর দুয়েক আগে, অল্প দামের ওষুধ দিয়ে মায়ের গর্ভপাত ঘটানো হয়েছে। শরীর থেকে অনেক রক্তপাত হয়েছে। অন্যান্য আরো অনেক আধিব্যাধি এসে জুটেছে। তথাপি মা নির্বিকার। কে জানে, এখনো হয়তো বাবা আদর করতে চাইলে, সহজেই, চিরদিনের মতো ধরা দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, গরীব গৃহস্থের রাস্তার ধারে খুটোয় বাঁধা, রুগ্ন গাভীর মতো মন হয় মাকে। যা পাচ্ছে, তাই খাচ্ছে। যতটুকু দুধ আছে, গৃহস্থ দুয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তথাপি কোলের কাছে বাছুরটাকে পেলে স্নেহাতুর চোখে তাকিয়ে চাইছে। দূরে থাকলে হাম্বা করে ডাকছে। আবার সময় এলে, ষণ্ডের আবির্ভাব, আবার গর্ভবতী।

ভাবা যায় না। লোকে শুনলে খুব খারাপ ভাববে, কিন্তু পুরন্দর অন্যরকম আর কিছু ভাবতে পারে না। কেন, মা কি মানুষ না? সকলেই প্রভৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, তথাপি মানুষ রাগ করে, নালিশ করে, প্রতিবাদ করে, হাসে, ঝগড়া করে। মা সেসব কিছুই করে না। এর ওপরে আছে রিটায়ার্ড কেরাণী ভদ্রলোকের নানান্ বায়নাক্কা, বড় বড় কথা, উপদেশ। পুরন্দরের বুকের মধ্যে একটা ভয় জমাট বেধে ওঠে, মায়ের দিকে তাকিয়ে। মা সত্যি কায়ারূপিণী মানবী তো! না কি অশরিরী আত্মা, মানুষের সমাজে একটা ছদ্মবেশ মাত্র। মা হয়তো বহু বছর আগেই আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু এ সংসার সন্তান স্বামীর মায়া ছাড়াতে পারে নি বলে, পুরনো রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পুরন্দরের সঙ্গে মায়ের প্রায় কোন কথাই হয় না। মা কেবল ওকে খেতে ডাকে, খেতে দেয়। চোখের দৃষ্টিতে স্নেহ গলে পড়ে কিন্তু তা বলে, 'আহা বাছা আমার' এমন কোন শব্দ কখনো বেরোয় না। সেটাই যা রক্ষা, তা হলে পুরন্দরের ভীষণ লজ্জা করত। ছ'টি ভাই-বোন, সকলের ওপরেই মায়ের একরকম টান। একমাত্র খিটিমিটি যেটুকু লাগে, তাও খুবই সামান্য, তা বাণীর সঙ্গে। বাণী বড় হয়েছে, পুরন্দরের থেকে ছ'বছরের ছোট বোন। একমাত্র বাণীকেই মা মাঝে মাঝে, অত্যন্ত ক্ষীণ গলায় একটু বকেঝকে। সন্ধ্যাবেলা চুল খোলা থাকলে বা মুখ নেড়ে কিছু চিবিয়ে খেলে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে দেরী করলে, ভর দুপুরে বাড়ি থেকে বেরোলে বা ঘুমোলে, মা বকে, 'এসব অলুক্ষণে, অলক্ষ্মী মেয়ে সাবধান হ।' অথচ মায়ের লক্ষ্মীপনা যে, এ সংসারে কোন লক্ষ্মীকে ডেকে নিয়ে এসেছে, কে জানে। কিন্তু বাণীকেও মা খুব ভালবাসে। সবাইকেই ভালবাসে। মায়ের বড় বড়, কোলবসা চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যায়, ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেই, স্নেহ যেন গলে পড়ে। কথায় কোন প্রকাশ নেই, অনেকটা সেই গাভীর মতোই। মায়ের প্রবৃত্তি থেকে একটা স্বাভাবিক উথলে-ওঠা জোয়ারের মতো।

বাবাকে অসহ্য লাগে। রাগে গালাগাল দেয় মনে মনে, আরো অনেক কিছু। মা যেন আরো অসহ্য। মায়ের এই শান্ত নির্লিপ্ত ভাব, সেই সঙ্গেই, বিনা নালিশে ধুঁকতে ধুঁকতে জীবন কাটানো, এ যেন চেয়ে দেখা যায় না। এটা যেন মায়ের একটা চ্যালেঞ্জ। কেউ তোমরা আমাকে টলাতে পারবে না। পুরন্দরের মাঝে মাঝে মনে হয়, মায়ের মস্তিষ্ক বলে কিছু আছে তো? মা কি চিন্তা-ভাবনা করতে পারে? তা পারলে এত নির্বিকার থাকে কি করে? সন্তান তো পাগল মেয়েমানুষেরও হয়। যদিও একথা মনে হলে, মাঝে মাঝে, রাগে ও বিদ্বেষে, পিছন থেকে হাতুড়ি মেরে মাকে মেরে ফেলতে

ইচ্ছা করে। মা কেন আত্মহত্যা করে না, একথা অনেকবার পুরন্দরের মনে হয়েছে।

কিন্তু এ সবের থেকেও মায়ের সব কিছুকে যেন কেমন অলৌকিক মনে হয় মায়ের জীবনটা যেন, পুরন্দরকে সব সময় কিছু একটা করতে বলছে। কেন এরকম মনে হয়, ও জানে না, কিন্তু, মনে হয়, ক্ষুধায় খাটুনিতে দুঃখে কষ্টে, এই যে নির্লিপ্ত নির্বিকার, তা যেন সব সময়েই, পুরন্দরকে একটা ভয়ংকর কিছু করতে বলছে। কি করতে বলছে ও বোঝে না। যেন বাঁচতে হলে, হয় মায়ের মতো হতে হবে, অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত, দুর্ধর্ষ কঠিন নিষ্ঠুর আর ধূর্ত হতে হবে। নইলে এ সংসারে বাঁচা যাবে না। মায়ের জীবনটা কি একথাই বলে? পুরন্দর বুঝতে পারে না, কিন্তু মনে হয়, মা যেন তার সমস্ত জীবনটা দিয়ে, ওকে একটা কিছু করতে বলছে। এরকম চিন্তার সময়, মাকে ওর খুব সহজ মানুষ বলে মনে হয় না। জটিল আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী মনে হয়। তুলনায়, বাবাকে মনে হয়, একটা বোকা বুড়ো, কেবল রাগ করছে, বকবক করছে উপদেশ দিচ্ছে আর ভাইবোনের জন্ম দিচ্ছে।

বাবা-মাকে নিয়ে, এই হল জীবনের পিছন দিকের অংশ। সেদিকে ফিরে তাকাবার কিছু নেই। পুরন্দরের কোন ইচ্ছাও নেই। পিছন দিকটা তার কাছে, শিশুর চোখে, অন্ধকারের মতো। কেবলই ভয়ের, নৈরাশ্যের। ওর চোখের সামনে জেগে থাকুক শুধু কলকাতা। সেখানে ওর ভবিষ্যতের ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষাগুলো কল্পনায় গুনগুন করতে থাকুক। এখন কলকাতায় চলছে।

ওর ভাইবোনেরা রয়েছে পিছন দিকে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, নিজের জীবনের হতাশা, সমস্যা, প্রায় কোনরকম ভ্রাতৃ বা ভগ্নিপ্রেমই জাগাতে পারে নি। নিতান্ত একটা পরিবারের মধ্যে, পিঠোপিঠি কতগুলো ছেলেমেয়ে। খেলা ঝগড়া খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি, ঈর্ষা এই পর্যন্তই। তাদের জন্ম ভাববার কোন অবকাশই

ওর আসে নি। রাণী আর বাণী পরপর দুই বোন। রাণীকে কোনদিনই বিশেষ ভালো লাগে নি। হয় তো বাণীর পরে, আবার একটা বোন জন্মেছে বলেই, ছেলেবেলা থেকে, ওর প্রতি বিশেষ কোন কৌতূহল বা উৎসাহ জাগে নি। এখন বাণীর ওপরেও কোন স্নেহ যেন নেই। চোদ্দ পনের বছর বয়সে, বাণীর কিশোরী মূর্তিটা ভারী সুন্দর লাগত পুরন্দরের। কচি কলাপাতার মতো স্নিগ্ধ আর পবিত্র মনে হত বাণীকে। কিন্তু সেই বাণীকেই ও দেখেছে, পাশের বাড়ির দেবেশের সঙ্গে, ছাদে জড়াজড়ি করে চুমো খেতে। এমন কি, একেবারে নগ্ন বাণীকেও সে আবিষ্কার করেছে দেবেশদের ঘরে। দেবেশেরও তখন একই অবস্থা। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত স্নিগ্ধতা পবিত্রতার চিন্তা মুছে গিয়েছে। রাগে ঘৃণায়, গা ঘুলিয়েছে, বাণীকে অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়েছে। অন্যান্য ভাইবোনদের বিষয়ে, ও প্রায় কিছু জানেই না। শুধু রাণীটা হিংসুটে আর দজ্জাল—এইটুকুই জানা আছে। ভালো লাগে না। বাণী আর রাণী, চরিত্রের দিক থেকে এক। প্রবৃত্তি দুজনেরই এক, প্রকৃতিতে যা একটু তফাত। ওদের জীবনের কী ভবিষ্যৎ, পুরন্দর তা জানে না, ভাবতেও পারে না।

এর পরে থাকে, ওর নিজের প্রেমের কথা। প্রবৃত্তিটা ওরও কিছু ভিন্নতর নয়। তবে শরীর সম্পর্কে ও প্রথম সজাগ হয়েছিল, বাণী আর দেবেশের ঘটনায় পরেই। তখন পুরন্দরেরও মনে হয়েছিল, প্রেম করবে। কিন্তু করতে চাইলেই প্রেম হয় না, লোক যেমন বা যেরকম প্রেমের কথা বলে। তথাপি, ওর পরিচিত মেয়েদের দিকে, ও একটু অন্য দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছিল, এবং সেই প্রথম টের পেয়েছিল, ও যাকে প্রেম ভাবছিল, সে সব ইশারা ইঙ্গিত, মেয়েরা ওকে অনেক আগে থেকেই দিয়ে আসছিল। কিন্তু ওর নিজেরই সে পাঠ জানা ছিল না। মেয়েরা যে ওকে মনে মনে হাঁদা গবেট বলছে, তখন বুঝতে পেরেছিল। প্রেমের যেটা প্রথম গুণ হওয়া উচিত, চেহারা, সেটা মুন্সেফের কেরাণীর ছেলেরও ছিল। সেটা

বোধহয়, রক্তের গুণ। অতএব প্রেমিকা জুটতে দেরী হয় নি। বীথি সেই মেয়ের নাম! হাই ইস্কুলের কেরাণীর মেয়ে। অনেকটা বাণীর মতোই, নিষ্পাপ পুণ্যবতীভাবের মুখ। পুরন্দর তার দিকে নতুন চোখ নিয়ে তাকিয়েছিল, অনেক ইশারা ইঙ্গিত বীথির ভাবে ভঙ্গিতে কথায়। প্রেম গাঢ় হতে সময় লেগেছিল তিনমাস। তার-পরেই শরীরের সঙ্গে শরীরের যোগাযোগ। ব্যাপারটা এ ভাবেই চিন্তা করতে ইচ্ছা করে, বা পুরন্দর অন্যভাবে চিন্তা করতে পারে না।

ট্রেনের এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়, বাঙালী অবাঙালী নানা জাতির নানা কলরব, বহু লটবহর, এবং স্বভাবতঃই সব মিলিয়ে একটা দুর্গন্ধ, এ সব কিছুর মধ্যে, বীথির চিন্তা, এখনো ওর রক্তের মধ্যে, একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। প্রথম সন্ধ্যায়, বীথিদের বাড়িতেই, ঠিক যেমন করে, দেবেশ ওর বোন বাণীকে আদর করেছিল, তেমনি ভাবেই পুরন্দরও আদর করেছিল। 'আদর' শব্দটা এখানে কেমন করে খাটে, ও বুঝতে পারে না। 'আদর' কথাটার মধ্যে, একটা নিরীহ নির্দোষ ভাব আছে যেন। কিন্তু কথাটা ও বীথির কাছ থেকেই শিখেছিল। কোন সময়, সকলের অলক্ষ্যে, বীথির হাত বা আঁচল ধরে টানলে, বীথি নিচু গলায়, কপট রোষে, ভুরু কুঁচকে বলত, 'আহ্, ছি, এখন আদর করবে না।'

নিশ্চয় বাণীও দেবেশকে এভাবেই বলত। হয়তো সব মেয়েই এ ভাবে বলে। অন্ততঃ বাণী বীথিদের মতো মেয়েরা, কিংবা সব মেয়েই। কিন্তু আসলে, আদরের সঙ্গে, ওসবের কী সম্পর্ক। চুমো খাওয়াখাওয়ি, গায়ে হাত দেওয়া, তারসঙ্গে, একটা একমুখী মত্ত পাগলামি, একটা ইচ্ছা, একটা বিশেষ পদ্ধতিতে, সব কিছু পাওয়া বা শেষ করার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু না। এ ব্যাপারটাকে নিতান্ত আদর বলে ভাবতে ইচ্ছা করে না। এ আর-কিছু। কিন্তু, এটাও ঠিক, তখন মনটা কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। বীথিকে পাবার

জন্য, সারাদিন মনটা অস্থির হয়ে থাকত। সে অস্থিরতা কোন শিশুর ছটফটানি না। ভিতরে ভিতরে একটা অস্থিরতা। ইস্কুলে পড়াতে পড়াতে, একলা আনমনে, যখন তখনই বীথির কথা মনে পড়ে যেত। রবীন্দ্রনাথ একমাত্র তখনই ওর প্রিয় কবি হয়েছিলেন। তখন কবিতা পড়তে ভাল লাগত। শহরের চারদিকে, রেডিও রেকর্ডে যে গানগুলোকে নিতান্ত প্যানপ্যানানি অসহ্য বলে আগে মনে হত, সেই গানের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যাচ্ছিল। মনে হত, ওগুলো নিছক কথার কথা না, পেছনে কারণ রয়ে গিয়েছে। পুরন্দর বীথির মতোই, কোন মন, ওই সব গানই সুর জন্ম দিচ্ছে।

তবু মনের মধ্যে কোথায় একটা খচখচানি ছিল। পুরন্দরের মনে, বীথিকে নিয়ে একটা কল্পনা কাজ করছিল, যার মধ্যে, সৌন্দর্য পবিত্রতা, ইত্যাদি নানান্ কিছু, একটা বিচিত্র আবেশ সৃষ্টি করেছিল। প্রেম, সে তো স্বর্গীয় ব্যাপার। কিন্তু প্রেমের আচার আচরণগুলো যেন অন্যরকম, তার মধ্যে পবিত্রতা বা স্বর্গীয়, ইত্যাদির কোথায় কী মিল বা যোগাযোগ, ঠিক করতে পারছিল না।

প্রথমতঃ, বাণী দেবেশকে দেখার পরে, পুরন্দরের নিজের ভিতরের আকাঙ্ক্ষা যখন চোখ খুলে দিয়েছিল, তখন বীথির ইশারা ইঙ্গিতগুলো, ওর সুন্দর এবং মধুর লাগত। তার মধ্যে পবিত্রতা বা স্বর্গীয় কী আছে, বুঝতে পারে নি। বীথি ওকে চঞ্চল করে তুলতো, একটা নেশা ধরিয়ে দেবার মত। তারপরে যখন ও বীথিকে প্রথম বুকের কাছে জড়িয়ে ধরেছিল, চুমো খেয়েছিল, তখন পুরন্দর ওর নিজের অবস্থাটা ভেবে, কেমন যেন লজ্জিতই হয়ে উঠেছিল। তখন বুঝতে পারে নি, এখন বুঝতে পারে। অবচেতন মনে, ওর সংস্কার এবং শালীনতা বোধ, নিজের কাছে নিজেকে একটু হীন করে দিয়েছিল। নিজেকে ওর পশু বা কামুক মনে হয়েছিল, যদিও 'পশু' 'কামুক' শব্দ দুটো এত স্পষ্ট হয়ে, মনের মধ্যে জেগে ওঠে নি, নিজেকে হীন ভাবার মধ্যে, সেই চিন্তাটাই ছিল। কারণ, যে-বিষয়, সুন্দর, সে

বিষয়ের মধ্যে, শরীরের একটা উদগ্র ইচ্ছা এবং দৈহিক পরিবর্তন ঘটবে কেন। ব্যাপারটা ওর কাছে তাই লজ্জাকর ঠেকেছিল।

কিন্তু বীথি কেমন স্বাভাবিক, লজ্জায় আর খুশিতে, অথচ যেন একটা ভয় মেশানো রাগ রাগ ভাবে বলেছিল, 'এই অসভ্য, ছি?' তারপরে কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, 'আর একদিন।'

সেই মুহূর্তে তো পুরন্দরের নিজেকে মনে হয়েছিল, অন্ধ বোবা, একটা জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড মাত্র। 'আর একদিন, মানে কী, বুঝতেও পারে নি। পরে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল, যা নিয়ে ওর লজ্জা, হীনমন্যতা, সেটা বীথির কাছে, গভীর সুখ, তীব্র আকাঙ্খার বিষয়। বীথি ওর কাছে, সব খুলে দিয়েছিল, সমস্ত লজ্জা, আজীবন যে কৌতূহল, এক বিশেষ গোপনীয়তা ও সংস্কারে আড়াল করা ছিল, সমস্তই একে একে পুরন্দরের কাছে আবিষ্কৃত হয়েছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, বীথি প্রথম দিকে, নানারকমের বাধ-আপত্তির কথা তুলেছে। পুরন্দরও স্বাভাবিকভাবেই, নিতান্ত পুরুষের, বিশেষ একুশ বছরের রক্তের দাবীতে, সে সব বাধা আপত্তি কাটাতে চেয়েছে। যতটা কথা বা যুক্তি দিয়ে না, ততটাই শরীর এবং আবেগ দিয়ে এবং এ বিষয়ে কথা ও যুক্তির থেকে, আবেগটাই বেশী গ্রাহ্য বলে পুরন্দরের এখন মনে হয়।

কিন্তু সব কিছুর পিছনেই, তার একটা কার্যকারণের পটভূমি থাকে। ঝড়ের বাতাস না থাকলে, গাছের মাথা ঝাপটা খেয়ে উথালি-পারালি করে না। নিতান্ত একটা প্রাকৃতিক বিপদের বাধা-ই বীথির সমস্ত আপত্তির কারণ ছিল। সে সময়েই, কবিতা, গান, দীর্ঘ-শ্বাসের সময় গিয়েছিল। বীথি আমার বীথি। আমার জীবন মরণের বীথি। বীথি আমার ভবিষ্যতের সংসাররূপিণী।

তারপরে বীথি সব বাধাই কাটিয়ে উঠেছিল। বীথি বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেছিল। বিজ্ঞানের শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই পাড়ার বৌদি এবং বিবাহিতা দিদিরা। তখন নিরাবরণ, অবারিত জীবন। বীথিদের

বাড়ির একটা সুবিধা ছিল। ওদের বাড়ির পাশে একটা পোড়ো জমি ঘেঁষে বছর পাঁচেক আগে একজন বাড়ি তৈরী শুরু করেছিল। দরজার লিণ্টেল অবধি উঠে, তা আর শেষ হয় নি। সেটা একটা পোড়ো বাড়ির আকার নিয়েছিল প্রায়। সন্ধ্যার সময়, তুলসীতলায় আলো দেখিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে, সেখানে ঢুকে পড়তে ওর কোন অসুবিধা ছিল না।

চলন্ত ট্রেন। দূরের মাঠে পুরন্দরের চোখ, কিন্তু চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একেবারে আদিম দুই নরনারীর ছবি। প্রথম যেদিন বীথি ওর সামনে, সমস্ত জামা কাপড় খুলে দাঁড়িয়েছিল, সেই দিন, সেই মুহূর্তে, দেবেশ আর বাণীর সেই নগ্ন মূর্তি দুটো ভেসে উঠেছিল। এক মুহূর্তের জন্য, একটা বিরাগ, একটা ঘৃণা, একটা গ্লানির ভাব ওর মনে জেগে উঠেছিল। হঠাৎ মনে হয়েছিল, বাণীই যেন ওর সামনে একেবারে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখন প্রথম, দেবেশদের ঘরে বাণীকে, পুরন্দর একেবারে নগ্ন দেখেছিল, তখন ও নিজেই এমন চমকে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, ব্যাপারটা যেন ঠিক বুঝতেই পারে নি, দুপুরের দরজা জানালা বন্ধ অবস্থায় ঘরে কী ঘটছিল। দেবেশ পুরন্দরের বন্ধু। দুপুরের নির্জনে, তখন লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার জায়গা ছিল, দেবেশদের একমাত্র দোতলা ঘরটাই। দেবেশ তখন উনিশ, বাণী সতেরো। দেবেশ পুরন্দর সমবয়সী। দেবেশদের বাড়িতে লোক কম। দুপুরবেলা ওর মা ছাড়া, আর কেউ থাকত না। বাণী যে কী করে, দেবেশের মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে ওপরের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, কে জানে। কতদিন ধরে ঢুকছিল, তাই বা কে জানত। নিশ্চয়ই পুরন্দরের সম্পর্কেও বাণীকে সাবধান থাকতে হত। এখন মনে নেই, হয় তো দেবেশই বন্ধুকে আসবার বিশেষ সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল, যাতে, বাণীর সঙ্গে কখনো মুখোমুখি দেখা না হয়ে যায়। হয়তো সেই নির্দিষ্ট সময়ের কোন গোলমালের জন্যই একদিন অঘটন ঘটে গিয়েছিল।

কিন্তু ভাবলে এখনো অবাক লাগে, ওদের কি দরজা বন্ধ করার কথাও মনে ছিল না। এত সাহস কোথা থেকে পেয়েছিল ওরা, অথবা সেটা শুধুমাত্র নির্লজ্জতা। কিংবা দুজনের প্রেমের মত্ততায়, কিছু মনে ছিল না, খেয়ালই ছিল না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই প্রথমে দুটো উলঙ্গ অস্পষ্ট ছায়া দেখেছিল পুরন্দর। পরমুহূর্তে বাণীকে দেখে চমকে উঠেছিল। রাগ বা ঘৃণা, সে সব কিছুই তখন হয় নি। কিন্তু এই অবস্থায় যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, এ কথা ওর চকিতে মনে হয়েছিল, আর বাণী আচমকা একটা ভয়ের শব্দ করে, ঘরের কোণে ছুটে যাবার আগেই, পুরন্দর দরজার বাইরে চলে এসেছিল।

সেদিন সন্ধ্যার আগে ও বাড়ি ফেরে নি। বাণী ওর বোন, অমন নিষ্পাপ নিরীহ মুখ, যাকে পুরন্দরের খুবই ভাল লাগত, ভাবতেই পারছিল না, তাকে ও ওভাবে দেখে এসেছে। বাণী, বাণী আমার সেই বোন। প্রথমেই একটা ভীষণ রাগ আর ঘৃণা জ্বলে উঠেছিল মনের মধ্যে, দেবেশকে শাস্তি দিতে হবে। মেরে ওর হাড় গুঁড়িয়ে দিতে হবে। বাড়ি গিয়ে বাবা মাকে সমস্ত কথা বলে দিতে হবে। মা কি করবে, না বুঝতে পারলেও বাবা যে বাণীর চুলের মুঠি ধরে, উঠোনে আছড়ে ফেলবে, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

পরমুহূর্তেই আবার কেমন, ঝিমিয়ে পড়েছিল পুরন্দর। শাস্তি দেবার পরিবর্তে, মনে মনে কেমন অসহায় লাগছিল নিজেকে। দেবেশকে মার বা বাণীকে পেটানো, কোন ব্যাপারটাই ঠিক মনঃপূত হচ্ছিল না। ব্যাপারটা যেন ঠিক মারপিটের বিষয় বলে তার মনে হচ্ছিল না। এ একটা অন্যরকম ব্যাপার, মারপিট করাটা যেন কীরকম বিশ্রী জঘন্য ভাবের লাগছিল। ওদের একলা ঘরে ল্যাংটো হয়ে জড়াজড়ি করার থেকেও যেন বিশ্রী। প্রথমতঃ দেবেশকে মারধোর করার কথাটা তেমন করে ভাবতে পারছিল না। আর বাণীর বিষয়ে, বাবা মাকে বলে দেওয়াটাও, মনের মধ্যে সায় পাওয়া

যাচ্ছিল না। শত হলেও বাণী তো দু'বছরের ছোট বটে, কিন্তু ওরা দুজনে প্রায় বন্ধুর মতো। একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিতে, কোথায় যেন আটকাচ্ছিল। অথচ এ বিষয়ে, দেবেশ বা বাণীর সঙ্গে যে কোনরকম কথাবার্তা বলবে, তাতেও উৎসাহ পাচ্ছিল না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেবেও কিছু স্থির করতে না পেরে, পুরন্দর বাড়ি ফিরে এসেছিল। বাণী ওর কাছ থেকে কেবল লুকিয়ে বেড়িয়েছিল। কয়েকদিন ধরেই এইরকম লুকোচুরির খেলা চলছিল। পুরন্দরও দেবেশের সঙ্গে দেখা করছিল না। দেবেশেও না। কিন্তু ইতিমধ্যে, দেবেশ বাণীকে সেই অবস্থায় দেখার একটা প্রতিক্রিয়া, ওর অবচেতনে ঘটতে আরম্ভ করেছিল তা ও জানত না। তা ছাড়া, এমন ঘটনায়, বাণীর যে বিশেষ কোন বিপদ ঘটতে পারে, একটি অবিবাহিতা মেয়ের যেটা সব থেকে বড় বিপদ, সে বিষয়েও ওর মাথায় কোন চিন্তা আসে নি। ও শুধু ভাবছিল, দেবেশ বাণী যা করছিল, সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, একটা ভয়ংকর কিছু। অথচ, ওর পরিচিত অন্যান্য মেয়েদের কথা, কেবলই ওর মনে পড়ছিল। একটা গর্হিত কাজ ভেবেও, পুরন্দরের মনের মধ্যে, আর একটা দরজা খুলছিল একটু একটু করে।

প্রায় সাতদিন পরে, দেবেশেই পুরন্দরের সঙ্গে এসে কথা বলেছিল। প্রথমটা রাগ করে থাকলেও, দেবেশের কথা শুনে, পুরন্দর অবাক আর কৌতূহলিত হয়ে উঠেছিল। দেবেশ কেমন অদ্ভুত পাকা পাকা, থিয়েটারি ঢঙে, ক্ষমা চেয়েছিল, আর সে যে বাণীকে কীরকম ভালবাসে, যে ভালবাসাবাসি জীবনে কোনদিন শেষ হবে না, ভবিষ্যতে বিয়েও করবে, সব শুনে, পুরন্দর কোন কথা খুঁজে পায় নি। দেবেশ যে কবে কী করে এত পাকা হয়ে উঠেছে এত কথা বলতে শিখেছে, পুরন্দর টের পায় নি। দেবেশকে ওর বেশ বড় পাকা লোক বলে মনে হয়েছিল। দেবেশ বিয়ের কথা পর্যন্ত ভাবছিল। বাণীকেও যেন, হঠাৎ কী রকম বড় বড় মনে হয়েছিল।

মনে মনে এরকম ভাবে, পুরন্দর ওদের প্রায় মেনেই নিয়েছিল কেন, তার সঠিক কোন যুক্তি ওর জানা নেই। সম্ভবতঃ, দেবেশ ওর বন্ধু, বাণীও ওর বন্ধুর মতোই প্রায়। তা ছাড়া, পাড়ার লোক বা পরিবারের লোকদের সম্পর্কে পুরন্দরের এমন কোন শ্রদ্ধা বা নির্ভরতা ছিল না যে যেখানে সে কথা বলবে। তবু সে বলেছিল, 'কিন্তু লোকে যদি জানতে পারে ?'

দেবেশ বলেছিল, 'ও, তুই ছেলেপিলে হবার কথা বলছিস্ ?'

শোনা মাত্র পুরন্দরের শিরদাঁড়াটা কেঁপে উঠেছিল। সর্বনাশ, সে কথাটা তো তার মনেই ছিল না। ও বলে উঠেছিল, 'নিশ্চয়ই।'

দেবেশ বয়স্ক লোকের মতো হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'সে জন্যে তুই একটুও ভাবিস না। আজকাল আবার ওসব হয় নাকি। কতরকমের জিনিস বেরিয়ে গেছে।'

পুরন্দরের আর একবার মনে হয়েছিল, দেবেশ ওর থেকে অনেক বড়, অনেক বেশী জানে। অবিষ্যি, ওদের শহরটা কলকাতা থেকে, একশো দেড়শো মাইল দূরে হলেও, সরকারি আর বেসরকারি সংস্থার, নানা ধরনের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। খবরের কাগজেও বেরোয়। কিন্তু, পুরন্দর কোনদিনই, ওসব বিজ্ঞাপনের ওপর নজর দেয় নি। তার নিজের ব্যাপারে, তাকে একটুও ভাবায় নি। বরং কোন কোন সময়, বাবার কথা তার মনে হয়েছে, বাবা কি এসব বিজ্ঞাপন-গুলো কোনদিন চোখে দেখে নি। তবুও দেবেশকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই সব জানিস ?'

'নিশ্চয়ই।' দেবেশ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল। বলাটাই স্বাভাবিক, বাণীকে নিয়ে কোন বিপদেই পড়তে হয় নি। তবুও, বাণী-দেবেশকে নিয়ে, মনের মধ্যে একটা খচখচানি পুরন্দরের ছিলই। অথচ খচখচানি যতই থাক, ওর ভিতরে ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া ঘটতে আরম্ভ করেছিল। যা ছিল ওর মধ্যে সুপ্ত, তাকেই জাগিয়ে দিয়েছিল, দেবেশ-বাণী! বীথির কাছে ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রথম দিকে, যত বাধাই থাক, পরে আর, বীথির সঙ্গে, অবারিত প্রেমে কোন বাধাই ছিল না।

এখন ভাবলে কেমন অবাক লাগে। যে বিষয় ছিল পুরন্দরের কাছে অত্যন্ত দুরূহ, ভয়ংকর ভয়ের, তা-ই যেন অতি অনায়াস হয়ে উঠেছিল। বীথির ভয় সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারটা যত সহজ, অনায়াস, অনিবার্য হয়ে উঠেছিল যে, মনের মধ্যে প্রথম প্রেমের যে আবেগ, কবিতা গুনগুনিয়ে ওঠা গান, ও যেন আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে যাচ্ছিল। ইংরেজীতে যাকে বলে ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, ব্যাপারটা সেইরকম হয়ে উঠেছিল।

আসলে, পুরন্দরের বয়স কম ছিল। একজন পরিপূর্ণ যুবকের, একটি যুবতীর সঙ্গে মিলনের যে নানা মানসিক ভাবনা বা উদ্বেগ, যা অনেক সময়েই জটিলতার সৃষ্টি করে, ওর মধ্যে তার কিছুই ছিল না—একুশ বছরে অবুঝ অবাধ বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা দেবেশ জানতে পেরেছিল, অতএব বাণীও। তবু, বাণী দেবেশের ব্যাপারে, পুরন্দর কখনো সহজ হতে পারে নি। এটাই বোধ হয়, পুরন্দরের সমাজ পরিবার ও শ্রেণীর মন।

কিন্তু বীথির সঙ্গে, সেই প্রেম দেহের লীলা বেশীদিন চলে নি। বছর খানেক পরেই বীথির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বীথি যে মুখভার করে নি, তা নয়। তথাপি এখন ভাবলে তো, পুরন্দরের হাসি পায়, ওর ঠোঁটের কোণ বেঁকে একটা বিদ্বেষ আর ঘৃণা যেন, ওর বুকের মধ্যে, তুষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। অবিশ্যি এ কথা ঠিক ওর বাইশ বছর বয়সে কোন সাহসই ছিল না। বীথিকে ও মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে নি। কিন্তু বীথি কাঁদলেও, শেষ পর্যন্ত ও বিয়েটাকে অত্যন্ত সহজভাবেই নিয়েছিল।

পুরন্দর জানে, বীথির না মেনে নিয়েই বা কী উপায় ছিল। তবু, পুরন্দরও যে বিদ্রোহ করতে পারে, সমাজ পরিবারকে চমকে দিয়ে একটা কিছু করতে পারে, সেকথা বীথি একবারও ভাবে নি। সে

শুধু কেঁদেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে এবং সব থেকে আশ্চর্য, বীথি বার বার অনুরোধ করেছে, বিয়ের পরে যেন, ওকে পুরন্দর একেবারে ভুলে না যায়। বীথি চায়, পুরন্দর চিরদিনই ওর থাকবে।

সেটা কী করে সম্ভব, পুরন্দর বুঝত না। ও যখন দেখত, বীথি আসন্ন বিয়ের কেনাকাটা দেখে উৎফুল্ল, তখন ওর ভিতরে একটা তীব্র ঈর্ষা জেগে উঠত। ঈর্ষা থেকে ক্রমে হতাশা, হতাশা থেকে আস্তে আস্তে বিদ্রূপ। ওর ঠোঁটের কোণে, চিরদিনের জন্যই যেন একটা বাঁকা হাসি আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

তারপরে বীথি অনেকবার সগৌরবে পিত্রালয়ে যাতায়াত করেছে, ওর স্বামীর সঙ্গে পুরন্দরের আলাপ করিয়ে দিয়েছে, এবং পুরনো দিনের দু'জনের মেলামেশার অনেক ইঙ্গিত ও সংকেত করেছে। পুরন্দর তা পারে নি। না পারার কারণ কোন নৈতিক চিন্তা নয়। নিতান্তই বিদ্বেষ আর ঈর্ষা।

গাড়ি শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে গেল। উত্তরপাড়া, হিন্দমোটর, একে একে ছাড়িয়ে চলেছে, না দাঁড়িয়ে। ক্রমে শহরের উপকণ্ঠের ঘিঞ্জি বাড়িঘর, কলকারখানা, ঠাস বুনোটে দেখা দিচ্ছে। কলকাতা সামনে। কলকাতা অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা, আবার অনেক দিনের, অচেনার ভয়, ভিতর থেকে একটা বিরাগ এবং অনীহাও বটে। কলকাতাকে যে ও মনে মনে কোনদিন ভালবেসেছে, তা নয়। কিন্তু ভালো না বেসেও, যার কাছ থেকে, সব পাওয়া যায়, কলকাতা সেই উচ্চাশার শহর। কলকাতাকে ভালবাসতে হয় না, উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য, যেখানে দাঁতে নখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আঁচড়ে কামড়ে দেওয়া যায়, সেই শহর কলকাতা। তারপরে, কে জানে, কি আছে পুরন্দরের ভাগ্যে। কলকাতা তার কপালে কি লিখে রেখেছে।

কিন্তু কলকাতা যা-ই লিখে রাখুক, পিছনে ফিরে তাকাবার কিছু নেই। সমাজ, পরিবার, বাবা মা ভাই বোন, এবং প্রেম ও বীথি,

কোন কিছুই তার ফিরে চাইবার, ফিরে দেখবার নয়। বরং, সেসব পিছনে ফেলে, যত দূরে যাওয়া যায়, অন্য এক জীবনে তা-ই ও চায়।

পকেট থেকে, পুরনো, ডাকঘরের ছাপ মারা খামটা বের করল। তার ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে, বিশেষ একটা জায়গায়, পুরন্দর আবার চোখ বোলাল, কলকাতায় চাকরি বাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। এ শহরে যত বেকার আছে সমস্ত বাংলাদেশে বোধহয় তা নেই। তবু শ্রীমানকে পাঠিয়ে দিন। আমাদের কোম্পানির ডিরেক্টরকে আমি বলেছি, মোটামুটি একটা আশা দিয়েছেন। তবে মনে রাখবেন, ভাল চাকরি কিছুই হবে না। মোটামুটি চলে যাওয়া গোছের। হয়তো, এমনও হতে পারে, শ্রীমানকে, (এমন করে 'শ্রীমান' লেখা দেখলেই, হাসিতে পুরন্দরের ঠোঁট বেঁকে যায়। কারখানায় গিয়ে, মেকানিকের কাজ শিখতে হবে। আর শ্রীমান যদি সেরকম চালাক চতুর হয়, মনে মনে বিশেষ অধ্যবসায় থাকে, ভবিষ্যতে হয়তো উন্নতি করতে পারবে।'…

পুরন্দর নিজের মনে উচ্চারণ করল, চালাক, চতুর, বিশেষ অধ্যবসায়। ব্যাপারগুলো কি, এ যেন ঠিক ভালো বুঝতে পারে না। কি ধরনের চালাকি চাতুর্য দরকার, কিসের অধ্যবসায়, কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। কিন্তু কথাগুলো, ওর মনের মধ্যে যেন গাঁথা হয়ে থাকে।

পত্রলেখক ভদ্রলোক একজন ইঞ্জিনীয়র। বয়স হয়েছে মন্দ না, সরকারি চাকরি হলে এত দিনে ওঁকে অবসর নিতে হত। প্রাইভেট ফার্ম এবং পুরনো লোক বলেই, এখনো রয়েছে। মালিকদের সঙ্গে, সম্পর্কটাও খারাপ নয়, ওঁর খাতির আছে। কি ধরনের ফার্ম, পুরন্দর সঠিক কিছুই জানে না। তবে শুনেছে একটা মেকানিক্যাল ফ্যাক্টরি আছে। ফ্যাক্টরি বেশ বড়। বিদেশী কোন কোন কোম্পানির সঙ্গেও, কম্বাইন ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস আছে। এজেন্সীও আছে। সব মিলিয়ে, একেবারে ছোটখাটো কিছু নয়।

পত্রলেখক ভদ্রলোকের নাম মণীন্দ্র ঘোষ। তাঁর আদি বাড়ি, পুরন্দরদের শহরেই। বাবার যৌবনের পরিচিত বলা যায়। কেন যেন বাবার মনে হয়েছিল, মণীন্দ্র ঘোষকে অনুরোধ করলে, পুরন্দরে একটা কিছু হিল্লে হতে পারে। অবিশ্যি, তার অনেক আগেই, পুরন্দর কলকাতায় চলে আসবে, এ কথা বাড়িতে জানিয়েছিল। কিন্তু, একেবারে আত্মীয় স্বজনহীন কলকাতায় কোথায়, কার কাছে ও উঠবে সেটাই চিন্তার বিষয় ছিল। শেষ পর্যন্ত যে বাবার প্রতি ওর কোন ভরসা ছিল না, সে ই বাবা ই, মণীন্দ্র ঘোষের ঠিকানা জোগাড় করে, একটা যোগাযোগ করেছিল। পুরন্দর এখন, মণীন্দ্র ঘোষের বাড়িতেই উঠবে।

সেটাও পুরন্দরের মনে এক উৎকণ্ঠা। একেবারে অপরিচিত। বাড়িতে কারা কারা আছে, এবং কলকাতায় রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে সে বাড়ি খুঁজে ও ঠিক যেতে পারবে কি না, ওসর অনেক ভাবনা। ভদ্রলোকের বাড়িটা যদি বেশ ফাঁকা হয়, বাঁচা যায়।

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি যখন ঢুকল, তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। পুরন্দর ওর ক্যামবিসের বড় ব্যাগ নিয়ে স্টেশনের বাইরে এল। জিজ্ঞাসাবাদ না করে. ওর পক্ষে, এক পাও চলা সম্ভব হল না। কিন্তু, এত লোকের মাঝখানে, প্রথমেই মনে হল, শহরটা এত বিলাশ, এত লোক, এক সঙ্গে চলেছে, কথা বলছে, ছুটছে, কিন্তু সকলেই যেন বিচ্ছিন্ন। কারো জন্যই কারো কিছু যাচ্ছে আসছে না, অথচ সকলেই একই রাস্তায় হাঁটছে, ট্রামে বাসে উঠছে। কেমন যেন উদাসীন এবং নিষ্ঠুর।

এই মুহূর্তে, ওর একবার ওদের ছোট শহরটার কথা মনে পড়ে গেল। শহরের পরে নদী, নদীর ধারে সরকারি বাংলো, কোর্ট, কয়েকটা ছোটখাটো অফিস, ইস্কুল, কলেজ, কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি। সেখানেও লোকজন কম নেই। কিন্তু কলকাতার মতো নয়। বাস

যত এগিয়ে চলে, চারপাশে ও তাকিয়ে দেখতে থাকে? বড় বড় রাস্তা, বাড়ি, গাড়ি, অনেক লোক, কিন্তু পুরন্দর যেন মনে মনে খুশি হতে পারছে না। কোন আশা ওর মনে দানা বেঁধে উঠছে না। বরং একটা হতাশাই যেন ক্রমে চেপে আসছে। এই বিশালতার মধ্যে, ও কতটুকু। এত হাজার হাজার মানুষ, সকলেই নিশ্চয় পুরন্দরের মতই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলেছে। হয়তো অনেকের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে, অনেকের হয় নি। কিন্তু সত্যি কি কারোর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। একমাত্র ওর বয়সের ছেলেদের এবং নানা ধরনের মুটে মুজুরদের, এবং সিনেমায় বড় পোস্টারে ছাড়া কোথাও তো যেন হাসির চিহ্নও নেই। সত্যি কি এখানে টাকা উড়ে বেড়ায়। যে ধরতে পারে, সে মুঠো করে ধরে? হাস্যকর তবু, এই বিশাল কলকাতার এত সম্পদ, মানুষ নিশ্চয় টাকা দিয়েই তৈরি করেছে। উড়ে হয়তো বেড়ায় না, রাস্তার সন্ধান জানলে, যে, রাস্তায় গেলে, টাকা তৈরি করা যায়, সেই রাস্তা পেলে, সিদ্ধিলাভ হয়। কে জানে, সে রাস্তা কোথায়, কেমন করে খুঁজে বের করতে হয়, সে রাস্তা গতিবিধি এবং ভাষা কী।

বাসের কণ্ডাক্টরের চিৎকার থেকেই সে জানতে পারছিল, বিবেকানন্দ রোড, সার্কুলার রোড, পার্কসার্কাস, ল্যান্সডাউন ইত্যাদি নাম। ল্যান্সডাউনের শেষ স্টপেজে এসে, ও শুনল রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর নাম। গাড়ি থেকে নেমে শহরের এ তল্লাটটা ওর একটু অন্যরকম লাগল। প্রতি পায়ে পায়ে, ঠিকানা জিজ্ঞেস করে, রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়াল। এক হাতে ক্যামবিসের ব্যাগ, অন্য হাতে, মণীন্দ্রবাবুর বাড়ির ঠিকানা। একজন বলল, বাড়ির নম্বরটা গলির মধ্যে। যদিও এ গলি পুরন্দরদের শহরের গলির মতো নয়, মোটর যাতায়াত করতে পারে।

কয়েক পা গিয়ে, একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান সামনে, বেঞ্চিতে দেখতে পেল, ওরই বয়সী কয়েকটি ছেলে বসে আছে।

ও ঠিকানাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন্ বাড়িটা, বলতে পারেন?'

সকলেই ঝুঁকে পড়ে ঠিকানাটা দেখল। একজন বলে উঠল 'সতু' তোর সোফিয়া লরেনের ঠিকানা রে।'

বোধহয়, সতু যার নাম, সে-ই জবাব দিল, 'শালা, তুই তো ওকে অ্যানিটা একবার্গ নাম দিয়েছিস।'

আর একজন বলে উঠল, 'আরে এ ভদ্রলোককে ছেড়ে দে না। যান দাদা, আপনি যান, ওই যে হলদে রঙের বাড়িটা দেখছেন, ড্যান দিকে মোটরের গ্যারেজ রয়েছে, ওটাই মণীন্দ্র ঘোষের বাড়ি। গায়ে নম্বর লেখা আছে দেখবেন।'

পুরন্দরের প্রায় ভয়ই করছিল ছেলেগুলোকে। এদের দেখলেই, কেমন যেন এক ধরনের ক্ষুধার্ত বাঘ বলে মনে হয়। কী ভাবে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু যে দুটো নাম ওরা বলল তার মধ্যে একটা নাম ওর জানা আছে, 'সোফিয়া লরেন।' ওদের শহরে, সোফিয়া লরেনকে সিনেমায় দেখেছে। অ্যানিটা একবার্গ ওর জানা নেই মণীন্দ্র ঘোষের ঠিকানার সঙ্গে, এ নাম দুটোর যোগাযোগ কী আছে? এ ধরনের মেয়ে আছে না কি ও বাড়িতে?

পুরন্দর বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। সামনে গেট, বারান্দার সিঁড়ির সঙ্গে লাগানো। পাশে মোটর গ্যারেজ, কোলোপসিবল গেট, ভিতরে গাড়ি নেই, সব দরজাই বন্ধ। ও কি করবে, প্রথমটা ঠিক করতে পারল না। বারান্দার সিঁড়ির সামনে যে গেট, সেটা ঠেললেই খোলা যায়। বারান্দায় উঠে ঘরের দরজা, সেটাও বন্ধ। পুরন্দর গেট ঠেলে, সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠল। ঘরের বন্ধ দরজায়, কড়া ধরে নাড়তে যাবার সময়েই চোখে পড়ল, কলিং বেলের বোতাম। ও বোতাম টিপে, একটা অশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই, দরজা খুলে গেল, সামনে দাঁড়াল একটি মেয়ে-ফ্রক পরা, খোলা

চুল, শরীরটা অসম্ভব স্ফীত। একটু যেন হাঁপাচ্ছে মেয়েটি, এবং কোন কারণে উত্তেজিত মনে হল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'মণীন্দ্র ঘোষ এ—।'

পুরন্দরের কথা শেষ হবার আগেই, মেয়েটি বলে উঠল, 'ওই' গ্যারেজের পাশ দিয়ে যান।' বলেই দরজাটা বন্ধ করে দিল। পুরন্দর অবাক হল, প্রায় থতমত খেয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু বারান্দা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এল। একবার পিছন ফিরে দেখে, গ্যারেজের পাশে গেল। দেখল, চওড়া একটা বাঁধান চত্বর। সেখানে ঢুকে বাঁ দিকে দেখল বন্ধ দরজা, দরজার পাশে তালাবন্ধ চিঠির বাক্স। বাক্সের গায়ে লেখা এম. এম. ঘোষ। নিশ্চিত হওয়া গেল। দরজার চৌকাঠে কলিং বেল টিপল। একটু পরে দরজা খুলল। দরজায় যে-মেয়েটি—এরকম মেয়ের সঙ্গে, পুরন্দর কোনদিন কথা বলে নি একমাত্র ছবিতেই দেখেছে।

মেয়েটির হালকা ফোলানো চুল ঘাড় অবধি। চুলের একটি গোছা প্রায় তার মুখের একটা পাশ এবং একটি চোখ ঢেকে ফেলেছে। কয়েকটি চুল তার রাঙানো ঠোঁটের ওপর। মুখে কস্‌মেটিকের পাতলা প্রলেপ। গোলাপী মোলায়েম কাপড়ের ছোট্ট জামা, কাঁধ অনেকখানি কাটা, পেটের সবটাই খোলা মসৃণ। প্রায় সাদা অথচ সাদা নয়, একটু যেন নীলের ভাব আছে, এমন একটি পাড়বিহীন শাড়ি আঁচল বুকের এক পাশ ছুঁয়ে, বাকীটা ছোট জামা। এক হাতে একটা মোটা বালা, কিন্তু সেটা সোনা নয়, রূপো নয়, কি বস্তুর ও বুঝতে পারল না। বালাটাও প্রায় নীলচে রঙের শাড়ির মতো। আর একহাতে বড় ঘড়ি, সচরাচর মেয়েদের হাতে যেমন দেখা যায় না।

বিব্রত অস্বস্তির মধ্যেই পুরন্দর লহমায় দেখে নিল, মেয়েটির চোখ মুখ খুব ভালই, শরীরের রঙ দেখে বোঝা যায় ফর্সাই। তবে মুখের ভাবটা কেমন যেন রুক্ষ। চাউনিটা এত সোজা কেমন যেন উদ্ধত মনে হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যের বাঁধুনি বেশ সুন্দর। যদিও

সবকিছুতেই একটু যেন রুক্ষতার ছাপ। বয়স—বয়স কত? পুরন্দর আন্দাজ করতে পারল না। কেননা এরকম চেহারার ও বেশভূষার মেয়েদের বয়স ও বুঝতে পারে না। কেননা বীথিদের মতো মেয়ে হলে পারত।

মেয়েটি পুরন্দরের আপাদমস্তক দেখল, কী ভাবল, কিছু বোঝা গেল না।

কেবল প্রশ্নের সুরে একটা শব্দ করল, 'হম্‌ম্‌'।

পুরন্দর জিজ্ঞেস করল 'এটা কি মণীন্দ্র ঘোষের—।'

কথার আগেই জবাব হ্যাঁ। আপনি—আপনার আজ আসবার কথা, আপনি পুরন্দর?'

পুরন্দর হঠাৎ যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। বলল, 'আজ্ঞে।'

মেয়েটির রঙ ঝলকানো ঠোঁটের কোণ একটু যেন কেঁপে গেল, চোখেও যেন একটু ঝিলিক দিল। পাশ ফিরে একটু সরে গিয়ে ডাকল, 'আসুন।'

পুরন্দরের মনে হল, মেয়েটির গলায় স্বর যেন, উঁচু পর্দায় বাঁধা, তাদের ঝংকারের মতো। মেয়েটি সরে দাঁড়াতে, ও দেখতে পেল, সামনে কোন ঘর নেই, সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ওপরের দিকে। ও ভিতরে ঢুকে, মেয়েটির আগেই ওপরে উঠবে কী না ভাববার মুহূর্তেই, মেয়েই বলে উঠল, 'চলুন।'

পুরন্দর সিঁড়িতে পা দিল। মেয়েটি দরজা বন্ধ করে, ওর পাশ ঘেঁষে, ওকে টপকে গিয়ে, ওপরে উঠতে লাগল। মেয়েটির পিছনে পিছনে ওপরে উঠে, তাকেই অনুসরণ করে, একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। মেয়েটি ভিতর থেকে ডাকল, 'আসুন।'

পুরন্দর ঘরে ঢুকল। বড় ঘর, দেখে মনে হল, বসবার ঘর। কিন্তু আসবাবপত্র সবই যেন একটু পুরনো পুরনো, যদিও সবই ঝাড়া মোছা। মেঝেতে রঙ উঠে যাওয়া জুট কার্পেট।

বড় বড় ভারী চেয়ার, গদীও লাগানো তাতে, কিন্তু বিবর্ণ।

জানালার কাচ কোথাও ফাটা, দু' একটা ভাঙা সরানো হয় নি, বরং আঠা দিয়ে কাগজ লাগানো। এক পাশে একটা লম্বা সোফা রয়েছে। দুটো আলমারি, তাতে অনেক বই। সব কিছুতেই, সেই পুরানো ছাপটা আছেই। তবে পুরন্দরের কাছে এটাই অনেকখানি আভিজাত্য সম্ভবতঃ, সব মিলিয়ে মেয়েটির যেমন ঝলক, তাতে ও ভেবেছিল, সবই হয়তো ঝকঝকে সাহিবি কেতায় সাজানো।

মেয়ে বলল, 'ব্যাগটা এক পাশে রেখে আপনি বসুন।'

বলে দরজা দিয়ে বাইরে চলে যেতে গিয়ে, আবার ফিরে দাঁড়াল, বলল, 'আমার নাম রীণা। আপনি আসবেন বাবা বলেছিলেন। বিকেলে বাবার সঙ্গে দেখা হবে।'

পুরন্দর কী বলবে, ভেবে পেল না। ছ' ফুট লম্বা, এক মাথা রুক্ষু চুল এবং রাতজাগা চোখমুখ নিয়েও একটি বিশেষ আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল। রীণা মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

তারপরেও কয়েক মুহূর্ত যেন পুরন্দরের সমস্ত স্নায়ু টান টান হয়ে রইল। আস্তে আস্তে স্নায়ু শিথিল হল, সহজ হল। প্রথমেই মনে পড়ল মেয়েটির নাম রীণা! মণীন্দ্রবাবুর মেয়ে, তিনি পুরন্দরের আসার কথা বলে গিয়েছেন, এবং হঠাৎ-ই যেন ওর মনে হল, অভ্যর্থনাটা খুবই ভালো, এতটা ও আশাই করে নি। কে জানে, এ বাড়িতে আর কে কে আছে। মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী আছেন কি না, আরো কত ছেলেমেয়ে। কিছুই ওর জানা নেই। রীণার মতো ঝকঝকে আধুনিক মেয়ে একজন মফঃস্বলের চাকরিপ্রার্থীর সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছে। বাকীটাও যদি এরকম হয়, তা হলেই রক্ষে। অবিশ্যি না হলেও কিছু করার নেই। পুরন্দর কলকাতায় এসেছে লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। দরকার হলে ও বাসন মাজা, কাপড় কাচা থেকে শুরু করতে রাজী আছে। কিন্তু সিদ্ধি চাই, ওকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্তের অভাব-অপমানের গ্লানি থেকে ওকে নিষ্কৃতি পেতে হবে।

ব্যাগটা দেওয়ালের একপাশে রেখে, ও খোলা জানালার দিকে এগোতে গেল। তখনই লক্ষ্য পড়ল, ঘরের এক ধারে আর একটি দরজা। দরজাটা বন্ধ নয়, সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে, ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। ও থমকে দাঁড়িয়ে একটু ভাবল। দরজাটা কি ভিতর বাড়িতে যাবার? কোন সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না। ও আস্তে আস্তে দরজাটার কাছে গেল। ভিতরটা একটু অন্ধকার মতো, কিন্তু ছোট ঘর বলে মনে হচ্ছে। একবার বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে ও আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেলল। বাথরুম। কল বালতি। পুরনো কমোড, সবই আছে। একপাশে একটা বেসিন। বেসিনের ওপরেই দেওয়ালে টাঙানো আয়না। তবে সবই পুরনো পুরনো একটু দাগ লাগা। তা হোক, পুরন্দরের মনটা খুশি হয়ে উঠল। প্রথমেই দরজাটা বন্ধ করে, ও একটা প্রাকৃতিক কাজ সেরে নিল। ফ্ল্যাশ টেনে দেখল, জল আছে। তারপরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নাটা ওর পক্ষে একটু নিচুতেই টাঙানো। মাথা নিচু করে মুখটা দেখল। রুক্ষ চুলে একবার হাত দিল। ইতিমধ্যেই মুখে দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে, অথচ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেই তো কামিয়েছে। সবাই বলে ওর মুখটা না কি, ওর মায়ের মতো। কে জানে মায়ের মতো কী না, তবে নিজের চেহারাটা নেহাৎ মন্দ লাগে না। সকলেরই বোধহয় তা লাগে। কিন্তু নিজের বড় বড় চোখগুলো ওর মোটেই ভালো লাগে না। এতেই মনে হয় ওর মুখটা বোধহয় সত্যি ওর মায়ের মতো। ভাগ্যিস চরিত্রটা মায়ের মতো হয় নি। এতটা লম্বা ও কেমন করে হল। বাবা-মা সকলেই তো ওর থেকে অনেক খাটো। তবে মায়ের কাছে শুনেছে মামারা সবাই না কি ওর মতন লম্বা।

এ সময়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে শব্দ হতেই পুরন্দর তার নতুন অচেনা জগতে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যে এল। দেখল একজন এক কাপ চা এনে টেবিলের ওপর রাখছে।

মাঝবয়সী লোকটিকে চাকর বলেই মনে হয়, চা রেখে লোকটি বলল, 'চা। আপনি যদি চান করেন, এই বাথরুমেই চান করবেন। মা এসে পরে দেখা করবেন।'

বলে লোকটি চলে গেল। সবই নতুন লাগছে। মা-টি কে, কে জানে। নিশ্চয়ই রীণা নয়, বোধহয় রীণার মা। পুরন্দরের মনে হল, এখন একলা থাকতে পারলেই ভাল হয়। এ ঘরটার আড়ালে, আর একটা জগত রয়েছে, এটা ও অনুমান করতে পারছে। এই জগতের সে একজনকে দেখেছে, রীণা। এমনিতেই যাই হোক, পুরন্দরের জগতের মেয়ে সে নয়। তবে এখন পর্যন্ত যা আছে সেরকম থাকলেই ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

পুরন্দর চা খেয়ে, ব্যাগ খুলে তার দাড়ি কামাবার সেফটি-রেজার বের করল। এত পুরনো আর মরচে ধরা ব্রাশটা এমন ক্ষয়ে গিয়েছে, অপরিচিত লোকের সামনে বের করা মুশকিল। এ বাড়িতে যেখানে রীণার মতো মেয়ে আছে, সেখানে তো অসম্ভব। সস্তার সাবানটাও অনেকখানি ক্ষয়ে গিয়েছে। ঘরের দরজাটা বন্ধ করা উচিত হবে কি না, একবার ভাবল্। ভরসা পেল না। যদি কেউ কিছু বলে। পুরন্দর তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। দাড়ি কামিয়ে, স্নানটাও সেরে নিল। কিন্তু মুশকিল হল—কি পরবে। বাড়িতে যে ডোরাকাটা পায়জামাটা বা লুঙ্গি ও পরে থাকে, সেগুলো এখানে পরে থাকতে লজ্জা করল। অগত্যা একটা ধোয়া ধুতি আর জামা-ই ওকে পরতে হল সস্তা দামের সিগারেট বের করে খেল। পাছে কেউ এসে পড়ে তাই ভয়ে ভয়েই খেল। বেলা একটা পর্যন্ত ওকে কেউ ডাকল না। এ ঘরেও কেউ এল না। ইতিমধ্যে দোতলারই কোন ঘরে টেলিফোন বাজতে শুনেছে। বড় সোফাটায় শুয়ে প্রায় ওর ঘুম এসে গিয়েছিল। সেই সময়েই আগের দেখা চাকরটাই এসে ডাকল, 'খেতে আসুন।'

এবার ভিতরের ডাক। পুরন্দর যেন একটু আড়ষ্টতা অনুভব করল। ভিতরটা কেমন, কে জানে! চাকরের সামনে অনেকটা আপ্যায়িতের ভঙ্গি করে, তার পিছনে পিছনে গেল। আত্মীয়-স্বজন কেউ নয়, নিতান্ত, ওদের শহরের আদি বাসিন্দা মণীন্দ্র ঘোষ বাবার পরিচিত। সেই সূবাদে চাকরি প্রাপ্তির জন্য আসা। নিতান্ত একটা দয়া, পুরন্দরের প্রতি অনুগ্রহ। একরকমের ঘাড়ের বোঝা ছাড়া পুরন্দর নিজেকে কিছুই ভাবতে পারছে না। শুধু চাকরি নয়, তাদের কাছেই খেতে হবে যতদিন পর্যন্ত না একটা ব্যবস্থা হয়।

কিন্তু এসব কথা আর ভাববার সময় নেই। এখন অনেকটা ময়দানে মেনে পড়ার মতো। মান-অপমান জ্ঞান রাখলে চলবে না। পুরন্দর তো মনে মনে ভেবেই এসেছে দরকার হলে লোকের বাড়িতে বাসন মাজা কাপড় কাচা থেকেও শুরু করবে। কিন্তু নতুন করে শুরু করতে হবে। যেভাবে ছিল সে ভাবে আর থাকা যায় না।

অবশ্যি ওর লজ্জা সংকোচের কারণটা অন্যখানে। অচেনা অপরিচিত পরিবেশে চাকরবৃত্তি করতে লজ্জা করে না। এখানে ওর একটা পরিচয় রয়ে গিয়েছে। পরিচয়, গোত্রহীন হওয়ার উপায় এখানে নেই। চাকরের পিছনে পিছনে চলল, বারান্দার পাশে যে-কটি দরজা দেখা গেল সবই বন্ধ। কোন ঘরই দেখা গেল না। বারান্দা দিয়েই ও এসে পড়ল একবারে খাবার ঘরে।

এটা যে খাবার ঘর সেটা পুরন্দর বুঝতে পারছে, টেবিলের ওপরে থালা গেলাস সাজানো দেখে। স্টেনলেস্ স্টিলের থালা গেলাস, চারজনের ব্যবস্থা, সবই উপুড় করা। এটা এক অস্বস্তি। বাড়িতে কোন দিন টেবিলে খায় নি, মাটিতে পাত পেড়ে খাওয়াই সেখানকার অনিবার্য রীতি। অবিশ্যি, হোটেলে রেস্তোঁরায় যে একেবারে কোনদিন খায় নি, তা নয়। কিন্তু সব থেকে অস্বস্তি, ঘরে কেউ-ই

নেই? ও কি একলা খাবে না কি! চাকরটাই ওকে খেতে দেবে? কিংবা, ওকে হয় তো টেবিলে খেতেই দেওয়া হবে না। চাকরটা অন্য কোন জায়গায়, পুরন্দরকে পাত পেড়ে খেতে দেবে।

কিন্তু চাকরটা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। তার মধ্যেই পুরন্দর দেখে নিল, ঘরের একপাশে একটা রেফ্রিজারেটর রয়েছে। থেকে থেকে সেটাতে ঝিন ঝিন শব্দ হচ্ছে। তবে জিনিষটা পুরনো শাদা রঙটা ময়লা কাগজের মতো দেখাচ্ছে, জায়গায় জায়গায় শাদারঙ উঠে গিয়েছে। ঘরে তিনটে দরজা। একটা দরজা একটু ফাঁক করা রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মনে হল ওটা রান্নাঘর। দেওয়াল ধোঁয়াটে কয়েকটা এলোমেলো হাঁড়ি কড়া দেখা যাচ্ছে। আর একটা দরজা একটা সরু বারান্দার দিকে। যে বারান্দায় রোদ পড়েছে। আর একটা দরজাও খোলা কিন্তু এত মোটা পর্দা রয়েছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই রেফ্রিজারেটের শব্দ ছাড়া। টেবিলের ওপরে মাঝখানে ঢাকা দেওয়া খাবারও রয়েছে। মাথার ওপরে একটা ময়লা ফ্যান আস্তে আস্তে ঘুরছে। গোটা ঘরটা যথেষ্ট পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দেওয়াল, পর্দা, টেবিলের প্লাষ্টিক চাদর কিছুই ঝকঝকে নয়।

পুরন্দর প্রায় দেড় মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পরে মোটা পর্দা সরিয়ে একজন মহিলা খুব ব্যস্ত হয়ে ঢুকলেন। বয়স পঞ্চাশ নিশ্চয়ই, কাঁচা পাকা চুল। ধোয়া সবুজ পাড় শাড়ি, যাকে পুরন্দরেরা বলে, ড্রেস দিয়ে পরা সেইভাবে পরেছেন। হাতকাটা শাদা জামা প্রায় রীণার মতোই। ওঁরও পেট দেখা যাচ্ছে, তবে নাভির নিচে পরেন নি। হাতে মাত্র দুটি সোনার বালা। কপালে সিঁদুর নেই, কাঁচা পাকা চুলের সিঁথেয় হালকা সিঁদুরের দাগ দেখা যাচ্ছে। এখনো বোধহয় লাগাবার সময় পাননি, কারণ পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে স্নান করে কোনরকমে জামা কাপড় পরেই উনি চলে এসেছেন। উনি ঘরে ঢুকতেই সাবান আর পাউডার

মেশানো একটা হালকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। শাদা ঝকঝকে দাঁতে উনি হাসলেন, হাত দিয়ে টেবিল দেখিয়ে বললেন, 'বস, একটু দেরী হয়ে গেল।'

নিশ্চয়ই ওঁর দাঁতগুলো বাধানো। কিন্তু উনি কে? ওঁর নির্দেশে ও টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল বটে, অথচ এমন একটা আড়ষ্টতা আর লজ্জা ওকে পেয়ে বসল যে সে বসতেও পারল না, কথাও বলতে পারল না।

ঠিক এ সময়েই, রীণার প্রবেশ। ঢুকেই বলল, 'বসুন। ইনি আমাদের মা।' মায়ের দিকে ফিরে বলল, 'মা, বাপি যার কথা বলে গেছলেন, ইনি সেই পুরন্দরবাবু।'

মা বললেন, 'সেটা বুঝতে পেরেছি।'

এর পরে পুরন্দরের পক্ষে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। স্বয়ং মণীন্দ্র ঘোষের স্ত্রী ওর সামনে। ও যেন মরমে মরে গেলেও, তাড়াতাড়ি মহিলার সামনে গিয়ে, উপুড় হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। উনি সরেও গেলেন না, তবু হেসে খানিকটা অবাক হবার মতো করে বললেন, 'ও আবার কী! ঠিক আছে, ঠিক আছে; বস। টিনি কোথায় গেল রীণা, ডাক ওকে, বসে যাক।'

রীণা বলল, 'আসছে।'

সে সময়েই দেখা গেল, মোটা পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ে ঢুকল। এবার পর্দাটা সরবার সময়েই পুরন্দর দেখতে পেল, খাট আর বিছানা, সেই পুরনো পুরনো ভাব। ঘরটার চেহারাও যেন সেইরকম। অথচ, টিনি, নিশ্চয়ই এই মেয়েটির নামই টিনি, এল যেন একেবারে মেমসাহেব। স্ট্রাইপ দেওয়া হালকা রঙের অনেকটা যেন পাতলা মোলায়েম রবারের ফ্রক পরে। রবারের মতো মনে হল, কারণ ফ্রকের কোথাও কোন সেলাই নেই, গোটা শরীরটাকে আল্‌তো করে, অথচ ফিটফাট করে জড়িয়ে আছে। হাঁটুর ওপরে ফ্রক, হাঁটুর কাছ থেকে নিটোল পা, লাল রঙের স্লিপার। অনেকটা

রীণার মতোই দেখতে, কিন্তু রীণার থেকেও যেন বেশী সুন্দর, বেশী ফর্সা এবং রীণার মতোই বব্‌ চুল। বয়স কত হতে পারে, বোঝা মুশকিল, পনের থেকে কুড়ি হতে পারে। এইরকম পুরন্দরের ধারণা। টিনিকে দেখে মনে হল, এইমাত্র যেন ঘুম থেকে উঠে এল। সে এসেই, টেবিলের এক পাশে এসে চেয়ারে বসে পড়ল।

রীণা ওর পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে, পুরন্দরকে বলল,—'বসুন।'

পুরন্দর থতমত নিচু করে বসল। ওর রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছে। রীণা আবার বলল, 'পুরন্দরবাবু, আমার বোন, টিনি।'

টিনিকে বলল, 'ইনি পুরন্দরবাবু।'

পুরন্দর থমতম খেয়ে, প্রায় হাত তুলেই নমস্কার করল। টিনি ঠোঁট টিপে একটু হাসল, তারপর দুই বোনে চোখাচোখি করে হাসল। পুরন্দর তাতে আরো লজ্জা পেয়ে গেল। ভাবল, ও বোধহয় কোনরকম হাস্যকর ব্যাপার কিছু করে ফেলেছে।

রীণা হাত বাড়িয়ে পুরন্দরের থালা গেলাস তুলে, সোজা করে দিল। তাতে পুরন্দরের গায়ে, রীণার পরিষ্কার ঝকঝকে হাতটা, ওর কাঁধের কাছে ছুঁয়ে গেল। পুরন্দর তাতে একটু সংকুচিত হলেও রীণার কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। রীণা টিনি নিজেদের থালা উল্টে পেতে নিল। ওদের মা ভাত দিলেন। পুরন্দরের পরবর্তী লজ্জা ও অস্বস্তি, পুরো খিদেটা কেমন করে পেট পুরে খেয়ে মেটাবে। ভাত তো ও কম খায় না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মা বললেন, 'লজ্জা করে খেও না যেন।'

পুরন্দর বলল, 'না না।'

রীণা বলল, 'নামটা বেশ, পুরন্দর। তাই না মা?'

মা বললেন, 'হ্যাঁ, বেশ নাম।'

বলে, তিনি পুরন্দরকে যত ভাত দিলেন, মেয়েদের তার তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু খাবারের আয়োজনটা এত সংক্ষিপ্ত, এটা

যেন পুরন্দর ঠিক ভাবতে পারে নি। ডাল নিরিমিষ তরকারি-ই প্রধান। সব শেষে একটুখানি মাছ। সামান্য একটুখানি চাটনি। অবিশ্যি চার পাঁচটি করে ভাজা বড়ি, যা দোকান থেকে কেনা, সুন্দর বোতলের একটু আচার, ইত্যাদিও ছিল। কিন্তু, সব মিলিয়ে কেমন যেন, অল্প ব্যবস্থা। বেশ সম্পন্ন পরিবারের খাবার-দাবার নয় যেন! কিংবা পুরন্দর জানে না, এটাই হয় তো এ ধরনের পরিবারের রেওয়াজ।

পুরন্দর, না না থাক করেও, ডাল তরকারি দিয়ে মোটামুটি পেট ভরেই গেল। তুলনায় রীণা টিনি শালিকের খাবার খেল বলা যায়। তথাপি ওদের শরীর ভালো থাকে কেমন করে, কে জানে। কিংবা, খাওয়ার পরিমাণটা, সত্যি মানুষের একটা অভ্যাস মাত্র। ইতিমধ্যে গোলক অর্থাৎ চাকর দু' একবার ডাকাডাকিতে নামটা জানা গিয়েছিল, রেফ্রিজারেটর থেকে বোতলের ঠাণ্ডা জল দিয়ে গিয়েছিল। রীণার মা, পুরন্দরকে মাঝে মাঝে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। যদিও খুব আলগা, তেমন কোন কৌতূহল নেই, নিতান্ত জিজ্ঞেস করতে হয়, তা-ই 'তোমরা ক' ভাই বোন, 'ও, তুমি বুঝি সকলের বড়' বা 'কোন বোনেরই বিয়ে হয় নি?' এই জাতীয় কথা। পুরন্দর টুইশানি করেছে, ইস্কুলমাস্টারি করেছে, সে প্রসঙ্গও উঠল, এবং শেষপর্যন্ত উনি বললেন, দেখ, তোমার কপালে কি আছে। কলকাতা তো আর এক বেকারের শহর। চাকরি পাওয়া খুবই কঠিন, চারদিকের যা অবস্থা। সেইজন্যেই ছেলেরা দলাদলি আর রাজনীতি নিয়ে আছে।

ওঁর গলায় রীতিমত নৈরাশ্য। পুরন্দরের এসব একেবারে অজানা নয়। দলাদলি, রাজনীতি ও কলেজে যে একেবারে করে নি, তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে নিতান্ত বাঁচার প্রয়োজন ছাড়া, ও আর কিছু ভাবতে পারছে না, যা কিছু ও পিছনে ফেলে এসেছে তা সবই নিরাশা আর হতাশার। এখন বাঁচা, এবং বাঁচারও উর্ধ্বে, ওর ভিতরে এখন

উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ পোতা হয়েছে। পুরন্দর কলকাতায় এসেছে, ভারতবর্ষের এই কলকাতায়। দল রাজনীতি নয়, ওর লক্ষ্য ধনের জগতে, নিরাপত্তা এবং প্রতিষ্ঠার।

কিন্তু, এ বিষয়ে কোন কথাই বলল না, চুপ করে শুধু শুনে গেল। রীণার মায়ের কথা শুনে, হতাশার ছায়া পড়ছে ওর মনে। তবে কাটিয়ে ওঠারই চেষ্টা করে। সকলের আগে টিনি উঠে পড়ল কিছু না বলেই। ঘরের এক কোণে বেসিনে হাত ধুয়ে নিল। আতিথেয়তার দায়িত্ব যেন রীণারই। সে বসে রইল, এবং পুরন্দরের খাওয়া হয়ে যাবার পরে, এখানেই হাত ধুয়ে নিতে বলল।

পুরন্দর বলল, 'আমি ও ঘরের বাথরুমে গিয়েই আচাই।'

রীণার মা বললেন, 'আচ্ছা, তা-ই যাও।'

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে পুরন্দর যেন স্বস্তিবোধ করল। বাইরের দিকের ঘরটায় এসে বাথরুমে গিয়ে, হাত মুখ ধুয়ে নিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে, মনে মনে বলল, মন্দ নয়। এরকম হলেও চলে যাবে।

অর্থাৎ, এবাড়ির সকলের আচার-আচরণ, খাবার-দাবার ব্যবস্থা সম্পর্কেই, কথাটা বলল সে। মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল। ধপাস করে বসল লম্বা সোফায়। এখন বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু কয়েকটা কথা ওর পর পর মনে হল। এ বাড়িতে কি কোন ছেকে নেই! মণীন্দ্রবাবুর কি দুই মেয়ে মাত্র। খাওয়ার স্ট্যাণ্ডর্ড এরকম নীচু কেন! সবাইকে দেখলে, ঠিক মেলানো যায় না যেন। রীণার মাও কেতাদুরস্ত ভাবেরই মনে হল। কথাবার্তায় বেশ বাঁধুনি আছে। মণীন্দ্রবাবু কত টাকা আয় করেন? পুরন্দর তো শুনেছে, অবস্থা বেশ, ভালোই। অন্তত ওদের দূরের শহরে, সবাই তা-ই জানে। বাড়িটা কি এদের নিজেদের, না, ভাড়া।

ভাবতে ভাবতেই পা মেলে দিয়ে, কাত হয়ে শুয়ে পড়ল পুরন্দর।

ভাবল, যা খুশি তাই হোক গে বাবা, আমার একটা চাকরি হলেই হল, তারপরে সব দেখা যাবে।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে শব্দ হতেই পুরন্দর উঠে বসল, এবং রীণাকে দেখে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। এমন কি, ওর সস্তা দামের জ্বলন্ত সিগারেটটাও হাতের আড়াল করে ফেলল।

রীণা বলল, 'বসুন বসুন, উঠলেন কেন। আপনি তো মশলা-টশলা কিছুই নিলেন না।'

পুরন্দর বলল, 'থাক দরকার নেই।'

রীণা একটা পুরনো ছোট সোফায় বসল। ওর শাড়ির গোটা আঁচলটা বুক থেকে খসে বাঁ হাতের ওপরে গিয়ে পড়ল। পুরন্দর স্পষ্টই দেখল, রীণার খোলা নাভিমূল। নগ্ন বীথি, একদিন ঝাপসা অন্ধকার ঘরে নিজের বোন, এবং মায়ের ছাড়া আর কোন যুবতী মেয়ের নাভিমূল দেখেছে বলে ও মনে করতে পারল না। জামার বুক আর কাঁধ এত বড় করে কাটা, এমনিতেই যেন, রীণার বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দুই স্তনের মাঝখানের খাঁজ অনেকখানিই খোলা। এখন চোখে পড়ল, লালচে দু'একটি ব্রণ আছে রীণার গালে। ঠোঁটের রঙ প্রথমে যেরকম দেখেছিল, খাবার সময়ও সেই রকম ছিল, এখনো তাই আছে। খেয়ে উঠে মুখ ধুতে গিয়েও কি রঙ ওঠে নি।

রীণার এই সহজ-স্বচ্ছন্দ ভাব পুরন্দরের ভাল লাগল. কিন্তু ওর চোখের পাতাও সেই সঙ্গে নেমে গেল। ঠিক, ততটা এখনো পর্যন্ত ধাতস্থ নয়, তা ছাড়া অপরিচয়ের একটা অস্পষ্টতা তো আছেই। যদি কোনরকম ত্রুটি ঘটে যায়! রাণাদের জগতে আদব কায়দা, কোন্‌টা কী রকম ও কিছুই জানে না। তবে রীণাকে ওর সুন্দরই মনে হচ্ছে, কেবল কোথায় যেন একটা রুক্ষতা রয়ে গিয়েছে, ও ঠিক ব্যাখ্যা, করতে পারছে না। এই বেশবাস, ঘাড় অবধি কপালে গালে এলিয়ে পড়া চুলের জন্য কী না, কে জানে।

রীণা বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। সিগারেট খেতে

খেতে একটু কথা বলা যাক, তারপরেই আমি চলে যাচ্ছি।'

পুরন্দর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, আপনি যতক্ষণ খুশি বসুন না। আমি দিনের বেলা মোটেই ঘুমোই না।'

রীণা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'অ্যাবসার্ড, সেটা আমার হবে না। আমি একটু শুয়ে পড়ব গিয়ে

বলেই, গলার স্বরটা হঠাৎ বদলে বলে উঠল, 'ডু ইউ মাইণ্ড, ইফ আই স্মোক?'

পুরন্দর কথাটা বুঝতেই পারে নি, এত তাড়াতাড়ি রীণার উচ্চারণ। ও জিজ্ঞাসু চোখে রীণার দিকে তাকাতেই দেখল, রীণার হাতে সিগারেটের প্যাকেট। তখন ওর মনে হল, রীণার কথাটা কানে ঠিকই শুনেছে। কিন্তু এমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছে যে, হঠাৎ কোন কথাই বলতে পারল না। রীণা তখন ঠোঁট টিপে হাসছে, পুরন্দরের মুখের দিকে তাকিয়ে। অথচ, এমন কিছু দামী সিগারেট নয় রীণার হাতে। সস্তা ফিলটার টিপ্‌ড্, নরম সিগারেট। পুরন্দরের কোন নেশাই হয় না ওতে! ওর সিরাগেট আরো সস্তা বটে, তবে কড়া এবং খাঁটি স্যাঁকা তামাকের।

রীণা, পুরন্দরের বোকা বোকা অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী ব্রাণ্ড?'

পুরন্দর সংকুচিত হয়ে ওর সিগারেটের নাম বলল।

রীণা বলল, বড্ড কড়া। তা ছাড়া, আমি ফিলটার টিপ্‌ড ছাড়া খেতে পারি না। আপনার খারাপ লাগবে না তো সামনে বসে সিগারেট খেলে?'

পুরন্দর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, খারাপ লাগবে কেন?'

যেন নিতান্ত ডালভাত খাবার মতোই কোন কথা হচ্ছে। অথচ, পুরন্দর ওদের শহরের বেশ্যা, ঝাড়ুদারনি বা অন্যান্য কামিন মেয়েদের ছাড়া, কখনো কোন মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখে নি। অবিশ্যি কলেজে, কোন কোন মেয়ে, কখনো সখনো, নিতান্ত অ্যাডভেঞ্চার করে,

ছু'একটা টান হয় তো দিয়েছে। কিন্তু রীণার ব্যাপারটা ওর কাছে একেবারে অন্যরকম লাগছে। আসলে, ও প্রায় চমকে উঠেই রীণাকে বলেছে, ওর খারাপ লাগবে না।

রীণা ঠোঁটে সিগারেট নিতে নিতে বলল, 'আপনার দেশলাইটা দিন।'

বলেও রীণা হাত বাড়াল না। কিন্তু পুরন্দর এখনো সেই ধরনের ম্যানার্স শেখেনি যে, একজন মহিলা দেশলাই চাইলে তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেওয়াই বিধেয়। ও দেশলাইটা বাড়িয়ে দিল। রীণা ঠোঁট টিপে হেসে, দেশলাই নিয়ে, নিজের হাতেই সিগারেট ধরাল। বেশ সহজ ভাবেই রীণা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ভিতরেও নিল, যেমন নেশা করবার জন্য লোকে ধূমপান করে। এ সময়েই হঠাৎ দরজায় একটা ছায়া পড়তেই রীণা একটু চকিত হয়ে তাকাল। তারপরেই হেসে ডাকল, আয়।'

টিনি ঘরে ঢুকল। রীণার পাশেই একটা চেয়ারে বসল। পুরন্দর ভাবলে টিনিও বুঝি সিগারেট খেতে এসেছে। কিন্তু টিনি সেরকম কোন ভাব দেখাল না।. রীণা নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'খাবি?'

টিনি ঠোঁট উল্টে বলল, ইচ্ছে করছে না।'

তার মানে টিনিও খায়, এখন ইচ্ছা করছে না। মাঝখান থেকে পুরন্দর নিজেই সিগারেট টানতে ভুলে গিয়েছে। ওর সস্তা দামের সিগারেট ততক্ষণে নিভে গিয়েছে। কিন্তু, ও আর সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল না। একটা অস্বস্তি ওকে ঘিরে ধরল। এখন ওর কী করা উচিত, কী কথা বলা উচিত, কিছুই বুঝতে পারছে না। ভালো করে দুই বোনের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না। এবং বারেবারেই ওর মন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, ভাবছে এরা কী ধরনের লোক, কী ধরনের পরিবারে ও এসেছে।

ছু'এক মিনিট পরে রীণাই কথা আরম্ভ করল। ও জানতে চাইল, ওর বাবা পুরন্দরকে কী ধরনের চাকরির কথা বলেছেন, কাদের

অফিসে। ঠোঁটের কোণে সিগারেট নিয়ে, বেশ মৌজ করে টানতে টানতেই, পুরন্দরের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে গেল রীণা। কিন্তু যে ধরনের চাকরির কথা মণীন্দ্রবাবু জানিয়েছেন, সেটা যেন রীণার তেমন পছন্দ হল না। বলল, 'এসব চাকরির কি ফিউচার আছে, আমি বুঝি না।'

পুরন্দর যেন এবার বলার মতো কিছু পেল। বলল, 'কোনরকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা নিয়ে কথা।'

রীণা হাসল। সীগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, 'কোনরকমে মানে কি? রাস্তার একটা মুটেও তো খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই সেরকম ভাবে বাঁচতে চাইছেন না।'

পুরন্দর লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, মানে, ঠিক সেরকম বলছি না। মোটামুটি যা হোক ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার একটা সংস্থান।—'

কথাটা শেষ করল না। রীণা বলল, কিন্তু বাবি যেরকম বলেছে, তাতেই বা ভদ্রভাবে কি করে বেঁচে থাকা যায় আমি বুঝি না। অবিশ্যি ভেরি হার্ড ডেজ, একটা দুশো আড়াইশো টাকার চাকরি পাওয়াও এখন ভীষণ মুশকিল। আপনার কি চাকরি ছাড়া আরো কিছু করবার ইচ্ছে আছে?'

পুরন্দর উৎসুক এবং কৌতূহলিত হয়ে উঠল। বলল, 'কি আর করবার আছে।'

'এই ধরুন, যদি পড়াশোনা করেন। দিনে চাকরি, রাত্রে পড়া অনেকেই তো করে?'

পুরন্দর বলল, 'তা কি হবে! চাকরি করলে, পড়াশোনা হবে কি না, বুঝতে পারছি না।'

'হবে না কেন অনেকেই তো করে। তবে, শুধু শুধু পড়েই বা কি হবে, আমি বুঝি না। ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার কোয়ালিফিকেশন কি?'

পুরন্দর মাথা নিচু করে বলল, 'অর্ডিনারি বি, এ, পাশ করেছি।'

রীণা বলল, 'কোন কিছুতে স্পেশালাইজ করুন, তা নইলে কোন লাভ নেই। অবিশ্যি, তাহলে এখন আপনাকে আবার সায়ান্স বা কমার্স নিয়ে পড়তে হয়, উইথ অনার্স। আমি বলছি, রাত্রে পড়েই যদি কিছু করতে হয়।'

পুরন্দরের কাছে এ কথা একটা ভীতিজনক স্বপ্নের মতো মনে হল। আবার ডিগ্রি কোর্সের শুরুতে ফিরে যাওয়া, অনার্স নিয়ে সায়ান্স বা কমার্স পাশ করা, ওর কাছে দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। তাও সারাদিন চাকরি করে। কিন্তু রীণার এ ধরনের কথা ওর খুব ভালো লাগছে। রীণার সিগারেট খাবার কথাটা ও প্রায় ভুলেই যাচ্ছে। এতটা ও আশা করতে পারে নি রীণা ওর সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে আজই এত কথা বলবে।

টিনি এতক্ষণে, ইংরেজিতে বলল, হোয়াই, হি ক্যান জয়েন ইন এ কলেজ

রীণা ঠোঁট উল্টে বলল, 'আমার ভালো লাগে না। প্রফেসর লোকগুলো, প্রত্যেক মিনিটে একটা করে কন্সপিরেসি করে। আদারওয়াইজ, ওদের পেটের ভাত হজম হয় না।'

টিনি হেসে উঠল। পুরন্দরের মনে পড়ে গেল, একসময় ওর মাথাতে ছিল, কোনরকমে অনার্সটা পাস করে, এম, এ, পরীক্ষা দিয়ে কলেজে চাকরি করলে কেমন হয়। টিনির মুখ থেকে সেই কথাটাই যেন প্রতিধ্বনিত হল।

রীণা আবার বলল, 'টিনি নতুন কলেজে যাচ্ছে তো সেইজন্যে প্রফেসরদের ওপর ওর এখন বেশী ভক্তি।'

টিনি বলল, মোটেই না।'

আবহাওয়াটা যেন অনেকখানি সহজ হয়ে এল পুরন্দরের কাছে। যদিও ওর ভিতারের আড়ষ্টতা এখনো বিশেষ কাটে নি। টিনির ভাব-ভঙ্গিতে, একটা কাঠিন্য ও অবহেলার ছাপ রয়েছে। রীণা যেন, নিতান্তই, একটি নতুন দূর মফস্বলের ছেলেকে, দয়া করে উৎসাহিত

করছে। তবু পুরন্দরের, এইসব কথাবার্তায়, অনেকখানি সহজ লাগছে। অনেকটা ছেলেদের মতোই, সিগারেট খেতে খেতে রীণা কথা বলছে, এবং রীণার কথাবার্তা ওকে ভাবিয়ে তুলছে।

রীণার সিগারেট খাওয়া শেষ হতেই, পুরনো ফাটা একটা চিনে মাটির অ্যাসট্রেতে শেষাংশ গুঁজে দিয়ে বলল, 'দেখুন, কি হয়। মানুষ বড় অল্পেতে সাটিস্ফায়েড, এটা আমার একদম ভালো লাগে না।'

উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি, আপনি এবার বিশ্রাম করুন। ইচ্ছে করলে দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারেন, এখন আর কেউ আসবে না।'

টিনি আগেই চলে গেল, রীণা পিছনে পিছনে। পুরন্দর কয়েক মুহূর্ত একেবারে চুপ করে বসে রইল। কলকাতার শুরুটা, সত্যি একেবারে নতুন ধরনের শুরু হচ্ছে যেন। এমন একটা পরিবারের মধ্যে ও এসে পড়বে, এ কথা একবারও ভাবে নি। ভালো-মন্দর বিচার করবার সময় এখনো আসে নি। যা হল এতক্ষণ ধরে, এটাই যথেষ্ট। রীণা যেন শুধু সিগারেট খেতেই এঘরে এসেছিল, হয়তো রোজই এঘরে খেতে আসে। অদ্ভুত, আশ্চর্য! কিন্তু রীণার শেষের কথাটা যেন, তার চেয়েও অদ্ভুত! মানুষ বড় অল্পেতে সন্তুষ্ট, এটা ওর একেবারেই ভাল লাগে না। কথাটা পুরন্দরের মস্তিষ্কের মধ্যে বিচিত্র একটা আলোড়ন তুলে দিয়ে গেল যেন।

নিভে যাওয়া সিগারেটটা ও আবার ধরাল। ভাবল, রীণার এই কথাটা যেন, অন্যভাবে ও অনেকবার ভেবেছে। যেমন পুরন্দরের বাবা। ও দেখেছে, মাসের শেষে সামান্য ক'টা টাকা মাইনে পেয়েই, বাবার মুখটা কী রকম চমকিয়ে উঠত। ব্যাপারটা কোনদিনই ওর ভালো লাগে নি। বিশ্বসংসারে, পৃথিবীতে, মানুষ এত সম্পদ ভোগ করছে। অথচ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ, সামান্য একটু কিছু পেয়েই, কী রকম তৃপ্ত, হেসে খেলে কাটিয়ে দিচ্ছে।

রীণা ঠিক বলেছে। অল্পেতে সন্তুষ্ট হওয়ার মধ্যে ভালো লাগার

কিছু নেই। অনেক, অনেক পাবার পথ খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত চিন্তা বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। তার জন্য যে কোন পরিশ্রম করতে পুরন্দর পশ্চাৎপদ নয়। তাতে যদি দরকার হয়, আর একবার ডিগ্রিকোর্সে গিয়ে রাত্রে ভর্তি হবে। তবু—

তবু একটা 'তবু' থেকে যায়। ভিতরের হতাশা কাটতে চায় না এবং একই সঙ্গে ওর মনে হয়, রীণার পড়াশোনা কতদূর। কথাবার্তায় মনে হল, কম কিছু না। রীণা কি কোন চাকরি করে। চাকরি করবে নিশ্চয়ই, আজকের দিনে বাড়ি বসে থাকত না, নিশ্চয়ই কাজে যেত।

ভাবতে ভাবতে এক সময়ে ওর মনে হল, চোখ দুটো জুড়ে আসছে। উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে লম্বা সোফাটায় শুয়ে পড়ল।

পুরন্দরের যখন ঘুম ভাঙল, তখন ঘরটা প্রায় অন্ধকার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। জানালা দিয়ে এবাড়িতে ঢোকবার বাঁধানো চত্বরটা দেখা যাচ্ছে। চত্বরের পাঁচিলের ওপারে ছোট একটা বাগানসংলগ্ন লাল রঙের পুরনো বাড়ি। বাড়িটার কিছুই দেখা যায় না, বাগানসংলগ্ন দেখা যায়। বাগানে তেমন কিছু বেল ফুল, একটা যুঁইয়ের ঝাড়, চন্দ্রমল্লিকার টব কয়েকটা, একটা বকুল গাছ। সেই গাছে কাক শালিকেরা ডাকাডাকি করছে।

পুরন্দর দরজাটা খুলে দিয়ে বাথরুমে গেল। মুখ ধুয়ে আসার পরে গোলক চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে চুমুক দেবার আগেই এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। মনে হয় ষাটের ওপরে বয়স। একটু থপথপে মোটা শরীর। ভুঁড়ির ওপরে ঢলঢলে প্যাণ্ট বেল্ট দিয়ে বাঁধা। গায়ে সাদা শার্ট, পুঁইমেটুলি রঙের টাই। টেরেলিনের কোট। গোঁফদাড়ি কামানো, মাথায় টাক। পায়ে ভোঁতা টো-ওয়ালা লাল শু।

পুরন্দর চায়ের কাপটা নামিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক বললেন, 'তুমিই প্রিয়নাথবাবুর ছেলে ?'

পুরন্দর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম পুরন্দর মিত্র। আপনি বোধহয় মণীন্দ্র ঘোষ

পুরন্দর তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। মণীন্দ্র ক্লান্ত মোটা গলায় বললেন, 'থাক থাক। আমি এইমাত্র বাড়ি ঢুকে শুনলাম, তুমি ওবেলা এসেছ, খেয়ে ঘুমোচ্ছ। গোলক গিয়ে বলল, উঠে পড়েছ। তাই—আচ্ছা বস তুমি। তবে, একটা দুঃসংবাদ, ডিরেক্টর আজকেই মর্নিং ফ্লাইটে হঠাৎ দিল্লী চলে গেলেন। ফিরতে কয়েকদিন দেরী হবে, তারপরে তোমাকে নিয়ে যাব।'

পুরন্দর মুখটা একটু করুণ করে দাঁড়িয়ে রইল। এ ক্ষেত্রে কি বলার আছে, সে জানে না মণীন্দ্রবাবুর বলার ভাব থেকে মনে হয়, তিনি কিছু শুনতেও চান না। ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললেন, 'এনি হাউ, দেখা যাক, কতদূর কি হয়, ডিরেক্টর ফিরে আসুন। তোমার বাবা অনেক করে লিখেছেন। দূরের থেকে তো ঠিক বোঝা যায় না। কলকাতার অবস্থাও ভালো না। কোম্পানিকেও দোষ দেওয়া যায় না। খালি ধর্মঘট, ইউনিয়নের চেঁচামেচি, কাজের লোক পাওয়া মুশকিল। আচ্ছা, দেখা যাক, কি হয়। আলোটা জ্বালিয়ে নাও, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।'

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। পুরন্দর আলোটা জ্বালল; কিন্তু ওর ভিতরটা যেন মণীন্দ্রবাবু একরাশ অন্ধকার দিয়ে ঢেকে রেখে গেলেন। একরাশ হতাশা। ওঁর ক্লান্ত, বুড়ো একঘেয়ে গলায়, কোন আশা নেই, উৎসাহ নেই, শুধু একটু ভরসা, দেখা যাক কি হয়। মণীন্দ্রবাবুকে দেখে, তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের যেন কোথাও মেলানো যায় না। একথা একবারও মনে হল না, তিনি একজন বড় দরের এঞ্জিনিয়ার। যেন সাধারণ অবস্থার একজন, চিন্তিত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভদ্রলোক। অবিশ্যি পোশাক এমন কিছু খারাপ ছিল না, কিন্তু ওঁকে দেখে,

চলচল জবরজং লাগছিল। পুরন্দর ভেবেছিল, রীণার বাবি নিশ্চয় বেশ খানিকটা সাহেব হবেন, এবং সাহেবি মেজাজ ও আচরণও বটে।

ও চুপচাপ বসে চা খেল। রীণারা কোথায়, কে জানে। একটু বেরোলে হত। রাস্তা ঘাট কিছুই চেনা নেই; তবু, পায়ে পায়ে একটু ট্রাম রাস্তার দিকে যেতে ইচ্ছে করল। দাঁত ভাঙা রবারের চিরুনিটা দিয়ে মাথা আঁচড়ে, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। ছিটকিনি খুলে চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় এল। সবেমাত্র দশ পনের পা গিয়েছে, হঠাৎ মনে হল পিছনে যেন রীণার গলা শোনা গেল।

পুরন্দর পিছন ফিরে তাকাল। দেখল। দেখল, রীণা-ই। এখন ওর শাড়ি জামা, আরো ঝলমলে। পরবার ধরনটা একরকমই। মুখে ঠোঁটে চোখে ভুরুতে রঙটা আরো চড়া। একলা নয়, সঙ্গে একজন রয়েছে। ঠিক যুবক হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু খুব ফিটফাট, ঝকঝকে। লাউঞ্জ স্যুট পরা, টাই-পিন চিকচিক করছে।

রীণা পুরন্দরকে দেখতেই পায় নি। সে গ্যারেজ খুলে ভিতরে ঢুকল। সঙ্গের লোকটি বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। পুরন্দর দেখল, রীণা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে রাস্তায় নেমে এল। ওর সঙ্গেও লোকটি, গ্যারেজের কোলাপ্‌সিবল্‌ গেটটা টেনে দিল। রীণার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল, 'আসুন, গোলক তালা লাগিয়ে যাবে।'

ঝকঝকে ভদ্রলোক গাড়ীর বাঁদিকের দরজা খুলে রীণার পাশে বসল। রীণা গাড়ি চালিয়ে দিল, পুরন্দরকে দেখতে পেল না। একটু সামনেই, কয়েকটি ছেলে রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির হর্ণ শুনেও, কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, আস্তে আস্তে সরে গেল। গাড়িটা যেন অস্বাভাবিক জোরে বেরিয়ে গেল। চিলের ডাকের মতো একটা শিস শোনা গেল। সেই সঙ্গে কয়েকটি মিলিত গলার হাসি।

ছেলেগুলোর ব্যবহারে, একদিকে যখন পুরন্দরের মনে মনে রাগ হচ্ছে, তখনই মনের আর একটা পাশে, কেমন একটা গাঢ় অন্ধকারের ছায়া যেন ঘনিয়ে এল। রীণা ওকে দেখতেই পেল না। এটাই হয়তো স্বাভাবিক, তবু দুপুরের ছবিটা ওর চোখে ভেসে উঠল। রীণা তাহলে গাড়িও চালাতে পারে। গাড়িটা কাদের? ওবেলা, বাড়ি ঢোকবার সময়, গ্যারেজটা তো ফাঁকাই ছিল। ভদ্রলোকটি কে? রীণার দাদা না-কি। ওবেলা কোন পুরুষকেই তো ও দেখতে পায় নি। কিন্তু ভেবেই বা কী লাভ! রীণাদের সম্পর্কে এখনো ও কতটুকুই বা জানে!

বড় রাস্তাটা পুরন্দর দেখতে পাচ্ছে। সিগারেটের দোকানের সামনে ওদের বয়সী ছেলেগুলো জটলা করছিল। পুরন্দর সিগারেট কিনবে ভেবেছিল, ছেলেগুলোর জন্য যেতে ইচ্ছা করল না। কে একটা ছেলে বলে উঠল, 'হিরো।'

পুরন্দর ফিরে তাকাল। দেখল, একটা নির্লজ্জের মতো ছেলে, ওর দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। এ ধরনের বিদ্রূপের কী মানে, বুঝতে পারল না। ওকে হিরো বলার কী আছে। আর একটা গলা শোনা গেল, 'আস্ত্রোনিয়ান্নি।'

সেই সঙ্গেই হাসি শোনা গেল, যেটা পুরন্দরের কদর্য মনে হল। ওদের দূরের শহরেও যে এরকম হয় না, তা নয়। তবে কলকাতার রকগুলো যেন ঘুমিয়ে আছে। তা ছাড়া, পুরন্দর যেহেতু কিছুদিন ইস্কুল মাস্টারি করেছেন, সেই হেতু ও নিজে ঠিক ওরকম কিছু করতে পারে নি। মোটের ওপর এসব ছেলেদের চিনতে ওর খুব অসুবিধা হয় না। ও শুধু ভেবে পায় না, কলকাতাতেও ছেলেরা এ রকম করে। করে শুধু না, এক বেলাতেই মনে হচ্ছে, অনেক বেশী করে। অথচ পুরন্দর কলকাতায় এল, অন্য এক আশা নিয়ে, অন্য এক আকাঙ্ক্ষা, প্রায় এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে। প্রতিষ্ঠা চাই, সর্বরকমে প্রতিষ্ঠা, এই জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন। কলকাতার এই সব ছেলেদের মনে

কি, ওর মনোবৃত্তির কিছু নেই!

পুরন্দর বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ট্রাম, বাস নানা যানবাহনের অবিরাম চলাফেরা। সেই সঙ্গেই, নানা বয়সের, নানা বেশের মেয়ে পুরুষের নানা ভঙ্গিতে চলা ফেরা। কী যেন রাস্তাটার নাম। রাসবিহারী এ্যাভিনু। এই রাস্তাটা দেখলেই মনে হয়, সত্যি সত্যি এটা কলকাতা শহর। ভারতীয় নর-নারীরই মিছিল বটে, তবু কোথায় যেন একটা বিদেশী ছোঁয়া লেগে রয়েছে। পুরন্দরের পুরোপুরি চেনা চেনা লাগে না। কয়েক মিনিট সময়ের মধ্যেই ও দেখল, রীণার মতো অনেক মেয়েই গাড়ি চালিয়ে চলেছে। শুধু মেয়ে কেন, দু' একটা বুড়িকেও নানান্ ঠমকে ঠমকে সেজে, গাড়ি চালাতে দেখল। এর নামই বোধহয়, আজব কলকাতা। পথে হাঁটা প্রত্যেকটা মেয়েকেই ঝকঝকে আর খুব আধুনিক বলে মনে হচ্ছে। সবাইকেই বেশ সুন্দর লাগছে। ছেলেদেরও। প্রত্যেকেই বেশ স্মার্ট, চেহারায় ও পোশাকে। একটা কালো কুচকুচে ছেলেকেও মনে হচ্ছে, বেশ দেখতে। কলকাতায় সবাই সাজতে জানে।

তবু পুরন্দরের মন এবং চোখ সাবধানী। বড় রাস্তায় ফুটপাথের ওপারে, এখানে-সেখানে ছেলেদের জটলা। ভাবভঙ্গি, পাড়ার ভিতরের ছেলেদের মতনই। কিছু না আবার বলে বসে। কিন্তু কেউই সেরকম তাকিয়ে দেখছে না ওকে। কিছু বলছে না। শুধু ছেলেদের জটলাই নয়। মেয়েরাও কোথাও কোথাও জটলা করছে, এবং সেরকম একটি জটলার মধ্যেই ও টিনিকে দেখতে পেল।

টিনির গায়ে এখনো সেই পোশাক। খুকি! টিনির নাক টিপলে দুধ গলে। পুরন্দরের ঠোঁট দুটো বেঁকে উঠল। আবার সঙ্গে সঙ্গে ও সাবধান হয়ে গেল। কি দরকার বাবা, যার যা খুশি, সে তা-ই করুক না। টিনি একটা জাঙিয়া আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বেরোলেই বা ওর কি! দেখবার ব্যাপারটা তো একই, সেই বীথির শরীরটাই বেরিয়ে পড়বে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ হাড়গিলে,

কেউ ধুমসি। বীথির শরীরটা তো সুন্দরই ছিল। টিনের থেকে তা খারাপ নয় নিশ্চয়। তবে, টিনির পোশাক-পরিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা কথাবার্তা ওকে আলাদা করে তুলেছে।

পেভমেণ্টর ওওর টিনিদের দলটা এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল, পুরন্দরকে চোখে না পড়ে উপায় নেই, এবং টিনির সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়েও গেল। কিন্তু চোখাচোখি হলেও টিনি অনায়াসে, চোখ ফিরিয়ে তার বন্ধুদের সঙ্গে যেমন হেসে কথা বলছিল তেমনি বলতে লাগল পুরন্দরের কেমন লজ্জা করে উঠল, কোথায় একটা অপমানও বিঁধল। মেয়েটা ওকে চিনতেই পারল না, না কি চিনেও না চেনার ভাণ করল। অথবা, কথাই বলতে ইচ্ছা করল না।

পুরন্দর এগিয়ে গেল, দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, 'ক্যালকেশিয়ান নেকি। একটা সিগারেটের দোকান ওর দরকার। ওদের পেরিয়েই আর একটি ছেলের জটলা। দেখেই বোঝা গেল, এ জটলাটা টিনিদের জটলার সঙ্গে একটা অদেখা সূতোয় যেন বাঁধা উভয় পক্ষের চোখাচোখি থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে। পুরন্দর মনে মনে বলল, এই ব্যাপার! চালিয়ে যাও খোকা খুকুরা। তবে পুরন্দরের সঙ্গে টিনির কথা বলতে কি দোর ছিল!

পরমুহূর্তেই মনে হল, কি কথাই বা টিনি বলতে পারে ওর সঙ্গে? কি কথাই বা থাকতে পারে, কতটুকুই বা ওকে চেনে টিনি। দুপুরবেলা এক টেবিলে খেয়েছে মাত্র। তাতেই সব হয়ে গেল? বীণা হলে তবু একটা কথা ছিল ন্যাকা? নিজেকেই বলল পুরন্দর। এসব কথা ভেবে ওর কি লাভ? ও যেজন্য কলকাতায় এসেছে, তার মধ্যে এসব কিছুই নয়। টিনির জামা কাপড়ও তো ওকে কাচতে হতে পারে।

একটা চার রাস্তার মোড়ে, পান সিগারেটের দোকান পাওয়া গেল। সেখানেও বেশ ভিড়। ওর সস্তা দামের এক প্যাকেট সিগারেট চাওয়াটা যেন দোকানদার শুনতেই পেল না। দু'জন লোকের পক্ষেও

দোকানটা চালানো যেন অসম্ভব। এর নাম কলকাতা, এ রকম একটা দোকানও যদি থাকত পুরন্দরের, তা হলেও লক্ষপতি হতে অসুবিধা ছিল না। না হয় লোকে বলত, পান-সিগারেটওয়ালা টাকার কাছে সবই সমুত।

বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে সিগারেট পেল। দেশলাই কিনল না, লাইট পোষ্টের গায়ে জ্বলন্ত দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে, পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে ভাবল, কোন্‌দিকে যাবে। কোথাও যেতে ওর ভয়ও আছে। ফিরে আসতে হবে তো! তবে শুনেছিল, মণীন্দ্রবাবুর বাড়ি থেকে, বালীগঞ্জ লেক নাকি বেশী দূর নয়। কিন্তু সেটা কোনদিকে কোন রাস্তায়।

পুরন্দরের কাছাকাছিই এক দল ছেলে দাঁড়িয়েছিল। ও প্রায় ভয়ে ভয়েই তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, লেকটা কোনদিকে!'

ছেলেগুলো রাজনীতির আলোচনায় ব্যস্ত। জ্যোতি বসু আর প্রমোদ দাশগুপ্তের নাম শুনেই বুঝতে পারল। ওর দিকে না তাকিয়েই, একজন উল্টোদিকের রাস্তাটা হাত তুলে দেখিয়ে দিল। কোন কথা নয়, কারণ সময় নেই।

পুরন্দর যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে একবার ঠিকমত দেখে নিল। তারপর গাড়ির ভিড় কাটিরে, রাস্তার ওপারে গিয়ে, হাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই, মাঠ ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। গাছ-পালার ভিড় দেখে মনে হল, লেকের কাছেই এসেছে। ইতিমধ্যে আলো জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে! কলকাতাকে অন্যরকম দেখাতে লাগল। কেমন যেন অচেনা অচেনা।

ফিরে যাওয়া উচিত কি না, একবার ভাবল। তবু লেকটা না দেখে যেতে ইচ্ছে করল না। মোটামুটি লোকজনের চলাফেরার চেহারাটা অনুমান করে পায়ে পায়ে, ও ঠিক লেকের ধারে এসে পড়ল। শহরের বুকে এ-রকম, একটা টলটলে জলাশয়, দেখতে সত্যি

সুন্দর। ওদের মফস্বল শহরে, অনেক বড় দীঘি বা পুকুর আছে। সন্ধ্যের পরে সেখানে কেউ যায় না। ঝি ঝি ডাকে, আর প্রহরে প্রহরে শেয়াল। চারপাশে জঙ্গলের ভিড়। আর এখানে, জলের ধারে আলোর ছড়াছড়ি। অন্ধকারও আছে, কেউ হাঁটছে, কেউ বসে আছে। কেউ কেউ দলে। কেউ দু'জনে দু'জনে। দু'জন মানেই, মেয়ে পুরুষের জুটি, এরা কি সবাই স্বামী-স্ত্রী। নিশ্চয়ই না। হয় তো অনেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা। হাঁটার দলেও এ-রকম আছে, জোড়া জোড়া। কোথাও একদল ষাঁড়ের মতো ছোঁড়ারা, এখানে-ওখানে পাক মেরে বেড়াচ্ছে।

পুরন্দরের একটা নিঃশ্বাস পড়ল। এখানে এসে কাউকে নিয়ে কি, কোনদিন ও বসতে পারবে? সঙ্গে সঙ্গেই ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে ওঠে, শালা বসতে পেলে শুতে চায়। লেক দেখেই চিত্তির। নিজেকে পেটি কেসের আসামীর মতো বলে উঠল, খাটকে খাও, ভাগ যাও। তারপরে, এই লেক, এই সন্ধ্যা, অনেক দেখা যাবে।

দেখা যাবে কি। লেকের জলের ধারে দাঁড়িয়ে, দূরের দিকে তাকিয়ে ও ভাবল, তেমন দিন আসবে কি! পুরন্দর কি সেই দিন নিয়ে আসতে পারবে! ওর তো কিছুই মনে হচ্ছে না, ওর কাছ থেকে একটু দূরেই দুটি ছেলেমেয়ে বসে রীতিমত প্রেম করছে দেখে ও। ওদের জীবনের কী সমস্যা কী অবস্থায় এসে ওরা দুটিতে বসে, এই শহরের ঝিলের ধারে এমন নিবিড় হয়ে প্রেম করছে কে জানে। পুরন্দরের কিছুই যায় আসে না। হয়তো মনটা একটু টনটন করে। তার চেয়ে বেশী ঠোঁট বেঁকে ওঠে। নিজের লক্ষ্যটাই ওর কাছে বড়।

পুরন্দর ফিরে চলল। এত সহজে রাস্তা হারাবার পাত্র ও নয়। ফিরতে ফিরতে মণীন্দ্রবাবুর কথা ওর মনে পড়ল। কে জানে, ওর বস্-এর ফিরতে কত দেরী হবে। যত দেরী হবে, ততদিন কি ওকে চুপ করে বসে থাকতে হবে? নিশ্চেষ্ট বসে থাকার কথা ও ভাবতেই পারে না। নিজের যোগ্যতায় এখনই ও একটা কোন কাজে লেগে যেত।

বাড়ির সামনে এসে দেখল, গ্যারেজটা খালি। রীণা ফেরে নি পুরন্দর ওর আদ্যিকালের থাকা হাতঘড়িটা তুলে সময় দেখল, যে ঘড়িটার লোহার জং আর উঠতে চায় না। একজনের কাছ থেকে, খুব সস্তায় এক সময়ে কিনে নিয়েছিল, তার টাকাটা দেবেশ দিয়েছিল, যে ওর বোনেব সঙ্গে প্রেম করে। ভাবী ভগ্নিপতির দান। যদিও, ও জানে, দেবেশ কোনদিনই বোধহয় আর ওর বোনকে বিয়ে করবে না।

সময় মাত্র সাড়ে আটটা। দরজার কাছে এসে দেখল, ভিতর থেকে বন্ধ। বেলের বোতাম টিপল। একটু পরে চাকরটা এসে দরজা খুলে দিল। পুরন্দর ওপরে উঠে ওর ঘরে যেতে গিয়ে, পাশে আর একটা ঘর দেখতে পেল। পর্দাটা একটু ফাঁক। সেখানে টিনি, টিনির মা—মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী, এখন যেন আর একটু বেশী সাজগোজ করেছেন মহিলা, একজন অচেনা যুবককে দেখা গেল। মণীন্দ্রবাবু আছেন কী না, দেখা গেল না। পুরন্দর ওর নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুইচটা খুঁজে আলো জ্বালল। তেমন উজ্জ্বল না হলেও ওদের হ্যারিকেনের আলোর থেকে বেশী।

কিছু করার নেই পুরন্দরের। পাশের ঘরে, নানান্ রকম গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কথাবার্তা তেমন জোর বা স্পষ্ট নয় যে, সব বোঝা যায়। ও ভাবতে চেষ্টা করল পরিবারটা কেমন।

কয়েক দিন পরে সেটাই আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে লাগল, পরিবারটা কেমন। তার জন্য হয়তো, রীণাই বেশী সাহায্য করেছে পুরন্দরের নিজের দেখার মধ্যেও একটা বিশেষ তীক্ষ্ণতা ছিল। তাছাড়া, পুরন্দরের নিজস্ব একটা কল্পনা শক্তি আছে। যা ও দেখে তা-ই ওকে ভাবায়। ভাবনাটা কখনো অযৌক্তিক ভাবে ওর মধ্যে আসে না। সমস্ত ব্যাপারেই ও একটা কার্যকারণ ভেবে নেবার চেষ্টা করে। ছেলেবেলা থেকে ওর জীবনযাপন, জীবনকে দেখার দৃষ্টি, এবং

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে কলকাতায় আসা, সব মিলিয়ে ওর মধ্যে একটা বিশেষ সচেতনতা সব সময়ে কাজ করে। প্রত্যেকটা বিষয়কেই ও টু দি পাই অঙ্কের মতো মিলিয়ে নিতে চায়, এবং নিজেও সেই ভাবে সকলের সঙ্গে চলতে চায়।

পুরন্দর প্রথম সচেতন হল রীণার সম্পর্কে। কয়েক দিনের মধ্যে মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে ওর কোন কথাই হয়নি। টিনির সঙ্গে এক আধবার দেখা হয়েছে, এক টেবিলে বসে আর খেতে হয় নি। রীণার মায়ের নাম অরুণা, এটা ও জেনেছে মণীন্দ্রবাবুর ডাক শুনে। উনি অবশ্য ডাকেন অরুণ বলে। ধরেই নেওয়া যায় অরুণা। পুরন্দর জানে না অরুণা নাম হতে পারে কিনা। সূর্য নাম কখনো শোনে নি, সূর্যকুমারী শুনেছে, সেভাবে অরুণকুমারীও নাম হতে পারে। যাই হোক, অরুণার সঙ্গে পুরন্দরের খাবার ঘরে রোজ দেখা না হলেও এই ক'দিনে প্রায়ই দেখা হয়েছে। পুরন্দরের প্রতি ওঁর ব্যবহার প্রায় প্রথম দিনের মতই রয়ে গিয়েছে। অল্প হেসে, দু' একটি কথা, একটু খাবার নেবার জন্য সাধটা, কলকাতা কেমন লাগছে, এমনিতর দু'এক কথা, তার বেশী কিছু নয়। সেই সব কথার মধ্যে দিয়ে পুরন্দর ওঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হতে পারে নি, একই রকম রয়ে গিয়েছে। যদিও ওর মনে হয়েছে, অরুণা ঠিক একরকমই নন, আরো অনেক বেশী কথা তিনি বলেন, হাসেন অন্যান্যদের সঙ্গে। সেটা ও জানতে পারে, ওর পাশের ঘরের কথাবার্তা থেকে। এখন ও বুঝতে পেরেছে এ বাড়িতে আসল বসার ঘরটা ওর পাশের ঘর।

ঘরটা পুরন্দর দেখেছে। ওর ঘর থেকে পাশের ঘরটা একটু ছোট, কিন্তু অনেক ভালো করে সাজানো। সমস্ত বাড়ির মধ্যে পাশের ঘরটাই সব থেকে ভালো করে সাজানো। ও যেমন আশা করেছিল, ঝকঝকে আধুনিক আসবাবপত্র, সুন্দর পর্দা, সবই পাশের ঘরে আছে।

পুরন্দরের ঘরটা নিতান্তই একজন বাইরের লোকের থাকবার ঘর।

যার সঙ্গে এ বাড়ির, ও বাড়ির অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কোন যোগাযোগেই থাকবে না। যতটুকু দরকার, ততটুকুই থাকবে। এটা ওকে অবাক বা বিচলিত করে নি, স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে।

কিন্তু মনে মনে ও একটু অবাক হয়েছে, রীণার ব্যবহারে। রীণা ওর সঙ্গে অনেক কথা বলে, অনেক বেশী ওর ঘরে আসে, একমাত্র রীণাই ওর কাছে যেন অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। যে কারণে পুরন্দরও রীণার কাছে অনেকটা সহজ। কিন্তু সেই সঙ্গেই ওর চির দিনের সতর্ক মন নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছে, কেন?' তারপরে মনে মনে বলেছে, ধীরে, রজনী ধীরে, দেখে যাও। তবে, প্রেম? নিজেই ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসেছে। রীণা করবে পুরন্দরের সঙ্গে প্রেম! পৃথিবীতে সবই তা হলে যুক্তিছাড়া, কারণ ছাড়া হত। অতএব দেখা ছাড়া কী করার আছে!

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলাই রীণা ওর ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাকি কী বললেন, কাল কোন কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?'

পুরন্দর দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েদের সম্মান দেবার কথাটা মনে আনতে পারে নি, কিন্তু সমীহ ফুটে উঠেছিল ওর চোখে মুখের ভঙ্গিতে। চমকে উঠেছিল, কী বলবে হঠাৎ যেন ঠিক করতে পারছিল না। রীণা হেসে উঠে একটা পুরনো সোফায় বসতে বসতে বলেছিল, 'বী ইজি, অত ইয়ে হয়ে পড়েছেন কেন? মেয়েদের সঙ্গে কি কথা বলে অভ্যাস নেই না কি আপনার?'

পুরন্দর আরো থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'না, মানে, তা কেন?'

'তবে? আমাকে দেখে আপনি যেন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

বলে হেসে উঠেছিল। পুরন্দর লজ্জা পেয়ে হেসেছিল সকাল বেলাই রীণার সাজসজ্জা হয়ে গিয়েছিল, তখন মুখে একটু হালকা-প্রলেপ ঠোঁটে একটু রঙ, এবং পরিপাটি পোশাক, সই ছিল। পুরন্দর

ভেবেছিল, হয় তো রীণা এ ঘরে সিগারেট খেতে এসেছে। জিজ্ঞাসাটা নিতান্তই একটা কথার কথা।

রীণা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আজকাল তো মফস্বল শহরেও কো-এডুকেশন কলেজ। আপনাদের কলেজে কী ছিল?'

'কো-এডুকেশন।'

'তবে? মেয়েদের সঙ্গে নিশ্চয়ই মেলামেশা ছিল?'

'তা ছিল। তবে—।'

ও থেমে গিয়েছিল। রীণা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবে?'

পুরন্দর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। রীণাই বলেছিল, 'নতুন জায়গা, আর নতুন পরিচয়ের বাধা, তাই না?'

পুরন্দর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল। রীণা উঠে বাইরের দরজার পুরনো পর্দাটা একটু টেনে দিয়েছিল, যেটা পুরন্দরকে বললে ও অনায়াসে করে দিত, দিতে পারলে খুশি হত। তারপরে ওর সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলেছিল, 'দিন, আপনার দেশলাইটা দিন।'

পুরন্দর তাড়াতাড়ি দেশলাই দিতে দিতে মনে মনে বলেছিল, যা ভেবেছিলাম তা-ই. এ ঘরে সিগারেট খেতে এসেছে। রীণা দেশলাইটা না নিয়ে, ফিলটার টিপড সিগারেট ওকে অফার করেছিল, ও বলেছিল থাক না, আমার আছে।'

রীণা বলেছিল, 'লেডিজ অফার, রিফিউজ করতে নেই। একটা খেলে কিছু হবে না।'

ব্যাপারটা নতুন হলেও তার আগের দিনের মতো বিস্ময়কর নয়। একটু সহজই মনে হয়েছিল। ও সিগারেট নিয়ে মুখে দিয়েছিল, এবং দেশলাইটা নিজেই জ্বালিয়ে, আগে রীণাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

রীণা বলেছিল, 'থ্যাংকস্।

তারপরেই জিজ্ঞেস করেছিল, বলুন, বাবা কী বললেন কাল।'

মণীন্দ্রবাবুর কথাগুলো ও রীণাকে বলেছিল। রীণা কয়েক মুহূর্ত

চুপচাপ চিন্তিত মুখে সিগারেট টেনেছিল তখন ওকে বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছিল তারপরে যেন খানিকটা নিজের মনেই বলেছিল, 'কী ব্যবস্থা বাবী করতে পারবেন, আমি তো বুঝি না

কথাটা শুনে পুরন্দরের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। সর্বনাশ! স্বয়ং মণীন্দ্র ঘোষের মেয়ে এ কথা বলছে! কিছু যদি ব্যবস্থা নাই করতে পারবেন, তা হলে চিঠিতে ওরকম কথা লিখবেন কেন!

রীণা পুরন্দরের মুখের দিকে ভালো করে না তাকিয়েই বলেছিল, 'বাবীদের কোম্পানিটা ছোট বা খারাপ না, তবে আফটার অল বাবীর তো আর সেরকম ভয়েস নেই কোম্পানিতে, তাই বলছি।'

পুরন্দর সতর্ক এবং উৎকর্ণ হয়েছিল। কী বলতে চাইছে রীণা। ও তাকিয়েছিল রীণার দিকে রীণা ওর দিকে তাকিয়ে একটু সংকোচের ভাব করে বলেছিল, 'বাবী তো রিটায়ার্ড লোক, এক্সটেনশন বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাও নেই। নেহাত, পুরনো লোক, এক সময়ে যথেষ্ট কাজ দেখিয়েছেন, তা-ই একটা মোটামুটি স্যালারি দিয়ে রেখে দিয়েছে। সো কাইণ্ড অব দেম্। তাদেরই বা করবার কী আছে। নতুন দিনের মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে পুরনো দিনের মেলে না।'

বলেই ঘাড় দুটো একটু দুলিয়ে, হাত দুটো একটু মেলে দিয়েছিল। সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল, হয়তো, বাবী যতদিন পারবেন, কোম্পানি ততদিনই ওঁকে টেনে যাবে। ন্যাচারলি বাবীর আর সেরকম ইনফ্লুয়েন্স থাকতে পারে না।'

হতাশায় আর ভয়ে, পুরন্দরের মুখে অন্ধকার চেপে এলেও নিজের বাবার সম্পর্কে, এত স্পষ্ট খোলাখুলি কথায় ও ভীষণ অবাক হচ্ছিল, এবং রীণাকে যেন অন্যরকম লাগছিল। নিতান্ত মডার্ণ, ফ্যাশানদুরস্ত সিগারেট ফোকা একটি মেয়ে মাত্র নয়। তারপরেই, রীণার চোখ পড়েছিল পুরন্দরে মুখের দিকে। তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'কীহল আপনি একেবারে চুপসে গেলেন যে? ভয় পেয়েছেন না কি?'

পুরন্দর সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল, হতাশ স্বরে বলেছিল, 'মানে আমি খুব আশা নিয়ে এসেছি তো।'

রীণা হেসে উঠে বলেছিল, 'আরে, না ন', আপনার এতটা হতাশ হবার কিছু নেই। বাবী যখন বলেছেন. তখন নিশ্চয়ই একটা কিছু কথাবার্তা হয়েছে। তা নইলে ওরকম চিঠি লিখতেন না। মরা হাতীর দাম লাখ টাকা. জানেন তো।'

মরা হাতীর দাম লাখ টাকা! পুরন্দরের মনে কথাটা যেন আবার খানিকটা আশার সঞ্চার করল।

রীণা আবার বলছিল, 'আমি বলছিলাম, একজন ফুল ফর্মে থাকলে, সে যতটা করতে পারে, বাবীর পক্ষে এখন সেটা কতখানি সম্ভব। আমি আপনার কথা ভেবেই বলছিলাম, আপনি কতখানি আশা করে এসেছেন, তাতো আমি জানি না।'

পুরন্দর বলেছিল, 'যতটুকু না হলে নয়, ততটুকুই। তার বেশী আমি কী আশা করতে পারি!'

রীণা হেসেছিল। বলেছিল, 'ওটা আপেক্ষিক ব্যাপার। সকলের মিনিমাম্ নীড্‌স্ এক হতে পারে না।'

পুরন্দরের মুখে তখন কথা ফুটেছিল। বলেছিল, 'কলকাতার বুকে, একজন দরিদ্র যুবকের যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু।'

রীণা কয়েক পলক পুরন্দরের দিকে তাকিয়েছিল। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল। তারপরে হেসে বলেছিল, 'সেটা বাবী পারবেন।'

পুরন্দরের যেন সহজ নিঃশ্বাস পড়েছিল, কথাটা শুনে। ও প্রায় রীণার দিকেই কৃতজ্ঞ হয়ে তাকিয়েছিল। আর ওকে অবাক করে দিয়ে, রীণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল. 'আপনি কি শরীর চর্চা টর্চা করেন না কি। মানে কোন রকম এক্সেসাইজ?'

পুরন্দর বলেছিল, 'করতাম, এখন আর করি না।'

'আপনার বডি ফর্মেশন দেখে মনে হয়। হাইট নিশ্চই ছ' ফিট?'

পুরন্দর একটু যেন লজ্জা পেয়ে বলেছিল, পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি।'

রীণা ওর দিকে কেমন একটা প্রশংসার চোখে তাকিয়েছিল তারপর ঠোঁটটা কুঁকড়ে, কেমন একটা ঠাট্টার ভঙ্গিতে হেসে বলেছিল, 'এর পরে অবিশ্যি আমি জিজ্ঞেস করব না, আপনার চুলটা আপনি কোথায় কাল্ ড্ করিয়েছেন।'

পুরন্দর অবাক হয়ে, মাথায়, হাত দিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে?'

রীণা রিন্ রিন্ করে হেসে উঠেছিল, এবং হাসির ভারে, ওর শরীর লতিয়ে উঠেছিল। তখন যেন নিজেই একটু লজ্জা পেয়ে বলেছিল, 'না না, সে সব কিছু না, আপনার চুলটা খুব সুন্দর, তা-ই বলছি। আপনি কিছু খেয়েছেন সকালে?'

সমস্ত প্রশ্নগুলোই এত দ্রুত তার অসংলগ্ন, সহসা জবাব জুগিয়ে উঠেছিল না যেন। একটু থেমে বলেছিল, হ্যাঁ, খেয়েছি তো।'

রীণা হাসতে হাসতেই বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার কাছ থেকে আবার ফিরে বলেছিল, 'সারাদিন ঘরে বসে কী করবেন, কিছু বইপত্র ম্যাগাজিন দিন আপনাকে?'

সত্যি, পরম উপকার! ও মাথা কাত করেছিল। একটু পরেই রীণা একরাশ ইংরেজী ম্যাগাজিন, কয়েকটা মিস্ট্রি নভেল এবং সেদিনের খবরের কাগজটা এনে, টেবিলের ওপর রেখেছিল। হাতের ঘড়িটা দেখে বলেছিল, 'যাই' আমার আবার সময় হয়ে এল।'

পুরন্দর যে ধরনের প্রশ্ন সচরাচর করে না, তা-ই করেছিল, 'আপনি চাকরি করেন বুঝি?'

রীণা বলেছিল, 'একরকম তা-ই বলতে পারেন। ফুল টাইমার কোথাও নয়, সপ্তাহে চারদিন, সকালে আর সন্ধ্যায়, দুটো কলেজে, সোস্থাল সায়ান্সের লেকচার দিই। বাবার গাড়িটা আছে তাই রক্ষে, বাবা অফিসে গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দেন, তারপরেই বেরুই। এতক্ষণে এসে গেছে।'

দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে বলেছিল, 'আপনাকে একদিন আমি ঘুরে দেখিয়ে দেব কলকাতাটা, কেমন ?'

পুরন্দরের ঘাড় নাড়বার আগেই, রীণা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর পুরন্দর তখন মনে মনে বলে উঠেছিল, উরে শালা!

এরকম 'শালা' ডেকে অবাক হবার কারণ, আর কিছু নয়, রীণা। রীণার বয়স, পোশাক-আশাক, সাজগোজ, চালচলন, সিগারেট খাওয়া তার সঙ্গে, সোস্যাল সায়ান্সের লেকচারার, কোন রকমই ও যেন মেলাতে পারছিল না। ওই মেয়ে সোস্যাল সায়ান্সের লেকচারার! অনেকক্ষণ ও চুপচাপ বসেছিল। ভেবেছিল, রীণার বয়স কত? পুরন্দরের থেকে বড় নয় নিশ্চয়ই। এর মধ্যেই, এত দূর এগোতে হলে, এর সঙ্গে গাড়ি ড্রাইভ করতে জানাটাও যোগ করতে হবে, কতটা পরিশ্রম করতে হয় মানুষকে।

পুরন্দরকে সত্যি সত্যি ছোট মনে হয়েছিল, নিজের কাছে। সহজেই ধরে নিতে হয়েছিল, রীণা এম. এ. পাশ। কিন্তু এম. এ. পাস মেয়েও তো অনেক, দেখেছে, তারা সবাই রীণা হয় নি। কেউ হতে চায় কী না সেটা পরের কথা, সকলেই হতে পারে কী না, সেটা আগেই জিজ্ঞাস্য।

পুরন্দরের ঠোঁট উল্‌টে গিয়েছিল। ওর সতর্ক অবিশ্বাসী মন বলে উঠেছিল, সবটাই হয়তো সম্ভব করেছে, রীণাদের সমাজ ও পরিবেশ। রীণাদের পরিচিত জগতের সহায়তায়, এসব এমন কিছুই অসম্ভব নয় নিশ্চয়। পুরন্দর আজ হয়তো, অনেক উঁচুতে যেতে পারত মফস্বলের বা কলকাতার অনেক মেয়েই রীণা হয়ে উঠতে পারত। সমাজ পরিবেশ পরিচিত মহল, এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তথাপি, একটা কিন্তু থেকে গিয়েছিল পুরন্দরের মনে। শুধুই কি তা। রীণার নিজের জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা পরিশ্রম চেষ্টা কিনা থেকে পারে। রীণার মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আর রীণার চোখ দুটি, আর সেই মুহূর্তেই ও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাথরুমে আয়নার

সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রীণার মতো মেয়ে অমন প্রশংসার চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছিল কেন? সত্যিই কি প্রশংসা করার মতো পুরন্দরের চেহারা? ইতিপূর্বে, কেউ কেউ নিশ্চয়ই ওর চেহারার প্রশংসা করেছে। রীণার প্রশংসার দাম একটু অন্যরকম।

তারপরেই আয়নায় ওর চোখে পড়েছিল, গায়ের ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জিটার ওপর; ইস্, একেবারেই ভুলেই গিয়েছিল, সেটা পরেই, এতক্ষণ কথা বলেছে রীণার সঙ্গে। লজ্জা করে উঠেছিল। কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না।

পত্র পত্রিকা আর বইগুলো পেয়ে, পুরন্দরের সময়টা মন্দ কাটে নি কয়েকটা দিন মেয়েদের বিষয়ে পত্রিকা ছাড়াও, ছেলেদের সম্পর্কে কাগজও ছিল রীণার সঙ্গে এ কয়দিন রোজই একবার দেখা হয়েছে। সকালের দিকেই বেশী। দুপুরে খাবার সময় রীণা প্রায় রোজই থাকে। টিনি কলেজে যায়। অরুণা ব্যস্ত থাকলে রীণা পুরন্দরকে ডেকে নিয়ে খেতে বসে যায়। চাকরটা খেতে দেয়। ইতিমধ্যে রীণার মুখ থেকে ও শুনেছে, ওর আরো তিন দিদি আছে। তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, এবং সেই সঙ্গেই রীণার বক্রোক্তিও বেজে উঠেছে, 'দিদিরাই বাবীকে অনেকখানি ধ্বসিয়ে দিয়ে গেছে। ভদ্রলোকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট প্রায় শূন্যের ঘরে।'

পুরন্দর অবাক জিজ্ঞাসায় তাকিয়েছে। রীণা বলেছে, 'বুঝতে পারছেন না? বলছি, বাবীর অনেক খরচ হয়ে গেছে অথচ দিদিরা কিন্তু প্রেম করেই বিয়ে করেছিল। তবে একটু বেছেগুছে করেছিল তো, তা-ই একটু বেশীই হয়ে গেছে।'

বলে খিলখিল করে হেসেছে। পুরন্দর সেই হাসিতে যোগ দিতে পারে নি, বুঝতে পেরেছে রীণার হাসির মধ্যে তিক্ততা রয়েছে। রীণা আবার বলেছে, 'তবে দিদিরা বেশ সুখেই আছে বলতে হবে। একজন থাকে সিডনিতে, আর একজন ন্যু-ইয়র্কে। আর এক দিদি লণ্ডনে

থাকলেই, ঘোষ বাড়ির মেয়েদের, তিন মহাদেশ জয় হয়ে যেত। এ ছাড়াও দুই দাদার বিয়ে হয়েছে

বলেই, হুস করে নিশ্বাস ফেলে বলেছে, 'আমার আর টিনির কোন গতি হবে না।' কথা শেষ করবার আগেই খিলখিল করে হেসে উঠেছে। পুরন্দর মনে মনে হিসাব করেছে তিন-দুই-পাঁচ-দুই সাত। সাতটি সন্তানের জনক মণীন্দ্র ঘোষ। পুরন্দরের বাবার থেকে কোন অংশে কম না। যোগ্যতাটা অবিশ্যিই পুরন্দরের বাবার থেকে বেশী। সেটাও আপেক্ষিক সত্য! ওর বাবার তুলনায় মণীন্দ্র ঘোষের যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার্য। দু'জনের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। সেটা তো চাক্ষুষ। রীণার মা অরুণা পুরন্দরের মা হয়ে যায়নি। তিনি এখনো সাজগোজ করেন, ঘুরিয়ে কাপড় পরেন, যেটা ওর মায়ের ব্যাপারে ভাবলে, মাকে রাস্তার পাগলি ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করা যায় না। অরুণা এখনো বাইরে ঘরে বসে, স্বামীর বন্ধু বা পারিবারিক বন্ধু এবং মেয়েদের বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করেন। সিনেমা থিয়েটার দেখতে যান। মেয়েরাও কেউ পুরন্দরের বোনদের মতো হয় নি। টিনি তো পাক্কা মেমসাহেব। রীণাও তাই। তবে একটু অন্যরকম।

পুরন্দর বুঝতে পেরেছে, রীণার চাকরিটা নিতান্ত প্রয়োজনেই। টাকার দরকার তার নিশ্চয়ই আছে। ও ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি ফুল টাইমার হচ্ছেন না কেন?

রীণা ঠোঁট উলটে বলেছে, 'আই ডোণ্ট লাইক। অন্তত এরকমের চাকরিতে আমার হোলটাইমার হতে একেবারেই ইচ্ছে করে না। পরিশ্রমটা কম, তাই করি।'

পুরন্দর তারপরে আর জিজ্ঞেস করতে পারেনি, কোন্ বিষয়ে রীণার উৎসাহ, কি হতে চায় সে। সকালে দেড় ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দেড় ঘণ্টার চাকরী ছাড়াও রীণার জগৎ বিস্তৃত। সে কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে ঘোরে পুরন্দর কিছুই জানে না, রাত্রের দিকে, প্রায় কোনদিনই

রীণার সঙ্গে ওর দেখা হয় না। রীণা কখন ফেরে, তাও ও জানতে পারে না। সবটা জানলে হয়তো বুঝতে পারত, রীণার কিসে উৎসাহ কি হতে চায় সে।

তবু, এসব কথারই ফাঁকে ফাঁকে রীণা ওকে কখনো হ্যাণ্ডসাম' বলে প্রশংসা করেছে। হয়তো তা প্রশংসার থেকে কিছু বেশীই হবে। রীণার প্রশংসার সময়, তার চোখ দুটো এমন ঝিলিক দিয়ে ওঠে, পুরন্দরের কোথায় যেন, পুরুষ মনটা চমকে ওঠে। অথচ সেই চমকের কোন প্রকাশ ওর মধ্যে ফোটে না। ফোটা সম্ভব নয়। নিজের কথাটা ও কখনো ভোলে না।

রোজ বিকেল হলেই, ও দরজাটা খুলে বসে থাকে। মণীন্দ্র যখন আসেন, তখন যেন ওকে দেখতে পান। যদি ওঁর ডিরেক্টর এসে থাকেন, তাহলে যেন কিছু বলতে পারেন। কিছু একটা শোনবার আশায় ও রোজ বসে থাকে। ক'টা দিন কেটে গিয়েছে, কিছুই শুনতে পায় নি পুরন্দর। না শুনতে পাক, অন্তত ও যে আছে এটাও মনে করিয়ে দেবার জন্য ওর বসে থাকা উচিত বলে মনে করে। কে জানে, উনি হয়তো ভুলেই যান, পুরন্দর আছে, অপেক্ষায় আছে। এই নিঃশব্দে মনে করিয়ে না দিলে, এ বাড়িতে কারুর মাথা ব্যথা নেই নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দেবার।

কিন্তু মণীন্দ্র আসেন, ক্লান্ত অবসন্ন। মাথা নীচু করে চলে যান বাড়ির ভিতর দিকে, মন্থর ঢপ্ ঢপ্ শব্দ তুলে। দেখলেই বোঝা যায়, বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু উপায় নেই, ঘাড়ের বোঝায় উনি যেন বেঁকে আছেন। মাথা তুলতে পারছেন না। ও জানতে পেরেছে এ বাড়িটাও ভাড়া, গ্যারেজসহ মাসে সাড়ে তিনশো টাকা। অথচ এই লোকের কথাই, কত রঙ চড়ানো অবস্থায় শুনেছিল। মণীন্দ্রকে দেখলেই পুরন্দরের ভিতরটাও অন্ধকার হয়ে আসে। দিনের আলো চলে গেলে যেমন, পাখির চোখে, একটা অসহায় ভয় এবং অনিশ্চয়তা জেগে ওঠে, মণীন্দ্রকে দেখবে, ওরও সেই রকম হয়। এই ভাড়া

বাড়ি, গাড়ি, পার্টটাইম ড্রাইভার, সংসার ও জীবনকে বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, পিছনে একটা নিষ্ঠুর আর অসহায় দৈন্যতা রয়েছে। যা বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। একটু ঘনিষ্ঠ না হলে, কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়।

মণীন্দ্রবাবু বাড়ি আসার পরেও, রোজই আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পুরন্দর। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। অনেক সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে ; লেকের ধারেও যায়। ঘুরতেই বেশী ভালো লাগে। অনেক বেশী দেখা যায়। কিন্তু ওর শান্তি নেই। এই দিন বারোর মধ্যে, ও একটা চিঠি বাড়িতে দিয়েছে। ওর বাবার দুটো চিঠি এসেছে। চিঠির বক্তব্য, 'মণীন্দ্র ঘোষ মস্ত বড় মানুষ, তাঁহাকে সর্বদা শ্রদ্ধা ও সমীহ করিবে, তাঁহার মন জোগাইয়া চলিবে যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিবে।'···জমিদারী সেরেস্তার হস্তাক্ষরে, সেই চিঠিগুলো পড়তে পড়তেই, ওর মাথায় যেন রক্ত উঠে যায়। দলা পাকিয়ে চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'নিকুচি করেছে তোমার উপদেশের। লোকটা সব সময়ে যেন ভাঁড়ামি করছে।'

এ ছাড়া পুরন্দরের আর কিছু মনে হল না। চিরটাকাল লোকটির উপদেশে শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। চিঠিতেও সেই একই বয়ান। এরা ভুলে যায়, চিন্তা ভাবনার ব্যাপারগুলো, কারুর একচেটিয়া নয়। ছেলে হলেই বাপের উপদেশ দিতে হবে! 'কেলাটা!' নিজের মনে মনে বলে ওঠে ও। বাবা হলেই উপদেশ দেবার অধিকার জন্মায় না।

মণীন্দ্র ঘোষের পরিবার সম্পর্কেও পুরন্দরের ঠোঁটের কোন্‌টা ক্রমাগত বেঁকে উঠছে। প্রথম দিন যেরকম একটা ভয় সমীহ সংকোচ নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল, দু'সপ্তাহ পূর্ণ না হতেই, সে সব কোথায় ধুয়ে মুছে গিয়েছে? ওর বাবার প্রতি যেরকম একটা ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের ভাব আছে, মণীন্দ্রর প্রতিও ক্রমে সেই ভাব আসছে। অরুণার প্রতিও সেই ভাব, সবটাইই ছলনা। টিনির বিষয়ে তো কোন কথাই নেই।

টিনি যখন ওর পাশ দিয়ে কোমর ঘুরিয়ে ঠসক করে চলে যায়, তখন শুধু একটা কথাই ওর মনে হয়, গেদে এক লাথ্ থি ওর পাছায়।

তবে ওর মুখের ভাবে সে সব কিছুই বোঝা যায় না। বরং একেবারে উলটো। প্রথম দিন যেমন ছিল, বাইরে থেকে, এখনো সেইরকমই আছে। যদিও মাঝে মাঝে ওর মনটা চকিত হয়ে ওঠে, মণীন্দ্র ঘোষের পুরনো দিনের কথা মনে করে। হয় তো একজন আপস্টার্ট ভদ্রলোকের এটাই পরিণতি, কোন বনেদীয়ানার সূত্রই এর মধ্যে নেই। কয়েক পুরুষের ট্রাডিশন নয়। তথাপি, মনীন্দ্র ঘোষ, সেল্‌ফ-মেড ম্যান এখন ওঁর জীবন থেকে রৌদ্র চলে গিয়েছে, রৌদ্রের তেজ গিয়েছে, অস্তাভার রক্তিমতাও হয়তো নেই। যা আছে, তা কেবল সারা দিনের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ মাত্র।

সেই উত্তাপের মধ্যে, এ পরিবারের চিন্তা ভাবনা আচরণ দেখলে মনে হয়, তারা যেন প্রখর রৌদ্রের তেজেই জীবন যাপন করছে। একমাত্র রীণা ছাড়া। রীণাকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না ওর বেশভূষা, কথাবার্তা, চালচলন, সবই অন্য কথা বলছে। কিন্তু রীণার ভিতরটা ফুটছে, জ্বলছে। রীণার কথা থেকেই তা বেরিয়ে আসে। বাবার প্রতি রীণার হয়তো একটু করুণা আছে, তাই কথাবার্তার ভাষাটা একটু অন্যরকম শোনায়। অন্যথায়, মনে হয় বাবার বিষয়ে ওর মনোভাবটা অনেকটা পুরন্দরের মতোই। হয়তো নিজেদের অবস্থার বিষয়ে, সকলেই সচেতন এ বাড়িতে, কিন্তু সেই অবস্থার থেকে একমাত্র রীণাই বোধহয় মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসতে পারে। তা না হলে, রীণা পুরন্দরের কাছে আসত না, এত কথা বলত না। সেইজন্য, রীণা-ই ওর কৌতূহল, রীণাতেই ওর আগ্রহ।

তবে, এসব তো কিছুই না। পুরন্দরের তো মনে হয়, ওর জীবনেও যেন বেলা পড়ে এল। ও যেন একটা দ্বীপে আবদ্ধ হয়ে আছে, কোনদিকে বেরুবার পথ নেই। কবে মণীন্দ্রর ডাইরেকটর আসবেন, কবে কথা হবে। ভিতরে ভিতরে একটা ভয়, এবং একই

সঙ্গে একটা ক্ষুব্ধ বিদ্রূপে, নিজেকে নিজেই হুল ফোটাচ্ছে। ও যে কলকাতায় এসেছে, এখনো পর্যন্ত সেই কলকাতার কোন ডাক এল না।

বেলা দশটা নাগাদ রীণা এসে ঘরে ঢুকল। যেন ঘরটা ঝলকে উঠল। এখন মনে হয়, রীণার ঘাড় ছাঁটা চুলের সঙ্গে, চোখের ওপর পাতার মোটা কাজলে, ঠোঁটের রঙে, নাভির নীচে থেকে খোলা, উদ্ধত বুকের নিচে পর্যন্ত যে একটা রুক্ষতা আছে, সেটা না থাকলে ওকে মানাত না। সম্ভবত না সাজলে, একটি ডাগর চোখ, টিকলো নাক, ফর্সা ফর্সা, শান্ত মেয়ে বলে মনে হত। ঘরেতে ওর ঝলক লাগল, একটা গন্ধ ছড়িয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কী করছেন?'

পুরন্দর রীণারই দেওয়া একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। কিন্তু একেবারে খালি গা, পুরনো একটা প্যান্ট পরা। ম্যাগাজিনটা সহ, দু'হাত বুকের ওপর জড়ো করে, ও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল বলল, 'এই বসে আছি।'

রীণা পুরন্দরের আপাদমস্তক একবার দেখল। রীণার এই দেখাটার মধ্যে এমন কিছু আছে, যেটা ওকে লজ্জা আর অস্বস্তি এনে দেয়।

রীণা বলল, 'আপনার ফিগার সত্যি সুন্দর।

পুরন্দর সে কথায় কোন জবাব দিল না রীণাও তা প্রত্যাশা করেনি। বলল, 'বাবী গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার আজ মর্নিং লেকচার নেই। চলুন আপনাকে নিয়ে আজ একটু বেরোই

পুরন্দরের মনটা খুশিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল। আবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, রীণার এই করুণা গ্রহণ করাটা ঠিক হবে কী না। ওর মতো একটা ছেলে রীণাকে কতক্ষণ খুশি করতে পারবে।

কিন্তু রীণা, সেসব চিন্তার ধারে কাছেও ছিল না। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার জামা-টামাগুলো সব কোথায়?'

পুরন্দর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন ?'

'একটু দেখি।'

পুরন্দর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'তা যদি দেখেন, তা হলে আর আমাকে সঙ্গে নিতে পারবেন না।'

'কেন ?'

রীণার ভুরু কুঁচকে উঠল। পুরন্দর হেসে, দ্বিধা করে বলতে গেল, 'মানাবে না।' কিন্তু সে কথা, না বলে, বলল, 'সবই বিচ্ছিরি। আমি আমার জামা-টামা সব সময়েই ব্যাগে ভরে রাখি।'

রীণা বলে উঠল, 'খুব ওস্তাদ লোক আপনি। বিশ্রী সুশ্রীর কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি। আমি যা বলব, আপনি তাই পারবেন, আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি থাকবে কেন। তবে আপনার বলে দেবার মতো জামা-কাপড়ও আমার নেই।'

হয়তো, এ ব্যাপারে মনে মনে একটা লজ্জা ও ক্ষোভ পুরন্দরের মনে জমতে পারত। কিন্তু রীণা যে ভাবে নিজেই ব্যাগ খুলে সব টেনে টেনে বের করতে লাগল, তাতে ও হেসে ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিরুপায় হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রীণার বাছাবাছি দেখতে লাগল। যদিও পুরণো গেঞ্জি, জাঙিয়া, লুঙ্গি ইত্যাদি গুলোর জন্যে ওর ভীষণ লজ্জা করতে লাগল, তথাপি লজ্জাটাকে রীণা যেন নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা ধোয়া চেক শার্ট আর কালো মোটা প্যাণ্ট বের করে, চোখের সামনে তুলে দেখল। তারপরে ঘাড় কাত করে বলল, 'এগুলো পরে নিন।'

পুরন্দর জামার হাতটার ভাঁজ খুলে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন, ছেঁড়া।'

রীণা দেখল, বলল, 'তা হোক, নীচের দিকে আছে, হাতাটা গুটিয়ে নিন জুতো কোথায় ?'

পুরন্দর দেখাবার আগেই, লম্বা শোফার নিচে জুতো জোড়া

দেখতে পেল রীণা। বলল, 'ঠিক আছে। তৈরী হয়ে নিন, আমি আসছি।'

বলে যেতে গিয়ে ফিরল। বলল, নিশ্চয়ই চান করেনি নি ?'

পুরন্দর বলে উঠল,'সকাল থেকে একমাত্র এই কাজই তো প্রাণভরে করি।'

রীণা অবাক হয়ে বলল, 'চান !'

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। পুরন্দরের চোখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত দেখল। যেতে যেতে বলল, 'বুঝেছি।'

পুরন্দরের মনটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে রইল। রীণার সঙ্গে গাড়ি চেপে বেড়াতে যাবার খুশির ঝলকের মধ্যে, একটা বিষণ্ণতা জেগে উঠল। এমন করে বেড়াতে না গেলেই বা কী হত ?

চাকরটা এল। সোফার নিচে থেকে জুতো জোড়া তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে ?

চাকর বলল, 'পালিশ করে দেব।'

লোকটা রেগে গিয়েছে কী না বুঝতে পারল না। কিন্তু দ্বিধা করে লাভ নেই। রীণাকে রাগিয়ে লাভ নেই, নিজেরই ক্ষতি। যেটুকু আশা আছে, তাও হয়তো যাবে। ও জামা প্যাণ্ট পুরে তৈরি হল। একটু বাদেই, চাকরটা জুতো জোড়া ঝকঝক করে দিয়ে গেল। রবারের দাড়া ভাঙা ময়লা চিরুনিটা দিয়ে মাথা আঁচড়ে নিল বাথরুমে গিয়ে। বেরিয়ে এসে দেখল, রীণা ঘরে ঢুকছে।

ওকে দেখেই বলল, 'ঠিক আছে। দেখি এদিকে আসুন। আপনার হাতাটা আমিই গুটিয়ে দিই।'

'ঠিক আছে, আমিই—।'

'দূর, আপনি কী করবেন। আমার মতো কি আর আপনি পারবেন, না, কলকাতার ছেলেদের মতো, ছেঁড়া তালি ঢাকতে শিখেছেন। কলকাতার ছেলেরা হল শিল্পী, বুঝলেন ? ছেঁড়া জামাকাপড় কিভাবে ম্যানেজ করে ফিট বাবু সাজতে হয় সেসব ওরা জানে। আর

জানি আমরা, মেয়েরা। ছেঁড়া শাড়ি এমন করে পরব, আপনার চোখ ঘুরে যাবে।'

বলেই রীণা হেসে উঠল। হাসিটার মধ্যে নিছক মজা আছে বলে মনে হল না, একটা তিক্ততাও আছে, পুরন্দর হাসতে পারল না। বাধ্য ছেলের মতো দাঁড়িয়ে রীণার হাত গুটানো দেখতে লাগল। রীণার নিঃশ্বাস ওর গায়ে লাগছে। গা থেকে ওর প্রসাধনের ও শরীরের গন্ধ বেরোচ্ছে। প্রথম দিনের রীণা, আজকের রীণা, অনেক তফাত। পুরন্দরের মন সব সময়েই, সব কিছুর পিছনে কার্যকারণ খুঁজে বেড়ায় ভাবল, ওর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতায় রীণার কি লাভ। কোন লাভই নেই, উপরন্তু রীণাদেরই ঘাড়ের বোঝা। তাহলে, সম্ভবত, রীণার করুণাটুকু অন্তত, একেবারে দেখতাই নয়। কিন্তু, রীণার কথাগুলোর মানে কি সত্যি কি ও ছেঁড়া শাড়ি ম্যানেজ করে পরে।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। এই যে ধবধবে সাদা, কাঁচের মতো স্বচ্ছসিলক্ শাড়ি, সাদা রেশমের এমব্রয়ডারি করা পাড়, ও পরেছে, এর কোথাও ছেঁড়া থাকতে পারে, ঈশ্বরও কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু ওর কথাগুলো যেন কেমন, হাসি জ্বালায় মেশানো।

হাতা দুটো রীণা একটু বেশী তুলে গুটিয়ে দিল। সরে গিয়ে, একবার দেখে বলল, 'ও-কে। চলুন।'

বাঁ হাতে ওর সুন্দর ব্যাগ। ডান হাতের আঙুলে, রিঙ জড়ানো চাবির ছড়া পুরন্দর ওর সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে এল। দরজার সামনে বাঁধানো চত্বরের ওপরেই গাড়িটা ছিল। রীণা আগে গিয়ে উঠল ষ্টিয়ারিং হুইলের সামনে। পাশের দরজাটা খুলে ডাকল, 'আসুন'।

প্রথম দিন বিকালের ছবিটা পুরন্দরের চোখের সামনে ভেসে উঠল। যদিও ও মনে করেছিল, রীণা ওকে হয়তো পিছনে বসতে বলবে। রীণা চোখের সানগ্লাস লাগিয়ে গাড়িটা ব্যাক করে নিয়ে, পাড়াটা পার হবার সময়েই, একটা শিস্ শোনা গেল, সেই সঙ্গে একটা আওয়াজ, 'মর যাউঙ্গা।'

রীণার মুখে কোন অভিব্যক্তি ফুটল না। চোখের দৃষ্টি তো ঢাকাই। কিন্তু ও হঠাৎ বলে উঠল, 'কী হল, আপনার মুখ শক্ত হয়ে উঠল কেন। রেগে গেলেন?'

পুরন্দরের মুখ সত্যি শক্ত হয়ে উঠেছিল, ছেলেগুলোর ব্যবহারে। বলল 'ভালো লাগে না।'

রীণা হেসে বলল, আমার বেশ মজা লাগে, আই এনজয়।'

পুরন্দর চোখ ঢাকা রীণার দিকে ফিরে তাকাল। রীণার মুখ সামনের দিকে। বলল, 'ওদের আমি খুব দোষ দিই না। কী করবে বলুন। পড়াশোনার দফা গয়া হয়েছে, বেকার, বাবা মাকে ভালো লাগে না, ভাই বোনদের সঙ্গে হেসে খেলে থাকতে পারে না, যাদের দেখে ভালো লাগে, তাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ নেই. ওরকম একটু করুকই না।

বলতে বলতেই, গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিল একটা পেট্রোল পাম্পে। মিটারের পাশে ব্যাগ কাঁধে লোকটাকে বলল, 'পাঁচ লিটার।'

পাশে রাখা ব্যাগ থেকে টাকা বের করতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল কথা বলছেন না যে?'

পুরন্দর বলল, কী বলব বলুন। আপনি ছেলেগুলোর সম্পর্কে যা যা বললেন, সবগুলোই প্রায় আমার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু—।'

চোখ ঢাকা থাকলেও, রীণা এমনভাবে মুখ তুলে তাকাল, বোঝা যায়, ও অবাক হয়েছে। কিন্তু কথা না বলে পেট্রোলের টাকাটা মিটিয়ে গাড়ি স্টার্ট করে, চলতে আরম্ভ করল। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক ওদের মতোই কী?'

'প্রায়।'

'তা হলে আপনাকে আমি নর্মাল বলব না, অথবা সামথিং এক্সট্রা অর্ডিনারি।'

'কেন?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। আসলে অপনি গোলমেলে! যাতে

তাতে সুখী হতে পারেন না অসুখী লোক, অতএব দুঃখ আপনার কপালে আছে।'

রীণা এমনভাবে বলল পুরন্দরের হাসি পেল। রীণাও হাসল, ঠোঁট টিপে। বলল, 'যদিও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, আপনার কখনো কোন বান্ধবী জোটে নি।'

কথাটা বুঝতে অসুবিধা হল না। রীণা বলতে চাইছে অন্তত মেয়েদের সঙ্গে কিছুটা মেশবার সুযোগ ওর জীবনে নিশ্চয়ই এসেছে। পুরন্দর যেন একটু লজ্জা পেল, কথা বলল না। কিছু পায় নি, তা বলা যাবে না, কিন্তু না পেলে কি, ও মেয়েদের দেখে শিস দিত, আর চিৎকার করত। যারা পেয়েছে, ওর অনেক বন্ধুদেরও ওসব করতে দেখছে।

'চুপ করে বসে কেন, সিগারেট খান।'

রীণা যে কখন পুরন্দরের দিকে কি ভাবে দেখছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রীণার চোখে কালো ঠুলি। পুরন্দর পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেটের প্যাকেট আনে নি। এমন কি, ওর শেষ পুঁজি, সামান্য কয়েকটি টাকা যে রুমালে বাঁধা, সেটাও ব্যাগে ঢোকানো আছে। ভীষণ লজ্জা করতে লাগল। কিছু না বলে, চুপচাপ বসে রইল।

রীণা বলল, 'কি হল, সিগারেট নেই?'

'ফেলে এসেছি।'

'আমার ব্র্যাণ্ডও তো আপনার সফট্ লাগবে। তা হলে কিনে নেওয়া যাক।'

পুরন্দরের ঘাম বেরুতে লাগল। কি করে বলবে পয়সাও নেই ওর কাছে। ও বলতে গেল, সিগারেটের দরকার নেই। তার আগেই রীণা একটা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। বলল, 'যান নিয়ে আসুন।'

পুরন্দর অথর্বের মত বসে রইল, বলল, 'থাক না'।

রীণা চোখের ঠুলি খুলে, ঘাড় নামিয়ে পুরন্দরের মুখের দিকে ভুরু

কুঁচকে তাকাল। বলল, 'তার মানে?'

নিরুপায় হয়ে ওকে বলতে হল, 'টাকা আনতে ভুলে গেছি।'

রীণা হেসে উঠল, বলল, 'বাব্বা, খুব দেখালেন বটে। নিন, এখন ধার দিচ্ছি, বাড়ি ফিরে শোধ দেবেন।'

ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের করে দিল। প্রথমে একটু দ্বিধা করল, তারপরে ওর মন বলে উঠল, ধার তো। আর তাও যদি না হয়, দিতে চাইছে দিক, লজ্জা করে কী হবে। এরকম পাওয়া গেলে মন্দ কি।

কিন্তু মুখটা নিপাট লজ্জিত ভালমানুষের মতো করে, টাকাটা নিয়ে, এক প্যাকেট সিগারেট কিনে এল। রীণা দেশলাইটা আগেই বের করে রেখেছিল। ও সিগারেট ধরাল।

গাড়ি এখন ময়দানের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। রীণা বলল, আপনার ডান দিকে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। দূরে চৌরঙ্গি। চলুন, আপনাকে নিয়ে গঙ্গার ধারে যাই।'

গঙ্গার ধারে একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে, রীণা নিজে একটা সিগারেট ধরাল। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে বলল, 'আপনি দুশ্চিন্তায় আছেন, না?'

রীণা হঠাৎ কথাটা কেন বলল, পুরন্দর এক মুহূর্ত ভাবল। রীণার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'খুবই।'

'ধরুন যদি বাবী আপনাকে চাকরিটা না দিতে পারেন।'

পুরন্দরের মনটা এক অজানা ভয়ে কালো হয়ে উঠল। রীণা সেরকম কিছু শুনেছে না কি! বলল, 'ভাবতে পারি না।'

রীণা চুপচাপ বসে সিগারেট খেতে লাগল। পুরন্দরের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'সেরকম, কিছু শুনেছেন না কি?'

'না না, কিছুই শুনি নি। বাবীদের ডাইরেক্টর তো এখনো ফেরেন নি। আপনার অবস্থাটা ভেবেই এসব কথা মনে এল। ভয়ের কিছু নেই।

রীণা এমন ভাবে বলল, যেন সত্যি ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু পুরন্দরের বুকের ভিতরটা থরথর করতে থাকে।

রীণা নিজেই আবার বলে উঠল, 'যাকগে, এসব প্রসঙ্গ থাকুক হোয়াট ইজ ইওর অ্যাটিচুড টু লাইফ।'

বিষয়ান্তরের দ্রুততা এত বেশী, পুরন্দর খেই ধরতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

'মানে, জীবনকে কি ভাবে দেখেন দেখতে চান আপনি?'

পুরন্দরের কোন জবাব এল না মুখে। বরং ওর মনের ভিতরে একটা বাঁকা জিজ্ঞাসা ঝিলিক দিয়ে গেল, রীণাদের মতো মেয়েদের প্রেমে পড়ার লক্ষণ এরকম না কি! কিন্তু রীণার কি প্রেমে পড়া এখনো বাকি আছে।

এক নয়, একাধিকও কি বাকি আছে। ও বলল, 'বলতে পারছি না।'

রীণা একটু হেসে উঠল, 'তার মানে কথাটা ঠিক ভেবে উঠতে পারছেন না। চলুন, আরো একটু ঘোরা যাক।'

সিগারেট ফেলে দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে চলল। ফোর্ট উইলিয়াম দেখাল আঙুল দিয়ে। সব কিছুই দেখাতে দেখাতে' বলতে বলতে নিয়ে চলল, হাইকোর্ট, গবরনরস্ হাউস, জি, পি, ও ঘুরে আবার চৌরঙ্গি। রীণার কাছ থেকে পুরন্দরের দূরত্বটা কম না, তবু, রীণার শাদা সিল্ক শাড়ির আঁচল, অনেক দূর থেকেই যেন ওর গায়ের ওপর এসে পড়ছিল। রীণা আঁচল টেনে নেয় নি। কাঁধ আর পেট কাটা ছোট জামায় রীণার শরীরের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। সামনের দিকে বুকের এক অংশে আঁচল ঢাকা পড়েনি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে রীণার শরীরটা দুলছিল, কপালের সামনের দিকে, চুলে দু-একটা কিলিপের আঁটুনি থাকলেও গালের ওপর চুল এসে পড়ছিল। চুল ওর পিছন দিকে উড়ছিল, ঘাড়ের কাছে ঝাপটা খাচ্ছিল। রীণা অনায়াসে গাড়ি চালাচ্ছিল।

বড় বড় গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে দ্রুত ওভারটেক করে, কখনো জোরে ব্রেক কষে,এমনভাবে যাচ্ছিল, যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

পুরন্দর বাইরের দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছিল, রাস্তার অনেক লোক রীণাকে দেখছিল, রীণার পাশে পুরন্দরকেও। পুরন্দরের তখন লজ্জা করছিল, ইচ্ছা করছিল রীণার আঁচলা ওর গায়ের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু রীণা পাছে কিছু মনে করে, ভাবে যে, পুরন্দর এটা পছন্দ করছে না তাই সরিয়ে দিতে পারে নি। যদিও পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্ন ছিল না, আসলে রাস্তার লোকেরা কি ভাবছে তা-ই মনে করে ওর মনে হয়েছিল, হয়তো, রীণার মতো মেয়ের পাশে ওর মতো জামাকাপড় পরা লোককে ড্রাইভার ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না। আর তখনই ওর নিজেকে বিদ্রূপ ও ধিক্কার না দিয়ে পারে নি। এই রীণাকে নিয়ে একটু আগেই ও ভাবছিল, রীণাদের মতো মেয়েদের প্রেমে পড়ার লক্ষণ এই রকম না কি। অর্থাৎ পুরন্দরের সঙ্গেও রীণা প্রেম করতে চাইছে।

চৌরঙ্গিতে এসে যখন গাড়ি থেমেছিল তখন আর রীণার সম্পর্কে ওরকম ভাবত পারছিল না বরং নিজের মনের সাহসকেই ধিক্কার দিচ্ছিল। আসলে রীণা ওকে করুণা করছে। লাই পেলে না কি কুকুর মাথায় ওঠে। পুরন্দরের মনে হয়েছিল রীণার সম্পর্কে ওর চিন্তটাও সেইরকম, হঠাৎ মাথায় উঠে বসেছিল। আসলে ও রীণার প্রশ্নটাই ধরতে পারে নি। রীণা জানতে চেয়েছিল, জীবন সম্পর্কে পুরন্দরের ধারণা কী জীবনটাইে কী ভাবে দেখতে চায়। কথাটা নিজেও পুরন্দর কোনদিন ভালো করে ভেবে দেখে নি, বা ভাবলেও, এ বিষয়ে কোন সম্যক জিজ্ঞাসা জাগে নি।

গাড়িটা থামিয়ে, রীণা নিজে থেকেই আঁচলটা টেনে নিল। ডান হাতের কব্‌জি ঘুরিয়ে, ঘড়ি দেখে বলল, 'চলুন, আপনাকে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আপনার দিকের কাঁচটা তুলে দিয়ে, নেমে দরজাটা লক করে দিন।'

ভাগ্য ভালো, অন্তত এ কাজটুকু পুরন্দরের জানা ছিল। কাঁচটা তুলে দরজা খুলে নেমে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা চেপে দিল। টেনে দেখল, বন্ধ হয়েছে। রীণা গাড়ির চাবি নিয়ে, দরজা লক্ করে নেমে এল। চৌরঙ্গির এ অঞ্চলটা, হোটেল সিনেমার এলাকা ছাড়িয়ে, পার্কস্ট্রিটের মোড় পেরিয়ে একটু নিরালা। রীণা গাড়টা পার্ক করছে, মাঠের ধারে গাছতলার ছায়ায়, যেখানে আরো অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

রীণা গাড়ি থেকে নেমে আর একবার পুরন্দরকে দেখল। এখন ওর কালো সানগ্লাস,, চোখ নয়, হাতে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় যেমন পরীক্ষকের চোখ নিয়ে দেখেছিল, এখন ঠিক সেইরকম না। একটু যেন অন্যরকম, পুরন্দর সেটা বুঝিয়ে বলতে পারে না। রীণা একটু হাঁসল ঠোঁট টিপে চোখে যেন একটু ঝিলিকও হানল। ব্যাগ খুলে, একটি ভাঁজ করা রুমাল বের করে সানগ্লাস মুছে নিয়ে, চকিতের মধ্যেই, একটা ছোট্ট আয়না বের করে নিজের মুখটা একবার দেখে নিল। তারপরে ডাকল, 'আসুন। কেয়ারফুলি রাস্তা ক্রশ্ করবেন।'

রাস্তা পার হয়ে, পেভ্মেণ্টের ওপর দিয়ে, দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তায় যানবাহনের ভিড়। বাস ট্রামস্টপে, মানুষ—মেয়ে আর পুরুষের ভিড়। কলকাতায় যে এতরকমের বড় বড় সুন্দর প্রাইভেট গাড়ি আছে, আগে কোনদিন পুরন্দর দেখে নি। আর ওর সব থেকে আশ্চর্য লাগছে, ট্রাম আর বাস ষ্টপ, অনেক মেয়েরই পোশাক আশাক চুলের ছাঁট প্রসাধন অনেকটা রীণারই মতো। অথচ তারা প্রাইভেট গাড়ির যাত্রী নয়। ট্রাম বাসের জন্য অপেক্ষা করছে শুধু মেয়েরাই না, পুরুষদের মধ্যেও, অনেকেরই পোষাক দেখে বোঝাবার উপায় নেই, তারা কেন পায়ে হেঁটে চলছে, তারা কেন বাস ট্রামের ভিড়ে, জোর করে ওঠবার জন্য মুখিয়ে আছে। কলকাতা শহরটা সত্যি আজব।

'নো মোর, আমরা এখানেই যাব!'

রীণার গলার স্বরে, পুরন্দর চমকে দাঁড়াল। রীণা ওর দু'হাতে পিছন, একটা বিল্ডিং-এর প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পুরন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে, হেসে হাতছানি দিল, বলল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

পুরন্দর তাড়াতাড়ি পেছিয়ে এসে বলল, 'বুঝতে পারি নি।'

রীণা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে, মার্বেল পাথরের বারান্দা দিয়ে খানিকটা গিয়ে লিফটের সামনে দাঁড়াল। লিফট তখন ওপরে, রীণা ঘণ্টার বোতাম টিপল। পুরন্দরের দিকে ফিরে তাকাল। বলল, 'আলাপ মানে কী, অ্যাজ ইফ, আপনি আমার সঙ্গে এসেছেন। আপনাকে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যই যে আমি যাচ্ছি, সেটা আমি বলতে চাই না।'

পুন্দর ব্যাপারটা বুঝতে পারল না, কিন্তু কিছু বলল না। রীণা যা বলেছে তার মেনে নেওয়াই উচিত যদিও ওর চোখে একটা জিজ্ঞাসা জেগে রইল। রীণা যেন সেটা বুঝেই, ঠোঁট টিপে একটু হেসে আবার বলল, 'কোন কিছুতেই সোজা গেলে হয় না, একটু বেঁকেচুরে যাওয়া, এই আর কী। আসুন, দুশ্চিন্তা করতে হবে না। বী ফ্রি।'

লিফট নেমে এসেছে ইতিমধ্যে। দরজা খুলে গেল। রীণা আগে ঢুকল, পিছনে পিছনে পুরন্দর। রীণা বলল 'ফোর্থ ফ্লোর।'

পুরন্দরের মনে হল, লিফট্‌ম্যানটা যেন যন্ত্রের মানুষ। লিফট্‌ নিয়ে নিচে নেমে এল, দরজা খুলে দিল, রীণার কথা শুনল, দরজা বন্ধ করল, লিফট্‌ উঠতে লাগল, এক ভাবে, সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু রীণার কথা ও বুঝতে পারেনি। রীণা সোজা বাঁকা চোরার কথা কেন বলল।

লিফট্‌ থামল, দরজা খুলে গেল, রীণা আগে বেরিয়ে এল। ওপরে মোজাইকের বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সামনেই একটি বড় ঘর। ঘরের এক পাশে, কোণ নিয়ে একটি টেবিলের সামনে : প্রায় রীণার মতোই পোশাক-আশাক, একটি মেয়ে বসে রয়েছে। সামনে প্লাস্টীক বোর্ডে

লেখা, রিসেপশন। বাঁ দিকে টেলিফোন। ঘরটার চারদিকে প্লাইউডে মোড়া। কিছু চেয়ার টেবিলটাকে ঘিরে রয়েছে। একদিকের প্লাইউডের দেওয়ালে একটা হাতল দেখে বোঝা যায়, ভিতরে যাবার দরজা রয়েছে।

রিসেপশনের মেয়েটি হেসে, রীণাকে বলল, 'আসুন।'

রীণা বলল, 'মিঃ মুখার্জি আছেন না কি?'

'আছেন

'বথ্ সীনিয়র এ্যাণ্ড জুনিয়র?'

রিসেপসনিস্ট মেয়েটি বলল, 'বথ্ আর ইন দেয়ার রুম, অ্যাণ্ড নো ভিজিটরস।'

রীণা বলল, 'থ্যাংকু।'

হাতটা একটু নেড়ে, রীণা বন্ধ দরজার দিকে যেতে যেতে, পুরন্দরকে ডাকল, 'আসুন।'

না ডাকলেও, পুরন্দর বোধহয় যেতই। এখন রীণাকে ছাড়া ও অনেকটা অসহায় বোধ করছে। কলকাতা শহরের ঠিক এরকম একটা পরিবেশে আরে আর কখনো আসে নি। রীণা দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। যেন অন্য একটা জগতে ঢুকে এল। একটা সরু ফালি কানাগলির মত লম্বা জায়গা। দুপাশেই প্লাইউডের দেয়াল। নিচে জুট কার্পেট পাতা। ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একজন সাদা প্যাণ্ট আর কোর্ট গায়ে দেওয়া লোক টুলে বসেছিল। সে দাঁড়াল। কপালে হাত ঠেকিয়ে, রীণাকে সেলাম ঠুকল। রীণা ঘাড়টা একটু নাড়ল।

এই সরু ফালির মধ্যে, ফ্লুরেসেণ্ট আলো না থাকলে, অন্ধকার দেখাত। লোকটা যেখানে বসেছিল, সেখানে, ডানদিকে একটা দরজা রয়েছে। দরজাটা আধ খোলা! মনে হয় ভিতরে লোক রয়েছে। বাঁ দিকে দুটো বন্ধ দরজা। একটাতে লেখা আছে, ডি, কে, মুখার্জি। আর একটাকে লেখা আছে এস, কে, মুখার্জি।

রীণা ডি, কে, মুখার্জির দরজাটাই ঠেলল, বলল, 'আসতে পারি?'

পুরন্দর দেখছিল, রীণার মুখে হাসি, গলায় এমন একটা সুর, যেন মিষ্টি মাখানো রয়েছে পুরন্দর মোটা আর ভারী গলা শুনতে পেল, 'অ ইয়েস্, ইয়েস্।'

রীণা আবার বলল, 'আমার সঙ্গে আর একজন আছেন।'

সেই গলা শোনা গেল, 'ওয়েলকাম টু হার টু-উ-উ।'

রীণা যেন লজ্জিত হয়ে বলল, 'একটি ছেলে।'

বলেই রীণা একটু ঘাড় নাড়িয়ে পুরন্দরকে আসতে ইঙ্গিত করল।

পুরন্দর রীণার পিছনে পিছনে ঢুকল, সঙ্গে সঙ্গে ওর গা টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঘরটাও কন্‌কনে ঠাণ্ডা। পুরন্দর দেখল, এখানে আর এক পরিবেশ বেশ বড় ঘর। মেঝেতে পুরু গালিচা সামনে অর্ধবৃত্ত টেবিল। ওপাশে, অর্ধবৃত্তের কোলে ঢুকে, চেয়ারে যিনি বসে আছেন, তিনি যে ধুতি পাঞ্জাবি-পরা লোক হতে পারেন, ও একবারও ভাবেনি। ভদ্রলোকের সারা গায়ে মাংসের আধিক্য বেশি, তেমনি দৈর্ঘ্যেও যে অনেকখানি, সেটাও বোঝা যায়। মাথার চুল বেশ বড় বড়, কিন্তু কেমন যেন বাদামী লালচে ভাব। কালো বা কাঁচা-পাকা ভাবের না।

টেবিল ঘিরে, গদীওয়ালা চওড়া বড় চেয়ার খানকয়েক। কাঠের দেওয়াল ঘেঁষে, বড় বড় সোফা। এক পাশে গদীমোড়া ডিভান। মোটা পর্দা সরানো, এক জায়গায় বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে কলকাতার মাঠ আর গাছপালা দেখা যাচ্ছে। পাঁচতলার এই ঘর একেবারে রাস্তার ওপরেই। গোটা কয়েক ষ্টিলের আলমারি একপাশে, কাচের পাল্লা বন্ধ। তার মধ্যে পলিথিনে মোড়া নানা ধরনের আর নানা আকারের যন্ত্রের টুকরো; যার কোন পরিচয় পুরন্দরের জানা নেই।

দরজায় লেখা অনুযায়ী, পুরন্দর বুঝল, ইনি ডি. কে. মুখার্জী। তিনি একপাশের সোফা হাত দেখিয়ে, পুরন্দরকে বললেন, 'আসুন, বসুন বসুন। এস রীণা, বস।'

ওঁর দু'পাশে দুটো চেয়ার, তারই একটা যেন রীণাকে দেখিয়ে

দিলেন। রীণাও সেইদিকে যেতে যেতেই বললে, 'ওকে আপনি করে বলবেন না। উনি আমাদের দেশের, মানে আমাদের যেখানে দেশ, সেখানকার ছেলে। প্র্যাকটিক্যালি, আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

রীণা তাকাল পুরন্দরের দিকে। বন্ধু! ছেলেবেলার! তাও রীণার? পুরন্দর দেখল, রীণা হাসছে, হাসতে হাসতেই ওর দিকে একবার তাকিয়ে ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল। ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে রীণার খোলা কাঁধের ওপর, একটু একটু চাপড়ে বললেন, 'ও, আচ্ছা আচ্ছা। বেড়াতে এসেছে বুঝি?'

রীণা একটু যেন থেমে গেল, ঠোঁট দুটো টিপল, যা বলতে চাইল তা বলতে পারল না। তারপরে বলল, 'ওই আর কী। ওঁকে নিয়ে একটু বেরিয়েছি কলকাতা দেখাতে। বাবীর তো এ সময়ে গাড়ির দরকার হয় না।'

ডি. কে. মুখার্জী কিন্তু পুরন্দরের দিকে তাকিয়েই দেখছেন না। তিনি রীণার কাঁধে, সস্নেহে হাত রেখে, রীণার কথা শুনতে, ওকে দেখতেই ব্যস্ত। পুরন্দরের ভিতরে হাসিটা বেঁকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বলল, থাক, দরদার নেই, আমি কী-ই বা বুঝি?'

মুখার্জী বললেন, 'তা, দেখানো হল?'

রীণা বলল, 'সামান্য। তারপরে ভাবলাম, আপনার অমরাবতীতে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে যাই।'

মুখার্জী এবার তাঁর মোটা থ্যাবড়া পাঁচ আঙুলের ডগা দিয়ে, প্রায় চিমটি কাটার মতো, রীণার গাল টিপে দিলেন। ওঁর থ্যাবড়া মোটা মুখ, ফোলা ফোলা চোখের কোল থেকে, বড় বড় চোখ দুটো যেন, রীণাকে গিলে খেতে চাইল। ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে বললেন, 'সো নাইস্ ইয়ু আর, খুব ভালো করেছ।

রীণা যেন আদরে-খুশিতে গলেই গেল, এমনি একটা ভাব। বুকের একদিকের আঁচল সরে গিয়েছে। মনে হল, রীণার খোলা আঁচল বুক যেন কেমন অহঙ্কারে আর খুশিতে, ঢেউ দিয়ে উঠছে। পুরন্দরের

আরো মনে হল, ও না থাকলে বোধ হয়, মুখার্জী রাণীকে চুমো খেতেন মস্ত বড়লোক, সে তো স্পষ্টতই। ওঁদের আদর সম্ভবত এই রকমই ভাবল, পুরন্দরের আসাটা, না, রীণা যে ওকে নিয়ে এসেছে, তাতেই রীণা নাইস্। আবার বললেন, 'তা, নামে তো অমরাবতী, আসলে ব্যাপারটা যে ভারি কাঠখোট্টা, সেটা ওকে বলেছ ?'

রীণা একটু হেসে উঠল। পুরন্দরেরও সেই মুহূর্তে মনে হল, অমরাবতী মানে কী ? এখন ওর চকিতে খেয়াল হল, এখানে ঢোকবার আগে, দরজার পাশে, ইংরেজীতে, প্লাষ্টিকের অক্ষরে লেখা দেখেছিল 'অমরাবতী ?' রীণা কিন্তু বলল, 'এ কি বলছেন, অমরাবতী কী, এটা আজকের বাঙালী ছেলেকে বলে দিতে হয় না।'

মুখার্জী তৃপ্ত খুশিতে হাসলেন, তাঁর চোখের চারপাশের থলথলে মাংসে চোখ প্রায় ঢাকা পড়ে গেল। রীণা পুরন্দরের দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'অমরাবতী এঞ্জিনিয়ারিং মার্চেন্ট অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স. আপনি জানেন না ?'

পুরন্দরের এক মুহূর্ত দ্বিধা হল। মুখার্জী ওর দিকে ফিরে তাকাবার মুহূর্তেই, ঘাড় নেড়ে হেসে জানাল, জানে। রীণার চোখের দিকে তাকিয়েই, বুঝতে পারল, রীণা চায় পুরন্দর যেন তা-ই বলে। অবিশ্যি, পুরন্দরের স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল না। কলকাতার ইংরেজী বাংলা, বড় বড় সংবাদপত্রে, 'অমরাবতী'-র বিজ্ঞাপন ও দেখেছে। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে কোনদিন দেখে নি, অমরাবতীর বিজ্ঞাপনে কী লেখা আছে। কারণ, কর্মখালির বিজ্ঞাপন তো ছিল না।

মুখার্জী জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার এই ছেলেবেলার বন্ধু কী করে ?

রীণা যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ল, এমনি একটা ভাব একটু হাসল, বলল, 'কিছুই ঠিক করছে না। বেশিদিন অবিশ্যি আসে নি। বাবীই ওকে কলকাতায় ডেকে এনেছেন, যদি একটা কিছু···।'

রীণা কথাটা শেষ করল। পুরন্দরের বুকে যেন হঠাৎ ঢাক বেজে উঠল। এই প্রথম ওর মনে হল, রীণা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে রীণা পুরন্দরের জন্যই সম্ভবত এসেছে। কিন্তু, পুরন্দর ওর মুখখানা একটা অবোধ ভাব দিয়ে ঢেকে ফেলল। ও তো এসব কিছুই বোঝে না। এমন কি, রীণাকেও বুঝতে দেবে না যে ও কথাটা বুঝেছে। অবিশ্যি, এখনো আরো কথাবার্তা শোনা এবং সময় সাপেক্ষ।

মুখার্জী খুব গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'আই সী। মিঃ ঘটকের সঙ্গে কয়েকদিন আগে কথা হচ্ছিল। ওরা তো ওদের কারখানার অফিসে অশান্তির ভয় করছে।'

রীণা বলে উঠল, 'মিঃ ঘটক মানে!'

'তোমার বাবার ডিরেক্টর।'

পুরন্দর চমকে উঠে রীণার দিকে তাকাল। মণীন্দ্র ঘোষ যে আশায় পুরন্দরকে ডেকে এনেছে, যেখানে চাকরি হবার সম্ভাবনা, সেখানে যে গোলমাল, এটা জানানোই মুখার্জীর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পুরন্দরের চমকটা অন্য জায়গায়। রীণাও সেই মুহূর্তেই একবার পুরন্দরের দিকে তাকাল। ওদের চোখাচোখি হল। পুরন্দরের মুখে ছায়া, রীণার বিব্রত ভাব। যেন পুরন্দরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই রীণা বলল, 'মিঃ ঘটক দিল্লী গিয়েছেন শুনেছিলাম।'

'সপ্তাহখানেক আগে ফিরে এসেছে। আমিও গেছলাম, আরো আগেই ফিরেছি। ওসব কথা থাক, তোমাকে আজকাল তো দেখতেই পাই না, অ্যাঁ? লাস্ট তোমাকে দেখলাম কোথায়?

রীণা বলল, 'এক ফরেন কনস্যুলেটে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে একটি খুব সুন্দরী মহিলা ছিলেন—মানে, মহিলা মানে, বয়েস খুবই অল্প, হার্ডলি বাইশ তেইশ।'

মুখার্জী যেন একটু ভাবলেন, তারপরে মস্ত বড় হ্যাঁ করে বললেন

'ও, নো নো, শী ইজ মিসেস চাকলাদার। বেশ টিপসি ছিল তো?'

রীণা যেন স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে এমনি ভাবে একটু হেসে বলল, 'ওই আর কী, বোধহয়।'

মুখার্জী বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। তাকে তুমি সুন্দরী বলছ, তার ওপরে আবার বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী।'

মুখার্জী হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন 'অন্ততঃ বত্রিশ বললেও একটা কথা ছিল।'

রীণা চোখ বড় করে বলল, 'ও, তাই বুঝি!'

পুরন্দরের মনে হল, রীণার ভাবভঙ্গি সবটাই যেন ছলনা। কোন্‌টা সে সত্যি বলছে, আর কোনটা মিথ্যা, কিছুই ধরতে পারছে না। মুখার্জী বললেন, 'সেইজন্যই বুঝি তুমি আমার কাছে আসছিলে না? তোমার মতো একজন সুন্দরী বিদুষী যুবতী পেলে, আমি কিছুই চাইতাম না।'

বলে একেবারে এক হাত বাড়িয়ে, প্রায় গলা জড়িয়ে ধরলেন নিজের দিকে টানলেন। রীণা যেন বড়ই আপ্লুত, এমনি ভাবে বলল, 'তা বলে আমাকে বিদুষী বলবেন না।'

পুরন্দরের মনে হল, ওর এ ঘরে না থাকলেই ভালো হত। মুখার্জী লোকটা তা হলে রীণাকে আর একটু ভালো ভাবে আদর করতে পারত। মনে মনে বলে উঠল, 'শালাকে একটা ভাদ্র মাসের কুত্তার মতো লাগছে।' পরমুহূর্তেই নিজেকে ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি কী জান হে উল্লুক, হয়তো এটাই অপত্য স্নেহের চেহারা!'

মুখার্জী বললেন, 'সেটা তো বলতেই হবে। যাক, কবে দেখা হচ্ছে আবার বল তো।'

রীণা বলল, 'শীগ্‌গিরই। আমি নিজেই যোগাযোগ করব।'

'সত্যি? তা হলে, সেদিন ডিনারের ব্যবস্থা রইল।'

'আচ্ছা।'

'গুড গার্ল।'

আবার রীণার গালে মোটা মোটা আঙুলের টিপুনি। বললেন, 'তোমার বাবা আসবে একবার। ঘণ্টাখানেক আগে টেলিফোন করেছিল। কি কতগুলো ফরেন মেসিনারি পার্টস্ না কি ট্যাংরার গোডাউনে মরচে পড়ে যাচ্ছে, সেগুলো ফ্যাক্টরীতে পাঠানো দরকার।'

পুরন্দর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না, রীণার বাবার সঙ্গে অমরাবতীর গোডাউনের কি সম্পর্ক। রীণা বলল, 'তাই বুঝি?'

বলতে বলতেই, পুরন্দরের সঙ্গে একবার ওর চোখাচোখি হল। রীণার চোখ দেখে মনে হয়, ও যেন পুরন্দরকে বুঝতে চাইছে। তারপরে বলল, 'আজ তা হলে চলি।'

আর একবার প্রায় আলিঙ্গন, রীণার আঁচলটাই খসে গেল বুক থেকে। মুখার্জী বললেন, 'আচ্ছা। কিন্তু মনে রেখ, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল্।'

পুরন্দর উঠে দাঁড়াল। মুখার্জী ওর দিকে ফিরে বললেন, 'ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু ইয়ং ম্যান, লেট মি একস্‌পেকট টু মীট এগেন। গুডবাই।'

রীণাই এগিয়ে দরজা খুলে আগে বেরোল, বেরোবার আগে, আর একবার ভামের মতো সেই চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। পুরন্দর বেরিয়ে এল! পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই রীণা জিজ্ঞেস করল, 'ড্যু ইয়ু ফীল্ ব্যাড।'

পুরন্দর চমকে তাড়াতাড়ি বলল, 'না তো।'

রীণা ঠোঁট টিপে একটু হাসল। বলল 'আপনাকে রিসেপসনে বসিয়ে, আমি একটু জুনিয়ার মুখার্জী, মানে পাশের ঘরে দেখা করে আসব, কেমন? ফাদার অ্যাণ্ড সান পাশাপাশি ঘরেই আছেন।'

পুরন্দর একেবারে সুবোধ বালকের মতো ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

আবার দু'জনেই বেরিয়ে এল। রিসেপশনের টেবিলে গিয়ে, রীণা বলল, 'মিস্ সেন, লুক অ্যাট দিস্ হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান, মিঃ ভাট্, মাই

ফ্রেণ্ড! ওকে আপনার কাছে বসিয়ে, আমি একটু জুনিয়র মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করব।'

মিস সেন মিষ্টি হেসে, পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। বসুন মিঃ দত্ত।'

রীণার পরিচয় পাড়ার ধরনে পুরন্দর ইতিমধ্যে লজ্জিতই হয়ে পড়েছিল। মাথাটা নিচু করে, একটা চেয়ারে বসল। রীণা যাবার আগে বলল, 'ওর নাম পুরন্দর।'

পুরন্দরের মনে হলো ঠাট্টা করছে। নামটা ওর নিজের খুব বিচ্ছিরি লাগে। কিন্তু বাপের সঙ্গে দেখা করার সময়, রীণা ওকে নিয়ে যেতে পারল, ছেলের বেলা না কেন? হয়তো বাপের থেকে, ছেলে আর এক কাঠি ওপরে। কোন লোকজনই মানবে না, সামনেই যা খুশি আরম্ভ করে দেবে। পুরন্দর মনে মনে বলল, 'তা করলেই বা কি হয়েছে, আমি তো সেই রাণীর নিগ্রো ভৃত্য। সামনে যা খুশি তাই কর, আমার একটা হিল্লে হলেই হল বাবা।···

'চা না কফি খাবেন পুরন্দরবাবু।'

পুরন্দর আবার চমকে উঠে শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

মিস সেন আবার হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মনে হয় মিঃ সিনিয়রের ঘরে আপনারা চা কফি কিছুই খান নি। কি খাবেন, চা না কফি।'

ইচ্ছা অনিচ্ছাটা বোধহয় বড় কথা নয় এখানে। পুরন্দর বলল, 'চা খাব।'

মিস সেন টেবিলের ধারে কোথায় যেন কি টিপল। পুরন্দর কোন শব্দ শুনতে পেল না। কিন্তু ভিতর দরজা ঠেলে একজন বেয়ারা বেরিয়ে এল।

মিস সেন বলল, 'দু'কাপ চা।'

পুরন্দরের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি এত লজ্জা পাচ্ছেন, সত্যিই তো আপনি হ্যাণ্ডসাম দেখতে।'

পুরন্দর মুখ তুলে হাসতে গিয়ে লজ্জা পেল। মনে মনে বলল, 'ও বাবা, এ মেয়েটাও যে কেমন করে কথা বলে! তা বলুক গে, আমি হাঁদারাম সেজেই থাকতে চাই। আমি কিছু বুঝি না। বুঝি শুধু একটা জিনিস। আমার একটা গতি চাই। তবে, রীণা আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে, কি করতে চায়, কি উদ্দেশ্য, কিছুই এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু সব মিলিয়ে আমি একটা নতুন জগৎ আর পরিবেশ দেখছি।

এ কথা ভাবতে ভাবতেই, আবার ওর মনে পড়ে গেল, মণীন্দ্র ঘোষের ডিরেক্টর সাত দিন আগেই কলকাতায় ফিরে এসেছে, অথচ সে-কথা ও জানে না। মণীন্দ্রবাবুও কিছু বলেন নি। রীণা কি সে কথা জানত, না কি, আজ এখনই মিঃ ভাম্ মুখার্জীর কাছ থেকে শুনল। ভাম মুখার্জী! ভাগ্যিস, মনের কথা কেউ জানতে পারে না। তাহলে বোধহয়, এখুনি পুরন্দরের গর্দানটা চলে যেত। লোকটার কি সত্যি রীণার ওপর অপত্য স্নেহ। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না যেন। স্নেহের চেহারা কি ওরকম হয়। অথচ লোকটা তো রীণার বাবার বয়সী প্রায়।

মিস সেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি কোন বিজনেস কনসার্ন?'

পুরন্দর অবাক হয়ে বলল, 'না তো।'

'আপনি মিস ঘোষের সঙ্গে অমরাবতীর ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন কি না, সেইজন্যই জিজ্ঞেস করলাম।'

পুরন্দর বলল, 'না। আমাকে উনি এমনি নিয়ে এসেছেন। কলকাতায় তো আমি কিছুই দেখি নি…।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল। মিস সেন টেলিফোন ধরে প্রথমেই বলল, 'হেলো, অমরাবতী প্লীজ হোল্ড অন্, আই উইল সী।'

বলেই আর একটা টেলিফোন তুলে বোতামের মতো কি একটা টিপল, বড় মাছির পাখার মতো শব্দ হল। বলল, 'এ, বি, রয়ের

টেলিফোন। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড কিছু শুনল, আবার বলল, 'আচ্ছা' আগের টেলিফোনে মুখ রেখে বলল, 'সরি স্যার, মিঃ মুখার্জী ইজ নট ইন হিজ রুম দিস মোমেণ্ট। ও কে।'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়েই পুরন্দরের দিকে আবার মিষ্টি হেসে তাকাল মিস সেন। বলল, 'কি বলছিলেন, কলকাতায় কিছুই দেখেন নি।

পুরন্দর মাথা নেড়ে বলল, 'না। কলকাতার বাইরেই বরাবর থেকেছি। উনি তাই আজ আমাকে নিয়ে একটু ঘোরাতে বেরিয়েছেন।'

মিস সেন মেয়েটি যেন কেমন করে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, উনি মানে কে ? মিস ঘোষের কথা বলছেন ?'

পুরন্দর বলল, হ্যাঁ।'

'উনি বুঝি আপনার রিলেটিভ ?'

'না, আমাদের দেশের বাড়ি ওঁদের বাড়ি এক জায়গায়।'

'ও।'

তারপরে পুরন্দরের মাথায় হঠাৎ নতুন কথা এল, বলল, আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

কথাটা ওর নিজের কানেই খট করে বাজল। এমন একটা নিটোল মিথ্যা কথা পুরন্দরও বলতে পারল। একি সঙ্গ গুণে না কি! মিস সেন গাঢ় কাজলমাখা চোখ একটু ঢুলু ঢুলু করে হেসে বলল, 'ও, আপনারা ছেলেবেলার বন্ধু। ভারি মিষ্টি সম্পর্ক।'

পুরন্দর খানিকটা বোকার মতো হাসল। এই সময়ে চা এল। মিস সেন বলল, 'চা খান।'

চা খেতে খেতে মিস সেন আবার জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতায় বেড়াতে এসেছেন ?'

ঠিক কি বলবে পুরন্দর প্রথমে বুঝতে পারল না। তথাপি সত্যি কথাটাই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'না! একটা কিছু করা যায় কি

না, দেখছি। চাকরি-বাকরির কথা বলছি।'

মিস সেন বলল, 'ও।'

তারপরেই মুখখানি কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। রীণা ফিরে এল।

পুরন্দরকে বলল, 'চলুন যাই।'

পুরন্দরের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ও উঠে দাঁড়াল। রীণা বলল, 'থ্যাংকু মিস সেন।'

মিস সেন মাথা নাড়ল। পুরন্দর হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'যাচ্ছি।'

গাড়িতে উঠে রীণা আবার চৌরঙ্গির ভিড়ের দিকে এগোল। খানিকটা গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড় করাল। তারপরে বলল, 'এবার বলুন, কেমন লাগল ওখানে।'

পুরন্দর বলল, 'ভালোই তো। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'নিশ্চয়ই।'

'অমরাবতীর সঙ্গে আপনার বাবার কি সম্পর্ক?'

রীণা যেন একটু ভাবল, তারপর ষ্টিয়ারিং-এর ওপরে হাত বুলিয়ে বলল,'আপনাকে বলতে আমার কোন বাধা নেই, তবে কথাটা গোপন। বাবা এখন যেখানে কাজ করছেন, সেখানে ছাড়াও অমরাবতীর কিছু কিছু কাজ দেখাশোনা করেন। বাবার কোম্পানি এটা জানে না, অমরাবতী অবিশ্যি সব জেনেই বাবাকে কাজ দিয়েছে। কি করা যাবে, টাকার যে বড় দরকার।'

রীণার সানগ্লাসের কাচ দুটো এত বড় ওর মুখের ও চোখের ভাব প্রায় সবটাই যেন চাপা পড়ে রয়েছে। তবু, পুরন্দরের মনে হল রীণার মুখে যেন একটা কষ্টের ছাপ ফুটেছে। এইরকম বেশভুষা, শিক্ষিতা,

কলকাতার রাস্তায় হু হু করে গাড়ি চালায়, এমন মেয়ের যে কোন কষ্ট থাকতে পারে, পুরন্দর সেটা এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু তাই না, এমন একটি মেয়ের বাবা যে, বুড়ো বয়সে রোজগার বাড়াবার জন্য, এরকম কারচুপি খেলছে, সেটাও যেন ভাবা যায় না। অথচ সমস্ত ব্যাপারটাই সত্যি। কলকাতা কী বিচিত্র, এবং কলকাতার মানুষ। অবিশ্যি, কলকাতাই শুধু না, মফস্বল শহরেও টাকার জন্য মানুষকে অনেক কিছু করতে দেখা গিয়েছে। ওদের জেলা শহরের হর্তাকর্তা বিধাতা, স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে একটা ছিনতাই বা চোরের থেকেও খারাপ লোক মনে হয়। কেবল ঘুষ আর জুলুম-আদায়ের ওপর সংসার চালায়, টাকা জমায়।

কিন্তু সেটা সরকারি ব্যাপার। সরকারি অফিসার, পুলিশ, এদের কথা সবাই জানে। রীণাকে দেখলে, কেউ কি এসব ভাবতে পারে? কোন কিছুর সঙ্গেই যেন কোন কিছুর মিল নেই। মণীন্দ্র ঘোষের অবস্থাটাও যত বেশি দেখছে, তার পরিবারকে চিনছে, ততই এ কথাটা বেশি করে মনে হচ্ছে। এখন ওর মনে হচ্ছে, নিজের বাবার সঙ্গে মণীন্দ্র ঘোষের তফাৎ কেবল পরিবেশের। ডিগ্রির এবং কলকাতায় দীর্ঘকাল থাকার দরুণ, কিছু সুযোগ।

রীণা আবার বলল, 'অবিশ্যি, অমরাবতীতে বাবীর কাজটা আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম। বাবী মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়র, এদেরও মেকানিক্যাল ফার্ম। ডীলারস্ অ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাক্টরাস্। যা হোক যতটুকু হয়, বাবা করেন, এরা মাসে কিছু টাকা দেয়।'

পুরন্দরের আর একটা কথা মনে পড়ল। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে বাধল। রীণা কথাটা কী ভাবে নেবে কে জানে। রীণার দিকে তাকাল। রীণাও তাকাল। কী বুঝল রীণা, কে জানে, নিজে থেকেই বলে উঠল, 'বাবী কী রকম হেলপলেস্ আপনি বুঝতেই পারছেন। ডিরেকটর দিল্লী থেকে এসেছেন, অথচ কোন কথাই বলতে পারেন নি। এদিকে আপনাকে আশা দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন। বাবী

হঠাৎ এরকম কাউকে কথা দেন না, বা ডেকেও আনেন না। আপনাকে যে কেন আনলেন!'

বলেই রীণা হাসল। তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি কিছু মনে করছেন না তো অ নার কথায়?'

পুরন্দর সেইভাবে কিছুই মনে করছে না, কেন না, আত্মসম্মান-বোধের সে-স্তরটা, ভিতরে ভিতরে, অনেক দিন আগেই পার হয়ে গিয়েছে। ও ভয় পাচ্ছে, ভয়ে ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে, মুখে কালো ছায়া নেমে আসছে। বলল, 'না, কিছু মনে করছি না।'

রীণা বলল, 'আমি সে ভাবে কিছু বলছি না। আমি বলছি বাবীর অশান্তি-অস্বস্তি ভেতরে ভেতরে অনেক বেশি। আমি তো বাবীকে বুঝি। বাবীকে তাঁর বিবাহিত ছেলেমেয়েরা, সবাই প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছে, এখনো দিচ্ছে। এখন আমিও বাবীর সঙ্গে খানিকটা জড়িয়ে গেছি। ঠাটবাট সবকিছু বজায় রেখে চলতে গিয়ে কী মূল্য যে দিতে হচ্ছে···।'

রীণা কথাটা শেষ করল না। হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। পুরন্দরও চুপ করে রইল রীণার দিকে চেয়ে। হতাশার একটা আবর্ত ওর ভিতরে পাক খেতে খেতে যেন, কেমন একটা রাগ আর ঘৃণার সৃষ্টি করছে। সেই সঙ্গে একটা বাঁকা হাসিও যেন ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়ে উঠছে, ঠোঁটের কোণে অলক্ষ্যে।

একটু পরেই, রীণা হেসে উঠল। যেন সমস্ত কিছুকে ঝাপটা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল, বলল, 'কী সব বাজে কথা আমরা আলোচনা করছি। আপনি এত ফ্রাস্টেটেড হবেন না। আমি আমার হাত যশটাও একটু পরখ করে দেখব আপনার ব্যাপারে! আপনাকে আমি টিকিট কেটে দেশে চলে যেতে বলছি না।'

বলেই, রীণা ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করল, বলল, 'আপনার ব্র্যাণ্ড বের করুণ, লেট আস্ স্মোক।'

পুরন্দর পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে, অনেকটা

অন্যমনস্ক স্বরে বলল. দেশে আমি ফিরব না। কলকাতার রাস্তায় অনেক লোককে, অনেক কিছু করতে দেখছি. যারা রাস্তাতেই থাকে খায়। দরকার হলে, আমিও—।'

পুরন্দরের কথা শেষ হবার আগেই, রীণা হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরল। বলল, 'প্লীজ পুরন্দর, এসব কথা বলবেন না। হতাশার সঙ্গে অবাস্তবতার অনেক মিল, তাই এসব বলছেন। এটা বাস্তব চিন্তা নয়।'

পুরন্দর রীণার দিকে ফিরে তাকাল। রীণাকে এখন ওর তেমন, দূরের অচিন পরিবেশের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না যেন। যদিও, কলকাতায় আসার পরেও কোনদিন ভাবতে পারে নি, এমন একটি মেয়ের সঙ্গে ময়দানের গাছতলায় গাড়িতে বসে, পাশাপাশি কথা বলবে। কিন্তু বাস্তবে তা-ই ঘটছে। রীণার কথাটাও ওর সত্যি বলেই মনে হল। হতাশ মানুষের অস্থির ভাবনার মধ্যে বাস্তবতা এবং সামঞ্জস্য থাকে না।

রীণা চোখ থেকে সান গ্লাসটা খুলল। ওর বড় বড় চোখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল, চোখের পাতা কাঁপল। বলল, 'দো আই অ্যাম আ ব্যাড গার্ল, ইয়েট—দেখা যাক না।'

বলে পুরন্দরের হাতে একটু চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল। নিজের সিগারেট ধরাল, পুরন্দরকে ধরিয়ে দিল। এই সময়ে, শ্লোগানের শব্দে ওরা রাস্তার দিকে ফিরে তাকাল। ছাত্রদের মিছিল চলেছে। ওদের কাছ থেকে রাস্তাটা খুব বেশি দূরে না। বেশ দীর্ঘ মিছিল। পিছনে পিছনে পুলিশের ওয়ারলেস্ ভ্যান্ ছাড়াও লাঠি আর ঢালধারী পুলিশের ট্রাকও রয়েছে। রীণা হাতের সিগারেট নামিয়ে নিল। পুরন্দরকে জিজ্ঞেস করল, 'এসব করেছেন কখনো?'

পুরন্দর মিছিলের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'করেছি। এক সময়ে ইচ্ছা ছিল, সর্বক্ষণ রাজনীতিই করব। কিন্তু পারলাম না। কিছুদিনের জন্য যখন ইস্কুল মাস্টারি করেছিলাম, তখন একবার অনশন ধর্মঘটও

করেছিলাম। তারপরে সরে আসতেই হল, যেন চুলের মুঠি ধরে কেউ সরিয়ে নিয়ে এসেছিল।'

'আপনার ভালো লাগত?'

'ভালো লাগত কী না, বলতে পারি না। কিন্তু মনে হত, সবাইকে নিয়ে, একটা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ি।'

রীণার মুখে বিস্ময় দেখা দিল। বলল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

পুরন্দর মুখ ফিরিয়ে তাকাল, বলল, 'কেন?'

'আমার অনেকটা এই রকমই মনে হত। আমিও এসব করেছি, ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিলাম আমি কলেজে। আমারও কী রকম মনে হত, সব তছনছ করে দিই। চারদিকে সবকিছুকেই অন্যায় বলে মনে হত।'

'এখন কি আপনার ন্যায় বলে মনে হয়?'

'না। অন্যায় যে কত বেশি, আর কত কুটিল, এখন সেটা আরো ভালো বুঝি। তার কাছে, আমার রাগ ঘৃণাটাও যেন তুচ্ছ। তার চেয়ে আরো অনেক বড় কিছু দরকার।'

পুরন্দর রীণার চোখের দিকে তাকাল; মনে হল, রীণার চোখে যেন একটা অন্যমনস্ক চিন্তার ছায়া। পুরন্দরের মনে হল, বইয়ে লেখা সেই সামগ্রিক সশস্ত্র বিপ্লবের কথা রীণা বলছে। রীণা বলল, 'কিন্তু আমার ন্যাক্ নেই।'

পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী।'

রাজনীতি নিয়ে জীবন কাটানো আমার ইচ্ছা না। আমি অনেক বেশি সাধারণ।'

সাধারণ। কথাটা পুরন্দরের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করল না। সাধারণ বলতে রীণার ধারণাটা কী রকম, ও বোঝে না। রীণা নিশ্চয়ই খুব সাধারণ না। এই রকম যার চালচলন, অমরাবতীর ডিরেক্টরের সঙ্গে যার এত ভাব, যে বিদেশী দূতাবাসে নিমন্ত্রিত হয়, যে সোস্যাল সায়ান্সের ওপর কলেজে লেকচার দেয়, সে কি খুব সাধারণ

মেয়ে। যদিও, ওদের পরিবারের সমস্ত কথা জানবার পরে, খুব অসাধারণ বলে আর মনে হয় না।

রীণা আবার বলল, রাজনীতি করি বা না করি, একটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

'কী।'

'যে ভাবেই হোক আমরা যে বৈষম্যের মধ্যে আছি, তা বদলানো দরকার। তাতে যদি দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়, তাতেও রাজী।'

'বিপ্লব?'

'হতে পারে তার নাম বিপ্লব। গুণ, মেধা, রূপ, অনুভূতি, এসবের কোন সাম্য হয় কী না, আমি বুঝি না, হতে পারে না বলেই মনে হয়। মানুষ কখনো এসবে সমান হয় না। কিন্তু মানুষ সবাই সমান খেতে পারে, পরতে পারে, বাস করতে পারে। অন্ততঃ সেটা যাতে হয় তার জন্যে যে-কোন অবস্থাকে আমি মেনে নিতে রাজী।'

রীণার মুখটা কী রকম শক্ত দেখাচ্ছে। পুরন্দর কথাটাকে উড়িয়ে দেবার মতো মনে করতে পারল না। রীণার মতো মেয়ে যখন এ কথা বলে তখন একটা বিশেষ সত্যের জন্যই বলে। বোধহয় সে সত্য রীণার জীবনেই আছে।

রীণা হঠাৎ আবার হাসল। বলল, 'আমরা খুব গম্ভীর হয়ে পড়ছি। মিছিলটা কিন্তু চলে গেছে। আসুন অন্য কথা বলি। আপনাকে তখন জিজ্ঞেস করছিলাম, জীবন সম্পর্কে আপনার অ্যাটিচ্যুড কী।'

আবার সেই কথা। কথাটা ঠিক মতো বলতেই জানে না পুরন্দর। জিজ্ঞেস করল, 'কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন, আমি ঠিক ধরতে পারি না।'

রীণা বলল, 'আপনি জীবনকে কী ভাবে ছাখেন, কী ইচ্ছা আপনার। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি কী না, জানি না।'

পুরন্দর এখনো পরিষ্কার না। তবু, ওর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আমি দাঁড়াতে চাই।'

রীণা ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল ঠিক বুঝতে পারল না যেন। পুরন্দর আবার বলল, 'এস্‌টাব্লিস্‌ড হতে চাই, যাকে বলে সেলফ মেড ম্যান হতে চাই, কারোর অবহেলা-গঞ্জনা সহ্য করতে চাই না, কারোর সাতে-পাঁচে থাকতে চাই না, শান্তিতে থাকতে চাই······।'

কথাটা শেষ হল না, কিন্তু পুরন্দরের আর কথা যোগাল না। রীণা বলল, 'একটি শান্তিপূর্ণ, নিটোল জীবন চান, জীবনটা এই রকম ভাবতে চান, কিন্তু কি ভাবে? আপনি দেখবেন, লেক-এর ধারে-কাছে, ঝুপড়িতে মানুষ থাকে, গান করে, ভিক্ষে পায়, কোন রকম গ্রাম্‌বল করে না। কোন কিছুতেই তার কিছু যায় আসে না। সে একটা শান্তির জগৎ-তৈরী করে নিয়েছে! সেটা কেউ ভাঙতে পারে না।'

পুরন্দর মাথা নাড়তে আরম্ভ করল, 'না না, সেরকম কিছু না। সমাজে মাথা উঁচু করে।

রীণা বলে উঠল, 'প্রায় আমাদের সকলের মতোই। কিন্তু তাতে শান্তি পাবেন কী?'

বলতে বলতেই রীণা ঘড়ি দেখল। বলে উঠল, 'ওহো দেরী হয়ে যাচ্ছে। চলুন আমরা এক জায়গায় যাব। তার আগে আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।'

পুরন্দর রীণার দিকে তাকাল। রীণা গাড়ি স্টার্ট করে, বাঁ দিকে ঘুরিয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরল।

গাড়ি এসে থামল পার্ক ষ্ট্রিটে। একটা বার কাম রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি পার্ক করল রীণা। তারপরে পুরন্দরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা বলতে পারেন?'

পুরন্দর অবাক হয়ে বলল, 'মিথ্যে কথা?'

'হ্যাঁ! এই ধরুন, আধঘণ্টা বাদেই, আপনি আমাকে কোথাও দেখতে পেলেন, আর হেসে, আমার সঙ্গে কথা বললেন, যেন সেখানে আপনি আমাকে খুঁজতে এসেছেন, আপনাকে আমি সেখানে যেন আসতে বলেছিলাম, আমার বাবীর ওখানে আপনাকে নিয়ে যাব বলে। পারবেন?'

পুরন্দর কথাটা বুঝলেও, ব্যাপারটা তখনো কিছুই বুঝতে পারে নি। রীণার দিকে তাকিয়ে কী বলবে, ভেবে পেল না।

রীণা আবার বলল, 'বাঁ দিকের কাঁচের দরজায়, রেস্তোরাঁটার নাম দেখতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি।'

মিনিট পনের পরে, একজনের সঙ্গে আমি এখানে ঢুকব। আপনি ওপাশের পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে দেখবেন, আমি কখন ঢুকি। পনের মিনিট পরে, আপনি ঢুকবেন, মানে বেলা তখন দেড়টা।'

পুরন্দর রেস্তোরাঁর জাঁকজমক পোশাকওয়ালা গেটম্যানকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমাকে ঢুকতে দেবে তো?

রীণা হেসে ফেলল, বলল, 'দেব। আপনি ঢুকতে গেলেই, ও দরজা ঠেলে খুলে দেবে। ভেতরটা দিনের বেলায়ও, আপনার একটু অন্ধকার লাগবে। আপনি আমাকে খুঁজে নেবেন। যে আসবে, তার পরিচয়টা আপনাকে আগেই দিয়ে রাখি, অমরাবতীর জুনিয়র মুখার্জী। ও আমাকে লাঞ্চে ডেকেছে, আমি ইচ্ছে করেই রাজী হয়েছি। ওকে আপনার সঙ্গে আমি আলাপ করিয়ে দিতে চাই, আর —আর—।'

রীণার কথা আটকে গেল। পুরন্দর কৌতূহল নিয়ে চেয়েই রইল। রীণা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'কোন বিষয়েই অবাক হবেন না। ঠিক আছে?'

পুরন্দর ঘাড় নাড়ল। কিন্তু এর কী প্রয়োজন আছে, ও বুঝতে পারছে না। রীণা যদি ওকে পথ চিনিয়ে দিত, তা হলে বাড়ি চলে

যেতে পারত। এখন পুরন্দরের খিদেও পাচ্ছে। অথচ, রীণার কথায় আপত্তি করতে পারছে না। ও গাড়ির দরজা খুলল। রীণা বলল, 'যান, রাস্তার ওধারে গিয়ে দাঁড়ান।'

পুরন্দর নেমে গিয়ে, রাস্তা পার হল। ছাদ ঢাকা পেভমেণ্টে গিয়ে দাঁড়াল। রীণা একটা হাত তুলে, ইশারা করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। পুরন্দর রাস্তার লোকজন দেখতে লাগল। এ পাড়ার পথ চল্‌তি মেয়েরা অধিকাংশই যেন রীণার সমগোত্রীয়। কিছু কিছু অন্যরকম মেয়েও দেখা যাচ্ছে, যেন ইস্কুল মাস্টারের মতো। কলকাতায় অনেক মেয়ে কেরাণী আছে, এরা হয়তো সেরকমই, নিজের কাছাকাছি লোক বলে মনে হয়। পুরষদেরও রকমারি আছে। বিদেশী মহিলা-পুরুষও হাত ধরাধরি করে চলেছে। তার থেকে, দেশী মেয়ে-মরদরাই যেন বেশি সাহেব. বেশি হাত ধরাধরি। কেউ কেউ হাঁটতে গিয়ে, মেয়েদের কোমরেও হাত রাখছে।

এখানে দাঁড়িয়ে পুরন্দরের ওদের জেলা শহরটার কথা মনে হল। কত দরিদ্র আর নির্জীব। সেখানেই কিছু করতে পারে নি পুরন্দর, এই শহরে কি পারবে? কোথাও কোন আশা দেখা যাচ্ছে না। রীণার ওপরে কতটুকু ভরসা করা যায়। রীণা ওর জন্য কিছু করবেই বা কেন? এতটাই বা করছে কেন, এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানো, এই সব লোকেদের সঙ্গে আলাপ করানো। ঠোঁট দুটো আবার বেঁকে উঠল ওর। প্রেম! ওর সঙ্গে রীণার প্রেম! পুরন্দর না হয় বিশ্বাস করতে পারে না, রীণাই কি বিশ্বাস করতে পারে?

পুরন্দরের ভিতরে হাসিটা যেন কুটিল হয়ে উঠল। প্রেম ভেবেই যদি রীণা কিছু করতে চায়, করুক। ওর আপত্তি কিসের, দায় তো সব রীণারই। ওর কোন দায় নেই।

এই সময়ে, একটা গাড়ির হর্ণ শুনে, পুরন্দর চমকে উঠল। শব্দটা চেনা মনে হল। দেখল, ওধারে রীণার গাড়ি দাঁড়িয়েছে। এ. কে. মুখার্জী, অর্থাৎ জুনিয়র আগে নামল। তারপরে রীণা কাঁচ তুলে,

দরজা লক করে, চাবি লাগিয়ে নামল। জুনিয়রের পোশাক-আশাক পুরো সাহেবি, রঙটাও ফরসা। রীণা কাছে যেতেই, লোকটা, রীণার কোমর আর পিঠের খোলা জায়গায় হাত রাখল। কাঁচের দরজার কাছে দাঁড়াতেই, গেটম্যান সেলাম ঠুকে, দরজা ঠেলে দিল। জুনিয়র বাঁ হাত দিয়ে রীণাকে রাস্তা দেখাল। রীণা ঘাড় নেড়ে ভিতরে ঢুকল। ঢোকবার আগে চকিতের জন্য, একবার এদিকে মুখ ফেরাল।

পুরন্দর হাতের ঘড়ি দেখল। একটা কুড়ি মিনিট। পনের মিনিট পরে, ওকে ঢুকতে হবে। ভেবেই অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু এদের সঙ্গে, রীণার সম্পর্কটা কী রকম! বাপ গাল টিপে আদর করে। ছেলে কোমরে হাত দিয়ে নিয়ে যায়। আর রীণা নির্বিকার। সবই যেন তার কাছে সমান, স্বাভাবিক! রীণাকে যেন ও ঠিক বুঝতে পারছে না।

পনের মিনিট পরে, রাস্তা পার হয়ে পুরন্দর কাঁচের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গেটম্যান দরজাটা ঠেলে দিল, কিন্তু সেলাম ঠুকল না। ভিতরে অন্ধকার ভাব, অথচ আলোও আছে। মেঝেতে ম্যাটস্ পাতা। বড় একটা হল ঘর, নানা ধরনের আলোর শেড ঝুলছে। অনেক টেবিল, অনেক মহিলা-পুরুষ। গান ভোজন ছাড়াও হলের একদিকে, মিউজিক হচ্ছে, একটি মেয়ে, ইংরেজীতে গান করছে। এরকম পরিবেশ পুরন্দরের জীবনে এই প্রথম।

একটু সামনে গিয়েই, রীণাকে দেখতে চেষ্টা করল ও। এমন সময় একজন স্যুটেট বুটেড স্টুয়ার্ড এসে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'গুডমর্নিং, হাউ মেনি পার্সনস উইথ ইয়ু?'

পুরন্দর প্রায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। ওর সঙ্গে আর লোক কোথায়? কথাই ঘুলিয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পেল না। লোকটা আবার একই কথা জিজ্ঞেস করল। ঠাণ্ডা ঘরটার মধ্যেও, পুরন্দর

ঘামছে। এবার কোন রকমে বলল, 'আই হ্যাভ কাম টু সা—সামবডি।'

ঠিক তখনই একটা বেয়ারা ছুটে এসে, পুরন্দরকে বলল, 'আপকো এক মেমসাব সালাম দিয়া, মেরা সাথ আইয়ে।'

স্টুয়ার্ট সরে গেল। পুরন্দর বেয়ারার পিছনে পিছনে গেল। প্রায় মিউজিক ডায়াসের কাছে একটি টেবিলের ধারে রীণা আর এ, কে, মুখার্জি বসেছিল।

রীণা হেসে বলল। 'আসুন পুরন্দরবাবু, বসুন।'

ওপাশে রীণারা পাশাপাশি একটা ডবল শোফায় বসেছিল। পুরন্দর এপাশে, একটা গদীমোড়া চেয়ারে বসল। রীণা বলল, 'ইনি অবনীশ কুমার মুখার্জি। পুরন্দর দত্ত।

পুরন্দর হাত তুলে নমস্কার করল। অবনীশ কোন রকমে একটা হাত একটু তুলল। রীণা অবনীশকে বলল, 'এর কথাই তোমাকে বলছিলাম, বাবীর কাছে একবার নিয়ে যাব, সেইজন্যই আসতে বলেছিলাম।'

অবনীশ বলল, 'দ্যাট্স অলরাইট।'

রীণা জিজ্ঞেস করল, 'কী ড্রিংক করবেন পুরন্দরবাবু?'

পুরন্দর থমকে গেল। ড্রিংক? জীবনে দু' একবার যে বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে করে নি, তা না। কিন্তু এখানে ও কি খাবে, কি করে খাবে। লজ্জিত মুখে বলল, 'থাক না, আমি ড্রিংক করি না।'

রীণা বলল, 'একটু কিছু খান। লাইম জিন খান একটু।'

জিনের নামটা শোনা ছিল। রীণা বেয়ারাকে ডেকে লাইম জিন অর্ডার করল। অবনীশ আর রীণা বড় বড় গেলাসে, বীয়ার নিয়ে বসেছে। অবনীশের হাত যেন, রীণার কোমরটা প্রায় পেঁচিয়ে ধরে আছে। পুরন্দর প্রায় শুনতেই পাচ্ছিল না অবনীশ রীণার কানের কাছে মুখ নিয়ে কী বলছিল। গানের জন্যই, আরো শোনা যাচ্ছিল না। রীণা হাসছিল, মাথা নাড়ছিল। পুরন্দর গায়িকা মেয়েটির,

কোমর আর বুক নাচান দেখছিল। মেয়েটি দুলে দুলে গাইছিল অন্যান্য টেবিলের দিকেও পুরন্দরের দৃষ্টি যাচ্ছিল। কিন্তু রীণা আর অবনীশের দিকেই যেন, ওর দৃষ্টি ঘুরেফিরে আসছিল। ও দেখতে পাচ্ছিল, অবনীশের হাত এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই। কখনো রীণার কোমরে, কখনো উরুতে, কোলের ওপরে, কখনো ঘাড়ের কাছে।

অবনীশ লোকটা তার বাবার থেকে সুন্দর। বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে বোধহয়। রীণাকে নিয়ে যেরকম করছে, ওর বাবার মতোই, পারলে এখুনি বোধহয় চুমো খেত। খাচ্ছে না-ই বা কেন, এক-একবার তো মুখটা প্রায় মুখের কাছেই নিয়ে যাচ্ছে। অবিশ্যি রীণা ওকে অবাক হতে বারণ করেছে।

ইতিমধ্যে, লাইম জিন এসে গিয়েছিল। রীণাই ওকে চিয়ার্স করেছে, যদিও পুরন্দর তাতে থতমতই খেয়ে গিয়েছিল। পুরন্দর একটু একটু খাচ্ছে, স্বাদটা বেশ ভালই লাগছে। ওদের বীয়ার শেষ হয়ে গেল। তারপরে এক একটা ব্লাডি মেরি, রীণার জন্য। অবনীশের জন্য, ওয়াইন গ্লাসে, জিন পিংক উইথ ক্রাশ্‌ড্‌ আইস্‌। ককটেল্‌ সস্‌ এল। রীণা খাবারের কথা বলে দিল।

পুরন্দরের মনে হল, ও একলা বসে আছে। কোনদিক থেকেই অবিশ্যি এখানে ওকে মানাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রীণা ওর দিকে তাকাচ্ছিল। কখনো কখনো, ওদের কথার দু'একটা টুকরো শোনা যাচ্ছিল। অবনীশের অভিযোগ, রীণা পালিয়ে বেড়ায়। দরকার না পড়লে, আসতে চায় না। রীণা কাটান দিচ্ছিল। কখনো অন্যান্য লোকদের নিয়ে কথা হচ্ছিল। পুরন্দর চেষ্টা করছিল, অন্যদিকে চোখ রাখার। মেয়েটি ইতিমধ্যে কয়েকটা গান করেছে, সবাই হাততালি দিয়েছে। পুরন্দর অবিশ্যি দেয় নি, গানের মাথা মুণ্ডু কিছুই ও বুঝতে পারে নি।

খাবার আসবার আগেই রীণা আর অবনীশের আর এক রাউণ্ড

ড্রিংকস হল। তারপরে খাবার এল। পুরন্দরের তখনো জিন শেষ হয়নি। এই প্রথম অবনীশ দয়া করে, পুরন্দরকে বলল, 'কী হল মশাই, সেই একটা জিন নিয়ে বসে আছেন ?

পুরন্দর একটু লজ্জা পেয়ে হাসল। লোকটা এখন রীণার কোলের ওপর এমন ভাবে হাত রেখেছে. এমন হেলে পড়ে শরীরের একটা দিক দিয়ে রীণার বুক ঢেকে দিয়েছে। পুরন্দরের মনে হল, রীণা খুব কায়দা করে, একটু সরবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা অবনীশকে জানতে দিতে চায় না। রীণার মুখ দেখে অবিশ্যি কিছুই বোঝবার উপায় নেই। ও শুনতে পেল, অবনীশ বলছে, য়ু টক অ্যাবাউট হিম উইথ সিনিয়র। বাবা কী বলে শোন। আমার দিক থেকে সব ঠিক আছে।'

বলবার সময় অবনীশ, পুরন্দরের দিকে একবার তাকাল। তারপরে রীণার নরম রুক্ষ চুল, গালের কাছ থেকে আদর করে সরিয়ে দিল। গরম আর সুগন্ধ খাবারের পাত্র ভরে, মস্ত বড় একটা ট্রে নিয়ে বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

খাবার শেষে বিল মেটাল অবনীশ। পুরন্দরের আক্কেল প্রায় গুড়ুম খেয়ে যাবার যোগাড়। তিন জনের খেতে লাগল আশী টাকার বেশী। তার ওপরে বেয়ারাকে পাঁচ টাকা বখশিস। যদিও পুরন্দর এখনো জানে না, কলকাতায় এটা পয়লা নম্বরের বার রেস্তোরাঁ নয়, তাহলে খরচ আরো বেশি হত। ওর কাছে, এটাই অনেকখানি। যে-কোন একজন গরীবের এক মাসের রোজগার। কে জানে, রীণা এখন কি ভাবছে। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে, রীণা যে অসহ্য আর্থিক বৈষম্যের কথা বলছিল, সে কথা ওর মনে পড়ল। দু'ঘণ্টা আগেই হবে, কেন না, খেতেই তো সময় লাগল দেড় ঘণ্টার ওপর।

কিন্তু এসব দেখে পুরন্দরের মনের প্রতিক্রিয়াটা অন্য খাতে বইছে ও ভাবছে, জীবনের এ পর্যায়টা ওর হাতে কি ধরা দিতে পারে না।

জীবনের সমস্ত সুখকে, ক্ষমতাকে, এমনি করে ও কি মুঠোর মধ্যে নিতে পারে না? এই-ই তো প্রতিষ্ঠা, এই তো শান্তি। একই সঙ্গে হতাশা আর আকাঙ্ক্ষার দুই স্রোত, ওর মস্তিষ্কের মধ্যে বইতে থাকে।

বিল মিটিয়ে দিয়ে, অবনীশ রীণাকে প্রায় এক হাতে বেষ্টন করে, বাইরে নিয়ে এল। ওরা দুজনে সামনে বসল। পুরন্দর পিছনে। এবার গাড়ি চালাল অবনীশ। কিন্তু বেশিক্ষণ না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই, অমরাবতীর ইমারতের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়ালে। অবনীশ নামবার আগে, হাতে হাত দিল না, রীণার কোলের কাছে উরুর ওপর একটু চাপ দিয়ে নেমে যাবার আগে বলল, 'তা হলে পরশু দেখা হচ্ছে। তুমি সেইদিনই সিনিয়রের সঙ্গে কথা বল, উই উইল ডিস্কাস ইভেনিং।'

রীণা ভুরু কাঁপিয়ে বলল, অল্‌রাইট, বাই বাই।'

অবনীশ চলে গেল। রীণা ডাকল, 'পুরন্দর, আপনি সামনে আসুন।'

রাণা সরে গিয়ে ষ্টীয়ারিং ধরল। পুরন্দরের ভিতরে ভিতরে সেই বাঁকা হাসি। একজন যাবে, আর একজন আসবে, এই তো দুনিয়ার খেলা। অবিশ্যি, অবনীশ ব্যানার্জির সঙ্গে, পুরন্দরের কোন তুলনাই হতে পারে না। ও পিছন থেকে, সামনে এসে বসল। রীণা গাড়ি চালাল। রীণার চোখে সান গ্লাস। ওর গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সমস্ত মুখেই যেন একটা লালের আভা। ওর বড় করে কাটা ব্লাউজের জন্য, বুক আর কাঁধের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, বুকের কাছেও যেন লাল হয়ে উঠেছে।

পুরন্দর দেখল, রীণা গাড়ি চালাচ্ছে, কিন্তু ওর ঠোঁট দুটো যেন শক্ত আর টেপা। নাকের পাশে একটু কোঁচকানো ভাব, এটা কোন যন্ত্রণার ছাপ, না বিরক্তিকর, পুরন্দর বুঝতে পারছে না। কিন্তু রীণার কিসের বিরক্তি, কিসের যন্ত্রণা থাকতে পারে? পুরন্দরের তো মনে

হচ্ছে, রীণা একটি উড়ন্ত সুখের পায়রা। ও লক্ষ্য করছে, রীণা এখন একটি কথাও বলছে না। মুখ ওর সামনের দিকে ফেরানো। এক জায়গায় ট্রাফিকের সিগন্যাল পেয়ে, ডান দিকে ঘুরে, আবার সবুজ মাঠের এলাকায় গাড়ি নিয়ে গেল। আর ঠিক এ সময়েই রীণার ঠোঁট দুটো যেন বিদ্রূপের হাসিতে বেঁকে গেল, একটা শব্দ করল, 'হুঁ।'

রাস্তায় একটা গর্ত থাকার জন্য গাড়ি দুলে উঠল, রীণার শরীরটাও যেন কেঁপে উঠল। রীণা কেন এরকম হাসল, শব্দ করল পুরন্দর কিছুই বুঝতে পারল না। ও রীণার দিকে সরাসরি দেখছিল না। রীণা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল পুরন্দরবাবু।

'কিসের?'

'এই যাদের দেখলেন, যেখানে গেলেন, এই সব।

রীণা খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে, ওর সমস্ত শরীরটাও যেন হাসতে লাগল। এই মুহূর্তে, একদিকে যেমন পুরন্দর খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল, তেমনি ওর রক্তেও একটা দোলা লেগে গেল। রীণার এভাবে হেসে ওঠায় অস্বস্তি, কিন্তু রীণার শরীরের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম মস্তিষ্কের টনক নড়ল, একটা নেশার মতো লাগল। গাড়িটা পশ্চিম দিকে চলছে, রীণার মুখের খানিকটায় রোদ পড়েছে। পুরন্দরেরও। রীণা সান কভারটা টেনে দিল, তাতে খানিকটা ছায়া পড়ল মুখে। পুরন্দরকে বলল আপনারটারও টেনে দিন।

সান কভার দিতে দিতে, পুরন্দর বলল, 'হাসলেন যে।'

রীণা বলল, 'এমনি।' তারপর আবার বলল, 'হয়তো আপনার মতো করে বলতে পারলেই ভালো।' -

'কিসের?'

'এই যেমন বললেন, 'ভালোই তো' আপনি কি মুখ ফুটে বলবেন, আপনার ভালো লাগে নি? আপনি সমস্ত ব্যাপারটা থেকে ডিটাচড্।'

পুরন্দর মনে মনে ভাবে সম্ভবত জীবনে এরকম কোন ব্যাপারে সে জড়িত হবে না। অবনীশ বা তার বাবার মতো, লোকও হতে চায় না, যদিও একটা অমরাবতীর মালিক হতে আপত্তি কী। কোন কিছুই পুরন্দরের কাছে মন্দ না, দুনিয়াতে সবই ভালো, যদি ওর কোনরকম গায়ে না লাগে, আরো ভালো, যদি কিছু লাভও হয়ে যায়।

রীণা আবার জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু সত্যি ভালো কী?'

পুরন্দর এবার সুর আর কথা বদলাল। একটু সঙ্কোচের হাসি হেসে বলল, 'আমি হয় তো ওসব কিছু বুঝি না।'

রীণা ওর মুখের দিকে একবার ফিরে তাকাল। তারপর বলল, 'কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয়, এটাই নিয়ম।'

সেটা স্বাভাবিক। দেওয়া-নেওয়া নিয়ে জগৎ, তার একটা বিধি ব্যবস্থা আছে। রীণা কী রকম দেওয়া-নেয়ার কথা বলছে, ও বুঝতে পারছে না। কিছু না বলে ও কেবল রীণার মুখের দিকে তাকাল। এই সময়ে ওর চোখে পড়ল আবার গঙ্গা। ঘাটে নোঙর করে আছে, কিছু জাহাজ, নানান দেশের। রাস্তার ধারে, একটা বড় গাছের ছায়ার নিচে, রীণা গাড়ি দাঁড় করাল। এই দুপুরে, আশেপাশে একেবারে নিরিবিলি নেই। কিছু লোকজন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরো কয়েকটা গাড়ি এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে জোড়া মেয়ে-পুরুষও আছে, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই রীণা আর পুরন্দরের মতো

পুরন্দর একটা সিগারেট বের করে বলল, আপনি খাবেন না?'

রীণা গাড়িতে যেন আলস্যে হেলান দিয়ে বলল 'না ভালো লাগছে না।'

রীণা পা দুটো মেলেছিল অ্যাকসেলরেটরের দিকে। মাথাটা এলিয়ে দিল এমন ভাবে, একটু বাঁ দিক করে, খানিকটা পুরন্দরের কাছে সরে এসে, চুলগুলো এলিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ের কাছেই। সান

গ্রাসটা খুলে, চোখ বুজে বলল আমার ঘুম পাচ্ছে পুরন্দর।'

পুরন্দর রীণাকেই দেখছিল, ওর বুকের দোলাটা বাড়ছে! সিল্কের শাড়ির ওর উরুর কাছে টান টান হয়ে আছে, যেন ওর নিচের শরীরের সমস্তটুকু ভাঁজে ভাঁজে ফুটে উঠছে। আঁচল ডান দিকে সরে গিয়ে রীণার বুকের সবখানি দেখতে পাচ্ছে ও। নাভির একটুখানি নিচে থেকে বুকের সীমানা পর্যন্ত, সবটুকুই খোলা। সবই যেন কেমন রক্তাভ দেখাচ্ছে। রীণা কি একটু ঘেমেছে মনে হচ্ছে, ওর সুগঠিত উদ্ধত বুকে যেন জামাটা আরো বেশি লেপটে গিয়েছে। বলল, 'ঘুমোন।'

রীণা আধখোলা চোখের কোণে একবার পুরন্দরকে দেখল। একটু যেন হাসল। পুরন্দর দেখল রীণার চোখ যেন একটু লাল। হয়তো পুরন্দরের চোখও লাল, এখন নিজে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ, এক পেগ জিন খেয়েই ওর রক্তে বেশ একটা আমেজ লেগে গিয়েছে। আমেজটা ও এখনো অনুভব করছে, ওর হাতে-পায়ে, নিঃশ্বাসে, এবং মেজাজেও।

পুরন্দর সিগারেট ধরাল। রীণা সেইভাবে থেকেই অনেকটা সুর-হীন গলায় বলতে লাগল, অর্থের প্রতিপত্তিতে যারা সব কিছু দেখে, তাদের কাছে অপরের কোন কিছুরই দাম নেই। তারা কারোর ইচ্ছার দিকে, মনের দিকে ফিরেও তাকায় না। তারা বোঝে কেবল আদায় আর উশুল। আর আমরা তাদেরই চারপাশে ভিড় করে থাকি, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে।'...

এ বিষয়ে কী বলা উচিত, পুরন্দর জানে না, কিন্তু রীণাকে এই মুহূর্তে দেখে, ওর বাঁকা হাসি বদলে কেমন একটা ছায়া ঘনিয়ে আসে মনে। রীণা যেন এখন আহত আর অবসন্ন হয়ে পড়ে আছে। কথাগুলো সত্যি। রীণা যে কেন বলছে, হয়তো, সেটাও কিছু অনুমান করতে পারছে। কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় সত্যি না, পুরন্দরের সামনে অবনীশের আচরণে, রীণা অপমান বোধ করছে। এরকম

ঘটনা নিশ্চয় নতুন না, এবং অবনীশ রীণার মধ্যে, ভালবাসার কোন প্রশ্ন নেই।

রীণা আবার তেমনি করেই বলল, কিন্তু অর্থ না থেকেও কি সবাই মনে মনে ভালো আছে? আমরা কি তাই আছি? আমরাও অধঃপতিত, আত্মসম্মানের বিনিময়ে সবটাই আপোষ করে বসে আছি। এর জন্যে নিজেদের নিরুপায়, অসহায় বলতেও লজ্জা করে। সবাই সুখের অংশীদার হতে চাই, দুঃখকে ভয় পাই···।'

কথাটা শেষ হল না, বলতে বলতে, রীণা যেন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল। ওর মুখে একটা কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল। রীণা যে সজ্ঞানে কথা বলছে, তা মনে হয় না। ওর এই কথাগুলো যেন পুরন্দরের নিজের কথা বলেও মনে হল। 'সবাই সুখের অংশীদার হতে চাই, দুখকে ভয় পাই···।' দুঃখকে ভয় পায় না কে? সুখের অংশীদার কে না হতে চায়? কিন্তু রীণা কি সেই দলের মানুষ। ওর আবার আপোষের কী প্রশ্ন আছে?

রীণা চোখের পাতা খুলল, দূরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। ওর চোখ রক্তিম, নাকের ডগায়, ঠোঁটের ওপরে, বিন্দু বিন্দু ঘাম। নিজের মনেই বলল, 'বাঁধা পড়েছি ফাঁদে বেরিয়ে আসবার পথ পাই না। কিন্তু কী হবে এসব ভেবে। অমুকদের বিবেক নেই, আমার আছে, এও সত্যি নয়, তবে—।

ঘাড়ে ঝাঁকানি দিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল রীণা। পুরন্দরের দিকে ফিরে বলল, জানেন পুরন্দর বাবু, অমরাবতীর ডি, কে. মুখার্জি একটা পার্টিতে মাতাল হয়ে, নিজের মেয়েকেও চিনতে পারেনি, ছুটে ধরতে গিয়েছিল। আর আমি তো তার কাছে··।'

কথা শেষ না করে, সোজা হয়ে বসল রীণা। গালের ওপর এসে পড়া চুলের গোছা, মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'যাক গে, এসব কথা আলোচনা করে কী হবে! আপনাকে বিরক্ত করা হচ্ছে।'

পুরন্দর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, বিরক্ত কিসের, আমি

আপনার কথাগুলোই শুনছি।'

পুরন্দর শুনছে ঠিকই, কিন্তু ওর কোথাও বাজছে না। কেবল রীণার জন্যই, ওর মনে যা একটু ছায়া ঘনাচ্ছে। জীবন সম্পর্কে কোন নীতিকথা ওর শুনতে আর ভালো লাগে না। ডি, কে, মুখার্জি যা করেছে, তার জন্য লোকটার মাথা হয়তো থেত্‌লে দিলে ভালো হত, কিন্তু অমরাবতীর মালিক সে, সেটা অনেক বড় কথা।

রীণা বলল, 'অনেকদিন অমরাবতীতে যাইনি, ডি, কে, বা এ, কে, কোন ব্যানার্জির সঙ্গেই বেশ কিছুদিন দেখা সাক্ষাত ছিল না। আমার এক দাদা প্রথম আমাকে, অমরাবতীর ডিরেক্টরদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। আমার সেই দাদা এখন, অমরাবতীর অ্যাড-মিনিষ্ট্রেশনে আছে।'

বলে রীণা ঘাড় বাঁকিয়ে, পুরন্দরের দিকে চেয়ে চোখের পাতা নিবিড় করল। যেন কিছু বলতে চাইল, পুরন্দর বুঝতে পারল না। রীণা একটু হাসল, জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলেন?'

পুরন্দর বোকার মতো ঘাড় নাড়ল, কিছুই বুঝতে পারেনি! রীণা জোরে হেসে উঠল, বলল, আপনি এখনো সত্যি ভালো মানুষ।'

পুরন্দরের ভিতরে আবার বাঁকা হাসিটা ফুটে উঠল। কিন্তু রীণার মুখে আবার যেন কষ্ট ফুটে উঠছে দেখা গেল! বলল, 'দাদার পরে বাবী অমরাবতীতে এল, সত্যি বলতে কি বাবীর কাছ থেকে, কোন কাজেরই আশা করে না অমরাবতীর ডিরেক্টররা, তবু মাসে কয়েক শো টাকা দেয়। তাতে অন্তত ড্রাইভারের মাইনে, তেলের খরচটা তো উঠে আসে।

কথাগুলো অন্যদিকে তাকিয়ে বলতে বলতে, রীণা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তারপরে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'পুরন্দর-বাবু আমি আপনার জন্যে অবনীশকে বলেছি। ডি, কে ব্যানার্জিকে সরাসরি না বলে, আগে ওকেই বললাম, যদি অমরাবতীতে আপনার কিছু হয়।'

পুরন্দরের বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। যেন কোন দৈববাণী শুনছে এমনি ভাবে ও রীণার মুখের দিকে তাকাল। এই কথাটা শুনতে চাইছিল, অবচেতনে ওর প্রতি অণু যেন অপেক্ষা করছিল, যে কারণে ও বিস্ময়ে চমকে উঠল না শুধু, হতাশার শুকনো হাতে, সহসা আশার ধারা ছুটে এল। আর এই মুহূর্তেই, ও যেন বুঝতে পারল, রীণা কেন দাদার চাকরি হবার কথা বলল, ওর বাবীর চাকরীর কথা বলল। অমরাবতী থেকে, রীণাকে হয়তো বিমুখ হতে হবে না, এবং এখানে আসবার আগেই, গাড়ী চালাতে চালাতে রীণা বলেছিল, 'কিছু নিতে হলে, কিছু দিতে হয়।' সেই কথাটারও একটা অস্পষ্ট কিন্তু নিষ্ঠুর অর্থ যেন অনুমান করতে পারল।

রীণা তখনো বলছিল 'বাবী যে কিছু করতে পারবে না, আমি জানি। অথচ আপনি উদ্বেগে আর অশান্তিতে আছেন, বুঝতে পারছি!'

এই মুহূর্তে মনে হল, পুরন্দর রীণার পায়ে হাত দেবে। যদিও অতটা নাটকীয়তা করতে ওর লজ্জা করল। বলল, 'কী বলব বুঝতে পারছি না। আপনি আমার জন্যে এতটা করবেন?'

রীণা পুরন্দরের দিকে তাকাল। পুরন্দরের চোখের দিকে, ওর মাথা থেকে পা পর্যন্তই যেন রীণা একবার দেখে নিল! রীণার চোখে যেন একটা মুগ্ধতা। সত্যিই কি ওকে রীণার ভালো লেগেছে? বিশেষ কোন পুরুষকে, বিশেষ করে ভালো লাগার মতো মন কি রীণার আছে না কি। বিশ্বাস হয় না।

রীণা বলল, 'কেন, তাই জানতে যাচ্ছেন?'

পুরন্দর বলল, 'জিজ্ঞেস করার সাহস আমার নেই।'

রীণা পুরন্দরের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, বলল, 'কিছু করতে পারব কী না জানি না, কিন্তু কেন করতে ইচ্ছা করতে, সে কথা আর একদিন বলব।'

বলেও রীণার চোখ সরাতে এক মুহূর্ত দেরী হল। তারপর বলল,

'নাউ ইট ইজ টাইম টু গো হোম, লেট আস মুভ।'

রীণা গাড়ি স্টার্ট করে, ঘুরিয়ে নিল। পুরন্দরের মনে অনেক কথা তোলপাড় করছিল। বিশেষ করে, একটা আশা-ই বেশি করে মনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছিল। প্রেম, ভালো লাগা, ভালবাসা, সব নিপাত যাক, যেভাবেই হোক, প্রতিষ্ঠার রাজ্যে একটা অনুপ্রবেশ চায় ও। ও বারে বারেই চোখ তুলে তুলে রীণাকে দেখতে লাগল।

রীণা বাড়ির কাছে এসে গাড়ি গ্যারাজে না তুলে, বাঁধানো চত্বরে ঢুকিয়ে দিল। কোথা থেকে যেন ড্রাইভার এগিয়ে এল। রীণা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'গাড়ি নিয়ে, বাবীর কাছে চলে যাও।'

পুরন্দর নেমে এল। কলিং বেল টিপল। চাকর এসে দরজা খুলে দিল। দু'জনেই ওপরে এল। রীণা পুরন্দরের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। বলল, 'এবার শুয়ে একটু বিশ্রাম করুন।'

পুরন্দর একেবারে চুপচাপ থাকতে পারছিল না। হঠাৎ বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'নির্ভয়ে।'

'কিছু নিতে হলে, কিছু দিতে হয়। আমি কী দেব, কিছু তো নই।'

রীণা পুরন্দরের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। পুরন্দরের চোখের দিকে তাকাল। রীণার চোখ দুটি ঝকঝক করে উঠল, অনেকটা নিচু স্বরে বলল, 'এরকম একটা লম্বা-চওড়া পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কলকাতায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সে আমায় কী দিতে পারে?'

পুরন্দর অবাক দ্বিধায় তাকিয়ে রইল, কিছু বলতে পারল না। রীণা আরো এগিয়ে, পুরন্দরের গায়ে ওর নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলল, 'য়ু আর এ কিলার, য়ু ক্যান কিল মী।'

বলেই, আঁচলের স্পর্শ দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। পুরন্দর

বোঝা না বোঝা একটা অবস্থার মধ্যেও যেন একটা কী অনুভব করল, যা ওর মুখেচোখে একটা ঝলক এনে দিল।

তারপরে প্রতীক্ষা। পুরন্দরের সবই মনে ছিল। রীণার সঙ্গে, 'পরশু দিন' সন্ধ্যায় দেখা হবে অবনীশের, সে কথা মনে ছিল। তার আগেই দিনের বেলা, ডি. কে, মুখার্জির সঙ্গে কথা হবে।

সেই 'পরশু' যখন এল, পুরন্দরের দিনটা যেন আর কাটাতে চায় না। সকাল থেকেই, রীণা বাড়ির বাইরে। গতকাল রীণা অনেকক্ষণ ঘরে বসে পুরন্দরের সঙ্গে কাটিয়েছে। সম্ভবত তা নিয়ে বাড়িতে সবাই একটু অবাকও হয়েছে। তার আগের দিন, ওরা দু'জনে বেরিয়েছিল, তাতেও রীণার মা অরুণা হয়তো একটু অবাক হয়েছেন। দু'দিন ধরে টিনি যেন কেমন করে পুরন্দরের দিকে তাকাচ্ছে। যেন, এতদিনে একটু পাত্তা দেবে কী না ভাবছে। টিনিকে ওর ঠসকী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। আর ফ্রকপরা টিনি যে মনেপ্রাণে, কোনদিকেই আর টিনি নেই, সেটা ও বোঝে।

আজ সকালে যাবার সময় রীণা জানিয়ে গিয়েছে, যত রাত্রেই ফিরুক, সে একবার পুরন্দরের দরজায় 'নক' করবে। পুরন্দর একবার বিকেলে বাইরে গিয়েছিল, বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি। তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এসেছে। তাছাড়া রাস্তায় বেরাতে ওর ইচ্ছা করে না। পাড়ার রকের বা দোকানের ছেলেগুলোর ব্যবহার দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠেছে। কী করে ওদের সঙ্গে মেশা যায়, সেটা ও জানে না, অথচ ওদের ব্যবহার ঠিক যেন বেপাড়ার কুকুর দেখার মতো। ঘরে একলাই ও থাকে ভালো।

কিন্তু রাত্রি দশটায়, খাওয়া দাওয়া মিটে যাবার পরেও, রীণা ফিরে এল না। অরুণা জিজ্ঞেস করেছিল রীণা আজ কোথায় গিয়েছে, ও জানে কী না। রীণা যখন ওর মাকে জানিয়ে যায় নি, তখন পুরন্দরও সত্যি কথা বলতে পারেনি। ও বলেছে, জানে

না। ও ঘরের মধ্যে কেবল পায়চারি করছে, বসছে রীণা কখন আসবে।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়, একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই, কলিং বেল খুব আস্তে একবার বাজল। পুরন্দর নিজেই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখল, চাকরটাও আসছে। ও বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

চাকরটা ফিরে গেল। পুরন্দর নেমে গিয়ে, দরজা খুলে দিয়ে দেখল দরজার চৌকাঠের ওপর হাত রেখে রীণা দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে পুরন্দরকে দেখে, রীণা অবাক হল, চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল, বলল, পুরন্দর।'

পুরন্দর দেখল, রীণা ক্লান্ত, চোখের কোল বসা, কিন্তু চোখ লাল, মুখে হালকা মদের গন্ধ। ঠোঁটে-মুখে, কোথাও রঙ নেই, কেবল চোখের কাজল ছাড়া। রীণা ঢুকে এল। পুরন্দর দরজা বন্ধ করে দিল। রীণা পুরন্দরের একটা হাত ধরল। হাত ধরেই পুরন্দরের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে উঠে পুরন্দরের ঘরে এল। রীণার গায়ের ছোঁয়া ওর গায়ে লাগছে। কিন্তু, আসল সংবাদটা না শোনা পর্যন্ত এই স্পর্শের মাদকতা যেন ওকে তেমন নাড়া দিচ্ছে না। কেবল এইটুকু টের পাচ্ছে, রীণার গা-টা গরম।

পুরন্দরের ঘরের মধ্যে ঢুকে, হাত ছেড়ে দিয়ে, রীণা পুরন্দরের কাঁধে একটা হাত রাখল মুখোমুখি হয়ে। বলল, সরি পুরন্দর, ওয়ান ডে মোর, ডে আফটার টু মরো, আর একটা পরশু। ডি, কে,-র সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্ট আছে, সেইদিন ফাইনাল জানা যাবে কী হবে।'

এক মুহূর্তের জন্য পুরন্দরের মুখে ছায়া ঘনিয়ে এলেও, তবু একটু আশা যেন জাগল। পরশু দিন নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়ে যাবে। ও বলল, 'ঠিক আছে, তাতে কী? আমি আপনার জন্য ভাবছিলাম, অনেক রাত হয়ে গেল।'

'রিয়ালি, পুরন্দর।'

রীণা মুখ তুলে, পুরন্দরের দিকে তাকাল। পুরন্দরের মনে হল, রীণা এমনভাবে মুখ তুলে রয়েছে, যেন ওর নিঃশ্বাস আটকে আসছে, গলাটা শুকিয়ে উঠছে। ও ঢোক গিলল। রীণা আস্তে আস্তে মাথটা নিচু করল, পুরন্দরের কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে বলল, 'যাচ্ছি।'

রীণা আস্তে আস্তে চলে গেল ঘর থেকে। কিন্তু যাওয়াটা যেন কেমন, যাওয়ার মতো যাওয়া নয়। যেতে যেন রীণার কষ্ট হচ্ছিল। পুরন্দরের বুকের মধ্যে কেমন ধক ধক করছিল। ইচ্ছা করছিল, রীণাকে হাত ধরে একটু বসিয়ে দেয়। সাহস পায়নি। ও ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার একটা 'পরশু' এবার ডি. কে. র সঙ্গে কথা। ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। গত পরশু দিন, দিনের বেলা ডি, কে, সোজাসুজি কিছু বলেন নি। কেবল, পুরন্দরকে নিয়ে কিছু ঠাট্টা-তামাশা করেছেন রীণার সঙ্গে, তারপরে বলেছেন, এসব কথা অফিসে বসে হয় না, রীণার সঙ্গে বাইরে গিয়ে হবে। তবে রীণার প্রস্তাব কি ডি, কে কখনো নাকচ করেছেন? অতএব রীণা যেন নিশ্চিন্ত থাকে, এবং পারলে জুনিয়র এ, কে, ব্যানার্জির সঙ্গে একটু কথা বলে রাখে যেন।

বাবা-ছেলে কেউ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে নেই। অবনীশের সঙ্গে কথা বলাই ছিল। রীণা এ কথা অবনীশকে জানায় নি, ডি, কে-র সঙ্গে একটা সন্ধ্যায় সে কোথাও গিয়ে কথা বলছে। ও অবনীশের সঙ্গে সন্ধ্যায় দেখা করে বলেছে, ডি, কে, আমাকে তিন-চার দিন বাদে সব জানাবেন। তবে তোমার সম্মতিটা আমাকে নিয়ে রাখতে বলেছেন।'

রীণার পক্ষে, কাউকেই সত্যি কথা বলবার উপায় ছিল না, একমাত্র পুরন্দরকে ছাড়া। যদিও, পুরন্দরকে রীণা একথা মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারেনি, ডি, কে, বা এ, কে, র সঙ্গে সে কোথায় যায়, ও কী করে। পুরন্দর মনে মনে কল্পনা করতে পারে। তাতে ওর মন বিমর্ষ হয় বটে, কিন্তু তারপরেই ভাবে, রীণা সব কিছুই তার নিজের মতো করছে। এতে পুরন্দরের কিছু বলবার নেই।

আজ আবার সেই আর একটা 'পরশু'। আজ রাত্রি দশটা বেজে কয়েক মিনিটের মধ্যেই, কলিং বেল বাজল! আজ পুরন্দরের আগে, চাকরই দরজা খুলে দিল। পুরন্দর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। রীণা সিঁড়ি দিয়ে আজ তাড়াতাড়ি উঠে এল। পুরন্দরের পাশ ঘেঁষে পুরন্দরের ঘরেই ঢুকল। পুরন্দরও ঘরে ঢুকল, দেখল, রীণা ওর হাতের ব্যাগটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে, বেড কাম-শোফার ওপর বসে, মাটির দিকে চেয়ে আছে। মুখ না তুলেই বলল, 'দরজাটা ভেজান থাক।'

পুরন্দর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রীণার দিকে তাকাল। রীণা মুখ তুলল না কিন্তু বুঝতে পারল, কিছু একটা গোলমাল। ওর চোখ দুটো কেমন জ্বলছে, ঠোঁটে ঠোঁট টেপা। পুরন্দর আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এখন পুরন্দরের মনে যেন কেমন একটা অপরাধ বোধ জেগে উঠেছে।

রীণা পুরন্দরের দিকে মুখ তুলে তাকাল। একটু মদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তুলনায়, রীণার চোখমুখ যেন আরো বেশি লাল। রীণা হাত দিয়ে ওর পাশের জায়গায়টায় পুরন্দরকে বসতে ইঙ্গিত করল। ও বসল। রীণা ওর দিকে চেয়ে প্রথমেই বলল, 'অমরাবতীতে কিছু হবে কিনা আমি বুঝতে পারছি না।'

পুরন্দর কোন কথাই বলতে পারল না। রীণা আবার বলল 'বুড়ো ভাম্ ডি, কে আজ সাইটিকার ব্যথায় ককাচ্ছিল, অথচ ড্রিংক করছিল। এতক্ষণ কাটিয়ে তারপরে বলল, চল রীণা, দু' একদিন

বাইরে কোথাও ঘুরে আসি, তখন তোমার এই পুরন্দরের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' আমি অবিশ্যি বলেছি, মায়ের অসুখ, বোনের অ্যাকসিডেন্ট,এ সময়ে কলকাতা ছেড়ে আমার নড়বার উপায় নেই। আসলে, এ, কে, কোনরকমে যদি জানতে পারে, ডি, কে,-র সঙ্গে আমি বাইরে গেছি, তাহলে এমনিতেই সব কেঁচে যাবে। বুড়োর মতলবও আমি কিছু বুঝতে পারছি না, হি ওয়ান্টস্ টু মেক মী হেল্। কিন্তু কিন্তু—'

রীণা থেমে গেল পুরন্দর শুনছে, কিন্তু হতাশা ছেয়ে এসেছে ওর ভিতরে। রীণা একটু নড়ে বসল, যেন শক্ত হয়ে উঠল। বলল, 'কিন্তু আমিও থামব না, প্লীজ ডোন্ট মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মী।'

পুরন্দর বলল, 'না না আপনাকে কেন মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ড করব? আপনি এত করছেন!'

রীণা হঠাৎ বলল, সেদিন বলব বলেছিলাম, কেন কিছু করতে চাই। পুরন্দর, এ পর্যন্ত কারোর জন্য কিছু করেই তৃপ্তি পাইনি, খুশি হইনি, কারণ সেইসব করার মধ্যে কোন আনন্দ ছিল না। কিন্তু আমি এমন একজনের জন্যে করতে চাই, যাকে আমি প্রথম থেকে গড়ে পিটে, একটা জায়গায় তুলতে পারি। কোন চালবাজ-স্বার্থপর এই শহরের ভণ্ডকে না। পুরন্দর—'

রীণা তাকাল। রীণার চোখেমুখে একটা আবেগ যেন টলটল করছে। বলল, 'তুমি সেই লোক। নতুন এই শহরে, তোমার ভয়, অসহায়তা, পরের বাড়িতে থাকবার গ্লানি, তোমার আকাঙ্ক্ষা, সব মিলিয়ে আমার মনে হয়েছে, তুমিই সেই লোক। আমাদের চারপাশের ব্যাধি, এখনো তোমাকে ছোঁয়নি। য়ু আর ফ্রেশ ফ্রম ফার বেঙ্গল। নাই বা হল অমরাবতীর কোন অ্যাডমিনিস্ট্রাল সার্ভিস, আরো পথ আমার জানা আছে।'

রীণার কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল, পুরন্দরের হতাশার অন্ধকারে যেন একটু আলোর ঝলক লাগল। ও রীণার দিকে তাকাল। রীণা

ওর এত কাছে, এত কাছে রীণার মুখ, নিঃশ্বাস লাগছে।

রীণা হঠাৎ পুরন্দরের ঢেউ খেলানো শক্ত ঘন চুলের মুঠি আলগা করে ধরল, প্রায় চুপিচুপি স্বরে বলল, 'কিন্তু এই সব না, তোমার জন্যে কেন করব, তার আর এক কারণ, তুমি, তুমি, তোমার দিক থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি না পুরন্দর।'

রীণার চোখ প্রায় বুজে এল। আর এই প্রথমে পুরন্দরের মুখ থেকে রীণার নামটা ভিন্ন সুরে উচ্চারিত হল, 'রীণা।'

'পুরন্দর, আমার চারপাশে যে সব পুরুষেরা ঘুরে বেড়ায়, তাদের দিকে আমার আর চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তোমার দিকে আমি পুরো চোখ মেলে চাইতে পারি।'

রীণার আর এক হাত উঠে গেল পুরন্দরের গালে। রীণা ওর মুখ তুলে নিয়ে এল পুরন্দরের মুখের কাছে। পুরন্দর দু' হাতে রীণার মুখটা ধরে বলল, 'আমি যেন বিশ্বাস করতে পারি না।'

'পুরন্দর, সেটা তোমার ভীরুতা না, সততা।'

বলেই রীণা পুরন্দরের ঠোঁট স্পর্শ করল। পুরন্দর দু' হাতে রীণাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু আশ্চর্য, পুরন্দরের মনে হল, সেই বাঁকা হাসিটা যেন কোথায় ঝিলিক হানচে ওর ভিতরে।

দশটা দিন তারপরেও কাটল। রীণা মুখে কিছুই বলে না। রোজই একবার করে রাত্রে পুরন্দরের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু রীণার মুখের চেহারা দেখে বোঝা যায়, ও নিশ্চেষ্ট বসে নেই তো বটেই, ভীষণ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। যদিও পুরন্দরের মনে একটা হতাশা, তবু এখন দেখা হলে, উদ্বেগের সঙ্গে করুণা বোধ জাগে। সারা দিন পরে, রীণা এসে ওর হতাশ বুকটার কাছেই ভেঙে পড়ে, যেন হাঁপাতে থাকে নিঃশ্বাসে পানীয়ের গন্ধ চিনতে ভুল হয় না। রীণার রক্তিম চোখে হতাশাটা ঢাকা পড়ে থাকে, একটা জেদের জ্বালায়। অমরাবতীই ওকে এমন পাগলের মতো ছুটিয়ে দিয়েছে। পুরন্দরের কিছু বলবার থাকে

না। কেননা রীণাকে কিছু বলে লাভ নেই। রীণা এখন নিজের গতিতে নিজে ছুটেছে। পুরন্দরের যা অবস্থা, তাতে ওর বলবারই বা কী থাকতে পারে?

দশ দিন পরে, রীণা এল এক বিজয় পতাকা উড়িয়ে, যার গায়ে লেখা ছিল, ওয়াধান অ্যাণ্ড রাণ্ডেরিয়ান অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।' চাকরি না, তার চেয়ে বেশ কিছু। হয়তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে পুরন্দরকে। বাঙলা দেশের জেলায় জেলায়, শহরে শহরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে, কিন্তু সফল হবে. চাকরির থেকে অনেক বড় সুযোগ হাতে তুলে নিয়ে এসেছে রীণা নিতান্ত একটা কেরানীর চাকরির কথা, রীণা কখনো চিন্তা করেনি। মানুষের সৃষ্টির প্রেরণার মধ্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে, রীণার কাছে, পুরন্দরের প্রতিষ্ঠা সেই রকম।

'ওয়াধান অ্যাণ্ড রাণ্ডেরিয়ান অ্যাণ্ড কোং-র কাছ থেকে, রীণা পাচ্ছে প্রায় দু'লক্ষ টাকার সম্পদ। এই বিরাট ফার্মের হাতে আছে, বিভিন্ন ধরনের মেসেনারী আর কেমিক্যাল পার্টস, তার মধ্যে, সিঙ্গল আর টু স্টেজের রকমারী রেগুলেটরস্ সিলিণ্ডার বিশিষ্ট ডিজেল এঞ্জিন—বিভিন্ন হর্সপাওয়ার-এর লুমস-লিন্ট ফ্রি-ভাটিকাল হলো শাফ্‌ট, মোটরস, স্টেনলেস্ স্টীলের নানা ইকুইপমেণ্টস্ কমপ্রেশার, হাইড্রলিক ডোর ক্লোজার, ওয়েল্ডার গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফ, ইত্যাদি নানা জিনিস। কোম্পানি রাজী হয়েছে, দু'লক্ষ টাকার মাল দিতে। কোন ডিপজিট নেই, কিন্তু কোম্পানির এজেণ্ট বা রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিসাবে, পুরন্দরকে একটি পয়সাও দেওয়া হবে না, একমাত্র কোম্পানির গুডউইল ছাড়া। মালবহন করা বা ডেলিভারি দেওয়া, পুরন্দর বা তার পার্টির মধ্যেই ব্যবস্থা হবে, কোম্পানী কোন দায়িত্ব নেবে না। তুলনায় অবিশ্যি, কমিশন অনেক বেশি, অত্যন্ত লোভনীয়।

কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার, এত টাকার মাল, অথচ কোন ডিপজিট বা চুক্তি নেই, ব্যাপারটা বিস্ময়কর। আর সেই বিস্ময়ের যে আঘাত, তার দাগগুলো আছে রীণার শরীরে, রীণার জীবন মন, সব কিছুর মধ্যে। ওয়াধান কাশ্মীরের থেকেও বেশি সিন্ধি। তার জন্ম-কর্ম সবই সিন্ধুতে। রাওেরিয়ান সুরাট মুসলিন, পার্টনার হিসাবে, সে কোম্পানীর খুব অ্যাকটিভ পার্টনার না। কলকাতার ব্যবসা, শ্রীওয়াধানই দেখা শোনা করে, কর্তা ব্যক্তি। রীণার সঙ্গে এই লোকটির একদা পরিচয় হয়েছিল, কোন এক ক্লাবে। পরিচয়টা অবিশ্যি করিয়ে দিয়েছিল, অমরাবতীর জুনিয়র ব্যানার্জি। ওয়াধান রীণাকে নাচের আহ্বান জানিয়েছিল। অনিচ্ছাতেও ভদ্রতার খাতিরে ওয়াধনের সঙ্গে ওকে নাচতে হয়েছিল। ওয়াধানের হাত ধরা আর উত্তাপ আর চোখের দৃষ্টিতেই তার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল রীণা। তাছাড়া ওয়াধান নাচতে নাচতে বাঙালী মেয়েদের, বিশেষ করে রীণার মতো মেয়ের অনেক স্তুতি করেছিল। জানিয়েছিল, রীণার মতো মেয়ের সঙ্গে, আরো ভালো করে পরিচয় হলে ওয়াধান স্বর্গরাজ্যে যাবার মতো সুখী হবে।

পুরন্দরের জন্য ওয়াধানকে সেই স্বর্গরাজ্যের সুখ দান করে নতুন দান নিয়ে এসেছে রীণা। শেষমুহূর্তে ওয়াধানের কথাটাই বিদ্যুৎ চমকের মতো রীণার মনে পড়ে গিয়েছিল।—'ইফ ইট ইজ ইওর কেস্ আই অ্যাম ফর ইউ।'

তারপরেই শুরু হল পুরন্দরের নতুন জীবন। পরদিনই রীণা ওকে নিয়ে গেল প্রথমে সাহেবপাড়ার দর্জির দোকানে। হাল ফ্যাশানের টেরিলিনের স্যুট অর্ডার হল। ওয়াধানের সঙ্গে পরিচয়, মালপত্র রিসিভ করাই সই সাবুদ লিষ্ট তৈরি হল তিন দিনের মধ্যেই পুরন্দরের গোটা আদলটাই গেল বদলে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাহেব, হাতে সুদৃশ্য ব্যাগ। ওয়াধান অ্যাণ্ড রাওেরিয়ানের এজেন্ট। কাজকর্ম বুঝে নিতে কয়েকটা দিন সময় লাগল। পুরন্দরের নিজের নামে কার্ড ছাপা

হল। বাঙলা দেশের বিভিন্ন জায়গায়, ব্যবসায়ী আর ডিলারদের কাছে ওর নামে ছাপা চিঠি গেল।

কলকাতার কাছে পিঠে, কয়েক দিন রীণা নিজে পুরন্দরের সঙ্গে ঘোরাফেরা করল। তার পরেই অন্যান্য জেলায় বেরিয়ে পড়ল পুরন্দর একলা। রীণাকে কলকাতায় থাকতেই হবে। কেবল সান্ধ্য কলেজের চাকরি না, ওয়াধানের মর্জি। ওয়াধানের একটা মূল্য তো চাই।

ছ' মাসের মধ্যে পুরন্দর গোটা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে ফেলল। ওর মাথায় ওয়াধান নেই, রীণা নেই, লক্ষ্য একদিকে—প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা চাই, অর্থ চাই। সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে হবে। এবং করলও তাই। এক বছরের মধ্যে, ওর লিস্টের অন্তর্ভুক্ত দু'লক্ষ টাকার মাল বিক্রি হয়ে গেল। এক লক্ষ বাষট্টী হাজার টাকা কোম্পানির নামে জমা পড়ল, যেটা তাদের পাওনা। পুরন্দর দেখল, ওর সমস্ত খরচখরচা বাদ দিয়ে সত্তর হাজার টাকা ওর নামে ব্যাংকে জমেছে, এক বছরে।

এই এক বছরের মধ্যে, পুরন্দরের নিজের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার হয়নি, কারণ ওকে রীণাই দেখছিল। কিন্তু রীণার দিকে চেয়ে দেখবার সময় বা মন, কোনটাই পুরন্দরের হয়নি। সুযোগ পেলেই রীণা ওকে নিয়ে সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছে। ঘুরেছে, বেড়িয়েছে, খেয়েছে আর পুরন্দরের কাছে, নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কেননা, পুরন্দর ওর অনেক মূল্যের সৃষ্টি, পুরন্দরকে ও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পুরন্দর রীণার সঙ্গে ঘুরেছে, বেড়িয়েছে, যা চেয়েছে রীণা, কোন কিছুতেই বাধা দেয়নি, কিন্তু গভীর অন্যমনস্কতা ওকে অন্যদিকে টেনে রেখেছে যেন। মনের ভিতরে সাড়া নেই, অথচ একটা অন্য জগতের বেগের সঙ্গে, রীণা কেবল ভেসে চলেছে। রীণাদের বাড়িতে পুরন্দরের খাতির বেড়েছে। টিনি এখন বাঁকা চোখে চেয়ে, কোমর ঘুরিয়ে চলে যায় না। মণীন্দ্রবাবু এবং অরুণা যেন বিশেষ সুরে ওর সঙ্গে কথা বলে।

ওয়াধানও খুশি। সে ব্যবসায়ী। যে ভয়টা তার ছিল, পুরন্দরকে নিয়ে, সে ভয় আর তার নেই। শুধু তাই না পুরন্দরের প্রতি তার একটা বিশেষ লক্ষ্য পড়ল। এদিকে হাতে রইল রীণা। সে আবার পুরন্দরকে মাল দিল। পুরন্দর নিজেও ব্যবসায় ব্যাপারটা, এক বছরে অনেকখানি বুঝে নিয়েছিল। এবার ছ'মাসের মধ্যে, একবছরের কাজ করল সে। এবার ও আগরতলা আর আসামের দিকেও কিছুটা অগ্রসর হয়ে কাজ করল।

ওয়াধান দেখল, পুরন্দর শুধু বিশ্বাসের মর্যাদাই রাখেনি, তাছাড়া ওকে মাইনে দিতে হয়নি, এজেন্ট হিসাবে কোন খরচ দিতে হয়নি, কিন্তু ও কোম্পানির ঘরে টাকা তুলে দিয়েছে। তাতে, পুরন্দরও ভালো টাকাই রোজগার করেছে। দেড় বছরে, বেশ ভালো টাকা। ওয়াধান খুশি হয়ে, তার অফিসেই. পুরন্দরের জন্য একটা চেম্বার করিয়ে দিল। টেলিফোন ব্যবহারের অধিকার দিল। আর উপদেশ দিল 'কারোর বাড়িতে থেকে দরকার নেই. নিজে ফ্ল্যাট নাও। ছোট একটা গাড়ি কেন, নিজে ড্রাইভিং শেখ, সেলফ ড্রাইভ কর! এখন থেকে ইনকাম-ট্যাক্স পে কর, হিসাব করবার ব্যবস্থা আমি সব করে দেব। সব টাকা ব্যাংকে রাখবার দরকার নেই। আর আর, বাজে মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়, ওরকম মহব্বত জীবনে অনেক হবে।

ওয়াধানের নির্দেশগুলো, কোনটাই বুঝতেই ভুল হল না পুরন্দরের। প্রায় সব ক'টা নির্দেশই ও পালন করল। কিন্তু রীণার পায়ের মাটি কাঁপতে লাগল। ও আর পুরন্দরকে ধরতে পারে না। পিছনে ছুটতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে। পুরন্দর আজ মর্নিং ফ্লাইটে দার্জিলিং চলে যাচ্ছে। কাল ইভনিং ফ্লাইটে চলে যাচ্ছে গৌহাটিতে। ওয়াধানও রীণার জন্য বিশেষ ব্যস্ত না এখন। রীণা অবিশ্যি সেটা চায়ও না। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে যে-বিগ্রহকে ও প্রতিষ্ঠা করেছিল, দেখল, সে মন্দির শূন্য। বিগ্রহ নেই। তথাপি, পুরন্দরকে ও অবিশ্বাস করবে

কেমন করে। সে তো অবিশ্বাসের পাত্র হতে পারে না। কাজের নেশায় সে রীণাকে ভুলেছে, রীণার তা-ই বিশ্বাস।

পুরন্দর জানি, ওর প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি এখনো অনেকখানি ওয়াধানের হাতে। ও ঠিক করে নিয়েছে, বাড়িতে মাসে ছ'শো টাকা পাঠিয়ে যাবে। বোনদের বিয়ের জন্য এককালীন দশহাজার টাকাও বাবাকে দিয়েছে। ফ্ল্যাট নিয়েছে, গাড়ি নিয়েছে। ওয়াধানকে ওর ভালো লেগেছে। কোন কারণেই ওয়াধানকে ত্যাগ করতে চায় না। হয়তো স্বাধীন ভাবে কিছু করতে পারে। ওয়াধান বাধা দিলে, ক্ষতি হতে পারে। সে সব ও ভাবতে চায় না।

কিন্তু রীণাকে ওর আর ভালো লাগছে না। নিজেই এখন রীণাকে এড়িয়ে চলতে চায়। মিথ্যা কথা বলে, পালিয়ে, বেড়ায়। তবু রীণাকে সরানো যাচ্ছে না।

তার থেকেও বড় কথা, ওয়াধানের শালীর মেয়ে, অমৃতা ধীলনের সঙ্গে, পুরন্দরের পরিচয় হয়েছে, এক পারিবারিক পার্টিতে। পরিচয়টা ক্রমে অনেক দূর এগিয়ে চলেছে। রীণা যেটা পারেনি, অমৃতা ওখন তাই পারে, পুরন্দরকে নাচ শেখায়। ছ'জনে বেড়াতে যায়। ক্লাবে হোটেলে, ক্যাবারে-তে। বাইশ বছরের সুন্দরী অমৃতার দিকে চেয়ে, শুধু যে চোখে মনে মাতাল হয় পুরন্দর, তা-ই না। ব্যবসার ভবিষ্যতের যোগসূত্রটাও মাথার মধ্যে পাক খায়।

ওয়াধান পরিবারের মতো ধীলন পরিবার বড়লোক না, তবে গরীবও না। পরিবারের মধ্যে প্রদেশ-বিদ্বেষের অনুদারতা নেই। ওয়াধানও সম্ভবত সেই মনোভাব পোষণ করে। তিন বছরে পুরন্দর যা করেছে. তাতে ছেলেটি প্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে. অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজও বুঝতে শিখেছে। এখন বেশ কিছু লোক, ওর কাছে কাজ করছে। পুরন্দরের সঙ্গে একটা নতুন ফার্ম খুললেও মন্দ হয় না।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন পুরন্দর ওর বাবার কাছ থেকে চিঠি

পেল, ও যে রীণাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করেছে, এতে বাবা মা সবাই খুশি মণীন্দ্রবাবু আর অরুণাও, সব জেনে যেচে প্রস্তাব দিলেন। টিনি তো এখন, রীণাকেও না জানিয়ে, কলেজে যাবার বদলে পুরন্দরের ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠে।

পুরন্দর যত রীণার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, রীণা তত ওকে আঁকড়ে ধরে। রীণা ওকে, বলেছে, পুরন্দরের পরে, রীণার জীবন বলে কিছু থাকতে পারে না। রীণা ওর বাবার জন্য, ভাইয়েদের জন্য সব কিছু করেছে। সবই বৃথা। ও নিজে কিছু পায়নি। সমাজ পরিবার শহর, সব কিছুর ওপরে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবার পরে, পুরন্দর ওর সামনে এসেছে। পুরন্দরের প্রতিষ্ঠাকে নিজের প্রতিষ্ঠা বলে জেনেছে।

পুরন্দর একটা কাজ পারে না, রীণাকে মুখোমুখি কথা বলে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তাছাড়া কলকাতার সমাজ এটা যেন একটা স্বতঃসিদ্ধান্ত হিসাবেই নিয়েছে, ওর সঙ্গে রীণার বিয়ে পুরন্দরকে তাই একথাও ভাবতে হল, অন্য কোন উপায়ে রীণাকে ওর জীবন থেকে সরানো যায় কি না। অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুর চিন্তাও ওর মাথায় পাক খেতে লাগল। অন্যদিকে অমৃতা ধীলনের জোয়ারে, ও ভেসেই চলল।

কিন্তু এ অবস্থাটা বেশিদিন গেল না। ওয়াধান মত পরিবর্তন করেছে। তার একটা বিশ্বাস হয়েছে, রীণাকেই নিশ্চয় পুরন্দর বিয়ে করবে! শুধু এই একটা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার মালের একটা কাগজ তৈরি করল, যার কোন হিসাব পুরন্দরের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। যদি হিসাবটা ঠিক মতো পাওয়া যায় তাহলে, ইনকাম-ট্যাক্সের কাছে, গুরুতর অপরাধের দণ্ড নিতে হবে পুরন্দরকে। যে-অপরাধের মূল্য বাবদ, ওর প্রায় সর্বস্বান্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাছাড়া, অন্যদিক থেকে আর একটা অস্ত্রও সে প্রস্তুত করে রাখল, পুরন্দরের আলাদা কোন অস্তিত্বই নেই, ওয়াধান অ্যাণ্ড রাণ্ডেরিয়ান ছাড়া।

পুরন্দর যথেষ্ট চতুর হওয়া সত্ত্বেও, কয়েকটি দুর্বল দিক ও চিন্তা করেনি বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতার জন্য। কারণ ও নিজে কখনো কখনো কোম্পানির সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করেনি। কিন্তু দু'এক মাসের মধ্যেই, ওয়াধান ওকে এই ব্যাপারে মোটামুটি একটা ইঙ্গিত দিয়ে সাবধান করে দিল।

পুরন্দর ছুটল অমৃতার কাছে। অমৃতা ওকে উপদেশ দিল, 'তোমার সমস্ত ব্যবসাটা দু'জনের নামে করে নাও। ওয়াধান আর তোমার।'

পুরন্দর বলল, 'তা কেন হবে? আমি তো ওয়াধানের কাছে ঋণী নই, আমি স্বাধীন।'

অমৃতা হেসে বলল, 'স্বাধীন কে আছে এই জগতে?'

পুরন্দর বলল, 'বেশ, ব্যবসাটা বরং তোমার আর আমার নামে হোক।'

অমৃতা জানাল, এই একটা ব্যাপারে, আমি আমার মেসোমশায়ের বিরুদ্ধে যেতে পারব না। তুমি জান না, আমাদের ধীলন পরিবারের ব্যবসারও সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা সবই ওয়াধানের কাছে বাঁধা।'

পুরন্দর একেবারে ভেঙে পড়ল। একদা ও ভাবত, যে-পরিবারে ওর জন্ম, যে সমাজে ও মানুষ, সেটাই জীবনের সব থেকে নীচতা এবং দুর্ভাগ্য। সেখান থেকে উত্থান চেয়েছিল ও। উত্থান ঘটেও ছিল, কিন্তু তার ভিতরেও যে এত কঠিন জটিলতা, ভয়ংকরতা আছে, এতদিন বুঝতে পারেনি। আর একটা নতুন সত্যের মুখোমুখি হয়ে, সংসার ওর মুখে আর একটা ছাপ এঁকে দিল। বিড়ম্বিত পরাজয়ের ছাপ।

অমৃতার কথানুযায়ী, ওয়াধানের হাতে পুতুল হয়েই, সব কাজ করল ও। এবার অবিশ্যি, ও কাগজপত্র তৈরির ব্যাপারে নিজে সব দেখল, পরিশ্রম করল, কিন্তু ওকে নামতে হল অনেকখানি। ওর

নিজের টাকা, ওয়াধানের হাতে অনেক চলে গেল, নিজের ব্যবসার কর্তৃত্বও। ফলে, উভয় পক্ষের বিশ্বাস নষ্ট হওয়ায়, পুরন্দরের ব্যবসাটা আসলে, একটা অনিশ্চিত অবস্থায়, ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় রইল। একরকম মৃত-ই বলা যায়।

এদিকে অমৃতার কাছ থেকে আর তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। পুরন্দর হঠাৎ একদিন হিসাব করে দেখল, প্রায় তিন মাস রীণার সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। রীণা আসেনি টিনি এসেছিল, হয়তো কিছু বলত। পুরন্দর এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল টিনির আসাটা ওর চোখে পড়েও পড়েনি।

পুরন্দর এল রীণাদের বাড়িতে। দরজা খোলা পেয়ে, ওপরে গেল। অরুণা ছাড়া কেউ-ই ছিল না। অরুণা-ই বললেন, রীণা একটা মিশনারি পরিচালিত মেয়েদের কলেজে চাকরি নিয়ে, শিলং চলে গেছে।।

পুরন্দর প্রথমে অবাক হল। তারপরে চিন্তা করল, সেই রীণা, যে অমন করে পুরন্দরের পিছনে ঘুরেছে, সে হঠাৎ একটা কথাও না বলে, কেমন করে চলে গেল। এই বোধহয় প্রথম রীণার মুখটা মনে করে, পুরন্দরের বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট বিঁধে গেল। রীণার সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা ছটফট করে উঠল। কয়েকদিন পরে ও নিজেই শিলংয়ে গেল।

পুরন্দর হোটেলে মালপত্র রেখে, বিকালের দিকে, রীণার কলেজে গেল। শহরের ঘিঞ্জি অংশের বাইরে! মাঝারি পাহাড়ের গায়ে কলেজ। মোটর যাবার রাস্তা আছে। কলেজ সংলগ্ন রীণাদের হস্টেল। কিন্তু পুরন্দর খবর নিয়ে জানল, মিস ঘোষ হস্টেলে নেই, মার্কেটিং বা বেড়াতে গিয়েছেন।

পুরন্দর কাছেপিঠে অপেক্ষা করবে মনস্থ করে, কলেজের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে, একটা নির্জন পথে খানিকটা এগিয়ে গেল। দু' পাশে

বড় বড় বার্চ গাছ। পাইন আর দেবদারু কিছু কিছু। পড়ন্ত বেলার রোদ পড়েছে গাছের পাতায়। ছায়াগুলো নিবিড় আর দীর্ঘ। বেশ খানিকটা নিচে একটা খাসিয়া বস্তি। সেখান থেকে ধোঁয়া ওপর দিকে উঠছে।

পুরন্দর থমকে দাঁড়াল। পথের চারে একটা বার্চ গাছের পাশে পাথরের ওপর রীণা বসে আছে। রীণা বলে চিনতে অসুবিধা হয় না, তবে কষ্টকর। শীর্ণ আর বয়স্ক দেখাচ্ছে ওকে। ও একেবারে অন্য মনে দূরের দিকে চেয়ে বসে আছে। পুরন্দর ডাকল, 'রীণা'।

রীণা চমকে উঠে অবাক হয়ে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে, একটু হাসল, বলল, 'এখানে কবে এলে?'

'আজই। থাক থাক' উঠো না, আমিও একটু বসি তোমার কাছে।'

পুরন্দরের চোখে মনে বিস্ময়। রীণা বেশ শান্ত আর নির্বিকার। বেশভূষায় অনেক সহজ, শালীন। হাসিটা এত শান্ত আর স্নিগ্ধ, সেই তীব্র রক্ত চমকানো ঝলক নেই। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে এসেছ নিশ্চয়?

পুরন্দর বলল, 'না। ব্যবসাটা প্রায় ওয়াধানের গর্ভেই গেছে। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

রীণা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, ভাবল। তারপর একটু হাসল, বলল, 'মনে হয়, তোমার মন-টন ভালো নেই। কয়েকদিন বেড়িয়ে যাও। ভালোই লাগবে।'

অনেক চেষ্টা করে, লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে, পুরন্দর বলল, 'তুমি ভীষণ বদলে গেছ রীণা।'

'বদলানো আর কী। কলকাতায় আর ভালো লাগছিল না।'

'আমাকে কি একেবারে ভুলে গেছ?'

রীণা হাসল। বলল, 'তা-ই আবার কখনো ভোলা যায় না কি, কী যে বল।'

পুরন্দরের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। রীণাকে ওর বরফের মতো ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল। তবু বলল, 'আর কি কলকাতায় ফেরা যায় না রীণা?'

'ভালো লাগবে না।'

'আমি জানি রীণা, তুমি সকলের জন্য অনেক কিছু করেছ, কিন্তু—'

রীণা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না না' পুরন্দর ওই কথাটা আর আমাকে বল না। ওটা আসলে আমার মনে একটা মিথ্যা অহংকার আর দাবী তৈরী হয়েছিল। আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম নিজের প্রয়োজনে অন্ধ যুক্তি দিয়ে। তবে সেটা না বুঝেই করেছি। পরে যখন বুঝলাম, তখন মিথ্যেটা বড় হয়ে দেখা দিল। আসলে যা করেছি তা নিজের প্রয়োজনেই কিন্তু ভেবেছি পরোপকারের জন্যে। তা না। আমি আমার নিজেকে তো চিনি।'

'কিন্তু আমি তা মানব কেমন করে?'

'বাস্তব যুক্তি দিয়ে। বাবা দাদারা বা তুমি, তোমাদের সকলের সব কিছুর সঙ্গে আমার নিজের আত্মসন্তোষ আর প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মিশে ছিল। তুমি আজ ভুল ভেবে দুঃখ পেলে, আমার খারাপ লাগবে। আমার আর সেই প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। জীবনকে আমি অন্যভাবে দেখছি।'

পুরন্দর জিজ্ঞেস করল, 'কেন আর সেই প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই রীণা?

'ফুরিয়েছে তাই। আজ অন্য প্রয়োজন আমার।'

'কী সেটা?'

'পিছনের জন্যে দুঃখ নয়, একটু নিজেকে বোঝা, একটু শান্তি!'

'এই কি শান্তি?'

'বিশ্বাস কর' তোমাকে বোঝাতে পারব না?'

'তাহলে আমার কি আর কিছুই তোমাকে বলবার থাকবে না?'

রীণা পুরন্দরের রুক্ষু চুল মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাকবে। তোমার খবর সব সময় দেবে।'

'তাতে তোমাকে পাব না।'

'না। আমরা যে যার পথে চলব। একটা কথা কি জান পুরন্দর, যে যার পথে জয় করে চলবে এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু জয় মানে কি? তাই, আমি যে পথে চলেছিলাম। জয় তো আমার আজ, আমি এখন আত্মজয়ের পথে চলেছি। চল উঠি, অন্ধকার হয়ে এল।'

রীণা সত্যি উঠল। পুরন্দর ওর সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে হোস্টেলের গেট অবধি এল। পুরন্দর কিছু বলতে পারল না। রীণাই বলল, 'কিন্তু পুরন্দর, তুমি খাঁটি নও এ কথা আমি বলব না। তোমার শক্তি আছে। ওয়াধানেরও পাপের কাছে মাথা নত করতে তোমাকে বারণ করব। তুমি তো নিঃস্ব ছিলে, না হয় আবার একবার নিঃস্ব হবে।'

এই রীণার শেষ কথা।

পুরন্দর আবার কলকাতায় ফিরে এল। জীবন তো বসে থাকতে পারে না। আর তা বাধাহীনও নয়ও। নিরন্তর বাধা কাটিয়েই তাকে চলতে হয়। কেবল চলতে গিয়ে প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কাটিয়েই তাকে বিস্ময় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা এবং এমন কি সুখ, সেগুলোকেও সঙ্গী করেই চলতে হয়। কিছুই ফেলে যাওয়া যায় না।

—ঃ শেষ ঃ—